জয়শ্রী

অষ্টম বর্ষ | পৌষ ১৩৪৬ | সপ্তম সংখ্যা

ক্রমবিবর্তনবাদ ও তাহার আধুনিক রূপ

জিতেন্দ্র গোস্বামী

আরিষ্টোটলের সময় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় একটি দুরূহ সমস্যা ছিল—জীব জগতের সীমাহীন বৈচিত্র্য। এই কারণেই কোন প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিভাগীকরণ সম্ভবপর হয় নাই এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে অধ্যাপনাও আরম্ভ হইতে পারে নাই। লিনিঁউস্ (Linnaeus) সর্বপ্রথমে একটি সুবিধাজনক শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অদ্যাপি মূলতঃ সেই পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়াই কাজ চলিতেছে। তাহার নিয়মানুসারে যেকোন জীবের পরিচয়সূচক নাম দুইটি বিভিন্ন কথা দ্বারা প্রকাশিত হইবে। প্রথমটি গণ (genus) নির্দেশক, দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রতর উপবিভাগ জাতি (species) সূচক। যেমন আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম Homo Sapaiens. Homo বলিতে মোটামুটি বিরাট মানুষ গোষ্ঠিকে বুঝায়, এই মানুষ গোষ্ঠির কতক কালক্রমে লুপ্ত হইয়াও গিয়াছে। Sapiens মানে জ্ঞানী। ভূপৃষ্ঠে অধুনা মানুষের যে শ্রেণী বাস করিতেছে তাহা বিরাট মানুষ গোষ্ঠির Sapiens উপবিভাগ। লিনিউস্ সৃষ্টিকে তত্ত্ব হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছিলেন; তাহার প্রতিভা এইদিকে বিন্দুমাত্র আলোকপাত করে নাই। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকেই তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। ভগবান সৃষ্টি কর্তা—বিশেষ দিনে তিনি সমস্ত রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় জীবগণ শুধু বংশবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির দিন হইতে সুরু করিয়া এ পর্যন্ত নূতন কোন জীবের সৃষ্টি হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না এবং প্রত্যেক জীব সৃষ্টির

আদিকাল হইতে আপনার বৈশিষ্ট্য অটুটভাবে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির সেই স্মরণীয় দিবসত্রয়ের (তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ) মধ্যেই.জৈব রাজ্যের আদি ও অকৃত্রিম ধারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পরিবর্তনভীত স্থিতিশীল মনোরম চিত্র বহুকাল পর্যন্ত জীবসৃষ্টির মতবাদ হিসাবে ধর্মপ্রাণ মনীষীবৃন্দের মনোহরণ করিয়া অধিষ্ঠিত ছিল। লিনিউসের প্রতিভা যে এদিকে আলোকপাত করে নাই সে জন্য দায়ী তাহার কাল ও পারিপার্শ্বিক। কি করিয়া নূতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে, কি করিয়া প্রাচীন জীব চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, প্রাচীন হইতে নূতনের মধ্যে ধারা সংক্রমণের নিয়ম কি ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালে এত কম তথ্য জানা ছিল যে এই সব বিষয়ে একটী বিশিষ্ট মতবাদ রূপ পরিগ্রহ করিতে আরও একশতাব্দী লাগিয়াছিল। তবে লিনিউসের জীবিতকালেই নতুন করিয়া ভাবিবার লোক জন্মাইয়াছিলেন। বাফন্ (Buffon), কুভিয়ার (Cuvier) এবং বিশেষ করিয়া লামার্ক (Lamarck) এর দার্শনিক লেখার ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশবাদের অস্ফুট কাকলী শ্রুত হয়।

লামার্কের দৃষ্টিভঙ্গী বাইবেলের দিবসত্রয়ের সৃষ্টিতত্বকে একেবারে অস্বীকার করিয়া একটি অতিশয় গতিশীল (dynamic) মতবাদের সন্ধান দিল। তিনি বলিলেন প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে অচেতন পদার্থ হইতে নূতন নূতন চেতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে উত্তাপ ও বিদ্যুতের সহায়তায়। ক্রমবিবর্তনবাদের অত্যুগ্র গতিশীলতাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়াও লামার্কের কাছ থেকে আনন্দ থিয়োরীর দিক দিয়া যেটুকু খাঁটি তথ্য লাভ করি তাহা হইল যে, জীব জগতের সকল রকম শ্রেণী বিভাগ মানুষের সুবিধা মাফিক। সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী ধারাবাহিকভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে। বাফন ও কুভিয়ারের মতবাদের সাথে তুলনা করিলেই দেখা যাইবে লামার্ক তাঁহাদের চাইতে কত অধিক বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বাইবেলপ্রভাব-বিমুক্ত ছিলেন। জীব জগতের ক্রমবর্ধমান বিচিত্রতা সম্বন্ধে বাফন কুভিয়ার সচেতন ছিলেন তাই তাঁহারা লিনিউসের মত দিবসত্রয়ের সৃষ্টিতত্বকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু বাইবেলকে ছাড়িয়া সংস্কার-বিমুক্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক মতবাদকে আশ্রয় করিবার মত বলিষ্ঠ মন তাঁহাদের ছিল না। তাই তাঁহারা বাইবেল শ্যাম ও সৃষ্টির চলিষ্ণুতা কুল উভয়ই বজায় রাখিয়া এক অপূর্ব থিয়োরী প্রচলন করিলেন। তাহারা বলিলেন যে সৃষ্টিকর্তা তিনদিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য নিঃশেষে সাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন সে কথা ঠিক নয়—সেই তিন দিনের পর প্রতি কল্পান্তে সৃষ্টিকর্তা নূতন নূতন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন—সৃষ্টির বিচিত্রতার কারণ এই। পক্ষান্তরে লামার্কের গতিশীল মন শুধু নূতন জীবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ক্রমবিকাশবাদকে আবদ্ধ রাখে নাই; জীব শরীরের নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ বা পরিবর্তন ব্যাপারেও ক্রমবিকাশবাদকে আরোপ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে পরিবর্তন সাধিত হয় জীবের বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব বা অন্তর্ধানকে উপলক্ষ্য করিয়া। যেমন পক্ষবিহীনের পক্ষ সঞ্চার, চক্ষুহীনের চক্ষুউদ্গমন, পুচ্ছ-বিশিষ্টের পুচ্ছলোপ, শৃঙ্গীর শৃঙ্গহীনতা। সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে জীবের দৈহিক

পরিবর্তন, প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্ধন ও পরিবর্জন লামার্কের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ইহার কারণ খুঁজিতে যাইয়া তিনি ব্যবহার ও অব্যবহার (use and disuse) থিয়োরীর অবতারণা করিলেন। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে জীববিশেষের প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গবিশেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কালক্রমে ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে সেই বিশেষ অঙ্গটি এমন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যদ্দারা সেই প্রয়োজনটি স্বল্পায়াসে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে এবং কালক্রমে এই ব্যবস্থাটি বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায়। অপরপক্ষে কোন বিশেষ অঙ্গ অপ্রয়োজনীয় বোধে ক্রমাগত অব্যবহারে ক্ষীণ, বিকল ও অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের এই রূপ কোন অঙ্গ জন্মায়ই না। এই থিয়োরীদ্বারা লামার্ক পুরাতন বনিয়াদী জীব হইতে নূতন ধরনের জীবের আবির্ভাবের ধারাটি আবিষ্কার করেন। প্রজনন বিদ্যা (Genetics) এর বিজ্ঞান শালায় নূতন তথ্য আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত লামার্কের ব্যবহার-অব্যবহার মতবাদ অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহা অবশ্য অস্বীকার করা ভুল হইবে যে, ব্যবহার অব্যবহারদ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয় না। কিন্তু ইহা সত্য যে এই পরিবর্তন স্থায়ীই হয় না, বংশানুক্রমিক হওয়া তো দূরের কথা—জীব-বৈজ্ঞানিকের বীক্ষণশালায় এর চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখানে আর ও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে ; লামার্ক সর্বাংশে বাইবেল প্রভাব বিমুক্ত হইলেও তাহার দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শবাদীর ভাবপ্রবণতার ছোঁয়াচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি সৃষ্টির ধারাবাহিকতার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যমূলক (purposive) ক্রমাভিব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ দৃষ্টি অদৃশ্য হস্তের হাতছানিকে অস্বীকার করিতে পারে নাই।

ক্রমবিকাশের বনিয়াদ যথার্থ ভাবে গড়িয়া তুলিবার কার্যে চার্লস্ ডারউইন্ (Charles Darwin)এর কথাই সাধারণ লোকে জানে। বস্তুতঃ সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁহার। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জীবরাজ্যে species অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর প্রবর্তন মানুষ আপনার সুবিধার নিমিত্ত প্রচলন করিয়াছে। ইহা প্রকৃতির একটি অপরিবর্তনীয়, নির্দিষ্ট এবং অমোঘ ব্যবস্থা বা বিধান নয়। এই মূলসূত্রটি স্বীকার করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে speciesএর পূর্ণসংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব, কারণ যেকোনো প্রকার ব্যাপক সংজ্ঞা দিলেও দেখা যায় যে উহা সর্বত্র খাটেনা, মাঝখানে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। দুইটি অতিসন্নিহিত আত্মীয় speciesএর মধ্যবর্তী অনেক species রহিয়াছে যাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একটা প্রতিষ্ঠিত species হইতে অন্য একটি সন্নিহিত speciesএর মধ্যে রহিয়াছে পরিবর্তন-পারম্পর্যশীল সমগোত্রী শ্রেণীসমূহ। ডারউইন জৈবরাজ্যের সর্বত্রই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করিতেন। উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যে সমভাবে এই রীতি চলিতেছে। species লৌহ নিগড়বদ্ধ বিশেষ সীমার আবেষ্টনী কক্ষে রুদ্ধ নয়—ইহার সীমান্তে এবং পরিধিতে সর্বদাই মিশ্রণ ও পরিবর্তন চলিয়াছে অশ্রান্তভাবে। অবশ্য দুই এক জায়গায় দুইটি বিভিন্ন speciesএর মাঝে ব্যবধান এত

দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে হইত যে ডারউইন জৈববিজ্ঞানের তথ্যদ্বারা উহার সম্যক সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না, মনে হইত ইহারা বুঝি সত্যই বিভিন্ন ও সম্পর্কবিরহিত species. কিন্তু তথ্যানুসন্ধানের জন্য শুধু জীববিজ্ঞানের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সর্বস্থান হইতে আহরণের চেষ্টা ডারউইন করিয়াছিলেন এবং আপাতদুরূহ সমস্যাগুলি তাহার সাহায্যে সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ডারউইনের সময়ে ভূবিদ্যা (geology) বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল মনীষী লায়েলের (Lyell) চেষ্টায়। ভূপৃষ্ঠের অবিরাম পরিবর্তন—কি করিয়া নূতন ভূস্তরের সংগঠন হয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার অন্তর্ধান ঘটে ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য Lyell, Hugh Miller এবং Smithএর গবেষণার ফল। ভূস্তর-বিন্যাসের সময় ও মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। জীববিদ্যার হারানো খেই সন্ধান করিতে যাইয়া ডারউইন ভূবিদ্যার কাছ হইতে প্রচুর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ভূবিদ্যার সহায়ক হিসাবে প্রত্নজীববিদ্যা (Paleoontology) তাহার আবিষ্কৃত তথ্য সম্পদ লইয়া ডারউইনের সমস্যাসমূহকে সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। জৈব দেহ প্রস্তরীভূত অবস্থায় সময়ের বুকে অবিনশ্বর অক্ষরে আপনাদের যে পরিচয়লিপি লিখিয়া গিয়াছে Paleontologistরা সেই দুর্বোধ্য সঙ্কেতলিপি বৈজ্ঞানিক ডারউইনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। দেখা গেল দুইটি আপাতবিভিন্ন বিষমধর্মী speciesএর মধ্যে যে পার্থক্য জীবতত্ত্বের দুরূহ সমস্যা বলিয়া নিরসন হওয়া অসম্ভব ছিল অতীতের অধুনালুপ্ত প্রস্তরীভূত species সমূহ তাহার ধারাবাহিকতার উপাদান বহন করিয়া চলিয়াছে। সময়ের ব্যবধানে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে দুইটি সমশ্রেণী আত্মীয় দূর বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া চলিয়াছে। বাইরেকার আকৃতিগত সাদৃশ্য সমগোষ্ঠী বিচারের কার্যকরী উপাদান সন্দেহ নাই কিন্তু অস্থিসংস্থান, পেশী-বিন্যাস এবং ভ্রূণতত্ত্ব (embryology) species বিচারে আরও অধিকতর উপযোগী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে-সব প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখিতে একরকম শুধু তাহারাই নয় দেখিতে বিভিন্ন রকম এরূপ অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ আসলে ঠিক এক জাতীয়। ভ্রূণতত্ত্ব (embryology)র সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ, যেমন ঘোড়ার সামনেকার পাদুইটি ও পাখীর ডানা—, তাহারা একই রকম ভ্রূণাবস্থার বিভিন্ন প্রকার বিকাশ মাত্র। বস্তুতঃ গোষ্ঠীনির্ণয় শুধু বাইরের আকারগত সাদৃশ্য দ্বারা হয়না, অভ্যন্তরীণ আকৃতি ও বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যথোচিত লক্ষ্য রাখিতে হয়। জীবজগতে সমগোত্রী ও ভিন্নগোত্রী বিচারে ভৌগোলিক বিভাগ (geographical distribution) প্রভূত আলোকসম্পাত করিয়াছে। ডারউইন সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া জলজ ও স্থলজ জীবের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। speciesএর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশবাদের প্রবর্তনে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল-সন্নিহিত গালাপগজ (Galapagos Islands) দ্বীপের উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগত বাইরের আকৃতিতে মহাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত

হইতে পৃথক মনে হইলেও আসলে উহারা সমগোত্রী। ইহাদ্বারা এই প্রমাণ হয় যে গালাপাগজ আধুনিককালে মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং বিচ্ছেদের পর হইতে প্রণালীর উভয় দিকে বিভিন্নমুখী পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে। মাডাগাস্কার (Madagascar) আফ্রিকার পূর্বউপকূলস্থ দ্বীপ সমূহের অন্যতম, কিন্তু আফ্রিকার প্রাণী ও উদ্ভিদরাজ্য মাডাগাস্কারের প্রাণী ও উদ্ভিদরাজ্য হইতে এত বিভিন্ন যে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রশ্নই উঠেনা; পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতের সাথে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে দক্ষিণ ভারতীয় স্থলভূমি মাডাগাস্কারের স্থলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মাডাগাস্কার আফ্রিকার স্থলভাগ হইতে ইতিহাসের অতি প্রাচীন অধ্যায় হইতেই গভীর সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত ছিল। ভূস্তরবিভাগ বিশ্লেষণ দ্বারা ভূতত্ত্ববিদেরাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উহাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া ডারউইন জীব সৃষ্টির ধারাটির সন্ধান পাইলেন এবং ইহাই Theory of Evolution বা ক্রমবিবর্তনবাদ নামে পরিচিত হইয়াছে। এক আধটা নূতন জীব বা উদ্ভিদের আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য না হইতে পারে, সমগ্রভাবে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন speciesএর উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ দিনে ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি ও তাহার উপসিদ্ধান্ত সৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব ডারউইনের বিচারের সম্মুখে দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিস্মিত শিশুমনের স্রষ্টা-প্রশস্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাছে হার মানিল। ডারউইন ক্রমবিকাশবাদের কারণ ও ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াটির একটি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন—কি করিয়া নূতন species গজায়? উত্তরে তিনি বলেন: কালক্রমে নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন (variation) প্রাণিদেহে সংগৃহীত হয় তাহার ফলেই নূতন species এর অভ্যুদয়। ডারউইন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে সকল variation গুলিই টিকিয়া থাকে এমন নয়—এমন কি সকল বহুকাল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাপন্ন species গুলিও যেকোন সময়ে লোপ পাইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তখনই প্রশ্ন উঠে কি সেই গুপ্ত কারণ যাহার জন্য বাছাই-করা কয়েকটি variation ও species মাত্র টিকিয়া থাকিবার অধিকার লাভ করে? ডারউইনের মতে এই প্রশ্নের জবাব "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (Natural Selection.) পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচিয়া থাকার জন্য সংগ্রাম (Struggle for existence) করিতে হয় প্রথমতঃ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়তঃ সমগোত্রী বা সহধর্মীদের সাথে। এই সংগ্রামের ফলে কেউ টিকিয়া থাকে কেউ বা লুপ্ত হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রক্রিয়াকেই তিনি species উৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"New species in the course of time are formed through natural

selection, others will become rarer and finally extinct. The forms which stand in closest competition with those undergoing modification and improvement will naturally suffer most."

এই যে variation ইহা কোথা হইতে আসে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া ডারউইন গোল পাকাইয়াছেন। কখনও তিনি ব্যবহার-অব্যবহার (use-disuse) থিয়োরীর অনুপযোগিতা সম্বন্ধে মত পোষণ করিতেন। কখনও বা বলিতেন এঁছাড়া variation কি করিয়া হয় তাহাও তো বুঝি না। সময়ান্তরে তিনি এও বলিয়াছেন যে প্রাণীবিশেষের জৈবিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবেই variation দেখা দেয়। নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে মনে হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনকেই তিনি variation এর মূল কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যেমন, "natural selection can modify the egg, seed or young as easily as the adult "অথবা" natural selection leads to divergence of character and to much extinction of the less-improved and intermediate forms of life."

ডারউইনের দিনে Genetics এর (প্রজনন তত্ত্ব) নিয়ম সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ গবেষণা সুরু হয় নাই, সুতরাং variation এর কারণ নির্ণয়ে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছোড়াই হইয়াছে। ডারউইন পায়রা ও কুকুর লইয়া কিছুকাল পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ gene (জীব কোষই ?) এবং mutation (রূপায়ণ ?) সম্বন্ধে তৎকালীন প্রাণিতত্ত্ববিদগণ অজ্ঞ ছিলেন সুতরাং variation এর কারণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত থিয়োরীই ভ্রমপূর্ণ ছিল। Genetics এর গবেষণা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে সমস্ত পরিবর্তন ও variation এর মূল কারণ mutation প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অবিরাম প্রতি জীবের দেহে সংঘটিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নাই এবং ইহা দ্বারা জীবের দৈহিক গঠন, স্বভাব, অভ্যাস, কার্যক্ষমতা instinct (সহজ প্রবৃত্তি) ইত্যাদি সর্ববিধ পরিবর্তন ঘটিতেছে। এমন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই যাহার বলে একটি বিশেষ অঙ্গ বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে mutation অন্ধ, অনির্দিষ্ট ও একেবারে খামখেয়ালী। একটি বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক, প্রয়োজনীয়তা বোধ, উন্নততর অবস্থার দাবী অথবা ব্যবহারের ন্যূনাধিক্য ইহার কোনটিরই mutation এর প্রকৃতি ও গতিবেগের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব নাই। দেখা গিয়াছে বহুপুরুষ পর্যন্ত একই রকম gene রহিয়াছে কিন্তু অকস্মাৎ mutation বলে তাহা হইতে একটি নূতন geneর উদ্ভব হইল! এই mutation কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা দুষ্কর। "A mutation is presumably some kind of physical change in the material particle on the chromosome, known as the gene. This change is invariably so involved in the psychologic-developmental reactions in which the genes participate, as to produce a

different end result from the pre-mutation gene". Mutation দ্বারা লব্ধ ফল যে সব সময়েই ক্রমবিকাশের সহায়ক হইবে এমন নয়। অপরপক্ষে এক্স-রে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে অধিকাংশ mutationই জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলির বিরুদ্ধপন্থী। প্রকৃত পক্ষে mutation দ্বিবিধ—একটি জীবন ধারার সাথে কোন সম্পর্ক-রক্ষা করে না সুতরাং আমাদের নিবন্ধের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়টি, যেখানে mutation দ্বারা নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। এই দ্বিবিধ প্রকার পরিবর্তনই embryonic selection বলা যাইতে পারে। Embryonic selection কথাটার সংজ্ঞা দেওয়া একটু কষ্টকর, তবে বলা যেতে পারে "the term refers to the sum total of circumstances which determine whether a given mutation expresses itself as a character or does not, and consequently perishes." Embryonic selection এর প্রাথমিক পরীক্ষায় বিজয়ী হওয়ার পর নতুন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গুণ সমূহ বহিঃপ্রকৃতিতে টিকিয়া থাকার পরীক্ষার (struggle for existence) জন্য তৈয়ারী হয়। এই নব-লব্ধ গুণ সমূহ যদি জীবটির জীবনধারার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবেই তাহা টিকিয়া থাকিতে পারে এবং ইহার বিপরীত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটিকে ডারউইন এক কথায় Natural Selection বলিয়া চালাইয়াছেন। সোজা কথায়, Natural Selection মানে—যে জীবের বাঁচিয়া থাকার যোগ্যতা নাই তাহারা মরে এবং যাহাদের বাঁচিয়া থাকার যোগ্যতা আছে তাহারাই শুধু বাঁচিয়া থাকে। উপরিলিখিত প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিলে আমরা এই দেখি যে embryonic selection একটি ছাঁকুনি বা সেন্সরের কাজ করে। Mutation এর ফলে কোন্‌টি বিশেষ গুণরূপে দেখা দিবে কোনটি দিবে না তাহার ব্যবস্থা করে। এই ছাঁকুনির ফলে যাহা টিকিল তাহাদিগকে পুনরায় পারিপার্শ্বিকের কাছে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়া স্থায়ী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। ইহার ফলে যাহা নির্ণীত হয় তাহাই Natural Selection.

Natural Selection কথাটির আবছায়ায় অনেক অবৈজ্ঞানিক ও অর্ধসত্য চলতি কথা নির্বিচারে বাড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "Survival of the fittest", "nature selects best", "the animal tries to adapt itself" এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাগুক্ত বিশ্লেষণ হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, যোগ্য-অযোগ্যের প্রশ্ন এ নয়, সর্বোত্তম-সর্বাধম ও মাপকাঠি নয়। একটি জীব টিকিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ একটা অবস্থা ও নিয়মের প্রয়োজন। যদি তাহা পাওয়া গেল তবেই সে টিকিয়া গেল এবং অভাব ঘটিলে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে সাধারণের আর একটি ভ্রান্তধারণার নিরসন করা আবশ্যক। মানুষের নির্বাচন কার্যে একটা প্ল্যান একটা বুদ্ধি-পরিচালিত নিয়ম আছে—যেমন, যে-মুরগী বেশী ডিম দেয়, যে-ঘোড়া ভাল দৌড়ায় অথবা যে-আনারসে চোখ কম ইহাদেরকে সে পৃথক করিয়া রাখিয়া নিজের সুবিধামতন ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে প্রকৃতিতে সে উদ্দেশ্য-মূলক নির্বাচন নেই। প্রাকৃতিক

নিয়ম অন্ধ, বাঁধাধরা—। এহেন অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য-বিবর্জিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করা ছেলেমানুষি বই আর কিছুই নয়। ক্রমবিবর্তনবাদের বহু নিবন্ধ এই কারণে গোলমেলে ও অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে সৃষ্টিতে পক্ষ-বিহীন পক্ষীর বাঁচিয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই কারণ তাহারা উড়িতে পারে না অথচ লক্ষ লক্ষ প্রকারের পক্ষহীন পক্ষী অবিকৃত জীবন-ধারা বজায় রাখিয়া আজিও ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে!

কি করিয়া চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা সঞ্জাত নূতন অঙ্গ ও স্বভাব বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায় সে বিষয়েও এতকালের প্রতিষ্ঠিত মত ক্রমশঃ শিথিল-ভিত্তি হইতে চলিয়াছে। ঘাড় লম্বা করিয়া দূরের জিনিষ ধরিবার ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা জিরাফ তাহার গলা লম্বা করিয়াছিল সুদূর অতীতে এবং এই দীর্ঘায়িত অঙ্গটি তাহার বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জিরাফের দীর্ঘ গ্রীবার এই জৈবিক ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে নব্য বিজ্ঞান সন্দেহ করিয়াছে, বলিয়াছে ইহা পরীক্ষিত সত্য নয়, ভাব-বিলাসী মনের কল্পিত রচনা মাত্র। এইরূপ গ্রীবা দীর্ঘীকরণ প্রক্রিয়া অন্যান্য জীবের মধ্যে পুরুষানুক্রমে সুদীর্ঘকাল প্রয়োগ করিয়াও দীর্ঘ-গ্রীব দ্বিতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। ভাইজমান্ (Weismann) দীর্ঘকাল যাবৎ বংশ-পরম্পরা বিড়ালের লেজ কাটিয়া লাঙ্গুলহীন মার্জার বংশ সৃষ্টি করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইহুদী ও মুসলমানগণের মধ্যে অঙ্গবিশেষ ছেদনের রীতি সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ছিন্ন-অঙ্গ মানুষের জাতি সৃষ্টি হয় নাই।

কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল

মহেন্দ্রনাথ

মানব জীবনের বিক্ষুব্ধ ঘাত প্রতিঘাত—তার সমস্যাসঙ্কুল উত্থান পতনই ইতিহাস সৃষ্টি করে। ইতিহাসের বিবর্ত্তনশীল রূপান্তর কখনো সমষ্টি জীবনকে রূপ দিতে পারে না। কাজেই ইতিহাস সমষ্টিগত মানব জীবনের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি—মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়। মার্কস্ বোলেছেন—সমাজ ব্যবস্থার বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী সাধারণত অচলায়তন পরিস্থিতির মাঝে সীমাবদ্ধ; অতীত অথবা বর্তমানকেও পেছনে ফেলে' ভবিষ্যত সমাজের রূপ দেখার ক্ষমতা নেই তার। তা' চলমান নয়। মানুষই তার রূপ দেয়—সমাজ ব্যবস্থার অতীত আর বর্তমানকে পেছনে ফেলে' মানুষই তার মাঝে অনাগত ভবিষ্যৎ গড়ে' তোলে। পারিপার্শ্বিক ঘটনা বৈচিত্র্যও সচল নয়। মানুষই তাকে চলমান শক্তি প্রদান করে এবং তার চলার পথে তাকে সঙ্গী কোরে নেয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ে' তোলবার পথে অতীত আর বর্তমানের যে কোনো মূল্য নেই—তা' নয়। সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে কার্য প্রণালী নির্ধারণে অতীত—এবং বর্তমানের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এক কথায় মানুষই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ প্রধানত সামাজিক জীব; সমষ্টিগত সামাজিকতাই তার প্রধান পরিচয়—যা' বাদ দিলে সে থাকে দুর্জ্ঞেয়। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজ ব্যবস্থার একটা নগণ্য অংশ মাত্র—সংগ্রামশীল বাস্তব জীবনে তার তেমন কোনো দাম নেই। কাজেই স্বতন্ত্রভাবে তারা তাদের ইতিহাস সৃষ্টি কোরতে পারে না—সমষ্টিগত সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত। ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে র'য়েছে—বিক্ষুব্ধ মানব জীবনের সমবেত আন্দোলন। কাজেই যা' ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, নূতন আলোকপাতে তাকে রূপান্তরিত কোরে তুলবে, তা' শ্রেণী আন্দোলন (Class Movement) ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর মাঝেই মার্কস্-এর ঐতিহাসিক অর্থ নৈতিক মতবাদের (Materialist Conception of History) ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং শ্রেণী সংগ্রাম তার একটা অপরিহার্য অংশ। মার্কস্ বোলেছেন—যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের মাঝে পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে—তা' শ্রেণী সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে: তবে তাঁর এই মত যে অবিসংবাদী সত্য, সকলেই যে তা' স্বীকার কোরে নেবেন, এমন কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই।

ইহার এবং আরও অনেক কিছুর মাঝেই সোস্যালিজম্ এবং কম্যিউনিজম্—এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তার বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রতিক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই "বাদ" বা ইজম্—এর সৃষ্টি। এবং এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই শাশ্বত কাল হ'তে নানা আন্দোলন সৃষ্টি হ'য়ে আসছে।

Historical action is to yield to their personal inventive action; historically created conditions of emancipation to phantastic one; and the gradual, spontaneous class organisation of the proletariat to an organisation of society specially contrived by these inventors. Future history revolves itself, in their eyes into the propaganda and the practical carrying of their social plans. *

পরিবর্তনশীলতাই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যই বর্তমানের বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রের প্রাকালে আমরা সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) স্বৈরাচারের নিদর্শন দেখতে পাই, যে অস্ত্রাঘাতে বুর্জোয়াগণ সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন কোরেছিলো, বর্তমানের ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতির মাঝে সেই অস্ত্রই আজ তাদের বিরুদ্ধে শাণিত হচ্ছে। তা' ছাড়াও—

Not only has the bourgeoisie, forged the weapons that bring death to itself; it has also called into existence the men, who are to wield those weapons—the modern working class—the proletarians. * *

বর্তমানের যুগান্তরকারী সমাজবিপ্লবের মাঝে আমরা সমাজকে দুভাগে বিভক্ত দেখতে পাই। সাধারণত এই দুই শ্রেণী পরস্পর বিরোধী। এক দল চাইছে—তাদের অধিকার, তাদের বনিয়াদ পাকা কোরতে; আর এক দল চাইছে—তাদের অধিকার আদায় কোরতে। এই ভাবেই দিনের পর দিন সামাজিক ব্যবস্থার মাঝে অর্থনৈতিক বিক্ষোভের ফলে এক দল অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল হ'য়ে পড়ছে এবং তার বিরুদ্ধবাদীদল শক্তি সঞ্চয় কোরে আসছে। বর্তমানের এই শ্রমআন্দোলন ধনতন্ত্রবাদেরই প্রতিক্রিয়াশীল রূপান্তর।

For the labour movement, as it exists to-day in every country which has advanced any measurable distance along the road of large-scale industrialism, is especially a product of the capitalist manchine age. †

মার্কস্ বোলেছেন—সামাজিক আন্দোলন কখনো গতিহীন নয়; উৎপাদনশক্তি দিনের পর দিনই বর্ধিত হচ্ছে। তাই তা' যুগের পর যুগ নানারূপে, নানা আকারে অধিকতর বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাঝে রূপ গ্রহণ কোরে আসছে। সেই জন্যই ধনতন্ত্রবাদ জাতীয় জীবনের অভ্যুন্নতির এবং উৎপাদন শক্তির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাড়িয়েছে এবং সাথে সাথে ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংসের সূচনা দুনিয়ার চলমান পরিস্থিতির মাঝে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

* Communist Manifesto. * * Communist Manifesto.

† Socialism In Evolution—By G. D. H. Cole.

এই ধনতন্ত্রবাদের প্রতিক্রিয়ারূপেই সোস্যালিজম্ অথবা কমিউনিজম্ এর সৃষ্টি, এ' কথা আজ কেউ অস্বীকার কোরতে পারবেন না। এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের (Communist International) সৃষ্টি।

এই কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের সার্থকতা এবং উদ্দেশ্য কি তার আলোচনা কোরব বোলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা প্রসার ব্যতীত কোনো আন্দোলনই সত্যিকার সফলতা লাভ কোরতে পারে না, তা' ছাড়া কোনো আন্দোলনের কর্ম প্রণালীর মাঝে সত্যিকার শুভেচ্ছা না থাকলেও তা' জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সমগ্র জন সমাজের সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয় না। বর্তমানের ফেনায়িত সমাজ বিক্ষোভের মাঝে মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শনই যে একমাত্র নির্ভুর যোগ্য মতবাদ, তুনিয়ার অধিকাংশ জনমতই মনে প্রাণে এ' কথা বিশ্বাস করে। এই কল্যাণকামী জনমতের অনুকূলে জনমত গঠন কোরবার জন্যই কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাসনালের প্রতিষ্ঠা। যদিও রাশিয়ার যুগমানব লেনিনের নেতৃত্বে ইহার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও এর যে একটা অতীত ইতিহাস আছে, এ' কথা আমাদের ভুললে চলবে না।

জার্মান হ'তে বহিষ্কৃত হ'য়ে মার্কস্ প্রথমে প্যারিস এবং তারপর লণ্ডন-এ আসেন। সে' সময় অর্থাৎ ১৮৪০ সালে যখন চার্টিজম্ (Chartism) তুর্বল হ'য়ে পড়ে, তখনই তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের (Scientific Socialism) আলোচনা কোরে নূতন মতবাদের অনুকূলে জনমত গঠন কোরতে আরম্ভ করেন। এবং এই মতবাদই Continental Socialist আন্দোলনের জন্ম দেয়। তারপর মার্কস্—এবং তাঁর চির-সহচর এঙ্গেলস্-এর সমবেত প্রচেষ্টায় 'সাম্যবাদীর ইস্তাহার' (Communist Manifesto) প্রকাশিত হয় এবং তখনকার কমিউনিষ্ট লীগ কর্তৃক তা' সাদরে গৃহীত হয়। এর পরও প্রায় বিশবৎসরের আন্দোলন এবং কর্মপ্রচেষ্টার পর ১৮৬৪ সালে প্রথম "আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান"—এর (International Working Men's Association) প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির মাঝে অগ্রসর হ'য়ে ১৮৭১ সালে তা' "প্যারিস কমিউন-এর (Paris Commune) রূপ প্রদান করে। কিন্তু, তুর্ভাগ্য এই প্যারিস কমিউন সাংঘাতিক রক্তারক্তির মধ্যে নিজের চলার পথ হারিয়ে ফেলে। কমিউনের এই অপ্রত্যাশিত পতনের প্রতিক্রিয়া International Working Men's Association এও সংক্রামিত হ'য়ে পড়ে। এবং মার্কস্ পন্থী ও মাইকেল বাকুনিন (Michal Bakunin) পন্থী সন্ত্রাসবাদীগণের বিরোধের ফলে তার মাঝেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, ইহার ফলে প্যারিস কমিউনের পতনের অব্যবহিত পরেই ইহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তবু ফ্রান্সে অথবা জার্মানীতে যে সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, তাদের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। এমনকি ১৮৭৭ সালে বিসমার্ক (Bismark) প্রবর্তিত Anti-Socalist Laws ও এদের অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ কোরতে পারে নি এবং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত তু'টো সমাজতন্ত্রীদলের ইতিহাস আমরা

দেখতে পাই। ইহাদের মাঝে একটী ইসেনাক্ (Eisenach) প্রতিষ্ঠিত মার্কস্ পন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আর একটী হ'লো—ফার্দিনান্দ লেসেল (Fardinand Lassalle) প্রতিষ্ঠিত জার্মান ওয়ার্কিং ম্যান্স্ এসোশিয়েসান। ১৮৭৫ সালে এই দুই দলই 'গোথা' কংগ্রেস-এ (Gotha Congress) সম্মিলিত হয়। মার্কস্ কিন্তু এই সম্মেলন সমর্থন করেননি। প্রথম ইণ্টারন্যাশনালের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেলিন্ বোলেছেন—"The first International laid the foundation of the proletarian international struggle for socialism." তারপর ১৮৮৯ সালে বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়নের নায়কগণের সাহচর্যে এবং সমবেত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সে বৎসরই লণ্ডনে সংঘটিত "লণ্ডন ডক ষ্ট্রাইক" (London Dock Strike) শ্রম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন কোরে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তার আভাষ পরিলক্ষিত হয়। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে লেনিন বোলেছেন—"The Second International marked the epoch in which the soil was prepared for a broad mass, widespread movement in a number of countries." কিন্তু গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন দলের নায়কগণ মজুর দলের মাঝে বিভেদের সৃষ্টি কোরে শ্রমিকদের আন্ত-র্জাতিক ঐক্য নষ্ট করেন। যে আদর্শ এবং কর্মপ্রণালী অনুসরণ কোরবেন বোলে, তারা প্রতি-জ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, তার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেন। প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনে সুবিধা বাদ (Opportunism) সাংঘাতিক শত্রু—ইহাই জাতীয় অভ্যুন্নতির পথে কলঙ্কময় অন্তরায়। এই সুবিধাবাদও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহার ধ্বংসের সাথে যে সমস্ত সুবিধাবাদী নায়কগণের নাম বিজড়িত ট্রট্স্কি এবং মেনেসেভিক পন্থীরাই তাদের মাঝে অগ্রগণ্য। ১৯১২ সালে লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে গৃহীত "বেসেল ইস্তাহারের" (Basle Menifesto) সংশোধন প্রস্তাব করেন। তারপর ১৯১৫ সালের শেষ ভাগে "সুবিধাবাদ ও দ্বিতীয় অন্তর্জাতিকের পতন" (Opportunism and the collapse of the Second International) শীর্ষক একটী প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ লিখেন; তাতে লেনিন বোলেছেন :—

"The Basle Manifesto proves in an inconstestable way the absolute betrayal of socialism by the socialists who voted for military appropriations, who entered cabinets, who re-cognised the defence of fatherland in 1914-15. This betrayal is undeniable. Only hypocrites can deny it."

এই সময়ই স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী নায়কগণের হীনতা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তারপর যখন বল্‌সেভিকগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল দলই সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় নিজেদের আদর্শকে

বলি দিলো, তখন লেনিন অসীম নিষ্ঠার সহিত সকল মজুর দলের একতার জন্য কর্ম ক্ষেত্রের রুঢ়তার সম্মুখীন হ'ন। তিনি বলেন—

"But the greater efforts of the Governments and the bourgeoisie of all countries to disunite the workers and to pit them one against the another, the more ferociously they use for this 'lofty' purpose of system of material law and military censorship...........the more urgent is the duty of the class conscious proletariat to defend its class solidarity, its internationalism, its social conviction against the orgy of chauvinism of the 'patriotic' bourgeois cliques of all countries."

শ্রমিকদলের মাঝে ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টায় লেনিন চতুর্দিক হ'তে সুবিধাবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ন। কিন্তু সমস্ত কিছুকে চোখ রাঙিয়ে তিনি কণ্টকিত-পথে তাঁর যাত্রা আরম্ভ করেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে লেনিন "On unity" নামে একটী প্রবন্ধ লিখেন; তাতে তিনি লিখেন :—

"বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিকদের মাঝে একতার একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিকগণ ব্যতীত অন্য কেহই এই একতা প্রদান কোরতে পারে না—এই উপলব্ধি আরও প্রয়োজনীয়।" পরিশেষে তিনি বলেন—

"Unity must be fought for, and only the workers themselves, the class-conscious workers themselves, are in a position to achieve this—by persistent stubborn work."

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের পর বলশেভিকগণ লেনিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য সংগঠনে আত্মনিয়োগ কোরে সুবিধাবাদের হীনতার উর্ধে নূতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা কোরবার নিমিত্ত প্রচার আরম্ভ কোরেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের পর তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিতে লেনিনের দান কারও অজানা নেই—তার বিস্তৃত আলোচনা করা আমি অনাবশ্যক বোলেই মনে কোরি।

তারপর রাশিয়ার ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাথে সাথে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিক্ষুব্ধ বিশৃঙ্খলার মাঝে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাসনালের প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। তারপর প্রথম এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধ্বংস স্তূপের কালো যবনিকা ভেদ কোরে বিপ্লবের রক্ত-রাঙা আবহাওয়ার মাঝে হাঙ্গারী, ব্যাভেরিয়া, বাল্টিক প্রদেশ ও অন্যান্য দেশ সমূহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ঠিক বিশ বৎসর পরে ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে মস্কো সহরে তৃতীয় আন্ত-

র্জাতিকের সৃষ্টি হয়। স্বার্থপূর্ণ হানাহানির নীচতা থেকে' আদর্শ রক্ষা কোরে প্রত্যক্ষ বাস্তবে মার্কসবাদের বিজয় অভিযানই এই আন্তর্জাতিকের অন্যতম উদ্দেশ্য, লেনিন এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে বোলেছেন :—

"The Third International gathered the fruits of the Second International, purged it of its social chauvinist, bourgeois and pretty bourgoeis dress and has began to effect the dictatorship of the proletariat."

নিয়মানুবর্তিতার চক্রব্যূহ ভেদ কোরে বিপ্লবী চিন্তাধারার সাহায্যে বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত কোরে, ধনতান্ত্রিকতার নাগ পাশ হ'তে লাখো লাখো মানুষের মুক্তির সন্ধান দেয়াই এবং শ্রমিক আন্দোলনের গতিকে অপরাজেয় কোরে Proletarian Dictatorship স্থাপন করাই এই আন্তর্জাতিকের প্রধান উদ্দেশ্য।

গঠনতন্ত্র-মূলক কার্য প্রণালী নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস যখন শেষ হ'লো, তখন তার সম্মুখে আবার বিপদের সম্ভাবনা দেখা গেলো। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সুবিধাবাদী ধুরন্ধরগণ ইহার মাঝে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি কোরবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ইহার মাঝে ধূর্ত centristদের হীন ষড়যন্ত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী মনোভাব সম্পন্ন শ্রমিক আন্দোলনের চাপে তারা প্রলেটারিয়ান ডিকটেটারসিপের বুলি আওড়াতে আরম্ভ করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংস্কারবাদ-এর (Reformism) কর্ম প্রণালী অনুসরণ কোরতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ছিলো —তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগদান কোরে তারা শ্রমিকদের বিশ্বাস ভাজন হ'বে এবং এই সুযোগে গোপনতার আশ্রয়ে তাদের প্রাক্তন সুবিধাদাকেই শক্তিশালী কোরতে পারবে। এই দুরভিসন্ধির প্ররোচনায় ১৯২০ সালের প্রারম্ভে তাদের দলের অধিকাংশ সভ্য কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্যাসনাল-এ যোগদান কোরবে বোলে মত প্রকাশ কোরে, তাদের মাঝে জার্ম্মানীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ফ্রান্স এবং ইতালীর সোস্যালিষ্ট পার্টি, ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশের লেবার পার্টির সভ্যগণই উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু বলশেভিকগণ এ' কথায় ভুললো না। তারপর ১৯২০ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং Down with the Centrist নীতি centristদের মাঝে আত্মচেতনার সঞ্চার করে, বিভিন্ন—অধিষ্ঠ'নে কম্যিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের জন্য লেনিনের একুশ দফা সর্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্তৃক গৃহীত হ'লে জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালীতে কম্যিউনিষ্ট পার্টি স্থাপন কোরে ইন্টারন্যাসনাল-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তারপর তৃতীয় কংগ্রেস ইন্টারন্যাসনালে-এর কর্ম প্রণালী পরিবর্তন কোরে Down with the Centrist এর বদলে Forward to the masses—এই নীতির দিকেই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। তার পর বৎসরই প্রথম বুলগেরিয়া এবং তারপর জার্মানীতে বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়, সে' সময় বুলগেরিয়াণ কম্যিউনিষ্ট পার্টির নায়ক ছিলেন—কমরেড্ ডিমিট্রফ; কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল কাম হ'তে পারেন না। জার্মানীর কম্যিউনিষ্ট পার্টিও পৃষ্ঠভঙ্গ কোরতে বাধ্য হয়। এইরূপে ধনতন্ত্রবাদের সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতি এবং ১৯১৭ সাল হ'তে ১৯২৩ সালের শ্রমবিপ্লবের অবসান হয়। একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত আর সকল দেশেই তা' হয় ব্যর্থ।

গত মহাসমরের পর ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে বিপ্লবী চিন্তাধারা ক্রমশঃ দুর্বল হ'য়ে পড়ে। একদিকে রাশিয়ায় যেমন সমাজতন্ত্রবাদের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়—অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদ তার বনিয়াদ পাকা কোরবার জন্য সচেষ্ট হয়। নবতররূপে ধনতন্ত্রবাদ সাংঘাতিক ভাবে বিকাশের পথ খুঁজে নেয়। শ্রমিক আন্দোলনের সেই 'ভাঁটার' সময়ে কমরেড ষ্ট্যালিনের নির্দেশে বিভিন্ন দেশের কম্যিউনিষ্ট পার্টি নিজেদের পুষ্টি সাধনে আত্মনিয়োগ কোরে। এ সময় কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল চীনে অধিকতর শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। ১৯২৫-২৭ সালের চীনবিপ্লব তারই গৌরবময় আত্মপ্রকাশ মাত্র। সেই বিপ্লবের তূর্য নাদে চীনের হাজার হাজার অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষের যুগ যুগান্তরের তন্দ্রা ভেঙে যায়—গা' ঝাড়া দিয়ে উঠে তারা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে বদ্ধ পরিকর হয়।

দক্ষিণ পন্থী সুবিধাবাদীগণের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কোরে কম্যিউনিষ্ট পার্টি সমূহকে অমিশ্র বলশেভিক বাদে প্রভাবান্বিত কোরবার জন্যই একনিষ্ঠ কম্যিউনিষ্টগণ বদ্ধ পরিকর হ'য়ে উঠেন। যে সমস্ত দক্ষিণপন্থী এবং কতিপয় বামপন্থী জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন, নরওয়ে এবং অন্যান্য দেশের কম্যিউনিষ্ট আন্দোলনে বিভেদের সৃষ্টি কোরতে এবং ঐক্য নষ্ট কোরতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠেছিলেন, কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল হ'তে তাদের বহিষ্কৃতি কোরে দে'য়া হয়। কম্যিউনিজম্-এর এই সকল শত্রু সে' সময়ে বিশ্বাস ঘাতক এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের গুপ্তচর ট্রট্‌সকি এবং ট্রট্‌সকাইটদের সাথে সহযোগিতা স্থাপনে সচেষ্ট ছিলো। এ' সময়ে ট্রটসকাইটদের বিরুদ্ধে কম্যিউনিষ্টগণকে সাংঘাতিক সংগ্রাম কোরতে হয়। ১৯২৬-২৭ সালে কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের একজিকিউটিভ কমিটির সপ্তম এবং অষ্টম প্লেনারী সেসানে (Plennary Session) কমরেড ষ্টালিনের নেতৃত্বে ট্রট্‌সিক-জিনোভিভ-সোভিয়েট বিরোধী সংগঠনে সাংঘাতিক আঘাত করা হয়। তারপর ট্রটস্কি, জিনোভিভ এবং তাদের সহযোগীদিগকে কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল হ'তে বহিষ্কৃত করা হয়। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ষ্টালিনের অপ্রতিহত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা। ইহাতেই রুশ-বিরোধী আদর্শচ্যুত হতভাগ্যদের হীন ষড়যন্ত্র জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে এবং তাদের সত্যিকার রূপ আত্মপ্রকাশ করে।

তারপর ১৯২৯ সালে বিশ্বের ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতি শোচনীয় আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়। অনিবার্য ভাবেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে' থাকে। জগতের এই ভয়াবহ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মাঝে কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের নির্দেশে বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী করা হয়। সেই ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সহযোগিতায় এবং পরিচালনায় ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতির আকারে সর্বহারা শ্রমিক এবং বেকারের দল ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে

মাথা তুলে' ওঠে। বুর্জোয়াগণকে সাংঘাতিক বিরোধীতার এবং অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সন্মুখীন হ'তে হয়। বুর্জোয়াদের এই সঙ্কটের সুযোগে ফ্যাসিষ্টবাদ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। গণতন্ত্রের প্রলোভনে তা' দুনিয়ার শান্তির প্রশ্নকে জটিল হ'তে জটিলতর কোরে তোলে। আবিসিনিয়া সংগ্রামে, চীন-জাপান সংঘর্ষ, স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবানিয়া, অষ্ট্রিয়া গ্রাসে, জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমন ও অধিকারে এই ফ্যাসিষ্টবাদের বর্বর আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফ্যাসিষ্টবাদের প্রতিক্রিয়া এবং তার বর্বরতার প্রতিবাদেই আজ কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল ক্রমবর্ধমান অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র এই কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালই যে দুনিয়ার মাঝে শান্তির আবহাওয়া প্রবাহিত কোরতে পারে, ইহাই বর্তমান কলঙ্কিত সভ্যতার আওতায় বর্ধিত বর্বরতার অবসান কোরতে পারে, দুনিয়ার অধিকাংশ জনমত তা' মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। ১৯১৩ সালে লেনিন বোলেছিলেন :—

"Unity is essential for the working class......And this unity is infinitely dear, infinitely more important to the working class. Divided the workers are nothing—united they are everything."

প্রত্যেক কমিউনিষ্ট লেনিনের এই উক্তির স্বার্থকতা এবং প্রয়োজনীতা মনে প্রাণে বিশ্বাস কোরেন এবং ইহাই কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের মূলমন্ত্র।

লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাসনালের জীবনেতিহাসের উপর দিয়ে কুড়িটি বৎসর অতিবাহিত হ'তে চললো। এই কুড়ি বৎসরের প্রত্যেকটী মুহূর্তে দুনিয়ার বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিকগণ কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে ধরণীর পৃষ্ঠ হ'তে নিশ্চিহ্ন কোরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছে—কিন্তু সফল কাম হ'তে পারে নি। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদল ফ্যাসিষ্ট-বাদের গুপ্তচররূপে প্রতিনিয়ত কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে বলশেভিক নীতি ভ্রষ্ট কোরে ধ্বংস কোরতে চেয়েছে। কিন্তু কমরেড ষ্টালিনের সুচতুর কর্মপ্রনালী তাদের সে হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কোরেই ক্ষান্ত হয়নি; জনসাধারণের সুমুখে তাদের সত্যিকার রূপ উদ্ঘাটিত কোরে দিয়েছে। ইহার ফলে দিনের পর দিন কমিউনিষ্ট আন্দোলন শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে।

গত ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন হয়। নানাদিক দিয়ে এই অধিবেশন মূল্যবান এবং গুরুত্ব পূর্ণ।

সমগ্র দুনিয়ার শ্রমজীবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন যা'তে নিবিড় হ'তে নিবিড়তর হ'য়ে ওঠে, একটী মাত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তারা যেনো একত্রিত হ'য়ে আত্মনিয়োগ কোরতে পারে, এই উদ্দেশ্য Anti-Fascist People's Front তা' ছাড়াও শ্রমজীবিদের সংগ্রামশীল সমন্বয়রূপে United Front গঠনের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হ'য়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ রাষ্ট্রসমূহে এদের প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে।

কী উপায় অবলম্বন কোরলে ফ্যাসিজম্ এর অগ্রগতি প্রতিরোধ করা যাবে—ইহার উপায় নির্দ্দেশে কমরেড ডিমিট্রফ বোলেছেন :—

"The first thing that must be done, the thing with which to begin, is to form a united front, to establish unity of action of the workers in every factory, in every district, in every region, in every country all over the world. Unity of the proletariat on a national and international scale is the mighty weapon, which renders the working class capable of not only of successful defence, but also of successful counter attack against fascism, against the class enemies."

ফ্রান্সের United Front, বিশেষ কোরে স্পেনের Peoples' Front এবং চীনের United Front এর কার্যক্রম আজ দুনিয়ার কার না বিস্ময় উৎপাদন করে।

বর্ত্তমানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন ফ্রন্টকে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরলে চলবে না। কর্ম্মপ্রণালীর আন্তর্জাতিক ঐক্য সাধন ভিন্ন সমস্ত দেশের শ্রমজীবীদের মাঝে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ব্যতীত ফ্যাসিজম্-এর বর্ব্বরতা হ'তে বিশ্বের গৌরবময় সংস্কৃতি কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। শ্রমজীবীদের মাঝে আন্তর্জাতিক ঐক্য সংস্থাপনের দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব নিতে হ'বে বিভিন্ন দেশের শান্তিকামিদের। সে জন্য কমিউনিষ্টদের বেশী ভাবতে হ'বে না ; কারণ, আজ দুনিয়ার মজুর শ্রেণী অবাঞ্ছিত ঘুমের ঘোর কাটিয়ে গা' ঝাড়া দিয়ে উঠেছে ; তারা বুঝতে পেরেছে বাঁধ-ভাঙা নদীর মত সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম কোরে বাঁচতে তাদের হ'বেই ; নির্ব্বিবাদে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু ইহাও সত্যি যে, সুবিধাবাদী ধুরন্ধরদের হীন ষড়যন্ত্র হ'তে শ্রমিকদের ঐক্য রক্ষার নিমিত্ত United Front কে শক্তিশালী কোরতেই হ'বে। কারণ, শ্রমিক কর্ম্মীদের মত, পথ এবং আদর্শের মিলন কেন্দ্র এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"। এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট-এর কার্যকারিতার উপরই ফ্যাক্টরী-ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির ঐক্য নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে কমরেড ডিমিট্রফ বোলেছেন :—

"The establishment of unity of action by all sections of the working class, irrespective of the party or organisations to which they belong, is necessary even before the majority of the working class is united in the struggle for the overthrow of capitalism and the victory of the proletarian revolution."

বিশ্বের লাখো লাখো সর্ব্বহারার শোষিত জীবনের অবসান কল্পে সোভিয়েট রাশিয়ার দান অপরিসীম এবং লেনিনই যে এই নবজীবনের সন্ধানী এ' কথা অবিসংবাদী ভাবেই স্বীকার্য। এ' দিক দিয়ে বিচার কোরলে লেনিন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংঘ "কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল" দুনিয়ার

লক্ষশত—মুক্তিকামী মানুষের অন্যতম নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহার কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়ে বিশ্বের ইতিহাস অদূর ভবিষ্যতে রূপায়িত হ'বে, এ' বিশ্বাস আমাদের আছে। ইহার সমবেত শক্তির প্রাচুর্যই বর্তমান জগতের একমাত্র কলঙ্ক ধনতন্ত্রবাদের নাগ পাশ হ'তে সমাজকে মুক্ত কোরে, সমাজ জীবনের নৈরাশ্যময় অন্ধকারের মাঝে নবারুণের কনক প্রভা বিকাশিত কোরবে। শৃঙ্খলিত জনগণের মুক্তি সাধনায় যে দেশের মধ্য দিয়ে চারণগীতিকা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'বে সে হলো সোভিয়েট। পৃথিবীর মজুরের দল এ' কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। শ্রমিক বিপ্লবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েটই যে একমাত্র অস্ত্র এবং এই অস্ত্র দ্বারাই যে অদূর ভবিষ্যতে ধনতন্ত্রবাদএর ক্ষয়িষ্ণু বনিয়াদ লুপ্ত হ'য়ে যাবে এ' বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের উদ্দেশ্য এবং স্বার্থকতা সম্বন্ধে লেনিন ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে লিখিত "The Third International and its Place in History" প্রবন্ধে বোলেছেন :—

"The world-historical significance of the Third Communist International lies in that it has began to put into practice Marx's greatest slogan which sums up the century-old development of socialism and the working class movement the slogan, which is expressed by the term : Dictatorship of the Proletariate."

লেনিনের এই ভবিষ্যৎবাণী এই কল্যাণপ্রসূ মতবাদ প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপ নিতে আরম্ভ কোরেছে—দুনিয়ার প্রগতিশীল পরিস্থিতি তারই রূপান্তরিত আত্মপ্রকাশ মাত্র।

চাষীর আশা

ধীরেন্দ্র চন্দ্র হোম

১

ইনায়ত সেদিন পাট ক্ষেতে নিংড়ান দিতেছিল। ক্ষেত তার নিজের নয়—ফতেমিঞা তালুকদারের—ইনায়ত নিয়েছিল আধি। তার নিজের কোন ক্ষেতই ছিল না। সে কিছু জমি ভাগী নিয়ে তাতেই আউষ এবং পাট বুনেছিল। এই আধি জমির ফসলই তার বল এবং ভরসা। এই জমিতে আপ্রাণ খেটে খাওয়াই তার কাজ—আর তাতে সে কসুর করছিল না একটু। মালিকের সময় অসময়ের আদেশ উপদেশে তার মনে মাঝে মাঝে দুঃখ হ'ত, নইলে এই জমি যে তার নিজের নয় একথা তার কখনও মনে হ'ত না। আর হ'তে পারতও না, কারণ এই যে ছিল তার একমাত্র অবলম্বন--সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশা।

কদিন ধরে পড়েছে নিংড়ান দেওয়ায় ঘাত। গ্রামের চাষারা নাইবার, খাইবার সময় পায় না—এত হয়েছিল কাজের তাড়া। ইনায়ত আধি জমিতে দিনরাত দিতেছিল নিংড়ান।

সে দিন নিংড়ান দিতে দিতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, সূর্য্য পশ্চিম দিকে প্রায় হেলে পড়েছিল কিন্তু ইনায়তের সে দিকে হুঁস নাই। মাথা নুইয়ে বসে ক্ষেতে ছেনা চালিয়ে যাচ্ছিল, অনাবৃত পিঠে সূর্য্যের কিরণ পড়ায় গায়ের ময়লা রং চিক্ মিক্ করছিল। পাগড়ী জড়ান মাথা থেকে মুখে চোখে বেয়ে পড়ছিল ঘাম।

এমন সময় তাদের গ্রামের ঈশান যাচ্ছিল সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে—সেও তার ক্ষেতে কাজ করে গ্রামে ফিরছিল। গ্রাম ছিল প্রায় মাইল খানিক দূরে, ঈশান ইনায়তকে তখনও কাজে দেখে বল্লে, "আরে ইনায়ত ভাই, বাড়ী ফিরবে না? দুপুর যে পার হ'য়ে গে'ছে।" ইনায়ত হাতের ছেনা মাটিতে পুতে ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলে, "না ভাই ঈশান, আজ এই ক্ষেতটার নিংড়ান দেওয়া শেষ না ক'রে বাড়ী ফিরছি না।" ঈশান আক্ষেপ করে বল্লে, "একি কথা! সারা দিন এমন ভাবে রোদে বসে থাক্‌লে বেমো না হয়ে যায়। গাঁয়ে ম্যালেরিয়ার যে ধুম।" "কি করব, একা মানুষ পয়সা কড়িও নাই যে কামলা রাখি—বেজান হয়ে না উঠলে নিংড়ান দেওয়া শেষই যে হবে না।" "তবু ত, কিছু খেয়ে নেওয়া উচিৎ—খালি পেটে থাকলে যে পিত্ত পড়ে যায়।" "হ্যাঁ ভাই সে কথা সত্যি। তবে খাব আমি এখানেই, আসফ আলিকে আমার ভাত নিয়ে আসতে বলে এসেছি।"

ঈশান চলে গেল, ইনায়ত আবার আপন কাজে মন দিল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার মনে হ'ল আসফ আলী আসছেনা কেন! আসফ আলী তার একমাত্র ছেলে—বয়স হবে ছয় সাত

বছর। ইনায়তের বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। দশ বৎসর হয়েছে সে বিয়ে করেছে কিন্তু এই এক ছেলে ছাড়া তার অন্য কেহ ছিল না। একবার একটি মেয়ে হয়েছিল—কিন্তু হয়েই মেয়েটি মারা যায়—সে আজ তিন বছরের কথা। অসিফ আলী ছিল ইনায়তের বড় আদরের। কোন কাজে তাকে দিত না—দারিদ্র্যের পীড়ন নিজে মাথায় তুলে নিয়ে ছেলেকে আপন সুখে খেলে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া তার দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল।

আসফ তখনও আসে নাই দেখে ইনায়ত উঠে দাঁড়ালেন। কপালের নীচে হাত রেখে গ্রামের পথ চেয়ে রইল, কিন্তু কোথাও ছেলেকে দেখতে পেল না। ছেলে কেন, কোন মানুষই তার চোখে পড়ল না। তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস, ক'দিন থেকে ভীষণ খড়ান আকাশ চিড়ে সূর্য্যের তাপ যেন মাটিকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সেই উত্তপ্ত দুপুরে সবাই যে যার আশ্রয় নিয়েছিল বিশ্রাম করতে। মাঠ হয়েছিল জনশূন্য—ইনায়ত বিস্তীর্ণ মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোথাও মানুষ ত দেখতে পেলেই না, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তার চোখে পড়ল না।

ধূ ধূ করা গ্রামের পথে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ইনায়ত বিড় বিড় করে বল্লে, "কি ছেলেকেই জন্ম দিয়েছি, বাপ উপসে মরছে আর সে কোথায় হয় ত খেলা করছে।" বলতে বলতে সে আবার লেগে গেল কাজে। কাজ করতে করতে সে হয়ত খাবার কথা ভুলে গিয়েছিল। এমন সময় কে তাকে ডাকলে "বাজান" বলে পিছন ফিরে দেখে আসফ এসেছে। বিরক্ত হয়ে বল্লে, "আরে বেটা এত দেরী—" কথা তার শেষ হল না—সে দেখতে পেলে ছেলের হাতে খাবার নেই। ফোঁস করে গর্জ্জে উঠে বল্লে, "ওরে আবাপ্পা ছেলে, এত দেড়ি করে এলি তাও শুধু হাতে। কোথায় গিয়েছিলি মরতে, খাবার নিয়ে এলিনে কেন?" সে আরও কি বলতে চাইছিল কিন্তু তার আগে ছেলেই চীৎকার করে উঠলে, "খাবার আমি আনব কোথা থেকে, মা'র হয়েছে জ্বর, রান্না করে কে?"

ইনায়তের মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল। তবু সে মনের আতঙ্ককে স্বীকার করতে চাইলে না, তেমনি কটুস্বরে মুখ ভেংচে বল্লে, "জ্বর হল আবার কখন?"

"সেই সকাল থেকে, সাড়া গতরে যেন আগুন।"

এবার ইনায়ত ভেঙ্গে পড়ল। আপন মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বল্লে, "আ আল্লা, তোমার কি বিচার।" এই বলে ছেনাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের সাথে চলল বাড়ী।

যেতে যেতে ইনায়ত ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "কোন সময় তোর মা'র জ্বর উঠেছে'?

—"সকালে উঠান বাড়ী ঝাড় দিয়ে যখন স্নান করে এসেছে তখনি কাঁপুনি উঠেছে। এত কাঁপ যে আর কিছুতেই যায় না। তারপর দুবার বমি হওয়াতে এই অল্পক্ষণ ধরে কাঁপুনি ছেড়েছে, এখন ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।"

ইনায়তের মনে দুঃখ এসেছিল। স্বরটাকে কোমল করে বল্লে, "তা, বাবা রান্না যে হয় নাই, তুমি কি খেয়েছ?" ছেলে ইনায়তের এত কোমল স্বর সব সময় শুনতে পায় না। যখন পায়

তখন তার আব্দার বেড়ে উঠে ! এখনও তার ব্যতিক্রম হল না, সে বায়না ধরে বল্লে, " না বাজান কিছু খাই নি, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আমি আর হাঁটিতে পারব না, কোলে উঠব।" ক্ষুধা তৃষ্ণায় এতক্ষণ রোদে কাজের পর স্ত্রীর অসুখ শুনে ইনায়তের মনে ঝড় বইছিল। তার উপর ছেলের আব্দার শুনে তার পিত্ত উঠল জ্বলে। খানিক আগের কোমলতা কোথায় গেল একেবারে মিশিয়ে। সে ধমক দিয়ে বল্লে, "কুত্তার বাচ্চার আব্দার শুনলে গায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়, ঢেঙ্গা ছেলে হয়েছে এখন তাকে কোলে তোল, পারবনা আমি কোলে নিতে।" ছেলের অভিমানে ঘা লাগল, বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেঁকে দাড়িয়ে বল্লে, সে যাবে না। বাপও টলবার নয়, থাক পড়ে—বলে চল্ল বাড়ীর দিকে। ছেলে আরম্ভ করল কান্না। ইনায়ত আর কি করবে। ফিরে এসে ছেলেকে কাঁধে করেই চল্ল।

ইনায়ত বাড়ী এসে দেখে তার স্ত্রী ফতেমার গা যেন আগুনের চুল্লি—কাছে যাওয়া যায় না, এত তাপ। সে মোহের মত পড়ে আছে আর চোখ মুখ কাল হয়ে গিয়েছে মাছিতে। সে কাছে এসে হাত নাড়তেই মাছিগুলি ভণ ভণ করে উঠল। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ইনায়ত গেল রান্না ঘরে। কোথায় কি আছে সব খুঁজে বা'র করল কিছু চাল আর খান কয়েক শুকনো পুঁটি মাছ। তাড়াতাড়ি ভাত উঠিয়ে দিয়ে ছেলেকে বল্লে জ্বাল দিতে আর নিজে গেল পাটা ভরে মরিচ বাটতে। ভাত হয়ে গেলে মাছ কয়টা পুড়ে নিয়ে তাতে মিশিয়ে দিল সেই ছটাক খানেক শুকনো মরিচ বাটা আর সাথে দিল কিছু নুন আর খান কয়েক পেঁয়াজ। ছেলেকে তাদিয়েই খেতে দিয়ে নিজে ফতেমার মাথা ধোয়ালে তারপর স্নান করে এসে নিজের খাওয়াটাও সেরে নিলে।

খাওয়া দাওয়া সেরে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখে জ্বর ছেড়ে আসছে, শরীর একটু একটু করে ঘামচে। ছেলেকে ফতেমার কাছে থাকার উপদেশ দিয়ে ইনায়ত পুনরায় চলে গেল ক্ষেতে। রাত্রিতে যখন ফিরে এল তখন ফতেমার জ্বর ছেড়েছে। সে ঘরের বারান্দায় বসে আছে।

মেঘমুক্ত জ্যৈষ্ঠের আকাশ তারায় তারায় ছাওয়া। দিনের উত্তাপে উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করতে পূব থেকে আসছিল হিল্লোলায়িত বাতাস। সেই বাতাসে ঘরের দাওয়ায় বসে ফতেমা দুটো ডাটা হাতে হাতে কুটছিল। ফতেমার বয়স হবে হয়ত ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু অনাহারে অর্দ্ধাহারে এবং ম্যালেরিয়ার কৃপায় সে দেখতে আরও বৃদ্ধা। শরীরের গঠন এবং রং এক সময় ছিল ভাল কিন্তু এখন কেমন যেন হ্যাংলা আর ময়লা দেখায় দেখতে মনে একট ব্যাথা লাগে। তাতে কি হবে, সারা দিন জ্বরে ভুগে এখন এই ফুর ফুরে হাওয়ায় বসে তার মনের আবেগে সাড়া পড়েছিল—তাই গুণ গুণ সে একটা গানের সুর টানছিল। তখন এল ইনায়ত—আর তাতেই ফতেমার গান হয়ে গেল বন্ধ।

ইনায়ত জিজ্ঞেস করলে, "জ্বর ছেড়েছে নাকি ?" "হ্যাঁ সে ত অনেকক্ষণ"—ফতেমার কথা আর শেষ হলনা। আসফ আলী বলে উঠল, "মা ভাত পর্য্যন্ত রেঁধেছে। পশ্চিম পাড়ার উমেশ চাচা বিল থেকে মাছ ধরে ফিরে যাবার পথে আমাদের দুটো শিং মাছ দিয়ে গেছে। মা তাই দিয়ে মাছের

ঝোল করেছে।" ইনায়ত দ্বিধা জড়িত স্বরে বল্লে, "জ্বর থেকে উঠে রান্না করার কি প্রয়োজন ছিল, আমিই ত পারতাম রাঁধতে।"

"সারা দিন খেটে খুটে এসে আবার রান্না করা যায় কি করে। আমার জ্বর ত রোজকার ঘটনা এ আমার সয়ে গেছে।" ইনায়ত আর কিছু বল্লে না, সারা দিন পরিশ্রমের পর রান্নার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে সে স্বস্তি পেল। সে ফতেমাকে জিজ্ঞেস কল্লে, "খাওয়া হয়েছে কি ?" শিং মাছের ঝোল মরিচ দেওয়ার আগে কিছু নামিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তাদিয়ে দুটো ভাতই খাব এখন পর্য্যন্ত অন্য কিছু খাইনি।" ইনায়ত একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, "ভাত না খেয়ে দুটো চিঁড়ে খেলেইত ভাল হয়।" চিড়ে ঘরে নাই, পুরনো জ্বরে ভাত খেলে কিছু হয় না।"

রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ইনায়ত গেল রোজকার মত পাড়ায় বেড়াতে। যখন ফিরে এল তখন রাত্রি অনেক। আসফ আলী ঘুমিয়ে পড়েছে, ফতেমা আছে জেগে। ইনায়ত পা মুছে বিছানায় যখন শুতে গেল, ফতেমা চাপা সুরে বল্লে, "রোজ রোজ এত রাত করে যে আসা হয় অন্য জনের চোখে বুঝি আর ঘুম আসে না।" ফতেমার সুরে অভিমান, ইনায়ত তা বুঝলে সেও একটু দুষ্টুমী করে বল্লে, "আমি কি কাউকে চোখ খুলে বসে থাকতে বলি—অন্য জন ঘুমিয়ে নিলেইত পারে।" "আচ্ছা, কথার ঢং দেখ" বলে ফতেমা অভিমান করে পাশ ফিরে শু'লে। ইনায়ত তাকে জোড় করে পাশ ফিরিয়ে টেনে নিল কাছে। ফতেমার অভিমান দূর হয়ে গেল; সে তার মাথাটী পেতে দিল ইনায়তের বুকে—তারপর দুজনেই চুপ। কিছুক্ষণ রইল তারা সেইভাবে। আসফ আলী হয়ত কি একটা স্বপ্ন দেখছিল, একটু এদিক ওদিক করে উঠল। ফতেমাও তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে নিলে।

ফতেমা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "কিগো, আজ বটতলার ক্ষেতখানার কাজ শেষ হয়েছে ?" বটতলার ক্ষেত মানে যে ক্ষেতে আজ ইনায়ত কাজ করছিল—এক সময় কাছে কোথায় একটা বট গাছ ছিল—এখন আর তার চিহ্ন নাই, কিন্তু তার স্মৃতি নিয়ে আছে ফতেমিঞার ক্ষেতখানা।

ইনায়ত জবাব দিলে, "হ্যাঁ শেষ হয়েছে, তবে একটু বাকী আছে, তা কাল এক দণ্ড কাজ করলেই শেষ হয়ে যাবে।" আর কত দিন লাগবে সব গুলি ক্ষেত নিংড়ান দিতে ?" আরও দিন তিনেক লাগবে।" ফতেমা একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বল্লে, "আল্লায় করে, এই কদিন আর বৃষ্টি না হয়!" সে একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে, "এবার আমরা ক'মণ পাট পেতে পারি।" ইনায়ত একটু হেসে, বল্লে, "কি করে বলব আল্লার কি মর্জ্জি, তবে মণ দশেক হতেও পারে।" ফতেমা হিসাব করে বল্লে, "তবে ত এবার পাট বেচে পঞ্চাশ টাকা পাব, এবার সাতকাঠা ক্ষেতটাকে বন্ধক থেকে ছুটান চাই। নির্ব্বংশে চৌধুরী মাত্র ২৫ টাকা ধার দিয়ে আমার সাতকাঠা জমিকে তিন বছর বন্ধক রেখেছে—এই ক'বছর ধরে আধি দিয়েও যে ফসল পেয়েছে তাতেইত ওর টাকা শোধ হয়ে গেছে। এবার ক্ষেতটাকে ছুটিয়ে আনা চাইই।

ইনায়তের এক সময় জমি জিরাত ছিল। কিন্তু অন্যের মত সেও ঋণ ও খাজনার দায়ে অজন্মার বছর সব বিক্রী করে দিয়েছিল, বাকী ছিল শুধু দুখানা ক্ষেত আর ঘরের ভিটে টুকু। তাও সে রাখতে পেলে না, একবার হালের একটা বলদ মরে যাওয়ায় সাত কাঠার জমিটাকে গ্রামের তালুকদার চৌধুরীর নিকট বন্ধক দিয়ে বলদ কিনতে হয়েছিল। অন্যবার অজন্মা হওয়াতে চাল কিনে এনে দাম না দিতে পারায় অন্য ক্ষেতটাকে দিতে হয় সেই চালের ব্যাপারীকে। পাঁচ কাঠা ক্ষেতটা তত উর্বরা ছিল না, এর জন্য তাই তাদের আক্ষেপও ছিল না তত। কিন্তু সাতকাঠা-ক্ষেতটার জন্য তাদের ভারি দুঃখ।

ফতেমার প্রেরণায় ইনায়ত নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেল্লে, ফতেমা একটু কাতর স্বরে আবার বল্লে, "কিগো, ক্ষেতটা আনা হবে না? একটা ক্ষেত নিজে না হলে এই এত খেটেই কি দিন পাড়ি দেওয়া যাবে? তারপর আসফ বড় হচ্ছে, দুই এক বছরে সেও ত চাষী হবে—তখন দুইটা হালেই আধি জমি চষতে হবে।" ইনায়ত বল্লে, "কুঁজোর কি আর চিৎ হয়ে শোবার ইচ্ছা হয় না—কিন্তু আল্লার মর্জ্জির বিরুদ্ধে মানুষের কি হাত আছে?" "না, না," ফতেমা অতিষ্ঠ হয়ে বল্লে, "আল্লার দয়া আছে, এবার সব খরচ বাদ দিয়ে ক্ষেত ছুটানই চাই, পঁচিশ টাকা পোড়ার মুখোকে দিতেই হবে।" কিন্তু তা হলে, আউষ ধান হওয়া পর্য্যন্ত খাওয়া চলবে কি করে, খোড়াক যে এরি মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তারপর পাটের দাম যে পাঁচ টাকা মণ হবে তারই বা কি ভরসা—দু টাকাও ত হতে পারে। এর উপর কাপড় চোপড় ত আছেই।" ফতেমা সব কথা কয়টিকে ভেবে দেখতেও চাইলে না, ক্ষেত ফিরিয়ে আনবে একথা স্বামীর মুখ থেকে শুনতে পেলে তার মনে আনন্দ হবে অসীম—। উপস্থিত আনন্দকে মাটি করে ভবিষ্যতের আঁধারের দিকে সে চাইলে না, বল্লে, "না, সব ঠিক হবে, কাপড় এবার চাইনে। আসফ ত লেংটিই পড়ে, তাকে একটা গামছা দিলেই চলবে, নিজের জন্য একটা লুঙ্গি আর আমার কিছুই চাইনে, আমার যা আছে তাই দিয়েই জোড়া তাড়া দিয়ে চালাব—কিন্তু ক্ষেত আনা চাইই।"

ইনায়তের মনেও আশা ছিল যে ক্ষেতটাকে আনবে। কিন্তু প্রতি বৎসরই এইরকম আশা করে হতাশ হয়ে এসেছে। তাই এবার পাটের রোখ দেখে তার গেল সালের পাটের দাম মনে করে যখন তার মনের আশে পাশে সেই আনা গোনা চলছিল তখন সে আশাকে বিশ্বাস করবার জোর খুঁজছিল। ফতেমার বিরুদ্ধে তর্ক করে সে তার নিজের মনের কথাটাকেই যাচাই করে দেখছিল। এখন তার মনে হল ফতেমার আশা অমূলক না। কিন্তু, তবু একটা সন্দেহ যেন মনে থেকেই গেল; সে তাই বল্লে, "ক্ষেত হয়ত ছুটিয়ে আনা যেতেও পারে, নিজে একটু সাবধান সতর্ক হয়ে খরচ বাঁচিয়ে চল্লেই হয়।" কথাটা ইনায়ত ফতেমাকে লক্ষ্য করে বলে নাই—এটা ছিল তার নিজের মনের তলার অজানিত অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি—তার নিজের অজ্ঞাতেই বেড়িয়ে এসেছে। কিন্তু ফতেমার তাতে অভিমান হল, সে কোঁশ করে বল্লে, "আমার উপরই যত দোষ।" বলে চুপ করে গেল। কথাটার শেষ এখানেই হতো না—একটা বুঝা পড়া হয়ে যেত—কিন্তু সেই

গভীর রাত্রে ছুটো দেহ মন যখন অতি কাছাকাছি এসেছিল তখন সামান্য কথাতে সে সামীপ্যের মাধুর্য্যটুকু খুইয়ে ফেলা কারও ইচ্ছে ছিল না। তাই ফতেমাকে রাগে চুপ করতে দেখে ইনায়ত তাকে আবার জড়িয়ে ধরে বল্লে, "রাগের ভড়া, আল্লা এই ঘটেই উজাড় করে দিয়েছে।" আর কোন কথার সময় না দিয়ে ফতেমাকে নিজের আরও কাছে টেনে নিলে।

২

তখন ভাদ্র মাস। সপ্তাহ ভরে রোদ হয়ে হঠাৎ কদিন ধরে নেমেছে বাদল। অবিরাম বৃষ্টি তার আর বিরাম হয় না। আকাশ জোড়া মেঘে ফাঁক পড়ে না কখনও। আউষ ধান কাটা হয়ে গেছে। কিন্তু রোদের অভাবে কাটা ধান মাড়ান যায় না, মাড়ান ধান ভানা হয় না। গাঁটের পর গাঁট ভিজে পাট জমে উঠেছে, তাকে শুকান যায় না। কৃষকদের উদ্বেগের সীমা নাই, কি হয়ে কি হবে সবার মুখে রব।

এমনি একদিন ইনায়ত গোশালায় বাঁশ টাঙ্গিয়ে তাতে ভিজে পাটের লাছি গুলো দিচ্ছিল ঝুলিয়ে। অনেক কষ্টে পাওয়া পাট ভিজে থেকে থেকে দাগী হয়ে যাবে। এই ভয়ে তার চোখে ঘুম ছিল না। আসফ আলী সাথে ছিল—সে এক একটা করে লাছি বাপের হাতে তুলে দিতেছিল, আর মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে চিৎকার করছিল চলে যাবার জন্য।

এমন সময় শাড়ীর আচলে গা মাথা জড়িয়ে তথায় এল ফতেমা। সে ছেলেকে রেহাই দিয়ে লাছিগুলি এগিয়ে দিতে দিতে এক সময় বল্লে, "আর ত পারা যায় না। ধার কর্জ্জও পাইনা, আজ দুপুরে যে কি রান্না হবে জানিনা ঘরে চাল নাই একটা।" এই সমস্যায় ইনায়ত ও দিশে হারা হয়ে ছিল। এখন ফতেমার কথা শুনে একটা অযথা ক্রোধে তার মন ভরে উঠল। সে গর্জ্জে ওঠে বল্ল, "না পারা যায় অন্য কোথায় গেলেই হয়—আমাকে জ্বালিয়ে লাভ কি?" ফতেমাও জ্বলে উঠল, হাতে যে লাছিখানা ছিল সেটা দিল ছুড়ে ফেলে, আর কর্কশ স্বরে বল্লে, "আর এক জনকে নিয়ে এলেই ত হয়—আমি রেহাই পাই। এতদিন থেকে ঘর করছি—তাতে না পেলেম একবার পেট ভরে খেতে, না জুটল একটা ভাল শাড়ী। তাতেও আবার গোমর দেখ না। এই মুরাদে ঘর করা চলে না।"

আসফ আলী তখনও কাছেই ছিল, সে বোকার মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার মা বাপে চালালে তুমুল বাক্য যুদ্ধ।

ঘণ্টাখানেক পরে দুপুর বেলাতে বৃষ্টি একটু থেমে গিয়েছিল। ইনায়ত মাথায় গামছা বেঁধে হাতে ছাতা নিয়ে, ঘরে যে আধমণ খানিক শুকনো পাট ছিল তাই নিয়ে চল্ল বাজারে—পাট বেচে চাল আনবে মনে করে, ফতেমা ছেলেকে দুটো বাসী ভাত দিয়েছিল খেতে। সে ছেলেকে বল্লে, "ডাক দিয়ে বল খেয়ে যাবার জন্য, বাসী ভাত আরও দুটো আছে—ঘরে কলাও আছে, খেয়ে গেলেইত চলে, খালি পেটে বাজারে যাওয়ার কি ঠেকা।"

ইনায়ত ছেলের ডাকে সাড়া দিলে না তেমনি চলে গেল। ফতেমা চেয়ে দেখলে, কিছু বল্লে না. আসফ কি একটা বলতে চেয়ে ছিল ফতেমা তাকে তেড়ে এল মারতে।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে যায় তখনও ইনায়ত বাড়ী ফিরেনি। ফতেমা সারা দিনের উপবাসী। বহু অন্বেষণে চাট্টী চাল কোথা থেকে ধার করে এনে আর আসফকে দিয়ে দুটো মাছ ধরিয়ে, সে মাছ ভাত রান্না করে নিল ও ছেলেকে আবার খাওয়ালে কিন্তু নিজে রইল ইনায়তের অপেক্ষায়। ইনায়তের এত দেরী হওয়ার কোন কারণ ছিল না। বাজার ছিল মাইল দেড়েক দূরে আর কাজও ছিল অল্প। তাতেও ঘণ্টা চার পাঁচ দেরী হওয়াতে ফতেমার মনে হল ইনায়ত তাকে উপোস রেখে শিক্ষা দেবার ইচ্ছাতেই বাজারে দেরী করছে। ফতেমা যে ইনায়তকে না খাইয়ে খায় না এটা ত জানা কথা। ইনায়ত তখনও আসেনি একটা রুদ্ধ বেদনা ও ক্রোধ মনকে জ্বালা দিতে লাগল, তবুও সে তার দৈনন্দিন কাজ গুলি সেরে নিয়ে বাইরের ছাউনি থেকে বলদ দুটোকে গোয়ালে এনে বাঁধতে গেল। একটা বলদ গোয়ালে এনে বাঁধছে এমন সময় পশ্চিম পাড়ার উমেশ এল হাঁপাতে হাঁপাতে। কোন প্রকার শ্বাস নিয়ে সে বল্লে, "আসফের মা, এখনও যে বসে আছ। ইনায়ত ভাইকে যে জমিদার কাছারীতে নিয়ে গেছে। খাজনা বাকী রেখে বসে থাক এখন তার জের টান।" "ওমা আমার কি উপায়" বলে ফতেমা এল চিৎকার করে বেড়িয়ে। জিজ্ঞাসাবাদ, আবেগ উদ্বেগে বেশ একটু সোর গোল উঠল—পাড়া প্রতিবেশী এসে জমা হল। প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক কথার বিনিময় হয়ে বিদ্রূপ সহানুভূতির একটু উপশম হলে উমেশ বল্ল, ফতেমাকে, "এখন কান্না কাটি করে কি হবে—একটা কোন বন্দোবস্ত ত করা চাই—ইনায়ত ভাইকে ত আর আটক ফেলে রাখা যায় না। রাত্রে ওখানে থাকলে আহার নিদ্রা ত হবে না, তার উপর মারধর হওয়াই অসম্ভব কি?" ফতেমা আরও কেঁদে উঠল, উমেশ বল্লে, "কি মুস্কিল কেঁদে এখন কি হবে—জমিদারের লোক শুনবে? না, শুনলেই ছেড়ে দেবে? আপনি মনি মোড়লকে নিয়ে আসুন, আমি নিয়ে আসি নবীন পঞ্চায়েতকে। তারপর পরামর্শ করে কি করা উচিৎ ঠিক করতে হবে।"

মোড়ল এবং পঞ্চায়েত এসে সব জেনে নিলে। সহানুভূতি, আর উপদেশের পালা শেষ করে মোড়ল বল্লে, "খালি হাতে কাছারীতে যেয়ে কি হবে, অন্তত ১৫ টা টাকা সাথে নেওয়া চাই। নইলে কোন ফল হবে না।"

পঞ্চায়েত চুপ, সে আগেও বেশী কথা বলে নাই। ফতেমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল টাকা সে পাবে কোথায়। মোড়ল ভেবে চিন্তে বল্লে, "এক উপায় আছে। বলদ দুটো বাঁধা দিয়ে তালুকদার বাড়ী থেকে কিছু টাকা নেওয়া যায়। তাছাড়া আর ত উপায় দেখিনে।" ফতেমা চোখে অন্ধকার দেখলে। বলদ দুটো বন্ধক দিলে হাল চলবে কি করে—তাদের না খেয়ে উপোসে মরতে হবে। আর না দিলেও যে স্বামী থাকবে আটক, কি উপায়? উমেশ ইনায়েতের দোস্ত কিন্তু বড় গরীব। কোন পথ তারও মাথায় এল না। কিন্তু মোড়লের কথায় সে বিরক্ত হয়ে

বল্লে, "মোড়ল, এটা আপনি কি যুক্তি দিলেন? বলদ দুটো গেলে এদের দিন গুজড়ান চলবে কি করে?" মোড়ল বল্লে, "সে কথাও ত ঠিক্—তবে পাঁট বেচে ত বলদ ফিরিয়ে ও আনতে পারে। কিন্তু ইনায়ত আটক থাকলে কি উপায়। এখন তোমরা বিবেচনা কর—। টাকা না নিয়ে গেলে কাচারীর নায়েব ত ইনায়তকে ছাড়বেই না। আর পেছনে মুরুব্বী আছে মনে করে টাকার আশায় ইয়ানতকে উৎপীড়নও হয় ত করতে পারে—তার চেয়ে চুপ করে থাক, কেউ খোঁজ নেয় না বলে দয়া করে আপনি আপনিই ছেড়ে দিতে পারে"—বলে, মোড়ল একটু অপেক্ষা করে নিয়ে, উঠে দাঁড়ালে বাড়ী যাবে বলে। ফতেমা চুপ করেই বসে ছিল এতক্ষণ, ছেলে ছিল পাশে। মোড়লকে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বল্লে, "না গো উমেশ, বলদ দিয়ে হবে কি, আজ যদি জমিদারের মানুষ আটকেই রাখে।" তার মনে স্বামীর ভীত এবং লজ্জিত মুখখানা ভাসছিল। চোখ দুটো তার জলে ভরে এল, ছেলেকে সে টেনে নিলে আরো কাছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বলদ বাঁধা দিয়ে ১৫ টাকা নিয়ে মোড়ল আর উমেশ গেল জমিদার কাছারীতে। পঞ্চায়েত গেল না—তার মনে আইনের ভয় ছিল। খাজনা বাকীর দায়ে বিনা নালিশে রায়ত কে যে আটক রাখা যায় না—একথা সে জানত। তাই আইনের ভয় আর নায়েবেরও সে বন্ধু, দুই বাঁচিয়ে সে পিছনে রয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। আজ দুপুর থেকে যে বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল তখনও পর্য্যন্ত সেই ধরণ ছিল। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আর তার নীচে পৃথিবীতে ঘুঁট ঘুঁটে অন্ধকার। সে অন্ধকারে চোখ মেলে চাইতে ভয় হয়। গ্রামে কোথাও টু শব্দটি পর্য্যন্ত নেই, সবাই ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

ফতেমা তখনও জেগে আছে। আসফ ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু সে বসে নানা কথা চিন্তা করছিল, সবই ইনায়তের ভাল মন্দ সম্বন্ধে। এমন সময় একটা পেঁচা নিকট একটা গাছ থেকে হুট্ হুট্ আওয়াজ করে উড়ে গেল। সেই শব্দে চমকে উঠে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে একটা আলো—তাড়াতাড়ি দোর খুলে সে বেড়িয়ে এল।

ইনায়তকে বাড়ী দিয়ে উমেশ আর মোড়ল চলে গেল আপন আপন ঘরে। ইনায়ত ঘরে যেয়ে মাটির উপর বিছানার এক পাশে যেয়ে বসল, আর হাঁটুর মধ্যে নিজে মুখখানাকে লুকিয়ে নিল। ফতেমা কি বলবে বুঝে উঠছিল না—অথচ বলার কথা তার ছিল অনেক। দিশেহারা হয়ে সে নিয়ে এল এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে। হুকাটাকে এগিয়ে দিলেও ইনায়ত মাথা তুল্লে না, হয়ত সে উহা দেখেও নাই। ফতেমা ধীরে ধীরে বল্লে, "তামাক সাজিয়ে যে এনেছি।" ইনায়ত এবার মাথা তুলে চাইলে। লজ্জায় দুঃখে ক্লিষ্ট মুখ বেয়ে পড়ছে চোখের জল। এতক্ষণে ফতেমা একটা পথ পেলে, এতক্ষণ তার বুক যাচ্ছিল ফেটে। কিন্তু ইনায়তের মনের অবস্থা তার জানা ছিল না। দুপুরের কথা মনে করে সে মনে মনে ভয়ও পাচ্ছিল—ইনায়ত হয়ত তাকেই দায়ী বলে ধরবে। কিন্তু তার চোখের জলে ফতেমার চোখের পাতা ভিজে এল। সে এক রকম ছুটে এসে ইনায়তের সামনে গালে হাত দিয়ে বসল। তারপর হুঁকাটাকে ইনায়তের হাতের

মধ্যে তুলে দিয়ে বল্লে, "আমাদের পোড়া কপাল তার জন্য দুঃখ করে কি হবে। আল্লার দোয়া না পেলে, এই দুঃখ যাবে না—।" ফতেমা আর যে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না—তাই একটু চুপ করে গেল। ইনায়তও তার চোখ দুখানা মুছে হুঁকাটাকে হাতে নিলে। হুঁকাটাতে দু এক টান দম দিয়ে ফতেমার দিকে না চেয়েই বল্লে, "আসফ আলী কি খেয়েছে?" ফতেমা বল্লে, হুসেনের মা'র কাছ থেকে চাট্টে চাল ধার করে এনে ভাত রেঁধে ছিলাম, আসফ তাই খেয়েছ।" ইনায়ত এবার ফতেমার মুখের দিকে চাইলে, আর চেয়েই বুঝলে ভাত রেঁধেও স্বামীকে অভুক্ত রেখে ফতেমা কিছু মুখে দেয় নাই—তার চোখ দুটো আবার ছল ছল করে উঠল। সে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি হাত পা ধুতে গেল, নিজে খেয়ে ক্ষুৎ পীড়িতা স্ত্রীকে খাওয়ায় অবসর দেওয়ার জন্য মনটা উতলা হয়ে গেল।

কিন্তু সে জানালে না যে যার কাছে থেকে ক্ষেত ছুটিয়ে আনার আশায় বুক বেঁধেছে, তার কাছেই বলদ বাঁধা দিয়ে নিজেকে ছুটিয়ে আনতে হয়েছে হায়! যখন জানাবে? ..

স্মৃতি

হরপ্রসাদ মিত্র

সেই পুরাতন পাহাড়তলীর রাঙা মাটি,
—'শাল্মলী মূলে রাজকুমারের ঘোড়া বাঁধো'
শমী-কোটরে কে আজো জাগো ?
ঝিলমিলি ঝাউ, ফণি-মনসার মরা ঝোপে
হায় বিহঙ্গ, মিছে কাঁদো !
—'হেথা আরবার রাজকুমারের ঘোড়া বাঁধো' ॥

এলো বৈকাল. হ্রদে শৈবাল জমে কতো !
নামহারাদের পদাবলী
—মুছে যায়, নীচে ধু ধু বালি।
মিছিলের দিন নীল পতাকার তলে-তলে
ভেসে চ'লে যায় কতো ছলে।
—কা'রও ভরা হাত, কা'রও খালি ॥

সুগভীর সেই বৈতরণীর কালো জলে
খেয়া পারাপার পলে-পলে।
তুমি বিনিদ্র একা জাগো !
আজ অরণ্যে রাঙা চাঁদ এলো দেখ চেয়ে,
কবে দিনমণি গেল চ'লে—
শমী-কোটরের অন্ধ জটায়ু মিছে কাঁদো,
—'হেথা আরবার রাজকুমারের ঘোড়া বাঁধো' ॥

শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রের 'শিশু'

লীলা দাশগুপ্তা

"জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা
* * * *
ফেনিল ঐ সুনীল জলে
নাচিছে সারাবেলা
উঠিছে তটে কি কোলাহল
ছেলেরা করে খেলা।"
—রবীন্দ্রনাথ

যে সাহিত্যে এ কোলাহল উঠে না, যে সাহিত্যে শিশুর জন্য কোন স্থান নাই, সে সাহিত্য অসম্পূর্ণ—অঙ্গহীন। যেমন গৃহমাঝে শিশুর কাকলী, শিশুর ঝঙ্কার বেজে না উঠলে সে গৃহ শ্রীহীন হ'য়ে পড়ে তেমনি যে সাহিত্যে শিশু মনোবিজ্ঞানে, তার হাসি কান্নায় সমবেদনা না জানায় তার দীনতা শত ঐশ্বর্য্যও দূর করতে পারে না।

এখন এই শিশু সাহিত্য জগতের নানা দেশে গড়ে উঠেছে আর এতদিন পরে তার আভাষ বাঙ্গালা দেশে ভেসে এসেছে। সে সাহিত্য ডেকেছে একজন প্রকৃত শিশুপ্রেমিক কবিকে। রবীন্দ্র তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাই আমরা শিশু মনের ভাবগুলিকে তার কবিতার মাঝে মাঝে জেগে উঠতে দেখি। তাঁর কবিতা দেখে মনে হয় তিনি চিরশিশু। তার প্রেরণা ছুটে গেছে যেখানে শিশু মায়ের কোলে বসে জীবন রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে

"এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি মোরে?"
'জন্মকথা'

এ প্রশ্ন শুনে মনে হয় শিশু মনের ভাবগুলিকে বৃদ্ধ রবীন্দ্র জোগাড় করেন নি, করেছেন আমাদের বৃদ্ধ শিশু রবীন্দ্র। তাঁর কবিতার মাঝে ছন্দের আভাষ, ভাবের সরলতা, কথা কাহিনীর অপূর্ব্ব সংযোগ যেন অকলঙ্ক শিশু প্রকৃতির চঞ্চল চরণগুঞ্জণে।

এই শিশু জানে মানব এ জগতে চলে যাবার জন্যই আসে, কার আহ্বানে চলে যায় জানে না, জানেনা কোথায় যায়, শুধু জানে যায়, তাই তার কৌতুক ছুটে চলেছে এই গুপ্ত রহস্য ভেদ করে নব আলোকের পথে,—

"তবে আমি যাইগো তবে যাই
ভোরের বেলা শূণ্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে
বলবো আমি—নাই সে খোকা নাই।
মাগো যাই।"
'বিদায়'

যা কিছু মুক্ত, যা কিছু সত্য তাকেই বিশ্ব প্রকৃতি আপনার দিকে ডেকে নেয়। এই ডাক শিশুদের কাছে পৌঁছায় তাই তারা সাড়া দেয়—বলে 'যাই, যাই যাই'। তাদের মন ক্ষণে ক্ষণে নব আনন্দের দিকে এগিয়ে চলে তাই সে বলে

"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে
* * * *
আমি বলি "যাব কেমন করে"
তারা বলে, "এসো মাঠের ধারে"
'মাতৃবৎসল'

এদের কাছে মনে হয় মেঘের দল যেন সারাবেলা আপন মনে খেলা করে চলেছে। রঙ্গিন মেঘের দল যেন রঙ্গিন মনের খেলা। শিশু মনে করে সেই মেঘের দল তাকে যাবার জন্য আহ্বান করছে। তার যাবার জন্য কত উৎসাহ, কত উদ্যম, দূর দেশান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাবে, কিন্তু সে শিশু, তাই সব আশা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল যখন মায়ের কথা মনে পড়লো। মাকে ছাড়া সে তো থাকতে পারবে না, তাকে রেখে যেতেও মন কেঁদে ওঠে, তাই মাকে সাথে নিয়ে যেতেই রাজি হয়। চঞ্চল ঢেউএর মত মন তখনি পৌঁছে যায়—আকাশের রঙ্গিন কোণে রঙ্গিন খেলার মাঝে, যেতে যেতে কিন্তু মায়ের কাছে বলে

"তার চেয়ে মা আমি হবো ঢেউ
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ
লুটিয়ে আমি পড়বো তোমার কোলে
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।"
'মাতৃবৎসল'

কি সুন্দর, কি সরল আকাঙ্খা।
রবীন্দ্র তুলিকা আঁকা শিশু যেন বীরত্বের প্রতীক। সেখানে আঁক পড়েছে

"মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে"

'বীরপুরুষ'

পথে পড়লো ডাকাতের দল—বীরপুরুষ ছুটে গেল তাদের মাঝে—কী-ভী-ষ-ণ লড়াই চল্‌লো। তার মার অবস্থা কল্পনা করে খুব উৎসাহিত

"এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছো খোকা গেলুই বুঝি মরে
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে।"

'বীরপুরুষ'

এ লড়াই থামানোর, এ বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ হ'তে জগৎ কিন্তু নির্ম্মম ভাবে সরিয়ে নিলো—তাই আপশোষের বাণী ফুটে উঠলো—উঠলো।

"রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয়না আহা।"

এ বীরত্ব কাহিনীর পর এ আপশোষ শুনে প্রত্যেকের মন কেঁদে ওঠে। যেমন মানবজীবন যদি চিরদিনই দুঃখে ঢাকা থাকতো তা হ'লে পৃথিবীটা হোতো একটা চোখের জলের খেয়াঘাট। সে ঘাটে সকল মানুষকেই ভিড়তে হোতো। কোনদিনই তারা অপর ঘাটের আস্বাদ পেত না, জান্‌তে পারতো না এর পর কোথায় গিয়ে তার জীবনতরী ভিড়বে। দুঘাটের মাঝে লাগান থাকতো মস্ত একটা দাগ। তেমনি 'শিশুতেও' যদি শিশুর এই করুণ আপশোষের পর তার মনের উপর কালো একটা কালির আঁচড় টেনে দেওয়া হোতো, তা হ'লে তার জীবনের ফুল কুঁড়িতেই ঝরে পড়তো। সেখানে নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটতো। শিশুর চঞ্চলতা প্রকাশ পেত না, তা হ'লেই তার সৌন্দর্য্য সকলের মাঝে বিকশিত হ'তে পারতো না। কিন্তু প্রকৃতিতে যা কিছু সত্য তাই সুন্দর। শিশুর জীবন হচ্ছে চঞ্চলতার প্রকাশ। সেখানে বাধা থাকবে না, কালিমা থাকবে না এই হচ্ছে চির সত্য, তাই চির সুন্দর। তাই শিশু মনে উঁকি মেরেছে শৈশবের চপলতা। সে বলেছে

"খুকী তোমার কিছু বোঝে না মা
খুকী তোমার ভারি ছেলেমানুষ
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়ে ছিলুম ফানুষ।"

"আমি যদি রাগ করি কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙ্গিয়ে বকি
তোমার খুকী খিলখিলিয়ে হাসে
খেলা করছি মনে করে ওকি ?"
'বিজ্ঞ'

এ বাণী শিশুর কল্পনা নয়, এটা হচ্ছে যিনি তাদের পাঠিয়েছেন তার প্রেরণা। শিশুর কাছে এ চিরসত্য ব্যাপার। জীবনের প্রত্যেকটী আকাঙ্খা তার অন্তরে জ্বলন্ত হ'য়ে জেগে উঠেছে। চোখের সামনে সে যা কিছু দেখেছে তাই সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে, তাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ ক'রে নিয়েছে। কোথাও এতটুকু অবহেলা করে ফেলে দেয় নি। বাবাকে লেখাপড়া করতে দেখে তার লেখাপড়া শিখবার একটা প্রবল আকাঙ্খা জেগে উঠেছে। কিন্তু সে শিশু। সে নিজের মাঝে কল্পনাকে স্থান দিয়েই সকলকে দেখাতে চায় সে বিজ্ঞ। তাই তার বাবার লেখা পড়তে চেয়েছিল—না পেরে এ প্রশ্ন

"বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে
বুঝেছিলি ?—বল মা সত্যি করে
এমন লেখায় তবে
বল দেখি কী হবে ?"
'সমালোচক'

* * * * * *

এবার এ কথা বলতে চাই, এই বাঙ্গালার শ্যামল বুকে জন্মে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুর' শিশুরা বীরত্বের, জ্ঞানের, সমালোচনার অগ্রদূত হ'য়েছে তারা চিরদিন তাদের পূর্ব্বতন tradition ঠিক রেখেছে। তাদের মনের মাঝে বাঙ্গালার ইতিহাসের একপর্ব্ব ভেসে উঠেছে। সেই পুরাকালের কাহিনী 'একছিল রাজা আর তার ছিল দুই রাণী—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। দুয়োরাণীর কি দুঃখ, রাজা তাকে এতটুকুও ভালবাসতো না।' এ কথা শুনে বাঙ্গালার প্রত্যেক শিশুর মনই একটা গভীর বেদনায় ভরে ওঠে। আর সেই আর এক গল্প। এক ছিল রাজপুত্তুর—সে বিয়ে করবে সেই তেপান্তরের মাঠের পরের রাজকন্যাকে। পথে ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গামীকে দেখলো। তাদের কাছে পথ জিজ্ঞেস করে করে রাজপুত্তুর তো কোনরকমে সেই অচিনপুরীতে এসে ঘুমন্ত রাজ কন্যার কাছে দাঁড়াল। সোনার কাঠি রূপার কাঠি বদল করে তাকে জাগিয়ে তুললো। তারপরে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল তারা সুখে ঘর করতে লাগলো। এ গল্প শুনতে তাদের উৎসাহ

আর ফুরোয় না। তারা যে বাঙ্গালী। বাঙ্গালার ইতিহাস তারা যে মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করে, তাই এত আগ্রহ।

আজ জগতের নানা দিক দিয়ে ঝড় ব'য়ে চলেছে, সে ঝাপটা বাঙ্গালার গায়েও এসে লেগেছে। পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙ্গালাতেও হ'য়েছে, তাই বাঙ্গালার শিশুকেও সেই সুরে সুর মেলাতে হ'য়েছে। কিন্তু সেটা বাইরের দৃশ্য। ভেতরে সেই পুরোণো দীপ জ্বলছে। সে আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালীর অন্তর কোনদিকে ছুটে চলেছে। বাঙ্গালার শিশুর পুজোর ফুল কার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। প্রাণে প্রাণে সে চায় বাঙ্গালাকে, তাই যুগে যুগে আঁকড়ে ধরে র'য়েছে সে সব ইতিহাসের কথা। তাই এত বীরত্বের মাঝেও রাত্রে ঘুমুবার সময় ঠাকুমার কাছে

"মনে পড়ে সুয়োরাণী
দুয়োরাণীর কথা
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।"
—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'

না শুনলে হয় না।

এ ভাবগুলো যে প্রকৃত বাঙ্গালী শিশুপ্রিয় ভাব। এ যে তার প্রাণের কথা। কে এ ইতিহাসের পাতা খুলতে চায়? কে বাঙ্গালার এ কীর্ত্তি গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতে চায়? সে হচ্ছে বাঙ্গালার শিশু। আর রবীন্দ্র-লেখনীই তাদের এ প্রিয় ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, তাই যুগে যুগে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ শিশুর অন্তরের সবটুকু জুড়ে থাকবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ

অনিলবরণ রায়

ভাবী সমাজের স্বরূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় অনুযোগ করিয়াছেন, "কোন রূপকারই আগামী কালের পরিপূর্ণ রূপটিকে মূর্ত্তি দিতে পারেন তাই। আজো আকাশে রহিয়াছে অস্পষ্ট কুহেলিকার আনাগোনা; অনাগত দিনের ভাবমূর্ত্তি আজো জমাট বাঁধিয়া দেখা দেয় নাই।" কিন্তু আগামীকালের পরিপূর্ণ রূপটি আগামী কালই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে—তাহার জমাট ভাবমূর্ত্তি পূর্ব্ব হইতে দেওয়া যায় না। তবে কোন্ নীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে, মানব জাতিকে সে জন্য কোন দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—তাহার নির্দ্দেশ দেওয়াই প্রকৃত দিশারীর কাজ। শ্রীঅরবিন্দ যোগলব্ধ দৃষ্টিতে ভাবী সমাজের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ যে-সত্য দর্শন করিয়াছেন—সেইটিকে সকল দিক দিয়া যুক্তির সাহায্যে সাধারণের মনের নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য তিনি একাধিক্রমে সাত বৎসর ধরিয়া Arya পত্রিকায় বিবিধ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন—এবং সেইদিক দিয়া তাহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পর তিনি ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করেন। তাঁহার সেই সব গভীর অভিনব বার্ত্তা লোকে শুনিবে সে সময় তখনও আইসে নাই—তাই Arya পত্রিকার বক্তব্য কেবল কতকগুলি গ্রাহক ও পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সে-সময় আসিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীঅরবিন্দের কোন সম্প্রদায় নাই, কঃ পন্থা, পথ কি—তিনি তাহাই দেখাইয়া দিয়াছেন।

Arya পত্রিকার চতুর্থ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তখন লিখিয়াছিলেন –

"Our idea was the thinking out of a synthetic philosophy which might be a contribution to the thought of the new age that is coming upon us. We start from the idea that humanity is moving to a great change of its life which will even lead to a new life of the race,—in all countries where men think, there is now in various forms that idea and that hope,—and our aim has been to search for the spiritual, religious and other truth which can enlighten and guide the race in this movement and endeavour. The spiritual experience and the general truths on which such an attempt could be based, were already present to us, otherwise we should have had no right to make the endeavour at all; but the complete intellectual statement of them and their results had to be found. This meant a continuous thinking, a high and subtle and difficult thinking on several lines, and this strain, which we had to impose on ourselves, we were obliged to impose also on our readers." (Arya, July, 1918).

শ্রীঅরবিন্দ সাত বৎসর ধরিয়া Arya পত্রিকায় ভাবী মানব সমাজের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন আমরা দুই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্যক পরিচয় দিব, পাঠকদের সকল সংশয় ও প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিব ইহা সম্ভব নহে। আমরা কেবল সামান্য ইঙ্গিত দিতে পারি, পাঠকদের মনে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিলে তাঁহারা নিজেরাই আরও পূর্ণতর পরিচয় লইতে যত্নবান হইবেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সহিত পরিচিত হইতে যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ-সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত সে আগ্রহ দেখান নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বহুলোকই যে ধারণা পোষণ করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ও আংশিক।

আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতার সহিত বাস্তব জীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই, শ্রীঅরবিন্দ সেই আধ্যাত্মিকতা লইয়া রহিয়াছেন, অতএব যাহারা কাজের লোক, দেশের সেবা, সমাজের সেবা করিতে চান তাহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সংবাদ লইবার কোন আবশ্যকতা নাই, শ্রীঅরবিন্দ এখন একটি back number হইয়া পড়িয়াছেন—অনেকেই এখনও এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সহিত বাস্তব জীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই—ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে, এই জগৎ হইতেছে জীবন ও কর্ম্মের জগৎ --কিন্তু জীবন ও কর্ম্মকে যদি উচ্চ চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত করা না হয় তবে মানুষ পশু ও উদ্ভিদেরই সামিল হইয়া পড়ে। মানুষের অন্তরাত্মা ইহাতে সায় দেয় না, কারণ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের উপরে তাহার মধ্যে রহিয়াছে মন, আত্মা—উচ্চতর আলোক ও প্রেরণার দ্বারা জীবনকে গঠিত ও রূপান্তরিত করাই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। তাই আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানে অজ্ঞানে মানুষ সর্ব্বদাই দার্শনিকতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলাম, বর্ত্তমান যুগেরই সকল বড় আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রভাব। যে ফরাসী বিপ্লব আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মানবের আদর্শ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে তাহা শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয় নাই —সে-সব কারণ ইউরোপের ও জগতের অন্যান্য স্থানেও বর্ত্তমান ছিল। সে-সব কারণকে নিমিত্ত করিয়া যে-শক্তি সেই মহান্ বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহা আসিয়াছিল রুসো, ভলটেয়ার প্রভৃতি দার্শনিক গণের অভিনব চিন্তাধারা হইতে। বহুদিনের পরাধীন ইটালী, ম্যাজিনির দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যে মার্কসবাদ আজ জগতের সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাও মূলতঃ একটি দার্শনিক চিন্তাধারা। আজ জার্ম্মাণিতে যে আসুরিক শক্তির বিরাট অনুশীলন ও অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে তাহার প্রেরণা আসিয়াছে নীট্শের অতিমানববাদ হইতে। আর ভারতে একটা সমগ্র জাতি যে ঐহিক জীবনকে অবহেলা করিয়া অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহার জন্যও প্রধানতঃ দায়ী হইতেছে তাহাদের দার্শনিকতা। এই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় দর্শনকেই প্রধান স্থান দিয়াছিলেন—পত্রিকাখানির পরিচয় ছিল—A Philosophical Review.

যাহারা বলেন আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য মোটেই নহে, এককালে সকল

দেশই সমান ভাবেই আধ্যাত্মিক ছিল—তাহারা ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষ সত্যের দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে তর্কের স্থান নাই। ধর্ম্ম সকল দেশেই আছে কিন্তু কোথায় কোনটির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়াই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হয়। ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয় বৈদিক যুগে, বেদের সাধনার পরিণতিই উপনিষদ বা বেদান্ত। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় কেমন একটা সমগ্র জাতি অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল—অন্যান্য দেশে যে-সব নিগূঢ় সত্য কয়েকজন সাধকের মধ্যে গুহ্যভাবে থাকিত ভারতে সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে-সব সত্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতীয় কৃষ্টির ভূমিকে ব্যাপক অধ্যাত্ম বিকাশের জন্য উর্ব্বর করিয়া তোলে। জগতের আর কোথাও এমনটি দেখা যায় নাই। সেই সময় হইতে ভারতীয় সভ্যতার মূল সুরই হইয়াছে আধ্যাত্মিকতা। অবশ্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের অধিকাংশ লোকই হইতেছে বহির্মুখী, তাহারা নিশ্চিন্তে বেচাকেনা, হাট-বাজার করিয়াই দিন কাটায়। তথাপি ভারতে তাহাদের অন্ততঃ এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও সাধনার ফলে তাহাদের অজ্ঞানের আবরণটা অপেক্ষাকৃত পাতলা হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত সহজেই তাহাদিগকে ভগবান ও আত্মার সত্যের দিকে ফেরান যায়। আর কোনদেশে বুদ্ধের সমুচ্চ ও কঠিন সত্য সকল এত দ্রুত জনসাধারণের মনকে অধিকার করিতে পারিত? আর কোথায় তুকারাম, কবীর, শিখগুরু, তামিল সাধু—ইহাদের গভীর ভক্তি এবং গভীর দার্শনিকতা এত দ্রুত সাড়া তুলিতে এবং সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিত? ইউরোপেও কয়েকবার আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকবারই সে ঢেউ আসিয়াছে প্রাচ্য হইতে, বিশেষতঃ ভারত হইতে, এবং প্রত্যেকবারই ইউরোপ সেই আধ্যাত্মিকতার সারটুকুকে বর্জ্জন করিয়াছে, তাহাকে ঐহিক জীবন ও প্রগতির কাজে লাগাইয়াছে। প্রাচ্য হইতে ইউরোপে প্রথম ঢেউ আসে গ্রীক দর্শনের ভিতর দিয়া। পিথাগোরাস্ হইতে প্লেটো ও নিয়ো-প্লেটোনিষ্টগণ যে প্রধানতঃ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন একথা আজকাল সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন। ইহারই ফল হয় গ্রীস ও রোমের সমুজ্জ্বল সভ্যতা—কিন্তু সে সভ্যতার স্বরূপ হইয়াছিল ঐহিক, আধ্যাত্মিক নহে। তবে তাহা দ্বিতীয় ঢেউটির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল—সে ঢেউ ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম্মের রূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অভিযান। প্রাচ্য হইতে তৃতীয় ঢেউ গিয়াছিল যখন মুসলমানেরা স্পেন্ জয় করে—তাহারই ফল হইয়াছিল ইউরোপে ক্যাথলিক অভ্যুত্থান। চতুর্থ ঢেউ—আধুনিক যুগে জার্ম্মান দর্শনের ভিতর দিয়া ইউরোপে বেদান্তের প্রচার। যাহারা বলেন ভারতীয় সভ্যতার "প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে" তাঁহাদের সেটা দৃষ্টিবিভ্রম। ঐহিক জীবনের চূড়ান্ত অধঃপতনের অবস্থাতেও ভারতীয় সভ্যতা জগজ্জয়ের যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। পাশ্চাত্যের সমস্ত দার্শনিক চিন্তার উপর বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের যোগ সাধনার দিকে পাশ্চাত্য মন ক্রমশঃ বেশী বেশী আকৃষ্ট হইতেছে। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergsonএর মত সম্বন্ধে Grant Duff

বলিয়াছেন—"His vital urge is a clever assimilation and adaptation of the Tantric notion of Siva Shakti to European tastes."

আদর্শ মানব সমাজ গঠন করিতে হইলে দর্শন ও ধর্ম্মকে তাহার আরম্ভ ও ভিত্তি করিতেই হইবে; কারণ কেবল এইগুলিই মূল সত্যের সন্ধান দিতে পারে। ইহাদের প্রাধান্য দূর করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। মানুষ সকল সময়েই সত্যের সন্ধান করিবে কারণ ঐটি হইতেছে তাহার জাগ্রত চৈতন্যের অপ্রতিরোধ্য নীতি; আর মানুষ যাহাকে সত্য বলিয়া জানিবে তাহাকে ধর্ম্মে পরিণত করিবেই। দর্শন হইতেছে বুদ্ধির দ্বারা মূল সত্যের সন্ধান এবং ধর্ম্ম হইতেছে মানুষের জীবনে কার্য্যতঃ সেই সত্যকে প্রয়োগ করিবার প্রয়াস। আজও কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে—জগতে ইহার প্রাধান্য ছিল ধনিকতন্ত্রের যুগ পর্য্যন্ত, ঐ তন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিত হইবে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের যুগ ত আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন, বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন large scale production, বৃহৎ আয়তনে উৎপাদন আরম্ভ হইল তখনই ধনিকতন্ত্রের আরম্ভ হইল। তাহার পূর্ব্বে কি ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা জগতে ছিল না? ভারতের প্রাচীন পল্লী জীবনে গ্রামবাসী নিজেদের জমি চাষ করিত, নিজেদের কুটীর শিল্প চালাইত—গ্রামের সকল লোক মিলিয়া গ্রামের সকল সাধারণ কার্য্য পরিচালনা করিত এবং নিজেদের আয়ের কতকটা অংশ সরাসরি রাজাকে খাজনা দিত। ইহা ধনিকতন্ত্র নহে, সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজিমএরই আদিম রূপ—কিন্তু ইহার সহিত ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার কোন বিরোধই ছিল না—বরং ধর্ম্মই ছিল তাহার ভিত্তি! রুশিয়ায় আজ যে ধর্ম্ম-বর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা হইতেছে সে পরীক্ষার ফল এখনও বাহির হয় নাই, আর তাহার লক্ষণও খুব ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কম্যুনিজিমের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্মও আধ্যাত্মিকতার সহিত যে-গুলির নিবিড় সম্বন্ধ ছিল—যেমন বৌদ্ধ সঙ্ঘ, Christian Communes—এইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হইয়াছে। মার্কস্ যে ধর্ম্ম-বর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন তাহার ভিত্তি শুধু জীবনের সত্যকেই ধরিয়াছে, আত্মার সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলিয়া এক কোনে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। এখন তাহারা সেই অতিমাত্রতা হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে। প্রাচ্য আত্মার সত্যের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়াছে, এবং কিছুকাল, অন্ততঃ ভারতবর্ষে, আর সব ছাড়িয়া কেবল সেই সত্যটিকেই ধরিয়াছে, জীবনের সম্ভাবনা সকলকে অবহেলা করিয়াছে, অথবা জীবনকে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচ্যও এখন এই আতমাত্রতা হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে। পাশ্চাত্য জাতি আত্মার সত্য এবং অধ্যাত্ম-সম্ভাবনা-সকল সম্বন্ধে পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; প্রাচ্য জাতি জীবনের সত্য সম্বন্ধে পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পদকে নূতনভাবে জীবনের উপর প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই যে প্রভেদ ইহা হইতেছে কৃত্রিম। আত্মাই যখন মূলগত সত্য তখন জীবন-কেবল তাহারই

অভিব্যক্তি হইতে পারে; কিন্তু এখন আমরা জীবনের যে-স্বরূপ দেখিতেছি তাহাতে আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ নহে, মানুষের দেহ, প্রাণ, মন তাহার আত্মাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আবার তাহাকে অনেকটা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে জ্ঞানে বৰ্দ্ধিত হইতে হইবে যতক্ষণ না এই অসম্পূর্ণতা দূর হয়, মানুষের দেহ, প্রাণ, মন অধ্যাত্মশক্তি ও গুণে বিকশিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে আত্মার অভিব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যন্ত্র হইয়া উঠে। দিব্য জীবনের পরিপূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে মানব জীবনের সত্য নীতি—পার্থিব জীবনকে দিব্য জীবনের রূপে গড়িয়া তোলা—ইহা হইতেছে মানুষের ক্রমবিবর্ত্তনের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, এইটিই হইতেছে তাহার মূল কথা।

এই সত্যকে তত্ত্ববিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, দার্শনিক তথ্যকেই আর সব কিছুর ভিত্তি করা প্রয়োজন—সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ "Life Divine" শীর্ষক নিবন্ধকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। জগতের দার্শনিক সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি হইয়াছে একটি অপরূপ জিনিষ। আত্মা, মন ও জীবন সম্বন্ধে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদান্তের শিক্ষা লইয়াই ইহার আরম্ভ। কিন্তু সাধারণতঃ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতে জীবনকে অস্বীকার হয় এবং এই ব্যাখ্যা শঙ্করের মায়াবাদেই চরমে উঠিয়াছে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, "এই সবই ব্রহ্ম।" এই সত্য হইতে আরম্ভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত মায়াবাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্ম নহে, ইহা অ-ব্রহ্ম; অনাত্ম। শ্রীঅরবিন্দ এই স্ব-বিরোধী মত গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করের মায়াবাদের প্রতিবাদ ইতিপূর্ব্বে অনেকেই করিয়াছেন—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যেমন সম্পূর্ণভাবে ইহার প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন এমনটি আর ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। রামানুজের অনুসরণ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন—এরূপ কথার মূলে কোন সত্য নাই। কারণ বস্তুতঃ পক্ষে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের সহিতই শ্রীঅরবিন্দের মিল বেশী। কারণ রামানুজের মতে জীব হইতেছে ভগবান হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ভেদই সব, অভেদ কোথাও নাই—আর শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের ন্যায়ই বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মই। শঙ্কর জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন জগৎও ব্রহ্ম—এইখানেই শঙ্করের সহিত শ্রীঅরবিন্দের পার্থক্য। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জগতের যে বাস্তবতা স্বীকার করেন, শঙ্করের সহিত তাহার তফাৎ খুব বেশী নহে—কারণ শঙ্করও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শনগুলির ভিত্তি সাংখ্য দর্শনের উপর—একথা সত্য নহে, তাহাদেরও ভিত্তি হইতেছে বেদান্ত। রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব—এঁরা সকলেই বৈদান্তিক। বস্তুতঃ, আমাদের দেশে সাংখ্যমতের প্রভাব অনেক পূর্ব্বেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গীতায় আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানযোগ বলিতে সাংখ্যকেই বুঝা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের প্রচারের ফলে সাংখ্যমত চাপা পড়িয়া যায়—তাহার পর আবার যখন হিন্দুদর্শনের অভ্যুত্থান হয়—তখন শঙ্কর কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বেদান্তই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এখন জ্ঞানযোগ বলিতে এই বেদান্তই বুঝায়, সাংখ্য নহে। এই বেদান্ত ও জ্ঞানযোগের

প্রচলিত মত এই যে, এই জগৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সৃষ্ট, ইহার স্বরূপ হইতেছে দুঃখময়, মানুষের সাধনার লক্ষ্য হইতেছে এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ নিবারণ করা, এই জগৎকে এমন ভাবে ছাড়িয়া যাওয়া যাহাতে আর কখনও এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত—সকলেরই এই মত। শঙ্করের সহিত রামানুজ প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, শঙ্করের মতে জগৎ আদৌ সৃষ্ট হয় নাই উহা অবিদ্যা-কল্পিত, ইহার অস্তিত্ব কেবল মানুষের মনে—যতক্ষণ অজ্ঞান আছে ততক্ষণই ইহার অস্তিত্ব; অন্যান্যের মতে জগৎ বস্তুতঃ সৃষ্ট হইয়াছে।* কিন্তু কার্য্যতঃ এই দুই মতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই—কারণ উভয় মতেই এই জগতের মূল হইতেছে অবিদ্যা—এবং এই জগৎকে ছাড়িয়া যাওয়াই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। শঙ্করের মত—জীব জগৎকে ছাড়াইয়া ব্রহ্মলীন হইবে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জীব জগৎকে ছাড়াইয়া-গোলকে বা বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে চির-আনন্দে বিরাজ করিবে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছেন, মানব জীবনের যাহা লক্ষ্য যাহা পূর্ণতম পরিণতি তাহা হইবে এই জগতে, এই মাটির পৃথিবীতে—অন্য কোথাও নহে। তিনি দেখিয়াছেন—এই জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া নহে, অবিদ্যা প্রসূত নহে—এই জগতের প্রতি অনু পরমাণু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের দ্বারা অনুস্যূত। তাঁহার এই মত তিনি কোনও দর্শনশাস্ত্র বা দর্শনাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া পান নাই—স্বয়ং ভগবান তাঁহার এই দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিলেন যখন তিনি আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁহার সেই সময়কার অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত "উত্তরপাড়া অভিভাষণে" বলিয়াছেন,

"তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।......দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই? আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।......আমার পালঙ্ক-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম—চোর, খুনী, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম।"

তাঁহার এই দিব্য দৃষ্টি লইয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে-সব মত প্রচার করিয়াছেন—বহুকাল হইতে যে-সবের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে, সে-সব মত প্রকৃত পক্ষে হইতেছে একটি সমগ্র সত্যের এক একটি দিকের আভাস। সেই সমগ্র সত্যের মধ্যে তিনি সকল মতের যে সমন্বয় পাইয়াছেন, তাঁহার Essays on the Gita গ্রন্থে তাহা তিনি বিবৃত

* রামানুজের মতে চিৎজীব ও অচিৎ জগৎ—দুই-ই হইতেছে ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ বিভিন্ন; আত্মা যেমন দেহ হইতে বিভিন্ন—ব্রহ্মও তেমনি জীব ও জগৎ হইতে বিভিন্ন।

করিয়াছেন—সেই মত অনুসারে ব্রহ্ম সত্য ; জীব এবং জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাই কি প্রকৃত অদ্বৈত নহে ? অন্ততঃ ইহাই যে গীতার অদ্বৈত, শ্রীঅরবিন্দ তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সমন্বয় ও সমগ্র দৃষ্টি সুলভ নহে, গীতায় বলা হইয়াছে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা। সাংখ্যমত অনুসারে অচিৎ জড়স্বভাবা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই হইতেছে এই জগতের মূল। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুইটি মতে যে সূক্ষ্ম প্রভেদই থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ ও ব্যবহারিক সাধনায় বিশেষ কোন প্রভেদই হয় না। উভয় মত অনুসারেই এই জগৎ হইতেছে মূলতঃ অজ্ঞান ও দুঃখের আগার, অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা এই জগতের জীবন হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইবে। শঙ্করের সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রভেদ এই যে, শঙ্কর সাংখ্যেরই ন্যায় জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তির উপরই জোর দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, জগতের মূল শক্তি অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা অচিৎ নহে—তাহা হইতেছে ভগবানের চিৎশক্তি, গীতায় যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই পরা প্রকৃতিই supermind বা বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া আত্মা হইতে দেহ, প্রাণ, মনকে প্রকট করিয়াছে—এই বিজ্ঞানই সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, মানুষের মন বিকশিত হইয়া যখন এই অতি-মানস বা বিজ্ঞানে পরিণত হইবে তখনই মানুষ জগতের প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্যে উপনীত হইতে পারিবে এবং জীবনের উচ্চতম নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছে সচ্চিদানন্দ, তাহার সহিত জগতের কোন অলঙ্ঘ্য বিরোধ নাই; কেবল এখন আমরা জগৎকে অজ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতেছি, এইটিই প্রকৃত মায়া, আমাদিগকে জ্ঞানের চক্ষু দিয়া জগৎকে দেখিতে হইবে। আমাদের অজ্ঞানও হইতেছে জড়ের নিশ্চৈতন্য হইতে পূর্ণ চৈতন্যে উঠিবার মধ্যবর্ত্তী স্তর, ইহা জ্ঞানেরই একটি পূর্ণ অবস্থা। মানুষ যাহাতে পূর্ণ চৈতন্যে উপনীত হইতে পারে, মানব জীবনে আধ্যাত্মিকতা প্রকট করিতে পারে, জন্মের পর জন্ম সে তাহারই সুযোগ লাভ করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল সত্যটি দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জগতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রকট করিবার জন্যই জড়ের মধ্যে বীজরূপে দেহ, প্রাণ, মন অনুস্যূত হইয়াছে এবং সেখান হইতে বিবর্ত্তনের দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। এই বিকাশের চরম পরিণতি ও চূড়া হইতেছে অধ্যাত্ম-জীবন, The life divine. *

এই সকল সত্য যে ভারতের প্রাচীন বৈদান্তিক সত্যের বিরোধী নহে তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেদ, উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

* কোরাণের মধ্যে আমরা এই গভীর অর্থপূর্ণ কথাটি পাই—
"Youma tubaddalul ardu ghair alard"
"সেদিন এই পৃথিবীই এক নূতনতর পৃথিবীতে পরিণত হইবে।"

আর দার্শনিক সত্যকে যদি জীবনে প্রয়োগ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না, সেই জন্য শ্রীঅরবিন্দ The Synthesis of Yoga নামক নিবন্ধে বিভিন্ন অধ্যাত্ম-সাধনার স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, মানুষ কেমন করিয়া তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনকে গঠন করিয়া পূর্ণ দিব্যজীবনে উপনীত হইতে পারে তাহার ব্যবহারিক প্রণালীটি দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহারা আধ্যাত্মিকতা ও অধ্যাধ্যসাধন হইতে দূরে থাকিতে চান তাঁহাদের একটি সাধারণ অজুহাত হইতেছে এই যে, নানা মুনির নানা মত, আমরা কোন পথের অনুসরণ করিব ? কিন্তু এই নানা মতেরও সার্থকতা আছে—সমগ্র সত্যকে মানুষ একেবারেই ধরিতে পারে না, তাই এক সময়ে এক একটা দিক ধরিয়া তাহার চরমে যাইতে হয়, তাহার পর আসে একটা সমন্বয়ের যুগ তখন মানুষ সত্যকে অনেকটা সমগ্রভাবে ধরিতে পারে। শঙ্করের মত ও সাধনা এইরূপই একটা ঐকান্তিক ধারা—তাঁহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে। শঙ্কর কেবল সেই বৈদান্তিক সত্যের একটা দিকের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে যতই সাময়িক ক্ষতি হউক, সমগ্র মানব জাতির অধ্যাত্মজীবন বিকাশের জন্য তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মের উপর, ব্রহ্মের নিশ্চল শান্তি, নীরবতা, ঐক্য, নিষ্ক্রিয়তার উপরেই জোর দিয়াছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগৎ ব্রহ্মের যে dynamism এর দিক, বহুত্ব, সক্রিয়তা, শক্তির দিক তাহার দিকেই অত্যধিক জোর দিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ যদি আত্মার শান্ত-প্রতিষ্ঠা না থাকে, সে কর্ম্ম হয় দুঃখ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ এবং অশেষ অনিষ্টকর। পাশ্চাত্য জগত ইহা এখন উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রতিক্রিয়া স্বরূপে শঙ্করের বেদান্ত সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করিতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ উপনিষদের সেই প্রাচীন সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সগুণ ভাব ও নির্গুণ ভাব, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয় শান্তি—দুইই সমান ভাবে সত্য ; যখন মানুষ ইহা উপলব্ধি করিবে, যখন তাহার বাহিরের কর্ম্ম ভিতরের শান্ত অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে উৎসারিত হইবে, তখনই তাহার জীবন ও কর্ম্ম দিব্য হইয়া উঠিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, যত রকম অধ্যাত্ম-সাধনা আছে, সাধারণতঃ যাহাদিগকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে করা হয়—তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই সত্য আছে—যত মত, তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যে সকল সাধন-প্রণালীর ঐক্যটি দেখাইয়া দিলেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়া, সকল সাধনার বহিরঙ্গ দিকগুলিকে ছাড়িয়া তাহাদের মূল শক্তি আহরণ করিয়া যে সর্ব্বযোগ-সমন্বয় তাহাই শ্রীঅরবিন্দের যোগ।

সমাধান

হিমাংশু রায়

গভীর চিন্তামগ্ন বীরু।

দামিনী নিঃশব্দে তাহার কাছটিতে আসিয়া বসিল ; সে টের পাইল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে পর দামিনী কহিল, শুনলে, সাহেবকে গিয়ে ধর এবার।

বীরু আত্মস্থ হইয়া একটু নড়িয়া বসিল।

আমায় কিছু বলছিলে ?

হাঁ। বলছিলাম ধর্ম্মঘট করা আমাদের কাজ নয়। সপ্তাহ ঘুরে গেল ; সুখ তো দূরের কথা, দুঃখই তো দেখছি দিন-দিন চরমে গিয়ে উঠছে। আগে দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটতো, এর কল্যাণে দেখছি তাও জোটা ভার হয়ে উঠেছে !

বীরু কথা কহিল না।

দামিনী পুনরপি কহিল, আমি বলি কি সাহেবকে বলে কয়ে......তুমি তো আর সত্যি ইচ্ছে করে ওর মধ্যে যাওনি, দশ জনের কথাতেই না জড়িয়ে পড়েছো। বুঝিয়ে বললে সাহেব নিশ্চয়ই বুঝবেন। দেখ খুসী হবেন কত।

বীরু কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তা কি করে হবে।

দামিনী ঈষৎ উষ্ণ হইয়া কহিল, কেন হবে না শুনি ?

তুই জানিস নে দামিনী মৃত্যুপণ করে আমরা সংগ্রামে নেমেছি। যদ্দিন না আমাদের দাবী গ্রহণ করা হয় তদ্দিন......

তদ্দিন আমাদের হাওয়া খেয়ে বাঁচতে হবে। বিদ্রূপে মুখটা ভরাইয়া লইয়া দামিনী বলিয়া উঠিল। বুদ্ধিকে বাহবা দিতে হয় বটে !

বীরু সপ্রতিভ-কণ্ঠে কহিল, রাগ করিসনে দামিনী। প্রয়োজন হলে আমাদের সবকিছু করতে হবে—প্রাণ উৎসর্গ পর্য্যন্ত। শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা তো তাই বলেন !

তা বলবেনই। তাদের যে দুবেলা রাজভোগ মিলে।

ওদের তুই অমন করে বলিসনে। ওরা মানুষ নন, দেবতা। বলিতে বলিতে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইল।

ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে! মুখ ঝাড়া দিয়া দামিনী কহিল। তা যদি হোত তা হলে লম্বা-চড়া কথা বলার সঙ্গে ডালভাতের ব্যবস্থাও করতেন তারা।

সে দোষ তাদের নয়, আমাদের। এতকাল যে পাপ আমরা করে এসেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে ? এ হচ্ছে তারই সূচনা।

বাঃ চমৎকার !

ঠাট্টা নয় ; খুব সত্যি ! অজ্ঞতার শেষ ধাপে আমরা দাঁড়িয়ে। তারা ঠেলে ফেলে দিয়েছে, বাঁধা দেয়নি ; অমানুষিক অত্যাচার করছে, শক্ত হয়ে দাঁড়াইনি ; যা দাবী করেছে, দিয়েছি, দাবী করিনি কখনও। এমনি করে, কতকাল কে জানে, পরাজয় স্বীকার করে এসেছি আমরা! আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইনি কোনদিন। ক্লীবত্বকে এমনি ভাবে বরণ করে নেওয়া পাপ নয় কি ? শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অপরাধ কি এতদিনে ধুয়ে মুছে যাবার ?

এসব দেবতারা বলেছেন, নয় ?

হাঁ।

তাই !

তাই কি ?

তাই আজ সারাদিনে একমুঠি ভাতও মুখে উঠেনি।

ছি ছি, কেন তুই তাদের ভুল বুঝছিস দামিনী। মৃদু তিরস্কারের সুরে বীরু কহিল।

মানুষের স্বভাবই ওই ; দেবতাদের তারা চিরকালই ভুল বুঝে আসছে। বলিয়া সে গম্ভীর-মুখে উঠে গেল।

ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় সপ্তাহ। শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান অসহিষ্ণুতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! তীব্র দারিদ্র্যের জ্বালায় তাহারা হতোদ্যম বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। যতখানি উৎসাহ ও সাফল্যের আশা লইয়া তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহারা অনেকখানিই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলে ভুল বলা হইবে না। নিজেদের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বাঁচিয়া থাকা তাহারা শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেছে। শ্রমিকদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এখন আর তাহাদের মনের গোপন স্থানটিতে শিহরণ তোলে না। একান্ত অনাবশ্যক—নিতান্তই হুজুগ বলিয়া মনে হয়।

বীরু একটু স্বতন্ত্র। সে অভিমান করে ; রাগ করে না! দারিদ্র্য তাহাকে পীড়ন করে ; সে পীড়িত হয় না। সবাই তাহাকে সমীহ করিয়া চলে। প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে তাহার নির্ভরশীল চোখের দিকে।

সেদিন পথে বীরুর সঙ্গে লোচন খুড়োর দেখা। লোচন খুড়ো কাতরভাবে বলে, আর তো এ পোড়াদেহে সয় না বাবা, যা হোক একটা কিছু ঠিক করে ফেল।

বীরু তাহার নিজস্ব হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে টানিয়া আনিয়া বলে, হবে খুড়ো, সব হবে, দুটো দিন আর সবুর কর।

দুটো দিন! হতাশ হইয়া পড়ে সে। তার আগেই যে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

কি যে বল খুড়ো! উৎসাহিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বীরু। মরবে বললেই কি মরা হয় ?

লোচন খুড়ো কথা কহে না ; স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

বীরু ততক্ষণ পথচলা সুরু করে।

বীরুর আজকাল অনেক কাজ। সারাদিনের মধ্যে সে নিঃশ্বাসটুকু ফেলিবার অবসর পায় না। শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে তাহাকেও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিতে হয়। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে হয়। এমন কি ইতিমধ্যে তাহাকে কার্য্যব্যপদেশে সহরে পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল।

আজ যখন বীরু বাড়ী ফিরিল তখন বেশ খানিকটা রাত হইয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই দামিনী একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, ওগো যে করেই হোক ছেলেকে আমার বাঁচাও। বাছা যে আমার কেমন করছে!

স্ত্রীর আকস্মিক কান্নাকাটিতে বীরু অভিভূত হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধে কাটিলে পর সে কহিল, চল, দেখি কেমন আছে ও।

ছেলেটার জ্বর—বীরু ইহা যথাসময় শুনিয়াছে কিন্তু কান দেয় নাই। আর সময়ই বা কই তাহার। তবু সে ভাবে তাহার ভয়ানক অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া ছেলেটা ভুগিতেছে একবার সে চাহিয়াও দেখে নাই। মনে মনে সে যথার্থ অনুতপ্ত হয়।

ছেলেটা ধুকিতেছিল। জীবন-দ্বীপের যেটুকু তেল অবশিষ্ট আছে ইহার জোরে সে কোনমতে টিকিয়া আছে বীরু দোরগোড়া থেকে কয়েক সেকেণ্ড অনিমেষে ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আরপর আস্তে আস্তে ছেলের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। দামিনী বসিল মেঝের উপর।

মৌন মুহূর্ত্ত একে একে সরিয়া যাইতেছে।

ওদিকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। অস্তমিত সূর্য্যের বিদায়-বেদনায় বাহিরের জীব-জগৎ বিষণ্ণ ; ততোধিক বিষণ্ণ এ তিনটি প্রাণী।

বীরু দুই হাটুর উপর মাথা গুজিয়া ভাবিতেছে—অসংবদ্ধ চিন্তা কতকটা। ঔষধ তো দূরের কথা, জল ছাড়া ছেলেটার মুখে আজ পর্য্যন্ত কিছু পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। নিশ্চিত মরণের মুখে সে আগাইয়া চলিয়াছে। চির সুষুপ্তির কোলে হয়তো এলাইয়া পড়িবে শেষরাতের দিকে।...

নাঃ ভাবিতে বীরু ভয়ানক ক্লেশ বোধ করে। মাথাটা টনটন করিয়া ওঠে। বা হাত দিয়া সে কপালের দুপাশ চাপিয়া ধরে।

বেশী দিনের স্মৃতি নয় ; বীরুর পরিষ্কার মনে পড়ে, আসন্ন মাতৃত্বের গর্ব্বে ও আনন্দে বিভোরা দামিনীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া সে একদা কহিয়াছিল, বল তো কি হবে ?

দামিনী মরমে মরিয়া গিয়া বলিয়াছিল, ধেৎ!

তারপর তাহার কানের কাছে কান লইয়া সে চুপিচুপি বলিয়াছিল, ছেলে।

বীরু সানন্দে সায় দিয়াছিল।

হাঁ ছেলেই হবে! পরে দৃপ্তকণ্ঠে কহিয়াছিল, ওকে আমি নিজের হাতে বড় করব ; লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে তুলব। ও আমাদের মুখ উজ্জল করবে একদিন দেখিস্।

বীরুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল।

তাহার সেই ছেলে আজ মৃত্যু যাত্রী। আর সে নির্লিপ্ত দর্শক!

অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস!

তাহার চোখ দুইটি জ্বালা করে। দুই ফোটা জলও গড়াইয়া পড়ে বুঝি।

সহসা সে মুখ তুলিয়া ছেলের ম্লান-পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকায়। তাহার ঠোঁটের কোনে হাসি। সহজ সরল নয় যেন? পিতার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের রেশ ইহাতে?

বীরুর বুকের ভিতরটা আরেকবার মোচড় দিয়া উঠিল।

বীরু সোজা হইয়া বসিল।

দামিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, ওকে তোমার বাঁচাতে হবে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। সাহেবের কাছে যাও, তিনি তোমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। যাও লক্ষীটি।

বীরু ইহা শুনিতে পাইল কিনা বোঝা গেল না। অন্যমনস্ক হইয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল।

কি একটা পাখি ঝট-পট শব্দ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

হঠাৎ বীরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভয় নেই দামিনী ওকে আমি বাঁচাবই। ও যে আমার......

বাকীটুকু স্পষ্ট শোনা গেল না। উন্মত্তের মত ছুটিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পর বীরু ফিরিয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গে তাহার অসহ্য ব্যথা। কপালের খানিকটা কাটিয়া অবিরত রক্ত গড়াইতেছে। অন্তরে গ্লানি; অপমানের তিক্ত জ্বালা।

সাহেব তাহাকে সম্মানিত করিয়াছে সবুট পদাঘাতে!

চোখ দুইটি বীরুর রক্তজবা।

দামিনী ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ওকি তোমার কপাল কাটল কি করে?

বীরু ইহার কোন জবাব না দিয়া কতকটা আপনমনেই কহিতে লাগিল, না না ওর মরাই উচিত। কি হবে বেঁচে থেকে? এমনি পদাঘাত, দারিদ্র্যের এমনি জ্বালা তো ওকেই একদিন সহ্য করতে হবে। পারবে ও? হয়তো পারবে—পৃথিবীর আস্তাকুঁড়ে একটু খান ঠাঁই হয়তো ও করে নিতে পারবে। কিন্তু কি প্রয়োজন এর? মরুক, শান্তি পাবে—চির শান্তি!......

দামিনী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঘর-কন্না

ক্ষিতীন মিত্র

ছন্দময় কবিতার সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির মাঝখানে হঠাৎ ছন্দ পতনের ক্ষণিক দৈন্যের মত, বিরাট কোলাহলের অন্তঃপুরে সে নিঃসঙ্গতা ও রিক্ততার ইঙ্গিত হানিয়াছে।

সদর রাজপথে, ট্রামলাইনের পাশে,• মস্তবড় দেবদারু গাছের তলায়, ঢাক্‌না সমেত ছোট্ট একটি ভাতের হাড়ি সামান্য কাত হইয়া প্রতিদিন পড়িয়া থাকে। কোমরের নীচটুকু কালোয় দেবদারুর গোড়াকে হার মানাইয়াছে, উপরের অংশটুকু লালে ময়লা মিশান। হাত খানেক দূরে আগুনে পোড়া কালো-কুৎসিৎ গোটা ছয় দশইঞ্চি ইট। কয়েকখানা আধ-পোড়া শুক্‌নো ডালা ঐ গাছটির শিকড় ভর করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ান।

ট্রামে আপিসে যাতায়াতকালে প্রত্যহ এদের চোখে পড়ে একই অবস্থায়। তেমনি পরিপাটি ধূলায় পড়িয়া থাকিয়া এরা অলস দিন কাটায়। এদের মালিক নিশ্চয়ই আছে। তাকে দেখিবার জন্য কৌতুহল ও জাগিল বটে, কিন্তু তার জের বড় জোর ডালহৌসী পর্যন্ত, তারপর দৈনন্দিন কর্ম-প্রবাহে তুচ্ছ আবর্জনার মত কোথায় তলাইয়া যায়!

সেদিন ট্রামে বসিয়া ঘটনাটী লক্ষ্য করলাম।...ভদ্রলোকটি ট্রাম কোম্পানীর কোন কর্মচারী হইবেন। কোম্পানীর সীমানার মধ্যে ঘর-কন্নার চিহ্ন দেখিয়া বেশ একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বিবাদ-উন্মুখ হইয়াও বিবাদীর সন্ধান পাইতেছিলেন না। অগত্যা আপন মনেই সশব্দ তিরস্কার শূন্যে উৎসর্গ করিতে করিতে ঐ হাড়িটির নিকট উপস্থিত হইলেন। বিবাদীর অপ্রতিবাদে সেটাকেই ভদ্রলোকের বিচিত্র মুখ ভঙ্গিমায় বিব্রত হইতে হইল। অভিনয় এখানেই, যবনিকায় পৌছিতে পারিল না, ক্রমে সেটাকে পদ-সঞ্চালনে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন কাজে সরিয়া পড়িলেন।

রাজা মরিয়া গেলেই রাজ-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া থাকে না। রাজ্যের সঙ্গে রাজার যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গৃহস্থালির সঙ্গে তেমনি অটুট সম্বন্ধ, ভাতের হাড়ির। ঠিক পরের দিনই দেখিলাম, মৃত পুরাতনকে বদলী দিয়াছে নতুন, এই হাড়িটির জাঁকালো টক্‌টকে লাল নিজের অস্তিত্বের কথা আমাদের বড় করিয়া জানাইতেছে।

দিনের পরে দিন আসিয়া সেটাকে একটু একটু করিয়া প্রাচীনের পথে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। কোমর পর্যন্ত যে রক্ত-বর্ণ ছিল কালিতে তা' বিবর্ণ হইল, ফিকে লাল হাড়ির তলাটি হইয়া দেখা দিল আগের হাড়িটির মত কালি-গোলা।

আরেকদিনের কথা।

হাসির ফাঁকে ফাঁকে আসে তার কান্না। অশ্রুজল সজল মাটিতে জমা হইয়া কেমন গোল বাঁধাইল। ট্রাম আমার বাহক। বিপদগ্রস্ত হইতে হইল আমাকেই বেশী। অচল ট্রাম ছাড়িয়া অগত্যা বাসের কাঁধে চাপিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করা গেল। কিন্তু হঠাৎ জোর বৃষ্টি বর্ষণে, পাড়ার মুখে পা দিয়া পথে আট্‌কাইয়া গেলাম। পা' দুটো হয়ত জল-কাদার অত্যাচার সহ্য করিতে একেবারে নারাজ ছিল না, কিন্তু দুর্বল মাথাটি জল বহিতে ভড়কাইয়া গিয়াই মাথায় গোল পাকাইয়া তুলিল। আপাততঃ একটি ছাদওয়ালা ফুটপাথে মাথা গুঁজিয়া, অনাবশ্যক এবং অবিবেচক বাদলাকে সাধ মিটাইয়া দোষারোপ করিতে লাগিলাম।

গাল ভারি করিয়া ঝাল মিটানতো খুবই হইল, বৃষ্টি আরো ভারি হইয়া গাত্র-দাহ উপস্থিত করিয়া ছাড়িয়াছে। তিক্ততায় যখন মন ভরিয়া উঠিল তখন, তাকে কাড়িয়া লইল সমুখের সেই পরিচিত দেবদারু গাছটি, তার অনাড়ম্বর গৃহস্থালির আসবাব লইয়া। অবশ্য, ঐখানেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল না। চোখ ঘুরাইয়া এই অবসরে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম—যে ফুটপাথে ক্ষণিক আশ্রয় লইয়াই অসুবিধায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি, তাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে কতগুলি পরিবার। ফুটপাথটির উপর এখানে-সেখানে দলে দলে অনেকগুলি মানুষ নিশ্চিন্তে শুইয়া, বসিয়া, ঘুমাইয়া আছে। বুঝিলাম, এরা কতগুলি পরিবারে বিভক্ত, একসঙ্গে যে কয়টি প্রাণী জড় হইয়া আছে, তারা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের অন্তর্গত। পথের কাঙাল এরা-সঙ্গতি না থাকিলেও সংসার আছে। এদের দুটো বাসা—দিনের বাসা সহর-ছড়ান পথ ও লোকের বাড়ী, রাতের বাসা নির্দিষ্ট পথের ফুটপাথ।

বেশ আছে এরা—উন্মুখ প্রকৃতির কোলে উলঙ্গ জীবন। ঘুমের ঘোরে এদের ক্লান্ত দেহ অবসন্ন, যে ভাবে খুসী পড়িয়া আছে, শৃঙ্খলার সূক্ষ্ম শাসন নাই। কেহ সোজা, কেহ এক-ভঙ্গ, কেহ কেহ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে দেহ রাখিয়াছে, কারো পা কারো মাথা পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে। কেহ কাসিতেছে, কেহ গান গায়, আর কেহ কেহ একটি মাত্র জ্বলন্ত বিড়ি এক হাত হইতে অন্য হাতে তুলিয়া লইয়া বাদলাদিনের স্যাঁৎসেঁতে আসরটা গরম করিয়া তুলিয়াছে। অধিকাংশ লোকই দেহ গোপন করিয়া আছে। তাদের মাথা হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত নেকড়া বা কাঁথায় ঢাকা। উদ্দেশ্য সাধু, ইহাতে একাধারে ঠাণ্ডা ও মশা-নিবারণের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

বৃষ্টির পশলা হইতে বাঁচিতে গিয়া নর-নারায়ণকে অবমাননা করিয়া ফেলিয়াছিলাম আর কি। লোকটা আগেই আমাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। চট করিয়া সে বসিয়া পড়িয়া, নিজে বাঁচিয়া আমাকে পাপমুক্ত করিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—লাগেনিতো?

বেচারী শুধু অভদ্র নয়—নিতান্তই বেরসিক। ওর নিকট হইতে মার্জিত প্রত্যুত্তর আশা না করিলেও সরল স্বাভাবিক একটা কথা শুনিতে পাইব ধারণা ছিল। হাসির বিনিময়ে লাভ করিলাম ভয়ার্ত চাহনি। আমার কথাবার্তায় যেন ঘাবড়াইয়া গিয়া, কাপড়ে কবরিত পাশের একটি প্রাণীকে আড়াল করিয়া বসিল।

বেচারীর সাবধানী মনের পরিচয় পাইয়া প্রথম হাসিলাম, তারপর আলাপের প্রলোভনে পায়ের উপর ভর করিয়া ওর পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এটী কে ?

আমার দুঃসাহসিক অগ্রগতিতে সে একেবারে মুসড়াইয়া গেল। তাকে নিরুপায় বিপদগ্রস্ত হইতে দেখিয়া নিজেই প্রশ্নটি ঘুরাইয়া বলিলাম—বউ, না ?

অপরাধীর মত সে মাথা বাঁকাইয়া জানাইল—হাঁ।

আমিও দমিবার পাত্র নই। বলিলাম—এখানেই তোমাদের ঘর-কন্না চল্‌ছে বুঝি ?

—আজ্ঞে হঁ্যা। সারাটি দিন ভিক্ষা করে বেড়াই। সন্ধ্যা লাগলে, ঐ দেবদারু গাছটির তলায় রান্নাবান্না করে খাই। দেখতে পাচ্ছেন—ঐ যে ?

বলিয়া ঐ দেবদারু গাছটির দিকে হাতের আঙ্গুল তুলিয়া ধরিল। এ কয়দিন যার গেরস্তালির আসবাব দেখিয়া আসিতেছিলাম, আজ তার গৃহকর্তার সাক্ষাৎ জুটিল। তাকে শত প্রশ্নে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলাম। তার আতঙ্ক অনেকটা কমিয়া আসিল। সরল স্বাভাবিকভাবে গত জীবনের এক অধ্যায় খুলিয়া বসে—

নাম তার হারাধন।

গাঁয়েই ওদের এতকাল কাটিয়াছে। দরিদ্র চাষী-মজুর সে। অভাবকেও অভাব মনে করিতে শিখে নাই। সেখানে বেশ ছিল। তবে তার জীবনের উপর দিয়া মস্তবড় একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বড় সাধ করিয়া সে ঐ মেয়েটীকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, দুয়ারে আসিয়া দেখে জমিদারের লোকেরা, তার ঘর চড়াও করিয়া, ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতেছে। ঘর নিয়াছে তাতে তার তত আপশোষ ছিল না, কিন্তু দুঃখ এই যে ওদের একটী দিন দেরী সহিল না। সেদিনকার মত আনন্দময় মুহূর্তটি মলিন করিয়া দিতে ওদের বুকে বাঁধিল না! তার এত কষ্ট হইয়াছিল যে সে তা কথায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনি হলে কি করতেন কর্তাবাবু ?

লেখা পড়া জানি, পৃথিবীতে শান্তি আনিতে হইলে মানুষকে কোন পথে চলিতে হইবে তা লইয়াও মাথা ঘামাই। অথচ ঐ সহজ প্রশ্নের একটা যথাযথ উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। একেবারেই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। যে পরিস্থিতিতে জীবনে কোনদিন পা' দিতে হয় নাই, ভবিষ্যতেও হয়তো হইবে না, সে সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা সহজ মনে হইল না।

বেচারী নিজে নিজেই পুনরায় বলিতে লাগিল—কর্তা, তথাপি গাঁয়েই ছিলাম। বা-হাতে কি বোমো হল, সেটা খালি কাঁপে !

—অর্ধাঙ্গ বলে, এ রোগকে।

—তা হবে। তখন ভিক্ষে ছাড়া কি আর পথ ছিল ? ক্রমে তাও জুটছে না দেখে গাঁ ছাড়লুম।...সেদিন থেকে বিয়ে করেছি, কপালে আগুন লেগেছে।...বৌ মাগী যত অনাছিষ্টি !

দু চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকাই ঘুমাইয়া পড়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। অদৃষ্টবাদী হারাধন যাকে এড়াইয়া মনের গোপন কথাটি খুলিয়া বলিতে গিয়াছিল, খপ্ করিয়া তারি হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

হারাধনের বউ হুড়্‌হুড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিল—ইস্ যত দোষ আমার। হ্যারে তুই না বল্‌ছিলি তোর ঘর গেরস্তি আছে, টাকা-কড়ি সুদে খাটে, হালের গরু দশটি ?...

হারাধনের উভয় বিপদ, একেত বৌ সকল পর্দ্দা ডিঙাইয়া আমার সুমুখে সপ্রকাশ, তার উপর সে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাকে এখন শান্ত করা সহজ সাধ্য নয়।

তার মুখখানিতে মলিনতার ছায়া। এতে সড়াইয়া পড়াই স্বাভাবিক। হারাধনের বয়েসের অনুপাতে বৌয়ের বয়েস অনেক কম, সে ব্যাধিগ্রস্ত, কুৎসিৎ, তার বৌ সুস্থ তরুণী—দারিদ্র্যের বিপাকে পড়িয়াও যতদূর সম্ভব সে দেহের সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াছে। বৌয়ের তুলনায় হারাধন নিগুর্ণ। তার মনের দুর্বলতা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

হারাধনের গলার স্বর উদারায় নামিয়াছে। অপরাধীর মত অথচ অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল—দূর ছাই, আমি বললুম কোন কথা তুই শুন্‌লি কি।...হ্যাঁ কি না কর্ত্তা ?

বিচারের ভার আমার কাঁধে চাপাইয়া হারাধন নিশ্চিন্ত হইল। তার সরল বিশ্বাস একটা সামান্য 'হ্যাঁ' বলিয়া তাকে এই সঙ্কট হইতে অবশ্যই রক্ষা করিব। আমাকে যে তা' হইলে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নাই। যাহা হোক সে কথায় সায় দিয়াই আপোষ-নিষ্পত্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলাম। কারণ মিথ্যা বলার ক্ষতি হইতে ওদের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির দাম অনেক বেশী বলিয়া মনে হইল। পথ চলার পাথেয় ওদের নাই, তার উপর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রেষারেষির আগুন জ্বালাইয়া দিলে, ওরা জ্বলিয়া মরিবে নাকি ?

আমার একটি কথায় মেয়েটি জল হইয়া গলিয়া, আবার শুইয়া পড়িল।

হারাধনের মুখে 'রা' নাই। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে একান্ত অসহায়ের মত আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম সে একটু করুণার জন্য কাতর। সে আজ বড় অসহায়। তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্ত্রীকে যথারীতি ভরণপোষণ করিতে পারিতেছে না। অথচ সেই সম্পদে কেহ বাদ সাধিলে হারাধন সংসারে কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

কী ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে আকাশকে গালি দিতে সুরু করিলাম। শুনিলাম আকাশে মেঘ গর্জন, দেখিলাম অন্ধকারে বিদ্যুৎ-পাত। ইতিমধ্যে হঠাৎ কানে অস্পষ্ট আসিয়া পৌঁছিল ওদের গোপন আলাপ। হারাধন গুরুত্বপূর্ণ স্বরে বৌকে জানাইতেছে—জানিস্ তুই ?

—কী জানব ?

—শহরের বাবুদের মোটেই বিশ্বাস নেই। ওদের নজর ভাল নয়।

মেয়েটি আড়ষ্টস্বরে বলিল—তাই নাকি ?

—হঁা।

—ঠাকুরের দিব্যি...ছেলের মাথায় হাত রেখে বল্‌ছি, যদি ওদের সঙ্গে আর কথা বলি।

—তাইত ভাল। শুনিস্‌নি মধুর বৌটা......

—নাঃ......

ওদের আলাপ আর কাণে আসিয়া পৌঁছে নাই। অবশ্য আর কিছু শুনিবার সাধও ছিল না। অবিশ্বাসের বার্ত্তাটুকুই আমার মনে তুমুল দ্বন্দ্ব রচনা করিয়াছে। যেন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, বাস্তবিক আমরা বিশ্ব ছাড়িয়া নিঃস্বের বুকের উপর আসিয়া ভর করি, এই পথ বড়ই সুগম, এদের লইয়া ছিনিমিনি খেল্‌লিলেও এরা প্রতিবাদ করে না। করিবে কি, সংগ্রাম না করিতে করিতে সে শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

জলের ঝাপটায় কখন পরণের কাপড়খানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। একটু সরিয়া দাঁড়াইতে আবার চক্ষে পড়িল একটি অপার্থিব অভিনয়—মা ও সন্তানের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। ঠাণ্ডায় ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় ছেলেটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চায়, মা তাকে নানা বুলি আওড়াইয়া, বুকে চাপিয়া, ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইয়া কিছুতেই জোরে কাঁদিতে দিবে না।

তন্ময়ভাবে মাতৃত্বের আকুতি দেখিতেছিলাম। হারাধন আমাকে ধরিয়া ফেলিল। নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আগেই প্রশ্ন জুড়িয়া বসিলাম—হ্যারে তোর খোকনের নাম রেখেছিস্‌ কি ?

সে খুসী হইয়া বলিল—আজ্ঞে আপনি যে নাম জানেন। ঐত ওর নাম।

—খোকন কাঁদে বুঝি ওর ঠাণ্ডা যাচ্ছে না!...ওর মাকে বল্‌, গায়ের কাঁথাটি ভাল করে টেনে দিতে।

এবার হারাধনের মুখ দেখিয়া টের পাইলাম, আমার পক্ষে ভীষণ বাড়াবাড়ি হইতেছে। এই আশঙ্কাটি আরো সুস্পষ্ট করিয়া সে বলিয়া উঠিল—এখনো বৃষ্টি ঝরছে বাবু ?

সরলার্থ করিতে গেলে এই প্রশ্নের কোন মানে হয় না। চোখের সমুখে বৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করা, আর খাবার সময় 'খাচ্ছেন' বলার একই কথা। তথাপি এক্ষেত্রে এর পরিষ্কার অর্থ রহিয়'ছে। বৃষ্টি মাথায় করিয়াই পথে পা বাড়াইয়া আমি কথাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করিলাম।

আকাশে বিদ্যুৎপাত, বজ্রের গুরুগম্ভীর শব্দ, তারই বুকের উপর দিয়া বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমেই চক্ষে পড়িল, শয়ন কক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক অভিনয়টী। কোলের খুকীটির গায়ে স্ত্রীর হস্তপরিচালিত হইতেছে। তার অপরাধ গুরুতর। হইতে পারে যে ঘরটি অন্ধকার এবং জনশূন্য ছিল তাই বলিয়া সে মায়ের ঘরের কাজ সারা হইবার আগে এমন চীৎকার করিয়া উঠিবে কেন ?

স্ত্রীর সৌভাগ্য। এই আসরে বিনাশ্রমে আমাকেও দেখিতে পাইল না। আমি আর পালাই কোথায়? পরম তৃপ্তিতে শত অভিযোগ কাণ পাতিয়া শুনিতে হইল। কিন্তু ভুলবশতঃ হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। অমনি স্ত্রী ঘায়ের উপর নূনের ছিটা পাইয়া কণ্ঠ পঞ্চমে চড়াইয়া বাড়ী মাথায় করিলেন। করিলে কি হইবে সে দিকে আমার খেয়াল ছিল না, তখনো আমার দু চোখ জুড়িয়া বসিয়াছিল ঐ সে দৃশ্যটি—সন্তানের দৈন্য দূর করিবার জন্য যে রিক্তা নারীর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কার্পণ্য করে নাই।

আপিসের কাজে ছিল ভিড় সুতরাং দেবদারু গাছটির গোড়ায় আসিয়া ট্রাম ভিড়িতে সন্ধ্যা হইয়াছে। নিজেকে গাছের আড়াল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, হারাধন সপরিবারে সারাদিনের পর ভোজনে বসিয়াছে। নিজেদের ভাত শালপাতায় লইয়া খোকনকে দিয়াছে একটি কাগজের উপর আলাদা। সে অধ্যবসায়ের সহিত বুকে মুখে ভাত মাখিয়া আহার করিতে লাগিল। সামান্য দু'টি ভাত স্বামী-স্ত্রির মুখে মুহূর্তে উঠিয়া গেল। তাদের ম্লান চোখ-চাওয়ায় স্পষ্ট অনুভব করিলাম, সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা ক্লান্তির পর আধ-পেটা খাবার শাস্তি কত দুঃসহ।

অধিক বিলম্ব না করিয়া হারাধনের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া খাবারের ঠোঙাটি দিবার জন্য উহা তুলিয়া ধরিলাম। হারাধন হতভম্ব হইয়া কাতর চোখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমার সহানুভূতিকে গ্রহণ করিতে যেন তার বিষম উৎকণ্ঠা। একদিকে অভাব, অপরদিকে অবিশ্বাস।—হারাধন কোন্ দিকে চলিবে?

ওর বউ ধমক্ দিয়া বলিল, বা রে! নে না?

হারাধন যন্ত্র চালিতের মত হাত পাতিয়া খাবারের ঠোঙাটি লইল। অভাবের তাড়নাকে দমাইতে পারিল না।

আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে ছুটিলাম, কিন্তু একটু আগাইয়া আবার ফিরিতে হইল। মনের একটা সাধ, খোকনকে যাহোক কিছু দিয়া যাইব ওর হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিতেই হঠাৎ ওর মা আহ্লাদে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—টাকা!

হারাধন বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি? টাকা?

পাছে সে একটা কিছু কেলেঙ্কারী করিয়া বসে এই ভয়ে আমি সেখানে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলাম না।

গত কালের মত আজও আপিসে যাবার সময় দেবদারু গাছটির নীচে সেই একই দৃশ্য দেখ পাইলাম।—কালো হাড়িটির ভাঙা টুকরাগুলি ইতঃস্তত ছড়ান, ইটগুলি তেমনি অবস্থায় প'ড় আছে, উনানের ছাই তোলা হয় নাই, কুড়ানো গাছের ডাল পালা গুলি এখানে-সেখানে পড়িয়া খাইবার স্থানটিকে নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে।

ওদের সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সন্দেহ নাই। ভাবিয়া মনে হইল বোধহয় এই বন্ধনেরই নাম মায়া! আপিসের বেলা হইয়াছে অতএব সেখানে নামিবার সময় হইল না। আপিসের

কাজে হাত দিলাম বটে কিন্তু তাতেও যেন আজ কোন আকর্ষণ নাই, কাদের জন্য একটা করুণ আর্তনাদ গোপনে মনে গুমরিয়া মরিতেছে। আশঙ্কা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমি যে তাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম এতে কোন সন্দেহ ছিল না।

আপিস ছুটি হইল, আমিও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখন ওদের সাক্ষাৎ লাভ করাই আমার প্রধান প্রলোভন হইয়া দাঁড়াইল।

ট্রাম চলিয়াছে—মন পৌঁছিয়া গিয়াছে। সঙ্গীদের মধ্যে যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে মতানৈক্যের তুমুল দ্বন্দ, আমার মনে গভীর প্রশ্ন ওরা আর আমরা কে এবং কী সম্বন্ধ ?

একদিন ছিল যখন যুদ্ধের খবর পড়িতে উৎসাহ লাগিত। সেটা ছাত্র জীবনের কথা, মায়ের হাতের তৈরী জলখাবার বাঁ হাতে রাখিয়া, গরম চায়ের কাপ ডান পাশে লইয়া, শুইয়া, বসিয়া কাত হইয়া হাসিয়া সুর করিয়া পড়িয়া কইই না রোমাঞ্চকর মনে হইত। সেখানে এখন মিশিয়াছে। প্রথমতঃ মানুষের জীবনের উপর না হোক জিনিষের দামের উপর নজর বাড়িয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এছাড়াও চোখের সামনে সহস্র রকম সংগ্রামের নিদারুণ দৃশ্য। যে কালে মানুষের কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম দুর্জ্জেয় হইয়া উঠিয়াছে, সে সময় রাজ্য লিপ্সাজনিত যুদ্ধ নিতান্তই বিলাসিতা বলিয়া মনে হয়।

এরূপ নানা অবান্তর জটিল চিন্তায় দিশেহারা হইয়া পড়িতেছিলাম, ট্রামের ক্রমাগত ঘটাং ঘটাং শব্দ ও হঠাৎ ব্রেকের ঝাঁকনিতে আমার জড়তা কাটিল। আচমকা চাহিয়া দেখি ট্রাম নিশ্চল, ক্ষিপ্ত জনতা ট্রাম ঘিরিয়া ফেলিয়া, বিশ্রী গালিতে ড্রাইভারকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে প্রাণভয়ে কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে।

ট্রাম হইতে নামিয়া অল্প আগাইয়া গেলাম। কয়েকটি যুবক ট্রামলাইন হইতে সরাইয়া আসিয়া সমস্ত দেহ মোচড়ান একটি শিশুর মাংস খণ্ড ঐ দেবদারুর তলায় গুছাইয়া রাখিল। রক্তের সামান্য চিহ্ন ছিল শিশুর নাকের নীচে।

খোকনকে চিনিতে পারিলাম। তাকে কাছে গিয়া শেষ একটিবার দেখিবার সাধ হইল বটে কিন্তু পা সরিল না, ডাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম মুখে শব্দ বাহির হইল না। তারপর পরম উৎকণ্ঠায় একটি মেয়েকে পাগলের মত ছুটিয়া আসিতে দেখিব এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম এবং এই ভাবিয়াও কিনারা পাইতেছিলাম না যে, আজ তাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব।'

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল কিন্তু সে আসিল না। লোকে যাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিল সে হারাধন। নির্লিপ্তের মত একটিবার ছেলের দিকে তাকাইয়া লইয়া হারাধন বাতগ্রস্তের মত ঢলিয়া ছেলের পাশেই কাত হইয়া পড়িয়া গেল।

আমার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িতেছে বোধ করিয়া ট্রামে গিয়া চাপিলাম। ট্রাম ছাড়িবার যতটুকু বিলম্ব হইল ঐ সময়ের মধ্যে আরোহীদের নিকট হইতে ঘটনার পূর্ণ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম—

—আজ দু'দিন ধরিয়া হারাধনের বৌ নিখোঁজ। সে 'আস্‌ছি' বলিয়া কোথায় গিয়া আর আসে নাই বা আসিতে পারে নাই। মনের ক্ষোভে সংসার গুটাইয়া হারাধন বনে যাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঘর-কন্নার মায়া তখনো সে কাটাইতে পারে নাই। প্রতিমুহূর্ত মনে করিয়াছে ঐ বুঝি তার বৌ ভিক্ষার ঝুলি চাউলে ভরতি করিয়া পূর্বের মত ঘরে ফিরিতেছে। মরুভূমির মরীচিকার মত তার কল্পনা ব্যর্থ করিয়া প্রলোভন শুধু তাকে জর্জ্জড়িত করিয়াছে।...

আজ বিকালে যুদ্ধের গরম খবর কাগজে সরবরাহ করিয়া হকার পূর্ণ উৎসাহে রাস্তাদিয়া গলাবাজি করিয়া ছুটিয়াছে। কৌতুহলী জনতা তাকে ঘিরিয়া ফেলে। হারাধন বড় আশা করিয়া সেখানে ঝড়ের মত ছুটিয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, কি জানি লোকে তার বৌয়ের খবর লইয়া আসিয়া হয়তো তাকেই খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে খোকন তাকে অনুসরণ করিতে গিয়াই "বাবা" বলিতে বলিতে ট্রামের তলায় চাপা পড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল; মানুষের হাতে গড়া অকৃতজ্ঞ দুর্দান্ত জানোয়ার তার সামর্থের লীলা দেখাইয়া গেল।

ট্রাম ছাড়িল। আবার সে প্রতিদিন রীতিমত যাতায়াত করিতে লাগিল। একদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই দেবদারু গাছের তলা সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ। অতীত ঘর-কন্নার চিহ্নটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

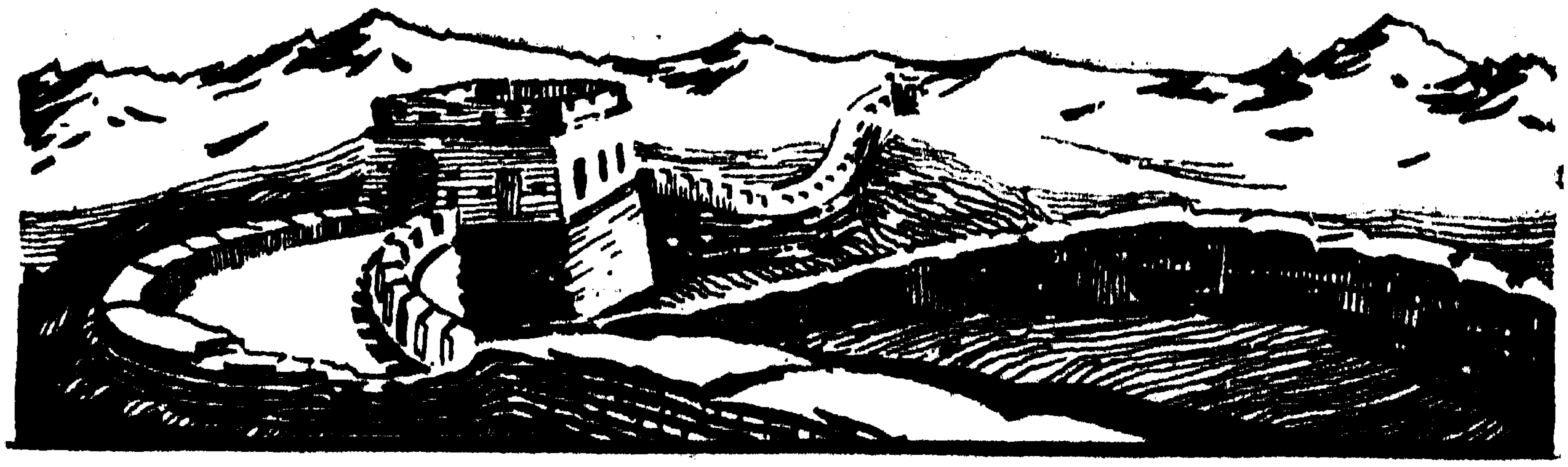

রাতের পৃথিবী

করুণাময় আচার্য্য

মৌন রাত্রির ধ্বনিহীন যে সঙ্গীত আজি এ আঁধারে
স্তিমিত আকাশতলে পূর্ণস্তব্ধতায়
গেয়ে যায় এ ধরণী ব্যর্থ বেদনায়
তাহারি গোপন কথা কি সে আভাষে কি কহিবে আমারে ?
শুনি আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে
সুপ্ত মোর কম্পিত হৃদয়ে
ধরণীর মৌন মুখরতা
ইথার তরঙ্গ স্রোত লয়ে চলে গ্রহে গ্রহে ক্ষুব্ধ সে বারতা।
ভাবি মনে কি সে নিবেদন—
মাগে কি কাহারো সাথে অনন্ত মিলন
এ শুভ লগনে ?
কিম্বা করে কারো লাগি অস্ফুট ক্রন্দন বিরহ স্মরণে ?

ভাষাহীন ধ্যানমগ্ন অনন্ত গম্ভীর তব গান
জানি কভু করিবেনা আমার প্রশ্নের সমাধান।
তথাপি কবির অধিকারে
সীমাহীন অনন্ত আঁধারে
রহস্যেরে দিলো অবকাশ
রাতের পৃথিবী তার সত্য মোরে করিয়া প্রকাশ :

আমারি না-বলা-বাণী—বেদনার অস্ফুট ক্রন্দন
ধরণী কহিছে চুপে ধ্যানরত যোগীর মতন :
নিঃশেষে ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস
স্তব্ধ-সুপ্ত ভাষা মোর মন্ত্রবলে টানি গ্রহে গ্রহে করিছে প্রকাশ ॥

বর্তমান ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ ও ইহার ঐতিহাসিক প্রেক্ষা

(পূর্বানুবৃত্তি)

খুব উদার ও সৎসাহসী না হইলে কোন মুসলমান নরপতি উলেমাদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না। কাজেই ইসলাম সংস্কৃতির ধারা পরধর্মে উদারতা ও অসহিষ্ণুতার রূপ দুই বিপরীত কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা শুধু ভারতেই না, মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্বিরোধে এক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠবার সুবিধা কখনও হয় নাই।

এখন আমরা গ্রহীষ্ণু হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রভাবপুষ্ট সংস্কৃতির কথা আলোচনা করিব। ইহা স্থায়ী না হওয়ার কারণ ইহার উদ্ভব যে অবস্থায় ও তার পরিবর্তন। হিন্দুমধ্যবিত্তগণ মুসলিম পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, পার্শী শিখিতেন ও তাহাদের আদবকায়দা অনুকরণ করিতেন, ইহা তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক ছিল। তাহারা শাসক শ্রেণীর কৃপা প্রার্থী ছিলেন, শাসন বিভাগে উচ্চ পদাভিলাষী ও সমাজ জীবনে পদ গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঐসলামিক সংস্কৃতির প্রভাব তত দিন ছিল যত দিন মুসলিমগণ শাসকশক্তিরূপে দেশে ছিল। কাজেই একটির সঙ্গে সঙ্গে অন্যটির ও তিরোধান হয়।

তারপর আমাদের গণসভ্যতার কথা আলোচনা করা যাউক। হিন্দু ও মুসলিম উপাদান উল্লিখিত দুইটি উচ্চস্তর চেয়ে এখানে অধিক স্থায়ীত্ব লাভ করে, কারণ এখানে ঐক্যবন্ধন অধিকতর জীবাত্মক সংযোগে পরিপুষ্ট। ভারতের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে শুধু জাতিগত সম্বন্ধ বর্তমান আছে তাহা নয়। উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণই সভ্যতার একই স্তরে আছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে অনুন্মেষ গণসভ্যতার পর্য্যায়ই ফেলা যায়। বিভিন্ন সভ্যতার সংযোগ হইলে আত্মচেতনার অভাব অনেক সময় পারম্পারিক আদান প্রদান সাহায্য করে। এইজন্য হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে। বিচার বুদ্ধির অভাব যেমন ইহার অনুবর্তন তেমন ধ্বংসেরও কারণ। যতদিন হিন্দু জনসাধারণ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা বিধ্বস্তের পর অর্ধ সভ্য অবস্থায় ছিল এবং মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ও আদিম মনোভাবাপন্ন ছিল ততদিন এক ঐতিহ্য উদ্ভবের কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু ইহার যে কোন পক্ষ উন্নতির সোপানে উঠিলে পরস্পরের বিরোধী হইবে, অবধারিত। সেই অবস্থায় হিন্দুগণ অধিক হিন্দু ভাবাপন্ন ও মুসলমান-গণের অত্যধিক ইসলাম প্রীতি দেখা দিবে।

ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ভাবাচ্ছন্ন করার প্রচেষ্টা মুসলমানদের তরফ হইতে সব

সময়ই হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায়ও ধর্মান্ধ মৌলভীদের তুষ্টি সাধন হয় নাই। ইহারা ভেদাভেদ জ্ঞানহীন বহু সংখ্যক অর্ধ মুসলমানকে পুনরায় ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত করে। কাজেই ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল।

হিন্দু জাগরণ

নবশক্তির সংঘাতে এই সকল অন্তর্নিহিত দুর্বলতা শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। বৃটিশ শক্তির উদ্ভবের সাথেই জাতীয় ঐতিহ্যে উচ্চস্তরের দুই উপাদান অন্তর্হিত হইল। মুসলমান শাসনের অবসানে হিন্দু মুসলমান সভ্যতার ভিত্তিভূমি বিনষ্ট হইল। তারপর মুসলমান রীতিনীতি অনুকরণের আগ্রহ ক্রমেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কমিয়া আসে। রাষ্ট্রিক অনুশাসন পরিবর্তন হইলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুরাগ অন্য লক্ষ্যে নিবদ্ধ হয়।

রামমোহন রায় এই যুগক্রান্তির মধ্যপুরুষ। বাল্যশিক্ষা ও অনুরাগে তিনি সম্পূর্ণ ইসলাম ভাবাপন্ন বাঙ্গালী ছিলেন। অতীত আদর্শের প্রকৃত সমন্বয় তাহার মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনন্যসাধারণ গ্রহীষ্ণু ও মানসিক সতেজতার ফলে তিনি প্রথম জীবনের প্রভাব অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শে আকৃষ্ট হন। তাঁহার পরবর্তীযুগে বাঙ্গলার কোন মনিষীর চিন্তায় বা লেখায় ঐসলামিক সভ্যতা ও জ্ঞানসম্পদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ১৯ শতকের বাঙ্গালী লেখক ও চিন্তাবীরগণ একান্তভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নবাবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টিতে মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করেন। ঐ সময়কার দুই একজন হিন্দু-মুসলিম আদর্শানুরাগীকে পুরাকালের বিবর্তন-বিক্ষিপ্ত জীববিশেষের মত মনে হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াইবার মত মানসিক সবলতার অভাবে ইহাদের ও শীঘ্রই রুদ্ধপথে আত্মবিলোপ ঘটিল।

ভারতে ইংরেজ শাসনের আশুফল ঐসালামিক ঐতিহ্যের প্রতি অনাদর এবং তৎপরিবর্তে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুরাগ। অন্য অবস্থায় মুসলমানেতর জাতির ঐসলামিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হওয়ার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইত; কিন্তু ১৯ শতকের হিন্দু ভারতে আর এক সুদূর প্রসারী প্রভাবের ফলে ইসলামের প্রতি বীতরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্‌গণ কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নবাবিষ্কার ইহার কারণ। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে অতীত ঐতিহ্য ও বৈদিক সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে হিন্দুদের কোন ধারণা ছিল না। এই শতাব্দীর হিন্দু ধর্ম বৈদিক যুগের গণধর্মের রূপান্তরিত অবশেষ। ইহা স্থান কালে অস্থিত ও অগ্রাহ্য।

কাজেই ইহার মতাবলম্বীগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের ঐসলামিক প্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের আবার সময় ফিরিল। অতীত ঐতিহ্য হিন্দুদের মানসপট উদ্ভাসিত করিল এবং চিন্তারাজ্যের এই সাড়া শুধু ইসলাম নয়, ভারতের মর্মোদ্বেলী পাশ্চাত্যের প্রাণবন্ত ভাবধারা পর্যন্ত কিছুটা প্রহত করিল। ইহার ফলে ১৯ শতাব্দীতে মুসলমানেতর জাতির মধ্যে ইসলামের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ এবং হিন্দু আদর্শের বিপুল প্রতিষ্ঠা হয়।

ইহা একটু আশ্চর্যের যে কয়েকজন ইংরেজ ধর্মযাজক ও শিক্ষাবিদ্ এই আন্দোলনের প্রথমভাগে বিশিষ্ট অংশ নিয়াছিলেন। হিন্দুদের পক্ষে প্রথমে তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ স্বাভাবিক। মিশনারীরা তাহাদের শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান আমলের রীতিনীতির বিরুদ্ধভাব প্রচার করিতেন। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দাবলীতে পার্শী ও উর্দু কথার আধিক্য ছিল। ইংরেজ শব্দ-কোষ প্রণেতারা ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গলা অভিধান হইতে অনেকগুলি আরবী, পার্শী শব্দ বাদ দেন। বাঙ্গলা ভাষায় শুচিতা বৃদ্ধি করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। যাহারা মিশনারী কর্তৃক এইরূপ কাজের জন্য নিযুক্ত হইতেন তাহাদের মধ্যে ও অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখা যাইত।

কাজেই ১৯ শতকের প্রথমার্ধের বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য পণ্ডিত ও মিশনারীদের মিলিত চেষ্টার ফল বলিলে, আমাদের উক্তি কোন অসঙ্গত দোষ-দুষ্ট হইবে না।

অন্যত্রও ঠিক একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত ১৯ শতাব্দীতে ভারতের নবতর কৃষ্টি আবার হিন্দু আদর্শে প্রত্যাবর্তন করে। ঐ যুগের চিন্তানায়কগণ পাশ্চাত্য ভিন্ন অন্য কোন বিজাতীয় প্রভাব হিন্দু আদর্শে স্বীকার বা গ্রহণযোগ্য মনে করিতেন না। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সমন্বয় সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের নিকট এই সমন্বয় শুধু হিন্দু ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয়। পাশ্চাত্য আদর্শানুরাগে ইহাদের মধ্যে তারতম্য দৃষ্ট হয়। কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ হইতে অধিকতর পাশ্চাত্য ভাবাকৃষ্ট ; কিন্তু এক কথা সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য যে তাহারা যখন নব ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেন তখন একজন নব্য হিন্দুর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের এবং প্রাচ্য আদর্শের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ জনিত আন্তর-বিক্ষোভের কথাই বলেন। ইসলাম ভাবধারার কথা তাহাদের মনের নিভৃত কোণেও স্থান পায় না।

এরূপ বলা অন্যায় হইবে যে এই নব ভাবধারা ইসলাম বিরোধী। দুই একজন ভিন্ন কাহারও মধ্যে কোনরূপ বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয় না। বেশীর ভাগ লোকই তখন ইসলামের প্রতি উদাসীন ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে এই উদাসীনতা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা পরস্পারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বর্তমান থাকিলেও সম্ভব হইত না কারণ বিদ্বেষ সব সময়ই বিপরীত পক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। উনবিংশ শতাব্দীতে নবভারতের সংস্কৃতি ইসলামের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া চলে। ইহার সৃষ্ট আবেষ্টনে ইসলাম প্রভাব ও প্রয়াস প্রবেশ করিতে না পারিয়া মুসলিমদের অপাংক্তেয় করিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বয়ং সম্পূর্ণতা অন্যভাবে ফল-প্রসূ হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'জাতীয়তা বোধ' এই দেশে জাগ্রত হইল। কিন্তু জাতীয়তাবাদ শুধু আদর্শ প্রীতিতে বাঁচিতে পারে না। কাজেই ভারতের জাতি-সংচেতনা রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আসিল। হিন্দু রাজনীতিজ্ঞগণ এই বিষয়ে অত্যন্ত একদর্শিতার পরিচয়

দিয়াছেন। এই কারণে বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন "মুসলিম নেতৃগণ শিখ ও মারাহাট্টাদের অতীত স্মৃতি বিলোপের চেষ্টা করিলে হিন্দু জাতীয়তাবাদীবৃন্দ তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হইত। জাতীয়তা প্রচারের জন্য তৎকালে এইরূপ মনোভাব সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন ছিল, এবং ইহা আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস, আশাহীন নিষ্ক্রিয় জাতির মধ্যে যে স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে ফলপ্রসূ বলা চলে" কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধের কাজ এখানেই সমাপ্ত হয় নাই। উক্ত দেশ নায়কের কথা আবার উল্লেখ করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে; "এই জাতীয়তাবাদ এক সম্প্রদায় দেশসেবীর মধ্যে একছত্র হিন্দু রাজত্ব বা যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাপনের অন্ধ আত্মঘাতী আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। তাহাদের নিকট 'স্বরাজ' ও 'হিন্দুরাজ' তুল্যার্থবোধক"।

মুসলিম জাগরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু আদর্শ মানসিক ও নৈতিক ভাবরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পর্যন্ত এই আন্দোলন পূর্বের ন্যায় শুধু অর্ধ মুসলমানদের পুরাদস্তুর ধর্মবিশ্বাসী করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাদেশে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রচারে ওয়াহিব আন্দোলন বিশিষ্টাংশ গ্রহণ করে। কঠোর পবিত্রতাপন্থীরূপে এই আন্দোলন আরব দেশে জন্মলাভ করে এবং ভারতে রাইবেরেলীর সৈয়দ আহাম্মদ ইহার একজন একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক হন। ১৮২২ সালে মক্কায় তীর্থযাত্রার পূর্বেই তিনি প্রচার করিলেন যে তিনি একজন 'মুশা'র অবতার কাজেই শিষ্য দীক্ষা দিতে সমর্থ। হজ যাত্রার পর তাহার উপর দেবত্ব ও দীক্ষার অধিকার আরোপিত হয়, এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র তাহার শিষ্যদল বর্ধিত হয়। তাঁহার এই আন্দোলন 'জরাতুর মুসলমান সমাজে নব প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে' বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা পয়গম্বর কালীন পবিত্র ইশলামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রচার সুরু করে। বাঙ্গলাদেশে তাহার মতবাদ 'বাঙ্গালী মুসলমান পুনঃ জাগরণ'-এ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।

ওয়াহিব আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে জাতিক সত্তা উদ্বুদ্ধ করে এবং ইহাতে অনেকে 'বিশিষ্ট' মুসলমান হওয়ার ফলে হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যার উদ্ভব হয়। মুসলমানগণ শাসক শক্তির অনুগ্রহ প্রার্থনায় হিন্দু-প্রতিদ্বন্দ্বী না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রাদায়িক সমস্যার আবির্ভাব হয় নাই। ওয়াহিব আন্দোলন মুসলমানদের শাসক সাম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করে। ইহা প্রথম হইতেই বৃটীশ-বিরোধী এবং অতীত মুখী। ইহা সনাতন ইসলামপন্থী এবং বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থ ও রাজনৈতিক অভ্যুন্নতির বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করিয়াছিল। ইহা নিরুপদ্রব অসহযোগ হইতে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদ দ্বারা বৃটীশ-শাসনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া ৭লিত। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এইভাবে ওয়াহিব আন্দোলন বৃদ্ধি পাইলে হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যার উদ্ভব হইত না, কারণ তাহা হইলে শাসক সম্প্রদায় অচিরেই মুসলমানদের দমন

করিত। ভারতের সর্বত্র ওহায়িব আন্দোলন প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহার পরিবর্তে মুসলমানগণ উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দুদের অনুরূপ সংস্কার আন্দোলন করে। গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মুসলমানদের কেহ কেহ ইহার নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইহার অগ্রদূত সার সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ মুস্‌লিম সমাজের রাজা রামমোহন রায় বলা চলে। বাঙ্গলাদেশে নবাব আব্দুল লতিফ ও বিহারে নবাব আমীর আলী এই আন্দোলনের আদিগুরু এবং ১৯ শতকের শেষার্ধে সার সৈয়দ আমীর আলী ইঁহার একজন বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন।

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। ইহা প্রথমে মুস্‌লিমদের বৃটীশ শাসনের সহিত অভ্যস্ত করে এবং উভয় পক্ষের সন্দেহ ও মনোমালিন্য দূর করিতে চেষ্টা করে। মুস্‌লিমদিগকে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত করা ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। হিন্দুদের তুলনায় ইহারা অর্ধ শতাব্দী পশ্চাৎবর্তী ছিল। তৃতীয়তঃ ইসলাম ধর্মবিশ্বাস ও রীতি নীতিকে উদার-ভাবাপন্ন করা। প্রথমোক্ত দুই উদ্দেশ্য সাধনে মুস্‌লিম সংস্কারান্দোলন খুব সফলকাম হয়। প্রথম উদ্দেশ্য খুব সহজে সফল হয় নাই, কারণ উভয় পক্ষেই তখন ঘোর সংস্কারাচ্ছন্ন। ওয়াহিব আন্দোলন ও সনাতন আদর্শের প্রভাবে মুস্‌লিমগণ বৃটীশের প্রতি শুধু বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না, তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ সামাজিক আদান প্রদানও পাপজনক মনে করিতেন। পক্ষান্তরে বৃটীশগণ মুসলমানদের পুরাতন শত্রু ও সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী মনে করিত। সার সৈয়দ আহাম্মদ বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে এইরূপ মনোভাব বিদূরিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। প্রথমতঃ মুসলমানগণ সিপাহী বিদ্রোহে প্রধান অংশ নিয়াছে ইহা তিনি মিথ্যা প্রমাণ করেন এবং অ-মুসলমানদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ ও সখ্য স্থাপনে অসহিষ্ণু তাহার স্বধর্মীদের বৃটীশ শাসন মানিয়া নিতে প্রবর্তিত করেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠদশ-ভাগে ভারতবর্ষ 'দার-অল-ইসলাম' না 'দার-অল-হার' বিচারের জন্য যে বিতর্ক উঠে তাহা ভবিষ্যৎ মুস্‌লিম সমাজের পক্ষে শুধু শিক্ষা বা ধর্মায়তনের আলোচনা নহে। বাস্তব প্রয়োগে ইহা গুরুতর সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল, কারণ সেই সময়ে ইহার প্রস্তাব গ্রহণ ও নির্দেশের উপর মুসলমানদের রাজনৈতিকক্ষেত্রে আবির্ভাব অথবা অবলুপ্তি নির্ভর করিত। ইসলামের ভাগ্যগুণে ও সার সৈয়াদ আহাম্মদ, মৌলবী কেরামত আলী ও অন্যান্য লেখকদের লেখনী বলে অধিকাংশ মুসলমান বৃটীশের বিরুদ্ধে দুর্মর বৈরীভাব ত্যাগ করেন। ইহার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পথ সুগম হয় এবং আলীগড়ে মুসলমানদের জন্য ১৮৭৫ সালে এঙ্গলো-অরিয়েন্টেল কলে স্থাপনই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে স্বভাবতই মুসলমান ধর্মের গোড়ামি কিছুটা বিনষ্ট হয়।

মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের একদিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদর্শ ও পরিণতিতে ইহা হিন্দু আন্দোলনেরই অনুরূপ এবং এক বিষয়ে ইহার অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য ছিল। নিজ সম্প্রদায়ই ইহার লক্ষ্যবস্তু ছিল। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দু আন্দোলনের এক বিশেষত্ব হইল মুসলমানদের সহিত সহযোগ রক্ষার ক্রমিক অবহেলা এবং আত্মকেন্দ্রিক উদাসীনতা। পরবর্তী অনেক মুসলিম আন্দোলন হিন্দুদের এই অবস্থার প্রতিবাদ করে নাই। ইহা হিন্দু আন্দোলনের সহিত

একঙ্গীভূত হইতে চায় নাই ; অথবা ভারতে এক অভিন্ন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আদর্শ স্থাপনের জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করিয়া আন্দোলন ব্যাপক ও বিস্তৃত করার প্রয়াস দেখায় নাই। ইহা সাম্প্রাদায়িক আদর্শে সংঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে। প্রথমে ইহা হিন্দু প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হইলেও পরিণামে ইহা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ায়।

মুসলিম সংস্কারান্দোলনের স্বতন্ত্র গতি প্রথম হইতেই দৃষ্ট হয়। ১৮৫৫ সালে 'মুস্‌লিম জাতীয় সঙ্ঘ' নামে নব্য ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও কল্যাণ সাধন বৃদ্ধি করা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ১৯ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত 'মুস্‌লিম অঞ্জুমান' এরও এই আদর্শ ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সময় মুসলমানদের ভিন্ন সত্তা বজায় রাখার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও ভারতবাসীদের রাষ্ট্রিক অধিকার লাভের জন্য সার সৈয়াদ আহাম্মদ একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তবু তাহাকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই। এমনকি তাহার স্বধর্মীদের কংগ্রেসে যোগ দিতে তিনি প্রকাশ্যে মানা করেন। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে গেলে এই বীতরাগের কারণ তাহার নরমপন্থী মনোবৃত্তি। এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে—যে মুসলমান সমাজ সংস্কারদের কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় গুরুতর কারণ ছিল। স্যার সৈয়দ আমীর আলী ইহার আরো সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দিয়া বলেন যে মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগদান করিলে 'সংখ্যাগরিষ্ঠরূপ জগন্নাথের রথের চাকায় আবদ্ধ ও পিষ্ট হইয়া নিজেদের জাতিক সত্তা বিসর্জন দিতে হবে'। সাম্প্রাদায়িক নির্বাচন এর স্বপক্ষে প্রচার করিয়া তিনি তাহার মত আরো স্পষ্টতরভাবে ব্যক্ত করেন 'বর্তমান অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইলে অপটু, অশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাহীন সংখ্যালঘিষ্ঠগণ লোক ও সংগঠন শক্তিতে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে পরিণামে আত্মবিলোপ করিতে বাধ্য হইবে। মুসলমানদের সমাজ, ধর্ম ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কেহ এইরূপ সম্ভাবনাকে নিশ্চিন্তচিত্তে উপেক্ষা করিতে পারে না'।

উদ্ধৃতাংশের অর্থ খুবই সহজ। গত শতাব্দীর অষ্টাদশ ভাগে মুস্‌লিমগণের আত্ম চেতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এই মনোবৃত্তির ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে ভারতে অখণ্ড জাতীয় আদর্শ সংস্থাপনের প্রতি মুসমানগণ বিমুখ হয় কাজেই তাহারা সাম্প্রদায়িক ভাবে ভিন্ন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ইহার পর কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুসলিম লীগএর প্রতিষ্ঠা খুব সহজ পরিনতি।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরাম্পরা যেমন মুসলমানদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার মনোভাব সুদৃঢ় করিতে ছিল, বহিঃসম্বন্ধের প্রভাবও তেমনি সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিল! মুসলমানগণ প্রথম হইতেই আন্তর্জাতিক ও অতিদৈশিক (extra-terrtorial) সম্প্রদায় ছিল। ইসলাম ধর্মের আদর্শ হইল স্বধর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। এই ধর্মমত শুধু মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়া নিশ্চেষ্ট নয় ; ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সব সময়ই তৎপর ছিল এবং এই বিশ্লিষ্টভাব অবস্থাবিশেষে চিরবিরুদ্ধভাবে পর্যবসিত হইত।

এই মতবাদের প্রভাবে ভারতীয় মুসলিমগণ তাহাদের জাতিগত উৎপত্তি যাহা হউক না কেন তাহারা যে বৃহত্তর ইসলাম সমাজের চেতনশাল অংশ এই কথা কখনও ভুলিতে পারে নাই। কাজেই শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের চাপে বিধর্মীদের সহিত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিতে পারিল না। ১৯ শতকের অধিকাংশ সময় এই অতিদৈশিক সংচেতনা তাহাদের কোন অনুপ্রেরণা বা আত্মশক্তি প্রদান করে নাই। কারণ ঐ শতাব্দীতে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইসলাম একান্ত শক্তিহীন ও গৌরবভ্রষ্ট। ইহা তখন আভ্যন্তরীণ অবসাদ ও বহিরাক্রমণে বিধ্বস্ত। তুরষ্ক ও পারস্য প্রভৃতি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সে সময় ধ্বংসোন্মুখ। এই সুযোগে মুসলমান জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। বহিঃসংঘাত বা আভ্যন্তরীণ অবনতি প্রতিরোধ করার মত ইসলামের কোন ঐহিক বা পারত্রিক শক্তির অবশেষ ছিল না। এইরূপ ঘোরঘটা হইতে অবশেষে যিনি ইসলামকে উজ্জীবিত করিতে আবির্ভাব হইলেন তিনি সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী।

দলীয় প্রাধান্য ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ এইরূপ অবস্থায় ছিল। পরস্পরের সম্মুখীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দুইটি দল যাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংশক্তি ভিন্ন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও অতীত গৌরবে অনুপ্রাণিত।

উভয় সম্প্রদায় যখন কঠোরভাবে চিত্তদৈন্য ও আত্মরিক্ততা অনুভব করিতেছিল তখন তাহাদের নবাবিষ্কৃত গৌরবোজ্জ্বল অতীত হিন্দু-মুসলমানের চিন্তারাজ্যে এক মাদকতা সৃষ্টি করিল। ইহার ফলে পরস্পরের প্রাণস্বরূপ অতীত ঐতিহ্যকে আকড়িয়া থাকার মনোভাব আরো প্রবল হইল। তাহারা নিজেদের ভিতর পারস্পারিক আদানপ্রদান সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই। শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই এক অভিন্ন ঐতিহ্য সৃষ্টির আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়। হিন্দু-মুসলমানের ভিন্ন আত্মবোধ বৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের আদর্শের মধ্যে আর্থিক প্রতিযোগিতা রূপে আর একটি ঐহিক গ্রন্থি সংযুক্ত হয়।

পরে ইহা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় আরো পরিস্ফীতি লাভ করে। মুসলমানদের সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার দাবীর সঙ্গে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতা সুরু হয়। প্রায় ৭৫ বৎসর যাবত পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে হিন্দুমধ্যবিত্তগণ সরকারী কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্তির ফলে অনুরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হইল। নূতন শিক্ষা ফলে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল যাহারা জীবিকার্জনের জন্য একই পন্থানুসরণ করিল। বৃটিশ শাসন সম্পর্কিত সৃষ্ট বা কোন সরকারী চাকুরী বা পেশার জন্য মুসলমানগণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার বিশেষ দিক হইল ইহা দুই বিরুদ্ধ ভাববাদের সহিত সংযুক্ত ছিল। সামাজিক ভিত্তি না থাকিলে সংস্কৃতি বা আদর্শবাদ বাঁচিতে

পারে না। ১৯ শতকের নব্য ভারতীয় সংস্কৃতি বৃটিশ-শাসন-সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত কর্তৃক পরিপোষিত। পরবর্তী কালের মুস্‌লিম কৃষ্টি ও বৃটিশ-শাসনানুগত বৃত্তিজীবিদের উপর নির্ভর করিয়াছে।

কাজেই দুইটি ছেদ-রেখায় উৎপত্তি একই কারণে। ইহার ফলে হিন্দু-মুস্‌লিম বিচ্ছেদ আরো প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ভারতে বৃটিশ কর্তৃক রাষ্ট্রিক অধিকার প্রদানের ফলে মুস্‌লিম আত্ম-বোধ ও হিন্দু মুসলমান প্রতিযোগিতা আরো বৃদ্ধি পায়। মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িকভাবে তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কাজেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যুন্নতিতে যাহা হইয়াছে তাহার অন্যথাচরণ রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে হইবে এইরূপ কেহ আশা করিতে পারে না। সামান্য প্রবর্তনায়ই তাহারা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী উপস্থিত করিল।

যদিও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা শুধু মুসলমানদের চিন্তাপ্রসূত স্বীকার করা যায় না, তবুও ইহা বলা চলে যে ভারতীয় মুসলমানগণ যে পথে উন্নত হইতেছিল তাহাতে এইরূপ পরিণতি খুব স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। ভারতের রাষ্ট্রিয় শাসনে উত্থাপিত সংস্কারের সময় মুসলমানগণ এক সমস্যার সম্মুখীন হইল। ভিন্ন বা যুক্ত নির্বাচন সম্বন্ধে ইহাদের চরম সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই সমস্যা অভীপ্সিতভাবে সহজসাধ্য করিয়া তাহাদের আশা আকাঙ্খা চিরদিনের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া দিল।

এইরূপ ব্যবস্থা শাসকশক্তির স্বার্থানুযায়ী হইলেও সিদ্ধান্তের মৌলিক ভিত্তির কোন পরিবর্তন হইল না। হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যা উদ্ভবে যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয় তবু ইহা শুধু স্থূল স্বার্থ-সংঘাতের ফল বলা চলে না। 'চাকুরী-বখরা' সম্বন্ধে যত কথাই বলা হয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ শুধু এই জন্য হয় নাই। ঐতিহাসিকভাবে দেখিতে গেলে হিন্দু ও মুসলমানের উভয় ঐতিহ্যে আপন আপন অতীন্দ্রিয় সত্তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনের সঙ্কল্প সাংসারিক স্বার্থ-সংঘাতের অনেক পূর্বে সুরু হয়। হিন্দু-মুস্‌লিম আত্ম-বোধে আর্থিকের চেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রথম ও চরম প্রবর্তনা দিয়াছে। হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যায় ঐহিক স্বার্থের প্রতি অত্যধিক জোর দেওয়ার প্রধান কারণ আজকাল প্রচলিত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। মুস্‌লিম সাম্প্রদায়িকতার মূলে নীচ সাংসারিক স্বার্থ ভিন্ন কোনরূপ নৈতিক সমর্থন আছে ইহা হিন্দুগণ বিশ্বাস না করার ফলও এইজন্য কিছুটা দায়ী সন্দেহ নাই।

কোন সম্প্রদায়ের ভিন্ন সত্তা বা ইহার ভাষায় তাহার প্রাণ-পুট (soul) রক্ষার অটল ও দৃঢ় সঙ্কল্প কখনই ভাসা ভাসা কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যার প্রকৃত মানসিক ভিত্তি হইল বৃহত্তর মানব সমাজ হইতে উভয় জাতির ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার আগ্রহ। দুই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হইল আত্ম-কল্যাণ নয় আত্ম-শ্লাঘা। এইজন্য হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যার মর্মকেন্দ্র নির্ধারণ করিতে হইলে গত শতাব্দীতে হিন্দু-মুস্‌লিমের আত্ম-বোধ ও তাহার

ক্রমবর্ধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষা ভিন্ন পরবর্তীকালের আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ নির্দেশ সম্ভবপর নয়।

গত শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই হিন্দু-মুসলমানের আত্ম-বোধ পূর্ণতররূপ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীযুগের সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধনের চেষ্টায় বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইহার বিশেষত্ব আরোপ করে। ইহার পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে শুধু সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাময়িক মিলন বা চুক্তি প্রসঙ্গে। এই সকল আলোচনায় উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের স্বার্থের একমাত্র সংরক্ষক ও বিচারক মনে করে। কাজেই এইরূপ চুক্তি রক্ষা অনেক সময় একত্বের চেয়ে পারস্পরিক সুবিধা বোধের উপর নির্ভর করে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই ঘটিয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে সাময়িক ঐক্য সম্ভব হইত না যদি তৎকালে ভারতীয় মুসলমানের তুরস্কের প্রতি অনুরাগ ও বৃটিশের প্রতি বিদ্বেষ না থাকিত। ১৯১১ সালের তুর্ক-ইতালী যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সেভার্সের সন্ধি পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ মুসলিম বিচ্ছেদ চরমাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং লসেইনে তুর্ক-বৃটিশ মিত্রতা স্থাপনে পূর্বানুসৃত সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু-মুসলিম আত্মবোধ সংহত ও সুস্থিত হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুস্‌লিম সংঘর্ষ শুধু বর্তমান সময়ের বিশেষত্ব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপ সংঘর্ষের যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিন্তু সেই সময় ইহারা আকস্মিক ও বিচ্ছিন্নভাবে হইত, চিন্তা রাজ্যে তখনও সুসংহত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে ব্যক্তি প্রধান দলের উদ্ভব হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভাবকেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতের সর্বত্র উপদল (Blocs) সৃষ্টি করিয়াছে।

স্বতন্ত্রভাব এতদূর বর্ধিত হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা খুব নৈরাশ্যজনক হবে সন্দেহ নাই। চুক্তির উপর কোন সত্যিকার ঐক্য সম্ভব হইতে পারে না।

ইহা কখনই বাস্তবে পরিণত করা যাইবে না যতদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি নিজেদের ভিন্ন অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ না করিবে। বর্তমান সময়ে কি এইরূপ সম্ভাবনার ক্ষীণ আশা দেখা যায়? স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা সুদূর পরাহত। হিন্দু-মুসলিম কেহই সেইজন্য প্রস্তুত নয়। বর্তমান জগতের দ্রুত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংঘাতের ফলে অদূর ভবিষ্যতেই হিন্দু-মুসলিমের এই পুরাতনপন্থী আদর্শ খসিয়া পরিবে। বর্তমান সমাজের কোন ঘটনার চেয়ে আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির উপর হিন্দু-মুসলমানের অ-হিন্দু ও অ-মুসলমান হওয়া নির্ভর করে। এই অবস্থা না আসিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দুঃস্বপ্নের মত ভারতে বিরাজ করিবে।

'Current thought' এর October & December পর্যায়ে শ্রীনীরদ চৌধুরীর Hindu-Muslim relations in India শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ।

রাত্রি-শেষে!

শুভেন্দু ঘোষ

ত্রিযামা যামিনী; নিদ্রা গিয়াছে টুটি',
অহেতু অচেনা ব্যথায় বিভোল্ হিয়া।
কুহেলি-করুণ জ্যোছনা রয়েছে ফুটি';
হেনা-বনে বায়ু ফিরিছে নিঃশ্বসিয়া।

অহেতু অচেনা ব্যথায় বিভোল্ হিয়া,
পথ চেয়ে কার নয়ন নিমেষ-হারা;
কে যেন আসিবে আমারি এ-পথ দিয়া!
নীলাভ উজ্জ্বল্ জ্বলিছে শুক্রতারা!

পথ চেয়ে কার নয়ান নিমেষ-হারা
পরিচয় বুঝি শুক্রতারা সে জানে!
জ্বল্ জ্বল্ চোখে একাকী জাগিয়া সারা
চেনা যেন চেনা, কবে সে? সে কোন্ খানে?

পরিচয় বুঝি শুক্রতারা সে জানে!
কুহেলির পথে চিরন্তনী কে আসে?
ব্যাকুল ধরণী কহে বাণীহারা গানে
"আমারে সে খোঁজে, আমারে সে ভালোবাসে।"

কুহেলির পথে চিরন্তনী কে আসে?
কুসুম কোরক উঠিছে কেমন করি'!
মৃদু শিহরণ জাগে জায়মান ঘাসে!
তন্দ্রিত তরু উঠিতেছে মরমরি!

কুসুম কোরক উঠিছে কেমন করি'!
হেনারে মাটীর স্নিগ্ধ মমতা টানে!
আলো-আঁধারির শাশ্বত পথ ধরি'
সসীম বাহু মেলেছে অসীম পানে!

দ্বন্দ্ব

(নাটক)

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

প্রভাতদেব সরকার

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—অবিনাশবাবুর বৈঠকখানা

[আরো দিন পনের পরে। ঘরের অবস্থা প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ, অন্যথায় ঘরে কিছু আলো আছে। বেলা আন্দাজ দশটা। ছুটির দিন, আদালত-অফিস বন্ধ। বেলা অধিক হওয়ায় ঘরের সব কিছু দৃশ্যমান—চতুষ্কোণের পেঁজা তুলোর মত ফ্যাকাশে কাল ঝুল আলোর সংস্পর্শে অপরূপ। অবিনাশবাবু আপন চেয়ারটিতে নিবিষ্ট মনে বসে' ব্রীফ দেখচেন—বাইরের জগত তাঁর কাছে একরকম অবলুপ্ত। ইত্যবসরে একটি ভদ্রলোক এসে অবিনাশবাবুর সামনাসামনি চেয়ারখানায় দখল নিলেন। অবিনাশবাবুর ভ্রুক্ষেপ নেই। যে ভদ্রলোকটী ঘরে এসে বসলেন, তাঁর বহিরাবরণ দেখে দর্শকের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং বলে রাখি, তিনি মাত্র ঘটক।—কোথায় কেমনটী মানায় খোঁজ রাখেন বলে'ই বোধ করি, নিজের মানান-বেনানে তত খেয়াল নেই, অথবা খেয়াল থাকলেও সামর্থে কুলোয় না। এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট!…কিছুক্ষণ উস্‌-খুস করে' ভদ্রলোক গলা-খাঁকারি দেবার চেষ্টা করে' ঢোঁক গিলে চেপে গেলেন। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। ঘরের পাতলা ঝুলগুলো হাওয়া লেগে দুলচে: ওদিকে আবার মুহুরীর ময়লা মশারীতে হাওয়া লেগেচে। কিন্তু অবিনাশবাবু স্থির। ঘটক মশায় কোটের পকেটে হাত চালিয়ে অনেকগুলি জীর্ণ কাগজপত্র বার করলেন। এখনও পকেটের গুরুভার 'হৃত-গাভী-পুনরুদ্ধারের', ইঙ্গিত করে।]

ঘটক (আরো খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে)

আজ্ঞে—এ—এ, আমি-ই আপনার কাছে এসেছি—হ্যাম্‌।

অবিনাশবাবু (মুখ না তুলে)

তা তো বোঝাই যাচ্চে! হেতুটা কী?

ঘটক (পকেটে হাত পুরে)

এই আজ্ঞে—এ, আমার হাতে ভাল ছেলে আছে—

অবিনাশবাবু

ছেলে তো সবারই আছে! তাতে আমার কী?

ঘটক

আজ্ঞে—এ, মানে সৎ পাত্র—বিবাহোপযোগী!

অবিনাশবাবু

তা ছেলের বিয়ে দিন্ না কেন !

ঘটক

আজ্ঞে-এ, সেই জন্যেই তো আসা ! আপনার—

অবিনাশবাবু

বলেন কি ! ছেলের বিয়ে দেবেন কিনা, তাতেও উকিলের পরামর্শ চাই !! (থেমে) ওঃ, মশায়ের বুঝি ঘরে কিছু মজুত আছে—(থেমে) পক্ষও বোধ করি, তিন ?

ঘটক

আজ্ঞে-এ, তা নয়। তবে-এ আপনার কনিষ্ঠা মেয়ের সঙ্গে যদি—

অবিনাশবাবু (সোজা হ'য়ে বসে)

অ্যাঃ, বলেন কি ! আমার কনিষ্ঠা মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে ? (থেমে) আপনার পরিচয়টা তা' হলে—

ঘটক

আজ্ঞে—এ, ছেলে আমার নয়। ছেলেটি ঈশ্বর তা-তা—

অবিনাশবাবু (সুস্থির হবার চেষ্টা করে')

তা বেশ ! তা' আপনি এত খোঁজ রাখেন কেন ?

ঘটক (বিনীত ভাবে)

আজ্ঞে—এ, আমার পেশা।

অবিনাশবাবু (বিচলিত হ'য়ে)

পেশা ? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই ! (থেমে) কার কটা মেয়ে, কটা ছেলে তার খবর রেখে বেড়াচ্চেন ? দুনিয়ায় কী আর কোন কাজ নেই। (থেমে) বেশ ভাল কথা।

ঘটক (আরো অপ্রতিভ হ'য়ে)

আজ্ঞে-এ, না। আমি ঘটক-ক্।

অবিনাশবাবু (নড়ে বসে')

সেই কথাটাই এতক্ষণ বললেই তো চুকে যেত ! যত সব অবান্তর—

ঘটক (অস্ফুটে)

আজ্ঞে—এ, গোড়া থেকে আপনি-ই শুনতে চাননি।

অবিনাশবাবু

কী রকম ? আমি শুনতে চাইনি, না, আপনি বলেননি ! কেবল কতকগুলো কথা বড়ালেন বইতো না ?

ঘটক (আত্ম প্রত্যয়ে)

তা বাড়ুক। কথায় আছে লাখ্ কথায় বিয়ে,—সবে তো সুরু!

অবিনাশবাবু

কিন্তু লাখ্ কথা শোনবার তো আমার ধৈর্য্য নেই, ফুরসুৎও নেই। যা বলবার বলে' ফেলুন চট্পট।

ঘটক

আজ্ঞে-এ্যঃ, পাত্রটি সৎ, বিদ্বান, অমায়িক এবং বংশে—

অবিনাশবাবু

আঃ, আবার কথা বাড়াচ্চেন? ওগুলো তো বাঁধা বুলি—পাত্রটির দর কত, তাই বলুন।

ঘটক (উৎসাহিত হ'য়ে)

আজ্ঞে-এ্যঃ, এতে দরদস্তুর নেই।

অবিনাশবাবু (চশ্‌মাটা খুলে)

নেই কি রকম? আলবৎ আছে। দরদস্তুর নেই, বিয়ে? (থেমে) দরদস্তুর নেই বিয়ে—এমন তো শুনিনি কখনো!

ঘটক (সাহায্য করার ভাব করে')

আজ্ঞে-এ্যঃ, না শুন্‌লেও এমন তো অনেক ঘট্‌তে পারে!

অবিনাশ বাবু (উত্তেজিত হ'য়ে)

পারে! স্বীকার করচি পারে, একশ'বার পারে—হ'য়েচে? পাত্র-পরিচয় শেষ করুন। কথা বাড়াতে আপনারা অদ্বিতীয়।

ঘটক

আজ্ঞে-এ্যঃ—

অবিনাশবাবু

দেখুন, আপনার বারবার ঐ-আজ্ঞেটি আমার পছন্দ নয়। অযথা কথা বাড়ে!

ঘটক

পাত্রটি হীরের টুক্‌রো।

অবিনাশবাবু

ফের সেই আরম্ভ করলেন যত রাজ্যের অলঙ্কার! সংক্ষেপে সারুন।

ঘটক

এম্-এতে বরাবর ফাষ্ট হয়েছেন। আজ্ঞে-এ্যঃ ল'তেও তিনবার—

অবিনাশ বাবু

ফের সেই আজ্ঞে! বেশ বুঝ্‌লুম, ছেলেটী যাকে-বলে স্কলার, জুয়েল। (থেমে) উপস্থিত কী করচেন?

ঘটক

আজ্ঞে—এ্ঞ ওকালতি।

অবিনাশবাবু (হতাশ হ'য়ে)

নাঃ, 'আজ্ঞেটা' দেখ্‌ছি আপনার মুদ্রাদোষ। (থেমে) মুনসেফীর জন্যে দরখাস্ত ক'রলেই পারতেন, বাঁধা আয়!

ঘটক

আজ্ঞে-এ্ঞ, গোলামী তিনি করতে নারাজ। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতে চান।

অবিনাশবাবু

থামুন। বলেন কী, বাঙ্গালীর ছেলে চাক্‌রি ক'রতে চায় না? এমন তো শুনিনি।

ঘটক

আজ্ঞে-এ্ঞ, না শুনলেও—

অবিনাশ বাবু

আঃ, আপনার 'আজ্ঞের' জ্বালায় গেলুম।...তা হ'লে বেশ বোঝা যাচ্চে যে পাত্রের বিষয় সম্পত্তি প্রচুর। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান চলতে পারে। তা' পাত্রের বাপ্‌-মা বর্ত্তমান?

ঘটক

আজ্ঞে-এ্ঞ, পিতা গত,—মাতা বর্ত্তমান।

অবিনাশবাবু

নাঃ, আপনাকে শোধরাণর চেষ্টা বৃথা।...ভাই-বোন?

ঘটক

তিনিই একমাত্র পুত্র। মাত্র একটি বোন, কলেজে পড়েন।

অবিনাশবাবু (আগ্রহ ভরে)

বেশ, বেশ। এবার ছেলেটীর নাম বলুন তো।

ঘটক

আজ্ঞে-এ্ঞ খুব সম্ভব পাত্রটিকে আপনি চেনেন। নাম শ্রীমান সোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর তেজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য পুত্র—যেহেতু, তিনি এক্ষণে উদীয়মান আইনব্যবসায়ী—বাঙ্গালার বাহিরে তাঁর নাম। মাত্র দেড় বৎসরে এইরূপ অসাধারণ ধীশক্তি—

অবিনাশ বাবু (গম্ভীর মুখে)

এবার আপনি যেতে পারেন। (থেমে) হ্যাঁ, আরো শুনে যান, ভবিষ্যতে যেন আর ও রকম সম্বন্ধ নিয়ে এখানে না-আসেন।....যত সব খোসামুদের দল। বাঙ্গালার বাহিরে!...মাত্র দেড় বৎসরে! অসাধারণ ধী-শক্তি—বুলি বাঁধাই আছে, বলে' গেলেই হ'লো আর কী!.. যান দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড়!

ঘটক

আজ্ঞে-এ্ঞ, বর-ঘর উচ্চ ছিল। অতুলনীয় পাত্র হাজারে একটা—

অবিনাশবাবু (রুখে)

ছাই! ল'-এর কী বোঝে ছোক্‌রা? যত সব ছেলে মান্‌সের দল। জুটেছে মন্দ নয়!

ঘটক

আজ্ঞে-এ্ঞ, পাত্রটি লোভনীয়। যেমন রূপ, তেমনি গুণ—

অবিনাশবাবু (চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে)

আপনি যাবেন কি না?

ঘটক (যেতে যেতে)

আজ্ঞে-এ্ঞ, পাত্রটী অতু-লো-তু-অ-অ—

[প্রস্থান

[অবিনাশ বাবু মাথায় হাত বুলতে বুলতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বাইরের জগৎটা সমস্ত শব্দ কোলাহল নিয়ে তাঁর কাছে প্রকট। কে জানে বেলা হয় তো সত্যিই অনেক হ'য়ে গেচে!]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অবিনাশবাবুদের খাবার ঘর

[পূর্ব্ব দৃশ্যের দিন দশেক পরে। অবিনাশবাবু মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেচেন। যদিও ঘড়ি-ধরা সময়ের মাপে বাড়ির গিন্নীবান্নি, ঝি-চাকর ছাড়া ও ভোজনবিলাসী হওয়া কারুরই ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, তবুও শিষ্টাচারে দশটার-আগে নাকে-মুখে-গুঁজে যাওয়াটাকে মধ্যাহ্ন-ভোজন আখ্যা না দিলে, নৈশ-ভোজনটাকে হাতের কাছে পাই না—ভোজন-পর্ব্ব ভাগাভাগির সময় গণ্ডগোল বাধে এবং অযথা ক্ষুধারই উদ্রেক হয়। এদিকে নাকে-মুখে-গুঁজে দশটার আগে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ ক'রলে বেলা বারোটার সময় দিব্যি বুকজোড়া অম্বলে আই-ঢাই করে' রাত ন'টার সময় নিশ্চিন্তে নৈশ-ভোজনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চলে। সুবিধে অনেক।······অবিনাশবাবুর সামনে বসে' মেনকা হাওয়া করচে। দূরে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্নেহময়ী খাওয়ার তাদারক করচেন। স্নেহময়ীর আঁট-সাঁট চেহরায় প্রতিমার ছাঁচে মুখটি এবং তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ দেহের সুষমায় বয়েসের আন্দাজ চলে না—তবে গিন্নী বলে' মেনে নিতে একটুও দেরি হয় না, চোখের দৃষ্টি এবং মুখের ভাব দৃঢ়তা ব্যঞ্জক হ'লেও কেমনতর যেন স্বভাব কোমল। সেখানে সব কিছুর উপদ্রব চলে, আবার এমন কিছুর বাড়াবাড়ি চলে না, যা বাড়ির লোক কেউ জানে না—সময় মত আবিষ্কার করে' নিতে হয়।······রোজ এই সময় তিনি ঠিক এসে দোর গোড়াতে দাঁড়াবেনই—অবিনাশবাবু ও একবার চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নেবেনই। এ পর্য্যন্ত কারুই ভুল হ'লো না কোন দিন।]

মেনকা

কই বাবা, আপনার যে হাত উঠচে না? সব ঠেলে রাখ্‌চেন!

অবিনাশবাবু

না, মা। ঠিকই খাচ্ছি। তোরা মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছিস্।

মেনকা

আজ আপনার শরীর কী খারাপ হয়েছে ?

অবিনাশবাবু

তোদের ঐ কেমন দোষ, একটুতেই মনে করিস তোদের বাবা ভীষণ ভাবে অসুস্থ !

মেনকা

বাঃ, আপনি কিছু খাবেন না, আর আমাদের ভাব্‌তেই যত দোষ !

অবিনাশবাবু

আচ্ছা, ঐতো তোর মা রয়েচেন, ওঁকেই কেন জিগ্যেস করনা—রোজকার খাওয়া খাচ্চি কিনা। (সাড়া না পেয়ে) তুমিও দেখচি মেনার দলে ! চুপ করে' রইলে যে বড় ! মতলব করে' বেশী খাইয়ে মারতে চাও নাকি ?

স্নেহময়ী

যত সব অলুক্ষুণে কথা !

মেনকা

মা জানবেন কী করে ? মা কি আপনার খাওয়ার মাপ জানেন নাকি ?

অবিনাশবাবু

তা বটে, তা বটে। তোর হেফাজতে মাসকতকে কিন্তু ভারি মোটা হয়ে গেচি।

মেনকা

মোটা কোথায় ? বরঞ্চ দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্চেন !

অবিনাশবাবু

কী বল্‌লি, আমি রোগা ? কখ্‌খোন না, আমার শরীরে বেশ গত্তি লেগেচে কিন্তু।

স্নেহময়ী

ছাই !

অবিনাশবাবু

না বাপু, কি হ'লে যে তোরা মোটা বলিস্ বুঝতে পারি না। তোর মার মত তোদেরও কী হাতীর মত চেহারা পছন্দ নাকি ?

মেনকা

যাই বলেন, আপনি বেশ রোগা হ'য়ে গেচেন।

অবিনাশবাবু

যদিও যাই, অপরাধটা কি করে'চি শুনি যে তোরা সবাই মিলে ভাবতে বসেচিস্ ! বয়েস তো কম হ'ল্যোনা, তার ওপর নানা ভাবনা আছে তো !

মেনকা

সেই কথাই তো আমরা বলছিলুম। চারুর এবার একটা ব্যবস্থা ক'রলে হয় না?

অবিনাশবাবু

নিশ্চয়ই হয়। এখনি হয়!

স্নেহময়ী

হুঁ, মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে তো আর ওঁর ঘুম হচ্চে না।...মেয়ে বড় হ'য়ে উঠলো, সে চুলোয় যাক—তার চেয়ে মামলা-মকদ্দোমাই ওঁর কাছে বড়!

অবিনাশবাবু

চারু কী বিয়ের কথা কিছু বলছিল না কি?

মেনকা (হেসে)

বাঃ, তা কি কেউ কখনো বলে না কি!

স্নেহময়ী

ওই রকমই বুদ্ধি কিনা ওঁর!—মেয়ে আগে ওঁর কাছে এসে বিয়ের আর্জ্জি পেশ করুক তখন! উকিলের বুদ্ধি তবে আর বলেচে কেন!

অবিনাশবাবু

কিন্তু সে তো আজকালকার মেয়ে! দোষ আছে নাকি কিছু ব'লতে?

মেনকা

বাঙ্গালা দেশের মেয়ে—তা সে যে-কালেরই হোক না কেন, কখনো বিয়ের কথা মুখ ফুটে বলে না।

অবিনাশবাবু

ও, তাই নাকি! তা ত' জানি না!!

স্নেহময়ী

তা' জানবেন কেন! মেনকার বিয়ের কথা মনে নেই? জেনে-শুনেও—

মেনকা

নাঃ, মা বাবার কোন কথা সহ্য করতে পারেন না! বাবা জানলেও কাজের চাপে ভুলে যান,—ঐ সামান্য কথাটা মনে করে' না রাখলে আর বাবার চলবে না যেন?

অবিনাশবাবু

বল মা, তুই বল।—তুই না থাকলে এই বুড়ো বাপ-এর দুঃখুটা কে আর বুঝ্‌বে বল!

মেনকা

তা' বাবা আপনি কোন পাত্র ঠিক ক'রেচেন না কি? আমার জানা একটি বেশ ভাল ছেলে আছে।

অবিনাশবাবু

তা হ'লে তো আর কথাই নেই—তাঁর সঙ্গেই ঠিক করে' ফেল্না। আমাকে আর এর মধ্যে জড়ান কেন ?

স্নেহময়ী

কথা দেখ না! গা জ্বলে যায়!

অবিনাশবাবু

আচ্ছা খুকি তুই-ই বল, আমার কথাটা কি অন্যায় হ'য়েচে! আমি বুড়ো হ'য়েচি আমাকে এর মধ্যে জড়ান কেন রে বাপু!

মেনকা (হেসে)

তা কি হয়। আপনাকেই তো সব দেখতে শুনতে হবে।...আমি যাঁর কথা বলচি, ছেলেটী খুব ভাল—ওঁর জানা ছেলে। শুনেছি দাদারও নাকি বন্ধু।

অবিনাশবাবু

তবে আর কি, বাবাজীকে লিখে দাও—তিনিই যেন সব ঠিক করেন। আমি না হয় পরে দেখে আসবো।

মেনকা

কিন্তু আপনার একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। শেষে—

অবিনাশবাবু

শেষে কী? তোরা কী চারুর মন্দ ক'রতে পারিস কখনো? আর বাবাজী আমার পাকা জহুরী। (থেমে) তবে দেখিস্ ছোক্‌রা উকিল-টুকিল না-হয়। যত সব গাছ-মুখ্‌খুর দল—একখানা দরখাস্ত লিখতে পঞ্চাশ গণ্ডা ভুল করে' বসে।

স্নেহময়ী

তোমার মত বুড়ো উকিল হ'লেই হ'বে তো? পাকা লোক!

অবিনাশবাবু

না, না, তা নয়—ছোকরা উকিলগুলো তেমন সুবিধের নয়! কেবল—

মেনকা

তা হ'লে লিখে দিই দেখা-শোনা করবার জন্যে। আসচে মাসে যাতে—

অবিনাশবাবু

নিশ্চয়ই। শুভস্য শীঘ্রম্। ভালই হ'বে এতে যখন বাবাজী আছেন, তার ওপর খোকার বন্ধু।

মেনকা

আপনার কিন্তু পাকা দেখ্‌তে হ'বে। তা না হ'লে মা রাগ ক'রবেন।

অবিনাশবাবু

সে পরের কথা। আগে তোরা পছন্দই কর। আচ্ছা এক কাজ ক'রলে হয় না, তোর মা না হয় পাকা দেখ্‌বেন!

স্নেহময়ী

কি যে কথার ছিরি!

অবিনাশবাবু

না বাপু, আমার কোন পরামর্শ ই যখন ওঁর মনোমত হয় না, তখন চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

মেনকা

কিন্তু মনে থাকে যেন—আমি এদিককার সব ব্যবস্থা করে রাখ্‌চি।

অবিনাশবাবু (আসন ছেড়ে)

আচ্ছা, আচ্ছা, সে যা-হয় করিস—ঐ ওঁকে জিগ্যেস করলেই হ'বে। আমি এখন চলি কোর্টের বেলা হ'য়ে গেল।

[স্নেহময়ী কি-জানি-কেন হেসে দোর গোড়া থেকে সরে' গেলেন। মেনকা পেছন পেছন চলল'।]

[ক্রমশঃ]

বিনয় ঘোষ

আসল যুদ্ধের সংবাদ বল্‌তে এখন শুধু উত্তর সমুদ্রে নৌ-সংগ্রামের সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি। কয়েকটা জাহাজডুবির খবর ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে না। তা' ছাড়া শীতকাল, চারিদিক কুয়াশা আর তুষারে ঢাকা থাকে, বিমান যুদ্ধ বা যন্ত্রসজ্জিত সৈন্যের যুদ্ধাভিযানও সম্ভব নয়। সুতরাং যুদ্ধ খুব ঢিমে তালে চলাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিমধ্যে যে একটা নূতন সমস্যার উদয় হ'য়েছে সেটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আজ যে-যুদ্ধ ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানির মধ্যে কেন্দ্রীভূত সে-যুদ্ধ আবার পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে পরিণত হ'তে পারে এবং সবচেয়ে গুরুতর হ'চ্ছে যে পঁচিশ বছর পর আমরা পৃথিবীর এই দ্বিতীয় চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হ'য়েছি, যখন সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সমস্ত দিক্ থেকে প্রত্যেকটি জাতি বহুগুণ বেশী উন্নত ও সচেতন। ইতিহাসের গতিশীল নিয়মানুযায়ী এ-যুদ্ধের মীমাংসা হবে, কোন শক্তির প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই। আমরা শুধু সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির আলোচনা করে' কিছুটা সে সম্বন্ধে আভাষ পেতে পারি।

যুদ্ধের সংবাদ দু'রকমের আছে। অন্ততঃ বুদ্ধিমান্ ব্যাক্তি মাত্রেই দু'ভাগে ভাগ করে' যুদ্ধের সংবাদগুলি গ্রহণ করেন। একপ্রকারের সংবাদ যা সকলেই চায়ের—টেবলে বসে' আলোচনা করে' থাকেন, আর একপ্রকারের সংবাদ যার সত্য মিথ্যা রূপ আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারি এবং পারি বলেই সেগুলি সম্বন্ধে চিন্তাও করি। প্রথমশ্রেণীর সংবাদে আমাদের দৈনিকের পৃষ্ঠাগুলি ভর্ত্তি থাকে, বড় বড় হেডলাইনে তাদের চোখের সামনে তুলে' ধরা হয়; দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবাদকে সন্ধান করে' নিতে হয়, এমন কি প্রয়োজন হ'লে বুদ্ধি দিয়ে সংশোধনও করে' নিতে হয়। দুই শ্রেণীর সংবাদই আমরা আলোচনা করব।

প্রথম শ্রেণীর সংবাদ হ'চ্ছে সম্প্রতি "গ্রাফ স্পী" জাহাজের বিষয়। "গ্রাফ স্পী" জার্ম্মান পকেট রণপোত এবং বহু সপ্তাহ ধরে' আতলান্তিক মহাসাগরের এর পিছু নিয়েছিল গোটা তিনেক বৃটিশ ক্রুইজার। "গ্রাফ্ স্পী" বহুদিন যাবৎ ঘুরে' অবশেষে মণ্টেভিডের বন্দরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু উরুগ্যের শাসনকর্ত্তারা তাকে বন্দরে থাকার অনুমতি দিলেন শুধু মেরামতের সময় পর্যন্ত। তাও সমুদ্রে পাড়ি দেবার মত মেরামত করতে হবে, যুদ্ধের উপযোগী সাজে তৈরী হওয়া নিষেধ। অনন্যোপায় হ'য়ে "গ্রাফ্ স্পী"র ক্যাপটেন্ হিটলারকে বেতারে সংবাদটি জানান এবং হিট্‌লার উত্তরে বলেন যে তিনিই ঐ অবস্থার পুরোপুরি মালিক এবং দায়িত্ব তাঁর, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তার সমাধান করতে পারেন। সংবাদ পাওয়া গেছে ক্যাপটেন্ বারুদবিস্ফোরণে জাহাজটিকে ধ্বংস করে' ফেলেছেন, শত্রুর কবলে তুলে' দিতে তাঁর নাকি দ্বিধা হয়েছিল। ক্যাপটেন্ বা নাবিকদের কোন সংবাদ মেলে নি। দ্বিধার কারণ নিয়ে অনেক রকমের অনুমান চল্‌ছে। কেউ বল্‌ছেন হয়ত জাহাজটির বিশেষ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বা সরঞ্জাম শত্রুর হস্তগত হোক্, ক্যাপটেন্ তা চান নি এবং সেইজন্যই জাহাজটিকে ধ্বংস করে' ফেলেছেন। হয়ত তাই হবে। কিন্তু আর যাই হোক্ জার্ম্মানির রণপোত ধ্বংস হয়েছে, যে ক'খানা বৃটিশ ক্রুইজার তার পিছু পিছু হায়রাণ হ'য়ে ঘুরেছিল এবং দূরে ওৎপেতে বসে'ছিল তাদের উল্লাসের যথেষ্ট কারণ আছে। শত্রুকে এইভাবে কাহিল করতে পারলে কার না আনন্দ হয়! বিশেষ করে' নাৎসী জার্ম্মানির জাহাজ, গণ্ডায় গণ্ডায় ডুবলেই আমাদের আনন্দ। বুদ্‌বুদের মত জার্ম্মানির জাহাজগুলি যদি রাতারাতি সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায় তা হ'লে আমরা সবচেয়ে খুসী হব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবাদের মধ্যে একদিকে উত্তর পূর্ব্বে ফিনল্যাণ্ডের সংগ্রাম, আর একদিকে জার্ম্মানির নূতন করে' সমর পরিকল্পনা। জার্ম্মানির উত্তরদিকে সৈন্যসমাবেশ নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের যথেষ্ট আতঙ্কের কারণ হয়েছে। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে যে দক্ষিণ পূর্ব্ব য়ুরোপে জার্ম্মানির দৃষ্টি পড়েছে এবং হাঙ্গেরীর সীমান্ত অতিক্রম করে' জার্ম্মানি বল্‌কান্ এলাকায় তড়িৎগতিতে প্রবেশ করতে পারে। এদিকে কেরেলীয়ান্ যোজকে রাশিয়ার লাল ফৌজ প্রবলভাবে চেষ্টা করছে ম্যানারহাইম্ লাইনের উপর দিয়ে অগ্রগতির জন্য। রুষ সৈন্য ৬৭ মাইল অগ্রসর হয়েছে শুনা গেছে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার এই সংঘর্ষের স্বরূপ আমাদের বোঝা দরকার। আমরা জানি সম্প্রতি এই সংঘর্ষের জন্য রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হ'য়েছে। ইতালী, জাপান রাশিয়ার এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে, এরকম নির্ম্মম আক্রমণের দৃষ্টান্ত নাকি ইতিহাসে বিরল। অথচ রাশিয়ার জবাব হ'চ্ছে যে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়া যুদ্ধই ঘোষণা করে নি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে বিচারের প্রশ্ন অবান্তর। ফিন্‌ল্যাণ্ডে আর একটি গবর্ণমেণ্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নূতন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট, কোমিণ্টার্ণের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী এম্, কুইসিনেন্-এর প্রধান মন্ত্রীত্বে। রাশিয়া এই নূতন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পঁচিশ বছরের চুক্তি করেছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করবার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সোভিয়েট—ফিনিশ্ সমস্যা ভালভাবে বুঝতে হ'লে সেইজন্য ফিন্ল্যাণ্ডের ইতিহাস এবং যেসব অবস্থা থেকে বর্ত্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত।

সোভিয়েট রাশিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ড

প্রায় ছ'শ'বছর সুইডেনের সঙ্গে একত্রিত থাকার পর জারিষ্ট রাশিয়া ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণ করে ১৮০৮ সালে। তারপর ফিন্ল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার জারতন্ত্রের অধীনে।* সেইজন্য কি আর্থিক, কি রাষ্ট্রীক কোন উন্নতিই ফিন্ল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীতে ফিনিশ জাতিয়তার জাগরণ দেখা গেলেও, ফিনিশ গবর্ণমেণ্টে সুইডিশ্ ফিন্দেরেই আধিপত্য ছিল বেশী। জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম সুযোগ ১৯০৫ সালের রুষ বিপ্লবের সময়। মহাযুদ্ধের সময় ফিনিশ জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই অগ্রসর হ'তে থাকে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জারতন্ত্রের ধ্বংসের পর ফিন্ল্যাণ্ডের আন্দোলন সফল হ'লেও কেরেনস্কীর প্রভিসানাল্ গবর্ণমেণ্ট তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজী হয় নি। কেরেনস্কী ফিন্ল্যাণ্ডকে আংশিক স্বাধীনতা দিলেন। অক্টোবর বিপ্লবে যখন বোল্শেভিক্রা ক্ষমতা পেলে তখন ফিন্ল্যাণ্ডও তার পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা করল। লেনিনের নেতৃত্বে বোল্শেভিক্রা ফিন্ল্যাণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে একটুও কুণ্ঠিত হয় নি।

এই জাতীয় স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফিন্ল্যাণ্ডের সোশ্যালিষ্ট্ ও কম্যুনিষ্টরাও সোশ্যালিষ্ট ওয়ার্কার্স্ রিপাব্লিক ঘোষণা করল। কিন্তু ফিনিশ মধ্যবিত্তশ্রেণী, বিশেষ করে' প্রতিক্রিয়াশীল সুইডিশ্ ফিন্রা জার্ম্মানির সাহায্য নিয়ে এই গণ আন্দোলনকে দাবিয়ে দিল। ম্যানারহাইম্ এই প্রতিবৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন, যেমন স্পেনে ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। এই অন্তর্বিপ্লবে প্রায় ১৫,০০০ সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টকে, হত্যা করা হয় এবং ৭৪,০০০ জনকে বন্দী করা হয়। এই সময় যে সব কম্যুনিষ্টের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে' দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তার মধ্যে একজন হ'চ্ছেন কুইসিনেন্, বর্ত্তমান নূতন ফিনিশ রিপাব্লিকের প্রধান মন্ত্রী। নাৎসী ঝটিকাবাহিনী ও ইতালীয় ব্ল্যাক্সার্ট্স্-এর মত ফিন্ল্যাণ্ডের হোয়াইট্ গার্ডরা ম্যানারহাইমের নেতৃত্বে ফিনিশ জনসাধারণ ও সোশ্যালিষ্ট্ কম্যুষ্টিদের উপর যে অত্যাচার করেছিল, ফিনিশ জনগণ আজও তা ভোলে নি, ভুলতে পারে না।

১৯১৮ সালে যে নূতন ফিনিশ 'ডায়েট্' গঠিত হ'ল তাতে সোশ্যালিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, এমনকি তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ছিল না। 'ডায়েট্' জার্ম্মান-ঘেঁষা ছিল বেশী এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের ফিন্ল্যাণ্ডের রাজমুকুট অর্পিত হয় জার্ম্মান, কাইজারের এক আত্মীয়কে। কিন্তু জার্ম্মানির পরাজয়ের পর এই মতলব আর টিকিল না এবং ম্যানারহাইম্ নিজেই রিজেণ্টের পদ গ্রহণ করলেন। ১৯১৯ সালে ভীষণ অত্যাচার সত্ত্বেও ফিনিশ সোশ্যালিষ্টরা ২০০ মধ্যে ৮০টি স্থান ডায়েটে দখল করে। হোয়াইট্ গবর্ণমেণ্ট নানা উপায়ে গণস্বাধীনতা নষ্ট করবার চেষ্টা করলেও

১৯২১ সালে এ্যাগ্রেরিয়ান্ কোয়ালিশনী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালের এবং পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা পার্লামেণ্টে অনেকগুলি স্থান দখল করে। ১৯২৫ সালে সোশ্যাল ডিমক্রেটিক্ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, ১৯২৭ সালে এ্যাগ্রেরিয়ান্‌রা আবার ক্ষমতা ফিরে পায়। তারপর থেকে কোয়ালিশনী গবর্ণমেণ্টেই ফিন্‌ল্যাণ্ডে চলে আসছে। কিন্তু এই গবর্ণমেণ্ট নাৎসী পন্থী বেশী এবং নানা উপায়ে নাৎসী আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। ফিনিশ ন'ৎসী পার্টির ১৪ জন সভ্য আছে ডায়েটে এবং এদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ১৯৩৮ সালের ফিনিশ কোয়ালিশনী গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করে' যে ১৯৩০ সালের আইন অনুসারে নাৎসী পার্টির ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বার্থ বিরোধী সম্প্রদায় বলে' বেআইনী ঘোষণা করা উচিত। ডায়েটের ২০০ জন সভ্যের মধ্যে ১৬০ জন এই অনুমোদন সমর্থন করে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নাৎসী পার্টিকে আজ পর্য্যন্ত বেআইনী ঘোষণা করা হয় নি। ফিনিশ আদালত এই ভোটকে অবৈধ বলেছেন। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে শাসনতন্ত্রের চাবিকাঠি কাদের হাতে। ফিনিশ গণতন্ত্র যে আদৌ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট নয় তারও প্রমাণ এর চাইতে বেশী আর কিছু হ'তে পারে না।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ চিরদিনই রুষ-বিরোধী। ১৯১৮-২০ সালে ফিন্‌ল্যাণ্ডই রাশিয়াকে আক্রমনের একটি ঘাঁটি ছিল। ১৯২০ সালের ডর্পাট্ চুক্তিতে ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সোভিয়েট য়্যুইনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ড সোভিয়েটের প্রতি কোন দিনই সদ্ব্যবহার করতে পারে নি গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার তাড়নায়। ফিন্‌ল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতি গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার উপর তার আর্থিক নির্ভরতার দিকে লক্ষ্য রেখেই চালিত হয়েছে। ফিনিশ পণ্যদ্রব্যের প্রধান ক্রেতা হ'চ্ছে বৃটেন ও আমেরিকা। বৃটেনের বহু অর্থ ফিন্‌ল্যাণ্ডের নিকেল খনিতে খাটছে। তা ছাড়া প্রায় তিন ভাগের একভাগ মাল আমদানি হয় জার্ম্মানি থেকে। সুইডিশ ফিন্‌ল্যাণ্ডরা সকলেই ধনী এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডে আর্থিক স্বার্থ তাদেরও কিছু কম নয়। এই হ'ল ফিন্‌ল্যাণ্ডের মোটামুটি অবস্থা।

এখন বোঝা যাবে সোভিয়েটের দাবী ন্যায্য কিনা। এ্যালাণ্ড দ্বীপ প্রমুখ যে ক'টি স্থান সোভিয়েট চেয়েছে ঘাঁটির জন্য তা খুবই যুক্তি সঙ্গত। লেনিন্‌গ্রাডের নিরাপত্তার জন্য এবং বল্‌টিক সাগর দিয়ে আক্রমণের পথ প্রতিরোধের জন্য সোভিয়েট এ-দাবী করা ভিন্ন উপায় নেই। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্ররোচনায় ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের দাবী গ্রাহ্য করেনি। সোভিয়েট বুঝেছিল যে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট যতদিন কায়েম থাকবে ততদিন তারা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মুখচেয়ে তার দাবী কিছুতেই স্বীকার করবে না। সেইজন্য সোভিয়েট ফিন্‌ল্যাণ্ডে সত্যকার গণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। কুইসিনেন-এর প্রধান মন্ত্রীত্বে এই নূতন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের যুক্তি সঙ্গত দাবী মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু হেলসিঙ্কি গবর্ণমেণ্ট এই গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার না করে' যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হ'ল? সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নয়,

যদিও আমরা জানি তাই। এম্ কুইসিনেন্ এর অধীনে যে নূতন ফিনিশ পিপ্ল্স্ রিপাব্লিক গঠিত হ'য়েছে তার বিরুদ্ধে ফিন্ল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল, পররাষ্ট্রদাস ট্যানার গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাশিয়া কুইসিনেন্ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ। নূতন গবর্ণমেণ্ট পক্ষে যুদ্ধ চালান সহজ নয়, সেইজন্য রাশিয়া সাহায্য করছে। স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড গণতন্ত্রী স্পেনের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করেছিল, আজ রাশিয়ার লাল ফৌজ ঠিক সেই রকম সংগ্রাম করছে ফিনিশ গণতন্ত্রীদের পক্ষে ট্যানার, ম্যানারহাইম প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। এ-যুদ্ধের সঙ্গে রাশিয়ার প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ নেই। স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট জয়ী হ'লে য়্যুরোপের যে উপকার হ'ত আজ ফিন্ল্যাণ্ডের কুইসিনেন্ গবর্ণমেণ্ট জয়ী হ'লে য়্যুরোপের সেই উপকারই হবে। রাশিয়ার স্বার্থ শুধু এইখানে, কারণ ফিন্ল্যাণ্ডে সত্যকার গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লে রাশিয়া একজন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেশী পাবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচার—

সোভিয়েট রাশিয়া এই কারণেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ ফিন্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারপ্রার্থী সে কেন হবে ? রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র সোভিয়েটকে আক্রমণকারী বলে' এক প্রস্তাব পাশ করে' তাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যপদ থেকে পদচ্যুত করেছে। রাশিয়া এ-সংবাদ শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসেছে। ষ্ট্যালিন, মোলোটভ তো হাসবেনই, যে-কোন শিশু ও অট্টহাসি হাসবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কি ? রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারের অধিকার আছে কি না, সে বিচারের মূল্য কতটুকু, এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু জানলেই হবে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন বিশিষ্ট সত্তা নেই, অধিকার নেই বা শক্তি নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব সমস্ত শান্তিকামী, যুদ্ধ বিরোধী রাষ্ট্রের সম্মিলিত অস্তিত্ব ও শক্তি মিলিয়ে, বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ তা যে নয় আমরা বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি। সে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে যাতে আমরা পরিষ্কার বুঝেছি যে যে সব য়্যুরোপীয় রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ও শান্তির বড়াই করে, তারা কোনদিনই এই গণতন্ত্রের ও শান্তির ইজ্জৎ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এতটুকু কাজে লাগায় নি। বরং বিপরীত উদ্দেশ্যেই এই সব রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এতদিন ব্যবহার করেছে। ফ্যাশিষ্টদের অগ্রগতির ইন্ধন জুগিয়েছে এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করেছে এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ। কার প্ররোচনায়, কার কূটনীতিক দুর্নীতির ফলে, কার ক্লীব মনোভাবের জন্য ? য়্যুরোপের তথাকথিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচার কোথায় ছিল ? আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতির ধ্বংসের সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দের এই বিচার বুদ্ধি মস্তিষ্কের কোন সেলের মধ্যে বন্দী ছিল ? সাইমন্, হোর একসময় জেনেভায় আন্তর্জাতিক নিয়মের কি আদর্শ সমর্থন ও প্রচার করেছিলেন ? রাষ্ট্র-

সঙ্ঘের সম্মিলিত নিরাপত্তার ও শান্তির আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া ১৯৩৪ সালে সভ্য হয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান করে আসছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর রাশিয়ার এ আহ্বানে ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভিয়া ভিন্ন কেউ সাড়া দেয় নি। দালাদিয়ের ফ্রান্সের সে-প্রতিশ্রুতির কোন মর্য্যাদা রাখেন নি। আজ উল্টে রাশিয়াই অপরাধী হ'ল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হ'ল। এতে বিদ্রূপের হাসি ছাড়া রাশিয়া আর কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে না, সম্মানের ক্ষতি হয়।

ফিনিশ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ফিনিশ যুদ্ধের ফলে য়্যুরোপে নূতন কয়েকটি পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা আছে। জার্ম্মানি প্রত্যক্ষভাবে কোন অভিযোগ না জানালেও, তার আতঙ্কের কারণ যথেষ্ট আছে। কারণ ফিন্‌ল্যাণ্ডে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লে জার্ম্মানির আর্থিক ক্ষতি ও অসুবিধা হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। যুদ্ধের সময় সুইডেন থেকে জার্ম্মানির আইরন্ ওর আমদানি করে এবং তার পথ রাশিয়া বন্ধ করে দিতে পারে ইচ্ছা করলে। তা ছাড়া বলটিকের জার্ম্মান বেরনদের মত ফিনল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ প্রভুদেরও পাত্তাড়ি গুটিয়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রাকরতে হবে। এই সম্ভাবনার জন্য জার্ম্মানি সুইডেনের কিছু অংশ দখল করবার চেষ্টা করতে পারে। আর একটি সম্ভাবনা আছে। ফিনিশ যুদ্ধে মীমাংসা কি ভাবে হবে জার্ম্মানি জানে। লাল ফৌজের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হওয়া ফিনল্যাণ্ডের সাধ্য নয়। বলটিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব য়্যুরোপে জার্ম্মাণির পথ আবদ্ধ। সুতরাং জার্ম্মাণি দক্ষিণ পূর্ব্ব য়্যুরোপে অর্থাৎ বল্‌কানের দিকে অগ্রসর হতে পারে। বল্‌কানের পথে প্রথমেই পড়বে হাঙ্গেরী। শোনা গেছে হাঙ্গেরীর সীমান্তে জার্ম্মাণ সৈন্য সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। হাঙ্গেরীও বিশেষ উৎকণ্ঠিত। বলকানে জার্ম্মানি প্রবেশ করলে রাশিয়ার পক্ষেও চুপ করে' থাকা সম্ভব নয়, রাশিয়াও হয়ত সরাসরি রুমানিয়ার কাছ থেকে বেসারবিয়া দখল করে' বসবে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের চুক্তির কথাবার্ত্তা স্থগিত থাকার পর আর একটি বলকান ব্লক গড়বার চেষ্টা হ'য়েছে। বলকানে পশ্চিম দিক থেকে জার্ম্মাণি এবং পূব দিক থেকে রাশিয়া প্রবেশ করলে ইতালী ও তুরস্কের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হবে না। ইতালীর অবস্থাই সবচেয়ে সন্দেহজনক। এ-অবস্থায় তুরস্কের পক্ষে বলকানের নিরাপত্তার জন্য মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়াই সম্ভব। সেইজন্যই আমাদের মনে হয় রাশিয়া এত শীঘ্রই বলকানের দিকে অগ্রসর হবে না, অন্ততঃ তার আগে রুমানিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে আর একবার শেষ আলাপ আলোচনা করে দেখবে। ইতিমধ্যে যদিও জার্ম্মানি অগ্রসর হয় রাশিয়া নীরবই থাকবে, যতক্ষণ জার্ম্মান অগ্রগতি না ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে।

য়্যুরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এই সম্ভাবনাই দেখা যায়।

১৯শে অক্টোবর ১৯৩৯

কলিকাতা।

গ্রন্থ-পরিচয়

Marxist Study Course Vol I.

Society and Its Development,—Rebati Burman

National Book Agency Calcutta, 72, Harrison Road, 3 Ans.

মার্কসিষ্ট ষ্টাডি কোর্স (Marxist Study Course) নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত রেবতী বর্মণের সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে পুস্তিকা গুলি বের হবে। Society and its Development 'সমাজের বিকাশ' এ সিরিজের ১ম খণ্ড। এতে আছে আদিম সমাজের ক্রমবিকাশ, গোষ্ঠী, সমাজতন্ত্র ও পণ্য উৎপাদন থেকে শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কি ভাবে বর্তমান ধনতন্ত্রী সমাজের উদ্ভব হয়েছে। পরিশেষে সাম্যবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি নিবন্ধিকা আছে। এ পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত কামাখ্যা ভৌমিক। অনুবাদ সরল ও সহজবোধ্য হয়েছে।

আমরা উভয় পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

একদা

গোপাল হালদার। প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

মূল্য দুই টাকা।

কালসন্ধির দুর্নিবার জ্বালা যখন দেবাসুরের মন্থনে বাঙ্গলায় মুক্তিলাভ করছিল, সেই বিক্ষুব্ধ দিনে ১৯৩১ সালের শেষভাগে 'মহাকালের পথের উপরে' লেখক 'একটী দিনের বাতায়ন' খুলেছেন। খুলবার প্রয়োজন ছিল—কারণ সেদিনের 'পৃথিবী ও আকাশযোড়া কুয়াসা' ভেদ করতে অনেক ঋষির প্রজ্ঞা অক্ষম হয়েছে—তাঁদের খোলা বাতায়ন দিয়ে সেদিনের কালের আলো, পথের ইঙ্গিত অন্দরে পৌঁছায় নাই।

১৯৩১এর সে অধ্যায়, অতীত অধ্যায়—ইতিহাসের পাতায় তার স্থান হয়েছে। বইখানা তার স্তুতিগান নয়। মর্ম ও মনীষা দিয়ে তাই পড়বার প্রয়াস, শরৎচন্দ্র তার মধ্যে দেখেছিলেন অত্যুগ্র জাতি দ্বেষ ও রোম্যান্স, রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যৌনাশক্তি ও ফিউটিলিজ্‌ম্। যে আশা আকাঙ্ক্ষা সাধনার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল' না তাকে রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁরা বিকৃত

করেছেন। অর্ডিন্যান্স্-ক্লিষ্ট সাংবাদিক এবং সরকারী প্রচার বিভাগের সঙ্গে কবিগুরুর চিত্র যে মিথ্যার ছাপ রেখে গেছে—এ বইখানা তা কিছুটা দূর করবে।

সেদিনকার মৃত্যু সাধনার পিছনে কেউ দেখেছে বেকার-সমস্যা, কেউবা তরুণীর আকর্ষণ, কেউবা দেখেছে অন্ধ আত্মদান লিপ্সার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থবোধ, ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত কত সুনীল ঘর ছেড়ে ভেসে পড়েছে, কত অমিতের cultured life ও setlled life ডকমজুর ও জার্ণালিজ্‌মের uncultured, unsetlled আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে—মননহীন ও দরদহীন বিশ্লেষণে তার খোঁজ মেলে নাই।

......সংসারে ঢুকিলে মানুষ প্রথমে যেন বেলা ভূমির নাগাল পাইয়া হাঁক ছাড়ে। একটা setlled life পাওয়া গেল : আর ডুবিয়া-ভাসিয়া মরিতে হইবে না। তারপর দেহ চাহে বিশ্রাম, মন পায় আরাম। তারপর পরিণাম,—ইহাই নিয়ম, ইহাই জীবন,—ধীরে, অতি ধীরে, চোরা-বালুতে আটকাইয়া যাওয়া—প্রথম পা ডুবিয়া যায়, পরে মন আবৃত হয়, চেতনা মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, বালুর তলে চিরসমাহিত হইয়া পড়িয়া থাকে এককালের কোলাহল-মুখর, জীবন্ত, জাগ্রত মানবাত্মা—যেন Sand buried cities of Khotan! ইহাই জীবন...মরু শয্যায় ধীরে—সমাধি।"

জীবিকার সঙ্গে 'success'এর সমীকরণ, জীবিকার যূপকাষ্ঠে মানুষের বলি, জীবনের এই মর্মান্তিক tragedy যাদের চোখ এড়াতে পারে নাই—তারাই সাধারণের বাইরে ছিটকে পড়ল'। "শৈলেন কি 'বোর'?...জাষ্টিস্ দে...শ্বশুর মশায়...স্পেশ্যাল পাওয়ার...শ্বশুর মশায়...বার লাইব্রেরী...ল অব্ মর্গেজ...শ্বশুর মশায়....

কি কুৎসিৎ!"

এই কুৎসিৎ, অস্বাস্থ্যকর, বদ্ধ জলার মত জীবনযাত্রার সঙ্গে যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে তারা পায় শান্তি ও তৃপ্তি। যাদের জীবনে আইডিয়ালের অভিশাপ লাগে তারা পায় তাড়না, যাতনা, আকুল বেদনা, আকণ্ঠ পিপাসা—কাঁটার মুকুট। সেই উচ্ছ্বাসিত প্রাণলীলার মধ্যে দিয়ে তারা সার্থক হয়। "সেখানে ঘরের দুয়ার-জানালা খুলিয়া যায়, হয়ত ছাদ ফাটিয়া পড়ে, তারা ভেদ করিয়া আকাশ ছুঁইয়া খাড়া হয় বিরাট সত্তা জগতের কোণে কোণে তাহার দৃষ্টি, উল্কার আলোতে তাহার মাথায় আশীর্ব্বাদ করে—বিশ্বব্যাপী বেদনার পৌরুষময় অনুভূতিতে তাহার করুণা উছলিয়া উঠে—এ করুণা 'The deep over flowing Love that is in the breast of God'—জগৎ জোড়া সেই করুণার প্লাবন। তাহাই আছড়াইয়া পড়ে তাহার বুকে। যেখানে তাহার সত্তার পূর্ণতা সেখানে সে এমনি 'বড় আমি'—আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম, আর বিশ্বাত্ম।—ইহাই অমিতের জীবনবোধ। কিন্তু এই কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া চলিতে পারিল না। তাই সকলে

তাহাকে ভুল বুঝে ; মনে করে—ক্ষণিক নেশায় নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছে, নিজের সত্তাকে বিস্মৃত হইতেছে।”

এই deep over flowing love ও গতিধর্ম চিন্তাকে ভাসিয়ে দেয়, তাই অমিতের মত—কৃতী ছাত্রও বলে—“এ যুগে চিন্তার খোঁজ করবেন না। চিন্তা আমাদের Second best substitute. It is an age of action.” অভিজাত সাহিত্যিক ও table socialist দের চিন্তা তার কাছে escapism, আত্মবঞ্চনা, “চিন্তার মুক্তি কর্ম্মে—কর্ম্মই চেতনার মোক্ষ।...প্রাণ শুকাইয়া আসিলেই মানুষ চিন্তার মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। চিন্তা কিছু নয়—প্রাণের একটা পরাজয় মাত্র।”

সেদিনের রাষ্ট্রবোধে ফাঁক বোধ হয় এদিকেই ছিল'—Divorce between thought and action. অমিতের কাছে পেশাদারী ও তপস্যার পার্থক্য ধরা পড়ে নাই। চিন্তাবিলাসীদের ওপর অধীর আক্রোশে চিন্তাকে নির্বাসন দেওয়ার মূল্য ভাল করেই দিতে হয়েছে। আইডিয়াল যেমন ভোগবিলাসের চাপে ম'রে যায় না, চিন্তাকেও কাজের নেশায় ভুলিয়ে রাখা যায় না। ১৯৩১এর ভস্মস্তুপের ওপর বিপ্লব দর্শনের sphinx হয়ত' খাড়া হ'য়ে উঠ্‌বে ততদিন অমিতকে করতে হবে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত—কারণ মনীশ সুনীলের মত সে ম'রে বেঁচে যেতে পায় নাই।

অতীন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদকীয়

কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী—

রাষ্ট্রের দরবারে ব্যাভিচারের বিরাম নাই। গোষ্ঠি-চেতন রাষ্ট্রনীতি গোষ্ঠির পরিচর্য্যা করে সার্বিকতার পরিচ্ছদে যতদিন পর্যন্ত না গোষ্ঠির কালপুরুষ এই অভিনয়ের যবনিকা টেনে দেয়। এমনি ধারা ঘটনা বিশ্বে অহরহ ঘটছে, রাষ্ট্রনীতি ও বিস্তর সাক্ষী-সাবুদ যোগাতে পারবে।

গত মহাযুদ্ধের সময় ও অবসানে highest national intetest, Civilising missions, national honour, right of self determination, interest of minorities, make the world safe for democracy ইত্যাদি কথামৃত বিশ্বের গোষ্ঠি চেতন "অমৃতস্য পুত্রাঃ"দের মুখে শোনা গেছে, কিছুকাল পরেই নির্মোক-মুক্ত মহাজনদের পরিচয় পেয়ে জানা যায় এ বিশ্ববাণী কাদের মর্মবাণী।

এই পর্যায়ের ব্যভিচার কংগ্রেসের ইতিহাসেও পূর্বে পাওয়া গেছে। কিন্তু ১৯২০ সালের আন্দোলনে জাতীয় জীবনের বয়সন্ধি। মুক্তি পাবার পর ইদানীং কংগ্রেসের অন্তঃপুরে ব্যভিচার প্রবেশ করেছে। সার্বিকতার মোড়ক খসবার আর একবার সময় এসেছে, বোধহয় এই যবনিকা তারই ইঙ্গিত।

বর্তমান যুদ্ধে কংগ্রেসের দাবীদাওয়ার বাকযুদ্ধে কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর (গণ-পরিষদ) প্রশ্ন অনেকটা যায়গা জুড়ে আছে, আর ব্যাভিচার যা কিছু এই কথা কয়টা নিয়ে।

বিগতযুদ্ধের লাহোরে পূর্ণস্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ১৯২৯ সালে। অবসানে ছোট বড় সব রাষ্ট্রেরই আত্ম-নিয়ন্ত্রনের দাবী স্বীকৃত হয়। ভারতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালে সেই অধিকার প্রয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। লাহোরের প্রস্তাবের পরিপূরক হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে তথা কংগ্রেসের বৈঠকখানায় কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী কিছুকাল পরে স্থান পায়। জওহরলালই এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সেদিনকার আলোচনায় এই পরিভাষার অর্থবোধ সামান্য সংখ্যক বিজ্ঞজনের হয়েছিল, অধিকাংশই কথা কয়টিকে আমল দেয় নাই।

বর্তমান বিতণ্ডা মথিত হোয়ে সেই কথাটি আবার উদ্গীত হোচ্ছে। এবার কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী কংগ্রেসের অন্দরে স্থান পেয়েছে—স্বয়ং মহাত্মাজীর আর্শীবাদ লাভ করে।

গোলযোগ এইখানেই। মহাত্মা কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর যে ভাষা দিয়েছেন তাতে

সেবাগ্রামের ছাপ পড়েছে—ইতিহাসের পাতায় এর জোড়া আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় না—ফৈজপুরে গৃহীত কন্‌সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর গৃহীত প্রস্তাবের সাথে এর আসমান্‌ জমীন্‌ তফাৎ।

ফৈজপুরে ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছিল—

"The Congress stands for genuine democratic state in India where political power has been transferred to the people as a whole and the Government is under their effective control. Such a state can only come into existence through Constituent Assembly elected by adult suffrage and having the power to determine finally the constitution of the country. To this end the congress works in the country and organise the masses."

এই প্রস্তাবের কোথায় পরনির্দেশে কনস্‌টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী আহ্বান করার কথা নাই। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে জনগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা কোথায়ও প্রতিহত হবার ইঙ্গিত নাই।

ফৈজপুরে (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) জওহরলাল তার সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

That this (Constituent Assembly) is the very corner-stone of the congress policy to-day and our election campaign must not be conceived as something emanating from the British Government or as a compromise with British Imperialism. If it is to have any reality, it must have the will of the people behind it, the organised strength of the masses to suppot it and the power to draw up a constitution of a free India.

লক্ষ্ণৌএর (১৯৩৬, এপ্রিল) অভিভাষণে—

"I am convinced that the only solution of our political and communal problems till come through such an Assembly......that Assembly will not come into existence will at least a semi--revolutionary stiuation has been created in this country and the actual relationship of powers are such......that the people of India can make their will felt"

ফৈজপুরের পরে সভাপতি কন্‌সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী প্রস্তাব উপলক্ষে সার্কুলারে বলেছেন—

It will be a Grand Panchayat of the nation, elected on adult franchise when the reality of power has already been shifted to the the people. so that they can give effect to their decisions without any interference from outuside ahthority."

জওহরলালের সেদিনকার উক্তিতে কোন অস্পষ্টতার কুয়াশা ছিল না। প্রতিবারই তিনি বলেছেন স্বাধিকার চেতন গণ-অভীপ্সা গণ-পরিষদের রূপ দেবে, ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন কিছুটা বৈপ্লবিক (semi-revolutionary) অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং তাদের স্বরাষ্ট্র বোধ দুর্বার হোয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিরোধী শক্তিকে জয় করতে পারবে।

ফৈজপুরে গান্ধীজীও একবার বলেছিলেন—

The decision of a Constituent Assembly can only be taken only when you have Swaraj at your door. You can call a Constituent Assembly when you have got full strength."

গান্ধীজীর কথায় জওহরলালের সমর্থন পাওয়া যায়। বহিঃশক্তির নির্দেশ অথবা অনুকম্পার স্থান সেদিনে ছিল না।

ফৈজপুরে রাজাগোপালাচারী 'half baked faddist'দের ওপর কটুভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী প্রস্তাবের জন্যে। আর আজ কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর ভাষ্য দিতে তিনি অগ্রণী হয়েছেন। High Commandএর তৃতীয় নয়ন দিব্যজ্ঞান পেয়েছে, কাজেই অকুতোভয়ে অপব্যাখ্যা আরম্ভ হয়েছে। High Command 'faddist' নয় তাদের হোমানলে রাষ্ট্রনীতি পরিস্রুত ও শুদ্ধ হয়। ফৈজপুরের ব্যাখ্যায় আর ইতিহাসে কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর পারিভাষিক ব্যাখ্যার বা তার প্রয়াশে পরনির্ভরশীলতার স্থান নাই —without any interference from outside authority.'

সেদিন রাজাজী ভাষ্য দিয়েছেন—

"A regularly elected Constituent Assembly cannot come into being unless there is state-help or a new state created. In the vacuam created by a revolution, we can make a new state......"

কিন্তু রাজাজী নূতন রাষ্ট্রের প্রতি বিমুখ, তিনি বিপ্লব দিয়ে শূন্য সৃষ্টি করবেন না, নূতন রাষ্ট্র রচনা করে শূন্য পূর্ণ করবেন না—তিনি রাষ্ট্রের (পুরাতন) সাহায্য নিয়ে 'গণ-পরিষদ তথা রাষ্ট্ররচনা করবেন। দধীচির দেহত্যাগ প্রয়োজন হয়েছিল শত্রু বধ করতে—যে পুরাতন রাষ্ট্রের সাহায্যে রাজাজী গণ-পরিষদের মারফৎ নূতন রাষ্ট্র রচনা করবেন, সেই রাষ্ট্র আত্মত্যাগ করবে কেন?

গান্ধীজীর পরিষদ রাজাজীর—"The Constituent Assembly if it come into being—I hope it will as a result of an honourable settlement between us and the British peoples.................. The succes of the experiment at the present stage of India's history depends on the intention of the British to part with powers without engaging India in a deadly, unorganised rebellion." গান্ধীজীর বিবৃতি স্পষ্ট, অত্যন্ত নিরেট লোকেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে। গান্ধীজীর পরিষদ সফল হবে, ও গান্ধীজী যা চান তা গোলটেবিল বা All parties conferenceএর উন্নত সংস্করণ। এখানে 'outside interference' আছে কিন্তু স্বাধিকারবোধ প্রতিষ্ঠার কোন স্থান নাই।

কনসটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী নূতন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। পুরাতন নিশ্চিহ্ন হোলে পরেই তা

সম্ভব, পুরাতনের অক্টোপাশ অঙ্কুরেই নূতন রাষ্ট্রের শ্বাসরোধ করবে ইতিহাসের শিক্ষাই এই। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর এই অপব্যাখ্যায় ভারতের পূর্ণ স্বরাজ আসেবে না। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক অর্থ ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা পরম্পরায় খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৮৯ সালে ১৭ই জুন ফরাসী রাষ্ট্রের 'Third Estate' রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করে Estate এর নূতন নামাকরণ কোরে। সেদিনকার সমবেত সভা রাজার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল না। প্রবল স্বাধিকার বোধ উদ্বুদ্ধ হোয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করে। সেদিনকার সভায় লোরেইনের ডেপুটির একটি কথায় কনসটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী পূর্ণরূপ চোখে পড়ে—"had the united states waited for the King of England"? জাতীয় চেতনার নামে আজ কংগ্রেসে এই ঐতিহাসিক উক্তির অপব্যাখ্যা হচ্চে।

কেউ কেউ বলছেন—"It (কনসটিটিউয়েন্টে এসেম্বলী) was created by the people involved in a struggle as an instrument through which power was captured." ক্ষমতা হস্তগত করার প্রতিষ্ঠান হিসাবে Constituent Assembly অপরিহার্য এ কথা বলা চলে না। জাতি অথবা জাতির যে কোন সাম্রাজ্যকে অথবা অর্থনৈতিক স্তর পরিচালনায় সমগ্র সংগ্রামশীল শক্তিগুলিকে সংহত করে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। যাকে বলা হয় 'sanction of the people' অর্থাৎ অধিকার দাবী এবং দাবীর মর্যাদা রক্ষা করবার শক্তি ও দৃঢ়তা এই কয়টিই ক্ষমতা হস্তগত করার অপরিহার্য অস্ত্র। যে সংহতির তূণে এই অস্ত্র আছে, তারাই ক্ষমতা হস্তগত করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে 'গণপরিষদের' যে দাবী তোলা হোয়েছে—সেই দাবী অর্থশূন্য হুঙ্কার নয়। এই দাবী আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী—আত্মনিয়ন্ত্রণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। পরিষদ (Constituent Assembly) ক্ষমতা হস্তগত ('Capture of power') হওয়ার পর আহূত হোলেও দাবীর সার্থক পরিণতির পথ পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করা দরকার।

বৃটিশ সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদ

গত ২৮শে নবেম্বর পার্লামেন্টের কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলেন—

'If Imperialism means the assertion of racial superiority, suppression of political and economic freedom of other peoples the exploitation of the resourees of other country for the benefit of the imperialist country, then I say these are not the characteristcs of this country, but they are the characteristics of the present administration of Germany. Whatever may have been the case in the past we have no thought of treating the Br. Empire on the lines I described, for years it has been the accepted dogma that the administration of the colonial empire is a Trust which has to be conducted primarily in the interests of the people of the country concerned.

অর্থাৎ জাতীয় প্রাধান্য স্থাপন, অন্য দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দমন, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্য দেশের সম্পদে শোষণ প্রভৃতি যদি সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হয়, তা হলে আমি বলতে পারি এ আমাদের (বৃটনের) ধর্ম নয়। ওগুলি বর্তমান জার্মানীর বর্তমান শাসন ব্যবস্থারই বৈশিষ্ঠ্য। অতীতে যা'ই থাক বৃটিশ সাম্রাজ্যের (অর্থাৎ শাসিত দেশ) প্রতি পূর্বোক্ত প্রকার আচরণ করার অভিপ্রায় আমাদের আদৌ নাই। ক'বছর যাবৎ এ নীতি গৃহীত হয়েছে যে উপনিবেশ সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ 'ট্রাষ্ট' মধ্যে গণ্য এবং তথাকার অধিবাসীদের স্বার্থই এর শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে মনে হয় বৃটিশ অন্য দেশের সম্পদ শোষণ করে না। এ সব জার্মানী সম্বন্ধেই বলা চলে। ১৮৭৬ হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বৃটনের ৩৭০০ × দশ লক্ষ পাউণ্ড ও জার্মেনীর ১,২০০ × দশ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশে মূলধন হিসাবে খেটেছে। ১৯১৪-১৯৩০ সালের মধ্যে বৃটিশ মূলধন একই রয়েছে, কিন্তু জার্মেনীর ১,২০০ হতে ২৩০ × দশ লক্ষ পাউণ্ডে নেমেছে। উভয় জাতিরই এ আট বছরের ভিতর বিদেশে নিযুক্ত মূলধনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

বৃটিশ বিনে লাভে এ বিরাট মূলধন বিদেশে ফেলে নি। ইহা বৃটিশের বিপুল অর্থাগমের পথ এবং পরাধীন দেশগুলিকে বঞ্চিত ও শোষণ করেই এর মোটা অংশের উদ্ভব। কাজেই অন্য দেশের অর্থ-সম্পদ শোষণ বৃটিশ শাসনে হয় না, শুধু বর্তমান জার্মেনীতে তা সম্ভব বলা চলে না।

প্রধান মন্ত্রী আরো বলেছেন 'পূর্বে যা'ই থাক, বর্তমানে বৃটনকে আর এরূপ অপবাদ দেওয়া চলে না। অর্থ শোষণের দিক দিয়ে তথ্য-তালিকার সাহায্য আমরা বৃটনের কোন পরিবর্তন দেখি নে। শুধু বলার ভঙ্গীতে একটু পরিবর্তন এসেছে। secred-trust, hinter land, sphere of interest, sphere of influence, paramouncy, suzerainty, protectorate, rectification of frontiers ইত্যাদি সাধু ও উচ্চাঙ্গের কথা এখন সাম্রাজ্যবাদের নগ্নতাকে ভদ্রবেশী করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতি সম্বন্ধে তাই Kurt Riesler বলেছেন 'every interest is linked with a theory ; religious and moral ideals, concrete and pliant and moulded by a keen and constant sense of actually and practically managed to follow their developmett the sequence of political interests'.

[তাৎপর্য্যার্থ—বৃটিশের প্রত্যেক স্বার্থ আদর্শ, ধর্ম ও নীতিবাদের সাথে মোলায়েম ও সাধু-ভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সবগুলি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অনুগমন করে]

বাঙ্গলার অর্থসচিবের পদত্যাগ

বাঙ্গলা ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

পুরোপুরি সমর্থন দিতে পারেন নি বলে ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। কোয়ালিশন দলের বৈঠকে অর্থ সচিবের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীযুক্ত সরকার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন এবং মতানক্য সম্বন্ধে বিবৃতিতে বলেন, 'যুদ্ধ সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাবের প্রথম দুই প্যারা গ্রাফে যে বলা হয়েছে, যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে বাঙ্গালা সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার অভিপ্রায় ভারত সরকারকে জানান হ'ক ; তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। প্রস্তাবের যে অংশে বলা হয়েছে 'যুদ্ধ শেষ হবার পরই' ভারতে উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হওয়া দরকার সে অংশ ও তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু প্রস্তাবের উপসংহারে যে বলা হয়েছে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের 'পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন' এর উপরই ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র নির্ভর করবে তা তিনি স্বীকার করেন না'।

শ্রীযুক্ত সরকার অবশেষে বুঝেছেন 'It is never too late to mend

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির প্রবেশ উপলক্ষে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাগুলি দিয়েছেন আমাদের জাতীয় জীবনের যুগ-ক্রান্তিতে তার কিয়দংশ বিশেষ স্মরণ যোগ্য।

'যে সযত্ন-স্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত, তার ও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ্য বারংবার উপস্থিত হয়, যে মহাত্মা বিশ্ব-পরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে। মানুষ আপন দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্যে সতর্কতা পুণ্য কর্মের অঙ্গ। কেননা কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বর লাভের সে অযোগ্য।

যে সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভ দৈবক্রমে দেশ লাভ করে, সেগুলি স্থাবর নয় ; তারা প্রাণ-বান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘতা তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুখে নিজের আদি পরিচয়কে ক্রমে অনতি-গোচর করে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমান ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন ক'রে ঘটাতে থাকে, যাতে ক'রে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বন্ধ্যা টাকাকে লাভের অঙ্কে গণ্য করাই যায় না সেজন্যই ইতিহাসের প্রথম দূরবর্তী দাক্ষিণ্যকে সুপ্রত্যক্ষ ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা ক'রে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অমরতা, নির্বিকার জড়ত্বের বন্দিশালায় নয়...... ?

জয়শ্রী

ষষ্ঠম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৬ | অষ্টম সংখ্যা

COOCH BEHAR

অনুভব

নিঃশব্দ পাথরে আছে প্রাণ
র'য়েছে প্রবাদ।
আমি স্পর্শ করিতেই
হ'ল তার উড়িবার সাধ।

তবে সে ধূসর প্রজাপতি :
এতক্ষণ রয়েছিল পাথরের কোলে ;
ঘাসের তরঙ্গ বেয়ে হয়তো পাথরই ধীরে
মাঠের ওপারে গেল চ'লে।

এমন ঘুমের মত তারা
এমন অনন্য জগতের ;
পাথর কি প্রজাপতি
মরণেও পাব না তা' টের।

মৃত মানুষ

সমস্ত শরীর তার জড়ানো র'য়েছে ফিট যুদ্ধের শোভায় ;

যেন কেউ ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরিমায়

তাহার প্রত্যঙ্গে আছে পরিপূর্ণ হয়ে ;—

সঞ্চারণ করিলেই উঠিবে সে জেগে।

নীল আকাশের নিচে অনন্ত জলের নদী—প্রণয়ের চেয়ে

দায়িত্ব বিশিষ্টতর ছিল তার ?

বিলোল বায়ুর চেয়ে ছিল ঢের কৃতী শৃঙ্খলার :

বহু শতাব্দীর পরে মানুষের মত স্বর পেয়ে ?

এই সব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।

এখন গিয়েছে সব অস্ফুট বায়ুর মত হয়ে।

জীবনানন্দ দাশ

ইউরোপীয় যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্র

গোপাল হালদার

বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন সম্প্রতি (৯ই জানুয়ারী) এক সভায় যুদ্ধের অবস্থা বিবৃত করিয়া বলেন—আসল যুদ্ধ এখনো আরম্ভ হয় নাই—বর্ত্তমানের এই নীরবতা শুধু ঝটিকার পূর্ববর্ত্তী স্তব্ধতা মাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া এই কথাটি বারেবারেই সকলের মনে হয়।

পশ্চিমে

সত্য সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো মোটের উপর তেমন বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটে নাই। পোল্যাণ্ড জয়ের পর পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানী প্রায় নিশ্চেষ্ট,—সেখানে রুশিরাই এখন আসল অভিনেতা, অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিগুলি তাহার পার্শ্ব-অভিনেতা মাত্র। পশ্চিম সীমান্তে অনেক আয়োজনের পরও উভয় পক্ষ প্রায় নিষ্ক্রিয়—লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য মোজেল ও বাস্‌লেতে সমবেত হইল, মনে হইল হল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা বুঝি ভঙ্গ হইবে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে বেলজিয়মের শেষ কথায় সেইদিকেও জার্ম্মান সৈনিকদল নিরস্ত রহিল। পূর্ব্বের মত এখনো তাই ম্যাজিনো দুর্গ রেখার অভ্যন্তরে বসিয়া ফরাসী ও বৃটিশ বাহিনী অপেক্ষা করিতেছে। ক্যানাডার প্রথম ডিভিশন সৈন্য সেখানে উপনীত হইয়াছে: ভারতবর্ষের সৈনিক ও খচ্চর-ফৌজ আসিয়া পৌছিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়া বিমান-বাহিনী ও আগত; আফ্রিকার সাহায্যও আসিল বলিয়া—বৃটিশ সাম্রাজ্য যে যুদ্ধে অগ্রসর তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এইরূপে বিলম্ব ঘটিতে জার্ম্মানরা কেন দিতেছে? জার্ম্মান বাহিনী ২০০ ডিভিশনে বর্দ্ধিত হইলেই সর্ব্বদিকে জার্ম্মান আক্রমণ আরম্ভ হইবে—ইহাই নাকি জার্ম্মান 'চিফ্ অব্ দি জেনারেল ষ্টাফ্'—বা সমর-নায়কের অভিমত। কিন্তু জার্ম্মান বাহিনীতে এখনো আছে মোট ১১০ ডিভিশন—তাই, আপাতত সিগ্‌ফ্রিড্ দুর্গ রেখার অভ্যন্তর হইতে জার্ম্মানদের পক্ষে ম্যাজিনো দুর্গ-রেখার শত্রুদের উপর দুই এক পশলা গোলা-বর্ষণই হইয়াছে সার। এমন কি, প্রয়োজন হইলে জার্ম্মান বাহিনী রাইন নদীর পূর্ব্বতীরে পশ্চাদগমন করিবে, এমন সম্ভাবনা ও আছে; সেইজন্য সেইসব অঞ্চল সুরক্ষিত হইয়াছে। মোটের উপর ইতিপূর্ব্বে যেই জার্ম্মান রণ কৌশলের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম, তাহা আর নাই—শত্রুকে আক্রমণ করিয়া উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্পই ছিল বিস্‌মার্ক-মলকের বিশেষত্ব। এই বার যুদ্ধে জার্ম্মান বাহিনীতে অভিজ্ঞ ও নিপুণ নায়কের অভাব, তাই নাকি জার্ম্মান বাহিনী আক্রমণে বিরত;—ইহাই হইল বৃটিশ সমরাভিজ্ঞদের কথা।

আকাশে

স্থল-পথে যাহাই হউক, আকাশ পথে জার্ম্মান আক্রমণের বিভীষিকাই বৃটেনের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিখ চুক্তির সময়ে অনেকাংশে এই ভীতিই বৃটিশ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া চেম্বারলেনের মন্ত্রিপরিষদ চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের নিকট বলি দেয়। তাহার পর একটি বৎসরে বৃটেন এইদিকে আত্মরক্ষার যে বিপুল আয়োজন করে; তাহা বৃটিশ সংগঠন-শক্তির, শিল্পোৎপাদন শক্তির ও কারু-নৈপুণ্যের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃটেনের 'স্পিটফায়ার' ও 'হ্যারিকেন' ও ফ্রান্সের 'মোরেন' ও 'কুত্তিস্' নামীয় যুদ্ধ বিমানগুলি জার্ম্মান যুদ্ধ বিমানের অপেক্ষা উন্নত ধরণের বলিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতেছে; জার্ম্মান বোমারু' বিমানগুলি উত্তর 'সাগরের উপরে বৃটিশ বিমানের মেশিন-গানের সম্মুখে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। জার্ম্মান বিমানের চালনা-কৌশলও বৃটিশ বিমানের মত উন্নন ধরণের নয়। অবশ্য, বিমানের নির্ম্মাণ কৌশলে উন্নতি প্রতিদিন ঘটিতেছে—জার্ম্মানীও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। বিনির্ম্মিত জার্ম্মান "মেস্সারসিএট—১১০" নামীয় যুদ্ধ ও বোমারু বিমানের গতি ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল; ২ এঞ্জিন, ২টী শেল-বর্ষী কামান ও ৬টী মেশিন গান দ্বারা তাহা সজ্জিত। কিন্তু আমেরিকা হইতে বৃটেন ও ফরাসী যেরূপ অধিক সংখ্যক ও উন্নত ধরণের বিমান আমদানী করিবে, জার্ম্মানীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, আর জার্ম্মানীর তত তৈল ও নাই। অতএব, আকাশ, যুদ্ধেও বিলম্ব হইলে জার্ম্মানীর অসুবিধা হইবারই কথা—বৃটেন শক্তিশালী ও সুরক্ষিত হইয়া উঠিবে। ইহাই বৃটেনের আশা।

সমুদ্রে

প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র এইবার এখনো সমুদ্র বক্ষে। বৈমানিকদের প্রয়াসও সেখানকার যুদ্ধক্ষেত্রই অধিকতর দৃষ্ট হয়—জার্ম্মান বৈমানিক স্কাপা ফ্লোতে বৃটিশ নৌ ঘাটিতে বোমা বর্ষণ করিতে তৎপর; বৃটিশ বাণিজ্যতরী ও রণতরীকে আক্রমণ করিতে সতত উদ্যত; আর সমস্ত বৃটিশ উপকূলে মাইন পাতিয়া বৃটেন ও অন্যান্য দেশের জাহাজ নিমজ্জিত করিতে চেষ্টিত। অন্য-দিকে বৃটিশ বিমান বহরের ও চেষ্টা হইল জার্ম্মান নৌ ও বিমান ঘাটি আক্রমণ করা, জার্ম্মান বিমানকে নিরস্ত ও নির্জ্জিত করা, বৃটেনের আকাশ ও সমুদ্র পথ মুক্ত রাখা, আর জার্ম্মান ডুবু জাহাজ, প্রভৃতি সংহার করা। মোটের উপর সমুদ্রকে কেন্দ্র করিয়াই এতদিন যুদ্ধ চলিয়াছে। 'ক্যারেজিয়াস্' ও 'রয়্যালওকের' নিমজ্জনের পর এইদিকে জার্ম্মানী অনেকটা কৃতিত্বই দাবী করিতে পারিত। 'ডয়েটশল্যাণ্ড' নামক ক্ষুদে জার্ম্মান যুদ্ধ জাহাজ (পকেট ব্যাটলশিপ) যখন বৃটেনের সুরক্ষিত জাহাজ 'রাওলপিণ্ডীকে' যুদ্ধে ডুবাইয়া দিল, তখন জার্ম্মানীর গর্ব্ব বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে আট-লান্টিকে এইরূপ দুইটী জার্ম্মান ক্ষুদে যুদ্ধ জাহাজ বৃটিশ বাণিজ্যতরীগুলির বিভীষিকা হইয়া উঠিয়া-ছিল। আমেরিকা, কানাডা এবং বৃটেনের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র পথ যদি এইভাবে বিপদ সঙ্কুল হইয়া

উঠে, তাহা হইলে কানাডার সৈনিকদল আসিবে কি করিয়া? আমেরিকার বিমান পৌঁছিবে কিরূপে? এমনি সময়ে আবার যদৃচ্ছা "চুম্বক-মাইনের" সহায়ে জার্ম্মানী বৃটেনের উপকূলে প্রতিদিন বৃটিশ জাহাজ ডুবাইতে লাগিল। চারিদিকেই একটা ভীতির সঞ্চার হইল বৃটেন কি তাহা হইলে সমুদ্র-শয্যায় বন্দিনী হইয়া পড়িবে নাকি? বৃটিশ সরকার ঘোষণা করিলেন,—জার্ম্মানীর সহিত নিরপেক্ষশক্তিদের ও বৃটেন আর বাণিজ্য করিতে দিবে না, তাহার "নেভিসার্ট," বা দরিয়ার ছাড়পত্র না লইয়া কোনো নিরপেক্ষ বাণিজ্য জাহাজের ও আর সমুদ্র গমনাগমন সম্ভব নয় হইবে না। এই আদেশ আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধী—তাই নিরপেক্ষরা আপত্তি করিলেন। হল্যাণ্ডের পক্ষে জার্ম্মান বাণিজ্য বন্ধ হইলে বিষম দুর্দ্দশা ঘটে, তাই তাহার আপত্তি; স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিরও আপত্তির কারণ ইহাই। আমেরিকার আপত্তি তীব্র নয়; মামুলী। ইতালী ও জাপানের আপত্তি সবল—কারণ, এই আপত্তির সূত্রে আপনাদের বল ও প্রতিষ্ঠা তাহারা প্রমাণ করিতে পারিল। কিন্তু, মোটের উপর তথাপি বৃটিশ হুকুমই কার্য্যকরী হইল এই পর্য্যন্ত সমুদ্রের ছাড়পত্রের জন্য ৫ হাজার আবেদন পত্র বৃটেন পাইয়াছে; জার্ম্মানীতে পাঠাইবার মত 'চোরাইমাল' ধরিয়াছে মোট ৫৪ হাজার ৪০০ টন। এই দিকে তাই বৃটেনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ঠিক এমনি সময়ে, আটলান্টিকে তিনটী বৃটিশ ক্রুজার দ্বারা বিতাড়িত ও আহত হইয়া জার্ম্মান রণতরী "এ্যাডমিরল কাউণ্ট গ্র্যাফ স্পী" দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টিভিয়ডোতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানেই অবশেষে "এ্যাডমিরাল কাউণ্ট গ্র্যাফ স্পীর' নাবিকদল তাহা ডুবাইয়া দেয়—গত যুদ্ধে স্কাপা ফ্লোতে' তখনকার জার্ম্মান নৌ-বহরও এমনি করিয়াই আত্মসমর্পণ না করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল। 'এ্যাডমিরাল গ্র্যাফ স্পী' সে পথই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু 'গ্র্যাফ স্পীর' পরিণাম যাহাই হউক, এই যুদ্ধে জার্ম্মান প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছে। কারণ, 'গ্র্যাফ স্পী' ও 'ডয়েটশল্যাণ্ডই' মাত্র এই দুইখানি রণতরীই বাহির সমুদ্রে জার্ম্মানীর ভরসা স্থল ছিল—দুইটিই এক উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইত; দুইটিই এক জাতীয় জাহাজ 'পকেট ব্যাটলশিপ'। ভার্সেই সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মানীর নৌ-নির্ম্মাণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিলে তখনকার গণতন্ত্রবাদী জার্ম্মানী সেই সন্ধি সর্ত্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই যুদ্ধে জাহাজগুলি নির্ম্মাণ করে,—জাহাজগুলি হালকা, অর্থাৎ ইস্পাতবর্ম্ম ইহাদের পাৎলা কিন্তু কামানের শক্তিতে ও গতিতে ছিল জাহাজগুলি বিস্ময়কর। তাই, সকলের বিশ্বাস ছিল, জাহাজগুলি দুর্জ্জয়। কিন্তু বৃটেনের সামান্য তিনখানা সাধারণ ক্রুজার যে ভাবে 'গ্র্যাফ স্পীকে' নির্জ্জিত করিল তাহাতে বুঝা গেল জাহাজগুলি দুর্ব্বল দেহ, আর বৃটিশ নাবিকেরা এখনো রণচাতুর্য্যে অতুলনীয়। ইহার পরে, যখন জার্ম্মান যাত্রীবাহী সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ "কলুম্বস্" জলমগ্ন হইল, তখন সমুদ্র পথে জার্ম্মান গরিমা ম্লান হইয়া পড়িল। এদিকে মাইনের উৎপাৎও অনেকটা বৃটেন বুঝিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকারোপায় উদ্ভাবন করিয়াছে—বৃটিশ নৌ বিভাগের হিসাবেই তাহা প্রত্যক্ষ নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মোট জাহজে ডুবিয়াছিল ৭২ হাজার টনেজর। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সেই ক্ষতির পরিমাণ ৪,৭০০ টনেজ। কাজেই, মাইনের ভীতি ও ক্রমশই

হ্রাস পাইতেছে। তাহা ছাড়া, বৃটিশ জাহাজ যেমন ডুবিতেছে, তেমনি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণও পূর্ণোদ্যমে চলিবে। তথাপি, এবারকার যুদ্ধে এখনো সমুদ্রই যে কেন্দ্র ছিল তাহার এক প্রমাণ বৃটেনের বাণিজ্যে বাধা জন্মিতেছে, বৃটিশ আমদানী ও খানিকটা কমিতেছে, দেশে 'খাদ্য নিয়ন্ত্রণ' 'রেশানিং' আরম্ভ হইবে। আর অন্য প্রমাণ, আমেরিকার বৃহত্তর নৌবহর গড়িবার সঙ্কল্প, ৬৪ হাজার টনের অতিকায় যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের সীমায়

কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ এখন এই সব সুপরিচিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নাই—এই যুদ্ধ শুধু জার্ম্মান ও ব্রিটিশ-ফরাসীর যুদ্ধও আর নাই। যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র আজ ফিন্‌ল্যাণ্ডের সীমায়। আর যুদ্ধ চলিতেছে—কিন্তু যুদ্ধ, কাহাতে কাহাতে তাহাও বলা দুঃসাধ্য। ইহা কি ফিন্‌ল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ—অর্থাৎ স্পেনের গৃহযুদ্ধের উল্টা পীঠ? না ইহা কি ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কুসিনিক বেনামীতে রুশিয়ার সংগ্রাম? অথবা, ইহা ফিন্‌ল্যাণ্ডের বেনামীতে পৃথিবীর ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এক অভিযান—ভাবী সমরায়োজনের পূর্ব্বাভাস? ইহা কি এক ক্ষুদ্র প্রতিবেশীকে রুশিয়ার গ্রাসের চেষ্টা, না এ্যাংলো-আমেরিকান্ ভাবী অভিযানের ভয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েটের ইহা আত্মরক্ষার প্রয়াস?

ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের স্বরূপ কি, বলা যখন সহজ নয়—এই যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বুঝা তখন আরও কঠিন। বিশেষত, সংবাদ যতদূর পাইতেছি তাহাতে আমাদের বিস্ময় এত বাড়িয়াছে যে সংশয় দূর হয় নাই। অবশ্য ফিন্‌ল্যাণ্ডের এক প্রধান সহায়—শীত ঋতু, তাহার যাণ্মাষিক নৈশান্ধকার ও তুষারবৃষ্টি। ইহার ফলে রুশিয়ার সৈন্য ও সাহায্য অনেকটা ব্যাহত হইবার কথা। তাহা ছাড়া, রুশ-বাহিনী ফিন-জনগণের নামে যখন যুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছে; তাই দুর্ব্বার বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া সেই জনগণকে ধ্বংস করিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহারা, জার্ম্মাণী যেরূপ পোল্যাণ্ডে অগ্রসর হইয়াছে সেইরূপ, নৃশংস স্পর্দ্ধায় অগ্রসর হয় নাই। অপর পক্ষে ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যাণ্ডের পিছনে সুইডেনের সাহায্য জুটিতেছে। ইতালির বিমানও আসে, আর আসিবে ইংলণ্ডের সাহায্য ও আমেরিকার টাকা। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে, ফিন্‌ল্যাণ্ড সত্যসত্যই সাহসের ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছে—সম্প্রতি স্যুমুস্‌স্মোলমি'তে যে বিজয় তাহার আয়ত্ত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিদের পক্ষেও গর্ব্বের বিষয় হইত। এই বিজয়-কাহিনী সত্য হইলে রুশ রক্ত-ফৌজের পক্ষে লজ্জার কথা মনে করিতে হইবে। মানিতে হইবে, সত্যই সে দলে চালক ও নায়কের অভাব আছে। জার্ম্মাণ সামরিক পরামর্শদাতাদের রুশ-বাহিনী পুনর্গঠনের জন্য ডাক পড়িয়াছে, এই কথাটীও তাহা হইলে ভিত্তিহীন নয়। আর যদি ফিন্‌দেশেই 'রক্ত-ফৌজের' এইরূপ লাঞ্ছনা ঘটে, তাহা হইলে সে বাহিনী পৃথিবীতে আর ভয়ের ও শ্রদ্ধার বস্তু থাকিবে না—সোভিয়েটের পক্ষে ইহাও কি কম দুর্ভাগ্যের বিষয়?

যুদ্ধের সংবাদাদি হইতে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্রের যে অবস্থাটা আমরা বুঝিতে পারি, তাহাতে দেখি ক্ষুদ্র ক্যারেলিয়া যোজকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া রুশবাহিনী প্রতিহত হয়। এই ক পথে রুশিয়া আপনার বিপুলবাহিনী লইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই;—তাহা ছাড়া তাহার ...তিক ও ট্যাঙ্কের পিছনে যথোচিত গোলা বা কামানও ছিল না, বিমানও ছিল না। তাড়াতাড়ি ই যোজক উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের কল্পনা। কিন্তু এই ক্যারেলিয়ার যুদ্ধে ফিন্‌রা শুধু মেসিন গানের জোরেই তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়। রুশিয়া আর তখন এই পথে বেশি শক্তি ব্যয় না করিয়া উত্তরে লাডোগা হ্রদের তীর দিয়া অগ্রসর হইতে গেল—উদ্দেশ্য, ঘুরিয়া ইহার পার্শ্বে বা পিছনে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু তাহাতেও বাধা পড়িল। এদিকে মেনারহাইম দুর্গবলীর বাধা উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা মূর্খতা। তখন রুশিয়ার এক প্রধান চেষ্টা হইল ফিন্‌ল্যাণ্ডের এই সঙ্কীর্ণ কটি-ভাগ সে বেষ্টন করিয়া একেবারে পশ্চিমের বোথ্‌নিয়া উপসাগরে গিয়া পৌঁছিবে—ফিন্‌রা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িবে, বোথ্‌নিয়া উপসাগর বন্ধ হইবে,—তখন দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এই অংশকে ক্রমশঃ ছাঁকিয়া ফেলিলেই হইবে। প্ল্যান হিসাবে ইহাতে ভুল নাই; কিন্তু রুশবাহিনীর তেমন তৎপরতা দেখা গেল না—সন্দেহ থাকিয়া যায়, সত্যই কি ইহারা রুশবাহিনীর না, কুসেনিনের সাহায্যার্থে প্রেরিত রুশিয়ার কিছু কিছু সৈন্য-সামন্তমাত্র? মোটের উপর ফিন্‌রাই বেশি কৌশলের পরিচয় দিল—সল্লা. স্যমুসসোলিমি ও টোকায়ারভি—তিনটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রুশবাহিনী একেবারে সীমান্তে গিয়া পৌঁছিল। সেখানেও ফিনেরা আবার জয়ের দাবী করিতেছে। অথচ, উত্তরে মেরু সমুদ্রের উপকূলে রুশিয়াকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হইল না—পেটসামো বন্দর ও নিকেলের খনি তাহার হাতে আসিয়াছে, সুইডেন ও নরওয়ের উত্তর সীমান্তে সে উপস্থিত। ইহা সত্য হইলে ফিন্‌দের পক্ষে সুইডেনের সাহায্য লাভ সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু, রুশিয়া তাহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যও করায়ত্ত করিতেছে। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের সাহায্যে বারোমাসই পেট্‌সামো হইতে জাহাজ এটলান্টিক গতায়াত করিতে পারে—অতএব, এটলান্টিকের এক অংশীদাররূপে রুশিয়া উদিত হইতেছে। ঠিক এই আশঙ্কাই না আমেরিকা করিয়াছিল? তাই, রুজভেল্ট ফিন্‌ল্যাণ্ডকে বাঁচাইবার জন্য আপনার নিরপেক্ষতা নীতি সত্বেও বহু কোটী ডলার ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

মোটের উপর উত্তর ফিন্‌ল্যাণ্ড হস্তগত হইলেও হেলসিঙ্কির সরকারের হাতে ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্য ও দক্ষিণাংশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রেই যুদ্ধ জয় হয় না। শেষ পর্য্যন্ত "আসল যুদ্ধ" অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়। তথাপি তাহার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ও কূটনীতিক যে যুদ্ধ চলে তাহাতেই যুদ্ধের স্বরূপ ও ফলাফল অনেকাংশে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। সেই দিক হইতে বিচার করিলে এই যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ অপেক্ষাও বড় যুদ্ধ সংবাদ—জাতি সঙ্ঘের রুশিয়াকে বহিষ্কার, জার্ম্মাণ-রুশ বন্ধুত্বের দৃঢ়তা;

এবং ব্রিটেন-আমেরিকাও ইতালির প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচার ও সাহায্য দান। এই সবে বুঝা যায় যুদ্ধ ক্রমশ কি রূপ গ্রহণ করিতেছে। আবার, পূর্ব্ব মাঞ্চুরিয়া রেলপথ বিষয়ে জাপান-সোভিয়েট ব্যবস্থায় বুঝা যায়—এই যুদ্ধ কত ব্যাপক হইতে পারে—পৃথিবী জোড়া যুদ্ধে পরিণত হওয়ার ইহার কতটা সম্ভাবনা। তেমনি ইতালি ও হাঙ্গেরীয়ার মধ্যে চ্যানোওচাকির মারফৎ যে বুঝাপড়া হইল, রুমানিয়াকে হাঙ্গেরীর বন্ধুত্বের জন্য যে উপদেশ দেওয়া হইল, ইতালি যে বল্‌কানের অভিভাবক হইয়া বসিলেন, ইহাতে বুঝা যায়—কিভাবে এই যুদ্ধের এক নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। আবার, ফিল্‌ড মারশ্যাল গোয়েরিংএর আর্থিক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বলাভে ও ব্রিটেনের 'খাদ্য-নিয়ন্ত্রন' চেষ্টায় বুঝা যায়, যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র কোথায়—এই শিল্প যুগের যুদ্ধে অনেকাংশেই তাহা অর্থনৈতিক।

আমরা হয়ত ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণই দেখিতেছি, কিন্তু ঝটিকার বিদ্যুদগর্ভ রক্তমেঘ সঞ্চিত হইতেছে অর্থনীতিক ও কূটনীতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ইহাও স্মরণীয়।

১০ই জানুয়ারী, ১৩৪৬

অরবিন্দ ও ভাবী সমাজ *

অনিলবরণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅরবিন্দ যে-আদর্শ দেখাইয়াছেন মানব জাতির সামাজিক জীবনে তাহা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই সকল সত্য কেমন নিগূঢ়ভাবে মানব সমাজের বিবর্ত্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে, শ্রীঅরবিন্দ The Psychology of Social Development নিবন্ধে তাহা বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ইউরোপে সমাজের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের অন্ত নাই। বস্তুতঃ ইউরোপের মন হইতেছে অতিশয় সক্রিয়, সকল বিষয়েই তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু মানুষের মন হইতেছে একটী অজ্ঞানের যন্ত্র, ইহা শুধু প্রশ্ন তুলিতে পারে, অনুসন্ধান করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। মন যে-সব আংশিক বিকৃত সত্যে উপনীত হয় তাহা সাময়িকভাবে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজে লাগিতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা কোন প্রশ্নের চরম সমাধান হয় না এবং মানব জীবনের কোন সমস্যারও চরম নিষ্পত্তি হয় না। ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ।

জয়শ্রী (পৌষ, ১৩৪৬) ৭৫৫ পৃষ্ঠা, ২২ লাইনের পর নিম্নলিখিত অংশটুকু যোগ হবে—

* মার্কস্ যে ধর্ম্মবর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন তাহার ভিত্তি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জড়বাদ—মার্কসের দর্শন ছিল এই জড়বাদ এবং হেগেলের দার্শনিক অভিব্যক্তিবাদের একটি জগা খিঁচুড়ী! জগতের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে জড় বিজ্ঞানের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই—কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আপাতদৃষ্ট বস্তু লইয়াই তাহার কারবার, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া জড়বাদের প্রচার করিয়াছিলেন। বিংশশতাব্দীতে হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর সে mechanical determinism যাহার উপর মার্কসের থিওরি প্রতিষ্ঠিত—তাহা এখন উড়িয়া গিয়াছে, আজিকার বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে একটা Indeterminismএর সন্ধান পাইয়াছে, তাই আজ প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করিতেছেন যে এই জগতের মূলে যে-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা অন্ধ জড়শক্তি নহে, তাহা চৈতন্যময়। আজও যাঁহারা মার্কসবাদ লইয়া মাতামাতি করিতেছেন তাঁহাদের নিকট এখনও সে তত্ত্ব পৌঁছায় নাই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া যাহাই বলুন, মানুষের যে গভীরতম অনুভূতি তাহাতে চৈতন্যই জগতের চরম সত্য বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে; জড় হইতেছে বস্তুতঃ চৈতন্যেরই একটি রূপ, একটি অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু জগৎও মিথ্যা নহে, জগৎও সত্য, জগতে জীবন ও কর্ম্মও সত্য, ব্রহ্ম সত্যের সত্য। এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন পথ ধরিয়াছে। পাশ্চাত্য গতি জীবনের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়াছে, এবং এক সময়ে সব ছাড়িয়া শুধু জীবনের সত্যকেই ধরিয়াছে।

যতক্ষণ না মানুষ এই মনকে বিকাশ করিয়া অতিমানস বিজ্ঞান শক্তি লাভ করিতেছে—ততক্ষণ মানব জীবনের প্রকৃত রূপান্তর ও উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে, তেমনিই সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা লোক নানা থিওরি বা মতবাদ দাঁড় করাইতেছেন—কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, বংশনীতি, ভৌগলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বাহ্যবিষয়গুলির উপর দৃষ্টি দেওয়ায় কাহারও মতই ধোপে টিকিতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, এ-সবই হইতেছে বহিরঙ্গ—উপলক্ষ্য; মানব সমাজের বিবর্তন প্রকৃতভাবে পরিচালিত হয় মানুষের আভ্যন্তরীণ চৈতন্য বিকাশের গতি অনুসারে—সেইজন্যই তিনি তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন, The Psychology of Social Development. এই দিক দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানব সমাজের বিকাশ পর পর চারিটি স্তরের ভিতর দিয়া চলে—প্রথম প্রতীকতার (Symbolism) যুগ, দ্বিতীয় শাস্ত্র ও আচারের যুগ, তৃতীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, চতুর্থ আধ্যাত্মিকতার যুগ *। এই সব স্তরের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবে মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ আসিয়াছে—মানুষ এখন আর শাস্ত্র বা গতানুগতিক আচার না মানিয়া নিজেদের অন্তরের মধ্যে গিয়া সত্যের সন্ধান করিতে এবং নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ সত্য অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। এই প্রবৃত্তি যদি বিপথে চালিত না হয়, পুনরায় মানুষ নূতন রকম আচার তান্ত্রিকতার গর্তে পতিত না হয়—তাহা হইলে ইহার পরই আসিবে আধ্যাত্মিকতার যুগ এবং তখনই মানুষের আদর্শ সমাজের স্বপ্ন সফল হইবে।

রাজনীতিক ক্ষেত্রে জগতের আজ প্রধান সমস্যা হইতেছে মানব জাতির কোন রকম ঐক্য সাধন—যেন জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যায়, মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাব অন্তর্নিহিত শক্তিসকল বিকাশ করিবার সুযোগ পায়। এই দিকে কি সব প্রবৃত্তি কাজ করিতেছে, তাহাদের ত্রুটি কোথায়, কি করিলে মানব জাতির প্রকৃত ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে শ্রীঅরবিন্দ The Ideal of Human Unity নামক নিবন্ধে এই সব প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে জগতের সকল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তিনি যেভাবে নিজের বক্তব্যগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন, জগতের রাজনৈতিক সাহিত্যে আর কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে না। Arya পত্রিকায় প্রকাশিত এই নিবন্ধে তিনি যে সব ইঙ্গিত দিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী ঘটনাধারায় তাহাদের সত্যতা আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই গ্রন্থের মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীন বিকাশের প্রবৃত্তি আছে তেমনিই অপরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবারও প্রবৃত্তি আছে, ব্যষ্টিও যেমন সত্য, সমষ্টিও তেমনি সত্য—উভয়ের ভিতর দিয়াই জগতে ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ হইতেছে। মানবের প্রথম সমষ্টিরূপ হইতেছে পরিবার, তাহার পর কুল, উপজাতি—শেষে

* চৈতন্যের দিক দিয়া সমাজতত্ত্বের আলোচনা প্রথমে আরম্ভ করেন জার্ম্মাণীরই একজন মনীষী, তাহার নাম Lamprecht—কিন্তু তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

আসিয়াছে nation বা অধিজাতি—এই ভাবে মানুষ ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সমষ্টি জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। সেই একই প্রেরণাতে সমগ্র মানব জাতির এক সমষ্টিগত জীবন গড়িয়া উঠিবে। বাহ্যিক শৃঙ্খলা বজায়ের জন্য একটী বিশ্ব-রাষ্ট্র বা বিশ্ব-সম্মিলন গঠনের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে—তাহা যদি জগতের জাতি সকল পরস্পরের সহিত বুঝা পড়ার দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তোলে তাহা হইলে এই ঐক্য সাধন প্রক্রিয়ায় ক্ষতি ও দুঃখ ভোগের মাত্রা ন্যূনতম হইবে—নতুবা প্রকৃতি অনবরত বিভ্রাটজনক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া মানুষকে তাহাতে উপনীত হইতে বাধ্য করিবে, কেবল তাহাতে ক্ষতি ও দুঃখ ভোগের মাত্রা অধিকতম হইবে। কিন্তু যেভাবেই মানব জাতির বাহ্য ঐক্য সাধিত হউক, যদি মানুষের আভ্যন্তরীণ চৈতন্যের পরিবর্ত্তন না হয়, এখন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে যে অহমিকা দ্বারা চালিত হইতেছে তাহা বর্জ্জন করিয়া আত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়—তাহা হইলে কোন ঐক্যই স্থায়ী হইবে না, মানব জাতির দুঃখ ভোগেরও অবসান হইবে না।

আধ্যাত্মিকতা যে মানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন এবং ভারত যে জগতের অন্য সকল দেশের তুলনায় আধ্যাত্মিকতার অধিক বিকাশ করিয়াছে সে-বিষয়ে এখন আর তর্কের স্থান নাই। তথাপি ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতার দিকে অত্যধিক ঝোঁক দেওয়ায় ভারত ইহ-বিমুখ হইয়াছে, ঐহিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই অভিযোগের চূড়ান্ত জবাব দিয়াছেন তাঁহার A Defence of Indian Culture নিবন্ধে এবং এই সূত্রে তিনি ভারতীয় কৃষ্টির বিকাশের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন তাহা ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব দিক্‌দর্শন। ভারতে আধ্যাত্মিকতা জীবনকে নিরুৎসাহ করে নাই বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিবারই প্রেরণা দিয়াছে *। তাহার ফলে ভারত ধন, সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সংগঠন, ঐহিক শক্তিতে যে সীমায় উঠিয়াছিল—আধুনিক যুগের পূর্ব্বে আর কোন দেশ, কোন সভ্যতাই তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় ভারতের প্রাধান্য অবিসম্বাদী। বিজ্ঞানে ভারত অন্য সকল দেশের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল এবং আরবদের ভিতর দিয়া ইউরোপকে জড় বিজ্ঞানে দীক্ষা দিয়াছিল। তাহার সাহিত্যও অতি মহান। বেদ, উপনিষদ্, গীতার তুলনা ত জগতের সাহিত্যে আর কোথাও মিলিবে না—তা ছাড়া আমাদের রহিয়াছে রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অতি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি। ভারতের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রকলার ইতিহাস সুদীর্ঘ। সাহিত্য

* ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহাই হইতেছে ভারতীয় সভ্যতার সমগ্র আদর্শ; জীবনের সর্ব্বতোমুখী ভোগ ও বিকাশকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমশঃ মোক্ষ বা অধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ অবিরাম সৃষ্টি ভারতীয় সভ্যতার মহান প্রাণশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু শুধু এই সকল উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রেই নহে, সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক জীবনেও ভারত একটা জীবন্ত শক্তিমান জাতি যাহা কিছু করিতে পারে সবই চূড়ান্তভাবে করিয়াছে—যুদ্ধ করিয়াছে, শাসন করিয়াছে, ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি লইয়া সকল রকম পরীক্ষা করিয়াছে, সাম্রাজ্যগঠন করিয়াছে। অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যে-জাতি, যে-সভ্যতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এইরূপ কর্ম্মশক্তি, সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাণশূণ্য বা জীবন-বিরোধী ছিল না।

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মপরতার পর স্বভাবের নিয়মে যখন ভারতীয় জাতির প্রাণশক্তি সাময়িক ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ঠিক সেই সময়ে শঙ্কর আসিয়া তাঁহার মায়াবাদ প্রচার করায় ভারতের জাতীয় জীবনে সমধিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শঙ্করের পূর্ব্বে বৌদ্ধেরাও সন্ন্যাসবাদ প্রচার করিয়াছিল কিন্তু তখনও জাতির প্রাণশক্তি সতেজ ছিল, হিন্দুরা বরাবর বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই—এবং শঙ্করের মায়াবাদ বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণতি—তাই অনেকেই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। বৌদ্ধদের শূণ্য এবং শঙ্করের নির্গুণ, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নহে। তাহা ছাড়া বৌদ্ধেরা দার্শনিকতা হিসাবে নির্ব্বাণকে বড় বলিলেও জীবন ও কর্ম্মকে শঙ্করের ন্যায় নিরুৎসাহ করে নাই। বুদ্ধের নীতিশিক্ষা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করিবার দিব্য শিক্ষা। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে নিছক নিরাত্মবাদী ও নিবৃত্তমূলক স্বরূপ উহা বেশী দিন টিকে নাই।* অশোকের শিলালিপিতে সন্ন্যাসমূলক বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষভাবে কোনই উল্লেখ নাই; উহাতে সর্ব্বত্র প্রাণী মাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। অশোকের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও পরোপকারের কাজ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও গ্রীস্ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে আমরা যে পরোপকার ও সেবাব্রতের মহিমা দেখিতে পাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই জগতে প্রথম তাহার পথ দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই নূতন মতটীই স্বভাবতঃ অধিকাধিক লোকপ্রিয় হয়। যাহারা সংসার ও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিজেদের নির্ব্বাণ-লাভের সাধনায় ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদের নাম হইল "হীনযান", এবং এই নূতন পন্থার নাম হইল

* অনুরূপ কারণেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সন্ন্যাসবাদ ইউরোপের ক্ষতি করিতে পারে নাই। জীবন ও কর্ম্মের দিকে পাশ্চাত্য জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য তাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নৈতিকতা ও সেবা ধর্ম্মের দিকটিই গ্রহণ করিয়াছিল—নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতা মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

"মহাযান"। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যত কিছু কীর্ত্তি ও গৌরব আসিয়াছে এই "মহাযান" পন্থা হইতে *। ইহা মূলতঃ গীতার কর্ম্মযোগ—মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থে গীতার অনেক কথা শব্দশঃ গৃহীত হইয়াছে। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে আজও এই মহাযান পন্থাই প্রচলিত আছে। পরে শঙ্কর যে মত প্রচার করিলেন তাহা বৌদ্ধ হীনযানেরই অনুরূপ, কিন্তু তিনি তাহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করায় হিন্দু জন সাধারণ সহজেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। আর তিনি যেমন সমুচ্চ প্রতিভা ও অসাধারণ কর্ম্মশক্তি লইয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্ব্বত্র নিজ মত প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এমনটী এ-পর্য্যন্ত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তিনি গীতার কর্ম্মযোগের বিকৃত ব্যাখ্যা করিলেন—সংসারের সকল কর্ম্মকেই বন্ধনের কারণ বলিয়া জ্ঞানের উপর জোর দিলেন। যাহারা নিতান্ত অক্ষম তাহাদের পক্ষেই সংসার ধর্ম্ম ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মমার্গের ব্যবস্থা রাখিলেন। অর্জ্জুন যখন তামসিকতায় আচ্ছন্ন, সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ করিতে উন্মুখ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই মনোভাবকে ক্লৈব্য বলিয়া নিন্দা করিয়া তাঁহাকে এক বিরাট কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন। আর ভারতীয় জাতি যখন তামসিকতায় মগ্ন হইতেছে—তখন শঙ্কর তাহাদের সেই ক্লৈব্যকেই প্রশ্রয় দিয়া সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সন্ন্যাসবাদ প্রচারে জাতির কোন ক্ষতিই হয় না—কারণ কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট লোকই এ সকল উচ্চতর সাধনা বা চর্চ্চা লইয়া থাকে, সাধারণ লোক নিজেদের চাষবাস বেচাকেনা লইয়াই থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এ কথা সত্য নহে। মানুষ যে স্তরেই থাকুক না কেন—জীবনের, জগতের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার এবং সেই অনুসারে জীবনকে চালিত করিবার একটা গভীর প্রেরণা তাহার মধ্যে আছে। বিশেষতঃ ভারতের লোকের পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে প্রজুয্য। শঙ্করের মায়াবাদের দার্শনিক চর্চ্চা খুব বেশী লোকে করে নাই—কিন্তু তাহার মূল কথাগুলি যাত্রা, গান, কথকতা, লোক সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের চাষারা লাঙ্গল ধরিতে ধরিতে গান করে,

কোন অপরাধে এ-দীর্ঘ মিয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল্।

অথবা,

মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ্ বাঁধা বলদের মত।

---

* হীনযান ও মহাযান এই দুই পন্থার ভেদ বর্ণনা কালে ডাঃ কেন্ বলেন

"Not the Arhak who has shaken off all human feeling, but the generous, self sacrificing, active Bodhisatoa is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests"—*Manual of Indian Buddhism.*

এমন অসংখ্য গান চাষী, দোকানী, মালী, নাপিত সকল শ্রেণীর লোকের মুখেই শুনা যায়—ইহাদের ভাব হইতেছে—এই সংসার একটা কারাগার স্বরূপ, কর্ম্ম এখানে বন্ধনের শৃঙ্খল—এই সাংসারিক জীবন নরকতুল্য, ইহা ছাড়িয়া যাওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সকলেই যে এই শিক্ষা অনুসারে সংসার ছাড়িয়া যায় তাহা নহে—কিন্তু সংসার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া যাহারা সংসার করে তাহাদের দ্বারা সংসারে বড় কাজ কিছুই হয় না। কোনরকমে নিজের স্ত্রীপুত্র লইয়া সঙ্কীর্ণভাবে দিনগত পাপক্ষয় করাই হয়—জীবনের স্বরূপ। গত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের জীবন ধারা মোটের উপর এইরূপ ক্ষীণ স্রোতেই চলিয়াছে। ভারতের সম্পদ সেদিন পর্য্যন্তও যে খুব বেশী ছিল—তাহার কারণ এ দেশের মত সুজলা, সুফলা সর্ব্বরত্নমণ্ডিতা দেশ জগতে আর কোথাও নাই। যাহাতে মানুষকে জীবিকার জন্য বেশী বেগ না পাইতে হয়, নিশ্চিন্তভাবে তাহারা উচ্চচিন্তা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে সেইজন্যই ভগবান যেন ভারতকে স্বর্ণ প্রসবিনী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী কর্ম্মশক্তি হারাইয়া নিজেদের সম্পদ রক্ষা করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই—তাই আজ শোষণে ও পেষণে তাহাদের দুর্দ্দশার চরম হইয়াছে।

কিন্তু মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদের দিন শেষ হইয়াছে—এতদিন ধরিয়া ভারত যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাতে আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ গঠনের সমস্ত উপাদানই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের যাহা ত্রুটি ছিল পাশ্চাত্যের প্রভাবে তাহা সংশোধিত হইয়াছে। আজ আসিয়াছে প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের এক মহান সমন্বয়ের দিন। শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় এই সমন্বয়েরই বিশাল ও গভীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জনসাধারণের ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক দার্শনিক ধর্ম্ম নহে, তাহা হইতেছে লোকাচার, দেব-দেবীর পূজা, লৌকিক ধর্ম্ম। কিন্তু যদি আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনকে এই ভাবে আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে চলিবে না—জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে ভিতরের আত্মসত্যের অভিব্যক্তি করিতে হইবে। আর যে আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের ও কর্ম্মের এইরূপ সমন্বয় হইতে পারে তাহা মায়াবাদ নহে। মায়াবাদ বলে এই জগৎ যেমন আছে, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, মৃত্যুতে পূর্ণ—ইহা চিরকাল এমনই আছে, এমনই থাকিবে—ইহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা বৃথা, এই জীবনের কোনই সার্থকতা নাই, not worthliving মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে এই জীবনকে ছাড়াইয়া নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নীরব ব্রহ্মে চিরদিনের জন্য লীন হওয়া বা নির্ব্বাণ লাভ করা। তাই যাঁহারা মানব সমাজকে আদর্শভাবে গঠন করিতে চান তাঁহাদিগকে মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মায়াবাদ শুক্‌নো"। তিনি চিনি হইতে এবং চিনি খাইতে দুই-ই চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মাও সত্য, জগৎও সত্য, আমি দুইটাই লই, নইলে ওজনে কম পড়ে।" শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টি লইয়া বেদ, উপনিষদ্, গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুভূতিকেই উচ্চতম দার্শনিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজ জগতের সর্ব্বত্রই আদর্শ মানব সমাজ গঠনের নানা প্রয়াস, নানা পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নটিকে যেমন সমগ্রভাবে ধরিয়াছেন, সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন, সকল জ্ঞান, সকল সভ্যতা, সকল ধর্ম্মের মূলশক্তি আহরণ করিয়া এক বিরাট সমন্বয় করিয়াছেন এমনটি আর এ পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। তাই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী Romain Rolland বলিয়াছেন, "The completest synthesis that has been reached to this day, of the genius of Asia and of the genius of Europe." রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।"

শ্রীঅরবিন্দ ভাবী সমাজের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার সহায় হইবে মানবধর্ম্ম, a religion of humanity. আধুনিক যুগে এই ধর্ম্মটিই হইতেছে অন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রবল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় rationalists বা যুক্তিপন্থীদের মনে এই ধর্ম্ম জন্মলাভ করে, তাঁহারা যাজকীয় খৃষ্টান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এই মানবধর্ম্মের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। আধুনিক Positivism ও Humanitarinism হইতেছে ইহারই অভিব্যক্তি। পরোপকারব্রত, সমাজসেবা এবং অনুরূপ কর্ম্ম হইতেছে ইহার অনুষ্ঠান; গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, pacifism বা শান্তিবাদ—এ-সব অনেকটা এই ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, অন্ততঃ ইহার সূক্ষ্ম ক্রিয়া হইতে বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে। এই ধর্ম্মের মতে মানবজাতিকেই দেবতারূপে বরণ করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে। মানুষের সেবা করা, মানুষকে সম্মান করা, মানবজীবনের উন্নতি সাধন করা—ইহাই হইতেছে মানবাত্মার প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান লক্ষ্য। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় এই ধর্ম্মের মূল কথা,

শুনহে মানুষ ভাই !
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ॥

অন্য কোন দেবতা—জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার—কিছুকেই মানুষের উপর স্থান দেওয়া চলিবে না, মানুষের সেবায় ইহারা কতটুকু লাগিতে পারে তাহাতেই এ সবের সার্থকতা। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষ্টি—সবেরই লক্ষ্য হইবে মানুষের সেবা। যুদ্ধ, প্রাণদণ্ড, নরহত্যা, ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বা সমাজ কর্ত্তৃক মানুষের উপর সকল প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ, শুধু শারীরিক নহে, মানসিক ও নৈতিক নিষ্ঠুরাচরণ, যে-কোন অজুহাতে কোন মানুষকে, কিম্বা কোন শ্রেণীর মানুষকে হীন বা অবনত করিয়া রাখা, মানুষের উপর মানুষের, শ্রেণীর উপর শ্রেণীর, জাতির উপর জাতির সকল প্রকার অত্যাচার ও শোষণ—পূর্ব্বকালে যে-সব কার্য্যতঃ ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের দ্বারা নানা ভাবে সমর্থিত হইয়াছে—এ-সবকেই মানবধর্ম্মের বিরুদ্ধে পাপ, জঘন্য অপরাধ বলিয়া পরিগণনা করা হইবে, সকল সময়েই এ-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিছুতেই আর এ সবকে বরদাস্ত করা হইবে না। মানুষের শরীরকে সম্মান করিতে হইবে, অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে

হইবে, বিজ্ঞানের দ্বারা রোগ ও নিবার্য্য মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে হইবে ; মানুষের জীবনকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে, শক্তিমান্ করিতে হইবে, মহান ও সমুন্নত করিতে হইবে। মানুষের হৃদয় ও অনুভূতিকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—রক্ষা করিতে হইবে বিকাশের ক্ষেত্র দিতে হইবে ; মানুষের মনকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, তাহাকে স্বাধীনতা ও প্রসারিত ক্ষেত্র ও সুযোগ দিতে হইবে, আত্ম-শিক্ষা ও আত্ম-বিকাশের সকল উপায় করিতে হইবে, তাহার সকল শক্তিকে মানুষের সেবার জন্য সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিতে হইবে। মোটামুটি এইটিই হইতেছে বুদ্ধিপ্রসূত যৌক্তিক মানবধর্ম্ম। দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে মানুষের জীবন ও চিন্তা ও অনুভূতি কিরূপ ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এই মানবধর্ম্ম কি মহান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহার কাজ কিরূপ সুফলপ্রসূ হইয়াছে।• পুরাতন ধর্ম্মগুলি যাহা করিতে পারে নাই ইহা দ্রুত তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই ধর্ম্মের আছে মানবজাতি ও তাহার পার্থিব ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস—এবং সে জন্য ইহা মানবসমাজের প্রগতিতে সাহায্য করিতে পারে ; অন্য পক্ষে প্রাচীন গোঁড়া ধর্ম্মগুলি মানুষকে পরকালের ভরসা দিয়া জীবনের সকল দুঃখ সহ্য করিতে এমন কি দুঃখ ও নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারকে ডাকিয়া আনিতেও উৎসাহ দিয়াছে।

কিন্তু মানবধর্ম্মকে যদি তাহার কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে চলিবে না—এরূপ থাকিলে তাহা জনসাধারণের হৃদয়কে অধিকার করিতে এবং মানবজীবনের সাধারণ নীতি হইয়া উঠিতে পারিবে না—তাহা কেবল কতকগুলি উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই স্পষ্ট হইয়া থাকিবে—সাধারণের উপর কেবল কিছু প্রভাব বিস্তার করিবে। আর সেভাবে তাহার যে প্রধান শত্রু, সকল প্রকৃত ধর্ম্মেরই যাহা প্রধান শত্রু—ব্যক্তির অহমিকা, শ্রেণীর অহমিকা, জাতির অহমিকা,—তাহাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে পারিবে না। সেজন্য তাহাকে আত্মার সত্যের উপর, আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—সকল মানুষ যে মূলতঃ এক আত্মা এবং ভগবানের সহিত এক, সেই অনুভূতির উপরই প্রকৃত মানব প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং এই প্রেম ও ঐক্যবোধই হইতেছে মানবধর্ম্মের, সকল সত্যধর্ম্মের প্রাণ। যতদিন না মানব চৈতন্যের রূপান্তর দ্বারা ভিতরে এই ঐক্যবোধ ও মৈত্রী সিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ততদিন বাহিরে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের দ্বারাই প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—আর যখন ইহা সিদ্ধ হইবে তখন বাহ্য প্রতিষ্ঠানসকলের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও নবসৃষ্টি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হইবে, এখনকার মত দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও দুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়া সে-সবের জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস করিতে হইবে না।

এই আধ্যাত্ম মানবধর্ম্মের প্রকৃষ্ট শাস্ত্র হইতেছে গীতা। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া আমিই রহিয়াছি—যাহারা মূঢ় তাহারাই মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্ আমাকে

অবজ্ঞা করে *। সকল মানুষের মধ্যেই সমান ভাবে যে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, সকলের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহাকে সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সহিত ঐক্যে সকলের সহিত জীবন্ত ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—এই প্রেমও ঐক্যবোধের উপর যে মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই হইবে আদর্শ সমাজ। এই আদর্শ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদের মন্ত্রেই প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মংত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়নি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

—ঋগ্বেদ্ ১০।১৯১।২-৪

তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র কথা কও। তোমাদের মন, তোমাদের মত এক হউক। প্রাচীন দেবগণও এইরূপে একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছেন।

তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি এবং হব্যদ্বারা হোম করিতেছি।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ কর।

ইহাই ঋগ্বেদের শেষমন্ত্র। সমগ্র মানবজাতির প্রতি ইহাই বৈদিক ঋষিগণের চিরন্তনবাণী।

* বাইবেলে আছে—God has created man in His own image. কোরাণে আছে ভগবান্ বলিয়াছেন, Nafakhtu fi hi meri ruhi, "I breathed unto him of my breath": এই মানবধর্ম্মের মধ্যেই রহিয়াছে জগতের সকল ধর্ম্ম ও সভ্যতার মিলনসূত্র।

অবিচ্ছিন্ন

শ্রীকান্ত

তুলাকে কাজে লাগাতে গিয়ে দেখতে দেখতে একটা বিরাট কলকারখানা গড়ে উঠলো। সেই যন্ত্রদানবের খোরাক জোগাচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক-দেহের রক্ত দিয়ে। সকালে ছ'টায় যারা কাজে গিয়েছে ছুটী তাদের বেলা এগারটায়, আবার যেতে হবে বেলা তিনটায়।

এগারটার ছুটীর বাঁশী বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সুখদা উন্মুখ হৃদয়ে চেয়ে আছে পথের পানে। এমন সময় প্রতিদিন সে সেবাপরায়না মূনটী নিয়ে চেয়ে থাকে স্বামীর পথ পানে। ইঞ্জিন ঘরে বয়লারে কয়লা জোগায় বৃন্দাবন। প্রচণ্ড উত্তাপে তার দেহের চর্ম্ম শিথিল হয়ে রঙ হয়েছে ছাইয়ের মত। ছাব্বিশ বছর বয়সেই মুখে পড়েছে স্পষ্ট বার্দ্ধক্যের ছাঁপ। সমস্ত দেহে শিরাগুলো ফুটে উঠেছে নীলাভ লতাজালের মত।

সুখদা পিপে ভরে জল তুলে রাখে স্বামীর স্নানের জন্য। নদীর জলের চেয়ে কুয়োর জল ঢের বেশী ঠাণ্ডা, তাই গ্রীষ্মের দিনে স্বামীকে ও কোনদিনই নদীতে যেতে দেয় না।

গত রাত্রিতে বৃন্দাবনের বেশ একটু জ্বর হয়েছিল। দু'দিন ধরেই শরীরটা তার ভাল নেই। সুখদা বারণ করেছিল সেদিন কাজে যেতে—বৃন্দাবন ম্লান হেসে বললো—মাইনে কাটা যাবে না? —যাক্, তোমার দেহের চেয়ে পয়সার মূল্য বেশী নয় আমার কাছে—সুখদার চোখে জল এলো। বৃন্দাবন ওষ্ঠের মৃদু স্পর্শে সে জল মুছিয়ে দিয়ে কাজে চলে গেল। সেই থেকে সুখদার আজ কত ভাবনা। তুলসী-তলায় গিয়ে একবার প্রণাম করে প্রার্থনা করে এলো স্বামীর জন্য। তারপর দুইপয়সার ময়দা এনে রুটী তৈরী করে রাখলো—রুটীর সঙ্গে পটল চচ্চরী খুবই প্রিয় বৃন্দাবনের। বৃন্দাবন যা খেতে ভালবাসে সুখদা যেমন করে হোক সংস্থান তার করবেই। মোটে তেরটী টাকা মায়না পায় বৃন্দাবন—তাই দিয়ে কোনমতে খেয়ে না খেয়ে চলেছে তাদের দিনগুলো। স্বামীস্ত্রীতে ওরা দুইটী জীব—তৃতীয় জীবটীর আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানে ছিল মাত্র তিনটি দিন। সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে গলা জড়িয়ে খুব খানিকটা কেঁদেছিল ওরা।

পনেরো মিনিটের পথ কাপড়ের কল। বেলা বেজে গেলো বারোটা; ব্যস্ত হয়ে উঠলো সুখদা। আরও আধ ঘণ্টা—সরু পথটা দিয়ে যতদূর দেখা যায় সুখদা চেয়ে দেখলো, কিন্তু সেপথে যে দু'একজন আছে তারা কেউ বৃন্দাবনের মত নয়। যারা ঘরে আসবার চলে এসেছে ঘরে; আর কাজে যাবার চলে গিয়েছে কাজে। মনে পড়লো গত রাত্রিতে স্বামীর দেহের উত্তাপের কথা। সুখদা আর পারলো না অপেক্ষা করতে—বেরিয়ে গেল কলের পথে। ভুলে গেলো বয়স আর লজ্জা-সম্ভ্রম।

দূর থেকেই শুনা যায় যন্ত্রদানবের ঘস্‌ঘসে শব্দ। বাতাসের সঙ্গে মিশে আসছে বয়লারের উত্তাপ-কণা। সুখদা ছুটেছে পাগলের মত।

ঐযে একপাল লোক জড় হয়ে আছে কলের সদর-দরজায়। দুক্‌ দুক্‌ করে উঠলো সুখদার বুক। ছুটে গেল সে প্রাণপণ শক্তিতে। দুএকজন ভীড় থেকে চলে আসছিল—একজন বললো—আহা জলজ্যান্ত মরদটা—দু'বছরও হয়নি বিয়ে করেছে।

—কে গো লোকটা, কে?

—বয়লার ঘরে কাজ করে শুনলুম। চুলোর মুখ খুলে কয়লা দিতে যাচ্ছিল—ভিমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েই নেই।

সুখদার কান খাড়া হয়ে উঠলো—পায়ের তলার পৃথিবী কাঁপছে থর থর করে। ভিতরের আত্মা চিৎকার করে উঠলো—কি বললে? কে মরেছে?—কিন্তু কণ্ঠ থেকে বের হবার আগেই সে আর্ত্তনাদ ভেতরে মুচ্ছিত হয়ে পড়লো। সুখদা ছুটে চলেছে সাঁ সাঁ করে বাতাসের মতো। কারখানায় নয়—বাড়ীর পথে। সূর্য্য ছুটেছে, গাছ ছুটেছে, নদী, পথ, আকাশ সব ছুটেছে সুখদার পেছনে পেছনে। সুখদা পালাতে চায়—চলে যেতে চায় গাছ লতা জীব জন্তুর সবকিছুর দৃষ্টির বাইরে—অবিচ্ছেদ্য অন্ধকারের মাঝে। হায়, হায়, ওরা ওকে এমন করে অনুসরণ কচ্ছে কেন! কেন ওকে পালাতে দিচ্ছে না?

সুখদা বাড়ী এসে একেবারে ঘরে ঢুকে গেল—বন্ধ করে দিল দরজা-জানলা সব। বাস্‌, সব অন্ধকার—পৃথিবী আকাশ সূর্য্য কিছু নেই—সব মরেছে,—বৃন্দাবন মরেছে—সুখ-সম্পদ, প্রেম-ভালবাসা, আদর-সোহাগ সব মরেছে। সুখদা দাঁড়িয়ে আছে—মানুষ নয়—একটা পাথরের মূর্ত্তি চেতনা হীন, জড়।

ঐ যে ভেসে আস্‌ছে কাদের মর্ম্মন্তুদ কোলাহল। নিশ্চয় সবাই মিলে বৃন্দাবনের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসছে স্ত্রীকে দেখাবার জন্য।

ক্ষেপে উঠলো সুখদা। একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। দুই কানের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যন্ত্র-দানবের ঘস্‌ ঘসে শব্দ—দানবটা যেন বিকট উল্লাসে ছুটে আস্‌ছে এই দিকেই—উঃ কলকব্জার সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ—কানের ভেতর দিয়ে যেন তুফান বয়ে চললো জোরে আরও জোরে—আর বুঝি সুখদা পারে না সইতে। হঠাৎ বজ্রের মতো একটা বিপুল আর্ত্তনাদ করে সব যেন ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেলো। চলে-যাওয়া ইঞ্জিনের আওয়াজের মতো শব্দ এলো ম্রিয়মান হয়ে—তারপর? সব নীরব। * * * * * * * * ???

সেদিন শীতলক্ষ্যার তীরে সন্ধ্যা-আকাশ যখন ধূম্র হয়ে উঠেছে—দুইটী দগ্ধ নরদেহের বাষ্প-কণায়—তখন কলের বাঁশীতে আবার এলো বৃন্দাবনের আহ্বান বয়লারের মুখে কয়লা ঠেলবার জন্য; আর সুখদার প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে তুলসী গাছটি উর্দ্ধপানে চেয়ে সকরুণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্‌লো গৃহবধুর হাতে সান্ধ্য দীপটি না পেয়ে।

কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্যক্রম

মহেন্দ্র নাথ

[The Revolution does not usually develop along a straight, continuously ascending line, not as a continuously swelling up-surge, but it develops in zig-zags, in advance and retreats, ebb and flows of tides, which in the course of development harden the forces of revolution and prepares for its final victory.—Stalin]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের আবহ সুর ব'য়ে চলেছে সাবলীল ছন্দে, ধনতন্ত্রবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ তার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় সদা-তৎপর। সামন্ত-তন্ত্রের স্বৈরাচারে পড়েছে যবনিকা। ইউরোপের প্রায় সব কটা রাষ্ট্রই দেখছে উজ্জ্বল স্বপ্ন।

এমনি সময়ে সেই আবহ সুরের রসভঙ্গ হ'লো। সেই রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্কস্ (Karl Max)—ইউরোপের রাজনৈতিক গগনের এক যুগান্তরকারী জ্যোতিষ্ক, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের ভাস্বর প্রতিভা! সেদিন খুব বেশী লোক এই রসভঙ্গকারীকে স্বাগত জানায়নি, নিতান্ত অপরিচিতের মতো ভাঙার-স্বপ্নে মাতাল এই যাযাবর যুবক লণ্ডনে তাঁর বাসস্থান নির্দেশ কোরে' নিয়ে, একটা অভিনব মতবাদ প্রচার কোরে' ক্রমবর্ধমান ধনতন্ত্রবাদের চলার পথে বেসুরা রাগিনীর গান গেয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন—তাঁরই মতো অনাহত সমাজ শৃঙ্খলার স্বপ্নে বিভোর আর এক যুবক; নাম তাঁর এঙ্গেল্‌স্ (Engles) তাঁদের প্রচারিত সেই অভিনব মতবাদই হ'লো—কম্যিউনিজম্।

তারপর তাঁরা Communist League এর জন্য একটা ইস্তাহার তৈরী করেন। এবং ১৮৪৭ সালে কমিউনিষ্ট লীগএর প্রচেষ্টায় তা' The Communist Manifesto রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। সেই সময় থেকেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সূচনা। তারপর সেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হ'লো—তাকে কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে আবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, এই উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণায় ১৮৬৪ সালে International Working-men's Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা কারও অজ্ঞাত নয় যে, এই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগ্রামশীল সৈনিক ধনতন্ত্র অধ্যুষিত দুনিয়ার সর্বহারা মজুরের দল। ধনতন্ত্রবাদের অবসান করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর কী কোরে প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল ধ্বংসের পর দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল গঠিত হ'লো এবং

তারও ধ্বংসের পর কী কোরে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হ'লো তার বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে কোরেছি।*

কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সূচনাতেই ইহা সমস্ত ধনতন্ত্রবাদী বিশ্বের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং ইহা স্থিরীকৃত হয় যে :—

Communism is already acknowledged by all European powers to be itself a power. It is high time that the Communists should openly, in the face of the world, publish their views, their aims, their tendencies, and meet this nursery tale of the sceptre of Communism with a Manifesto of the party itself. * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে মতবাদ মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছিলো, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তা কোন রূপে রূপান্তরিত হ'লো, তার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পর ইহার জীবনেতিহাসের উপর দিয়ে যে ক'টা বছর চ'লে গেলো— তার ইতিহাস সত্যিই গৌরবময়। এই ক' বছর অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে কণ্টকিত পথে চলতে হ'য়েছে। ধনতন্ত্রবাদের নিদারুণ আঘাত, ধনতান্ত্রিকতার পক্ষপুটে পরিপুষ্ট গণতন্ত্রের সাংঘাতিক আঘাতও তাকে বুকে পেতে নিতে হ'য়েছে। সমস্ত আঘাত, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিজের আভ্যন্তরিক জারকরসে জীর্ণ কোরে তা' এগিয়ে এসেছে সুমুখের দিকে ; মাঝ পথে তার চলার গতি বাধা প্রাপ্ত হ'লেও প্রতিহত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের যে বন্ধন আজ দুনিয়ার লাখো লাখো মানুষকে অক্টোপাশের মতো বেঁধে রেখেছে, তা' হ'তে তাদের মুক্ত করাই এই কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের সাধনা।

ধনতান্ত্রিকই হোক আর গণতান্ত্রিকই হোক, দুনিয়ার এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যেখানে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা হয়নি। সপ্তদশ কংগ্রেসের কার্যকালে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিলো ৮৬০,০০০। বর্ত্তমানে সেই সভ্য সংখ্যা ১২,০০,০০০তে উন্নীত হ'য়েছে। তা' ছাড়া Young Communist Internationalএর সভ্য সংখ্যা ১১০,০০০ হ'তে ৭৪৬,০০০তে বর্ধিত হ'য়েছে। মোটের উপর কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনাল বর্ত্তমানে ২০০,০০০ জন সভ্যের রসপুষ্ট কর্মপ্রবাহে সঞ্জীবিত এবং কমিউনিজম্‌এর প্রতিষ্ঠাই তাদের জীবন।

কিন্তু এই সংখ্যা দ্বারা কমিউনিষ্টদের সভ্য সংখ্যা নিরূপণ করা বাতুলতামাত্র। কারণ, সমগ্র দুনিয়ায় এমন হাজার হাজার মানুষ আছে—যারা এই কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার জন্য বাধা নিষেধের রূঢ়তাকে অবহেলা কোরে কাজ কোরে যাবেন। তা' ছাড়া এমনও হাজার হাজার মানুষ

* কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল,—জয়শ্রী পৌষ সংখ্যা। * * Communist Manifesto.

আছে—যারা প্রত্যক্ষভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপনের অংশ গ্রহণ না কোরলেও, পরোক্ষভাবে ইহার অগ্রগতির পথে সহায়তা কোরে আসছেন।

যে সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের ক্রমবিবর্ধমান অভ্যুন্নতির পথে শত্রু মিত্র নির্বিশেষে দুনিয়ার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছে—স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টি তার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। কমরেড ষ্টালিন বলেছেন—বলশেভিক অথবা কমিনিষ্টগণ এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত, যা—"Free from panic of everything akin to panic, when things begin to grow complicated and some dangers looms on the horizen." ষ্টালিনের সুন্দর উপদেশেই স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টি জগতের ইতিহাসে নূতন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হ'য়েছে। যদিও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি, তবুও স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টি সেখানকার অন্তর্যুদ্ধে ফ্যাসিজম্‌এর বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম কোরেছে, ইতিহাসই তার যথেষ্ট প্রমাণ। ১৯০১ সালে স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিলো মাত্র আট শত; কিন্তু ১৯৩৯ সালে তা' বর্ধিত হ'য়ে তিন লক্ষে দাঁড়িয়েছে। দুই লক্ষ বর্গ মাইল যার পরিধি এবং আড়াই কোটী লোকের বসতি যেখানে, সেখামকার কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা তিন লক্ষ। সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী হ'তে হ'য়েছে; বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক শত্রুদের সহস্র প্রকার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তাকে শক্তি সঞ্চয় কোরতে হ'য়েছে। সর্বহারা মজুরদলের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ বর্ত্তমানে এতো শক্তিশালী যে, ফ্যাসিজম্‌এর বর্বরতা কিছুতেই তাকে ধ্বংস কোরতে পারবে না। স্পেনের অধিকাংশ জনমত বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তাদের কার্য প্রণালীকে সমর্থন করে, Jose Diaz এবং শ্রমিক দুহিতা Dolores Ibaruri স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরব। শুধু তাই নহে, কমিউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনালও তাঁদের মতো কর্মীর কর্মপ্রবাহে রসপুষ্ট!

তারপরই আমাদের মনে পড়ে, চীনের কম্যিউনিষ্ট পার্টির গৌরবময় ইতিহাস। চীনের রাষ্ট্রিয় এবং জাতীয় জীবনে ইহার দান অতুলনীয়। বর্তমানে ইহার সভ্য সংখ্যা—একলক্ষ আট চল্লিশ হাজার। কেবল মাত্র শ্রমিক কর্মীদের দ্বারাই ইহা সংঘঠিত নহে; চীনের কৃষক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি এবং সহযোগীতাও এর মাঝে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বুদ্ধিজীবি এবং ছাত্র মহলেও ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। চীনের কম্যিউনিষ্ট পার্টি যে সামরিক শক্তিতেও শক্তিশালী, এ কথা কে না জানেন। বর্তমান চীন জাপান সংগ্রামে সেখানকার "লাল ফৌজ" (বর্তমান অষ্টম রুট আর্মি যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেছে, তার গৌরব কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবার নয়। কম্যিউনিষ্ট পার্টির গৌরব, লাল ফৌজের অধিনায়ক চু তে বর্তমানে চীনের সম্মিলিত বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ; তা' ছাড়া চীন কম্যিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মা সে তুং চীনের কম্যিউনিষ্ট পার্টির গৌরবের বস্তু। তাদের সমবেত শক্তির মাঝে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা এবং সামরিক শক্তি সুষ্ঠুরূপে রূপায়িত হ'য়েছে। বর্তমান চীন জাপান সংগ্রামে চীনের National

United Front প্রতিষ্ঠা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নবতম অবদান। গত ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে মা ও সে তুং-এর সভাপতিত্বে 'ইনান'-এ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির Enlarge Plenum অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনেই ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠনের প্রেরনা জাগে এবং কোমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতাই জাপ-বিরোধী National United Front গঠন কোরেছে। সেই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচারিত হয়েছে :—

"Both the international and internal situation of China clearly show that in the historical stage of China, no dictatorship of a single party is possible. Also the Socialist Soviet system can not arise at the stage but only the setting up of a democratic regime, a new republic based on the three principles of the people. The basis of this new Chinese Republic will commence after the defeat of the enemy".

সেই অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, প্রত্যেক কমিউনিষ্টই মনে প্রাণে সান-ইয়াট-সেনের Three Principles of People কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করবেন। চীনের কমিউনিষ্ট নেতাদের মাঝে মহিলা কর্মীর অভাব নেই—বর্তমান সমর পরিষদেও মহিলা সভ্য বর্তমান।

Anti-Fascist Popular Frontএর পরিচালিত সংগ্রামে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টিই অগ্রগামী। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার সভ্য সংখ্যা চল্লিশ হাজার হ'তে দু'লক্ষ সত্তর হাজারে উন্নীত হ'য়েছে। ফ্যাসিজম্ বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী প্রেরণাই ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির বৈশিষ্ট্য। স্পেনের গনতান্ত্রিক সংগ্রামে ইহা নানা দিক দিয়ে স্পেনকে সাহায্য কোরেছে। Reynaud Decreeর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের দু'কোটী শ্রমিকের প্রতিবাদ মূলক ধর্মঘট, দেলাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ফরাসী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন প্রচেষ্টা ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী মনোবৃত্তির সমবেত প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্টই ফ্যাসিজম্-এর সাংঘাতিক শত্রু। দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের শক্তি বিরোধী নীতির রূঢ়তাকে পদদলিত কোরে' ফ্রণ্ট যে বিবর্তনশীল কর্মশক্তির পরিচয় প্রদান কোরেছে, তার তুলনা নেই।

"The victory of the Popular Front in France has changed the balance of forces in favour of peace and democracy." *

দেলাদিয়ে গবর্ণমেণ্ট যখন প্রচার কোরলেন—"make the workers and the middle classes pay" তখন তার প্রতিবাদ কোরে' Popular Front প্রচার কোরলেন—"make the rich pay." মজুর দলই ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্ট-এর সুদৃঢ় স্তম্ভ। তাদের একতা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে,—সমবেত জনশক্তি যখন—"make the workers and the middle classes pay"-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো।

* Maurice Thorez

"A working class enriched by experiences which strengthen unity and capable of drawing lessons from the recent events, will known how to rally the middle classes and how to revitalise and broaden the Popular Front." *

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের কম্যিউনিষ্ট পার্টিও প্রচুর অভ্যুন্নতি সাধন কোরেছে। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হ'তে তাকে বিভক্ত কোরে' সর্বহারা শ্রেণী আন্দোলনের রূপান্তরে, ইহার সভ্য সংখ্যা বিশ হাজার হ'তে নব্বই হাজারে উন্নীত হ'য়েছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন-এর সভ্য সংখ্যা মোট চার কোটী। ট্রেড ইউনিয়ান-এর নীতিকে যাতে শ্রেণী সংগ্রামের নীতিতে রূপান্তরিত করা যায়, সে জন্য আমেরিকার কম্যিউনিষ্ট পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা কোরছে। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় আমেরিকার কম্যিউনিষ্ট পার্টির কার্যক্রম তেমন চমকপ্রদ এবং তত অগ্রগতিশীল নয়। এরও কারণ আছে: সেখানকার কম্যিউনিষ্ট পার্টি কৃষক সমাজের সাথে সম্বন্ধ বদ্ধ; কিন্তু আমেরিকার কৃষক আন্দোলন চলমান নয় সেজন্য কার্যক্ষেত্রে কম্যিউনিষ্টগণও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে' পারছেন না।

গ্রেট বৃটেনের কম্যিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা ছ'হাজার হতে আঠারো হাজারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে সত্যি; ট্রেড ইউনিয়ন এবং লেবার পার্টিতে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা কোরেছে, তাও সত্যি; কিন্তু তবুও সেখানকার পার্টি কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে অন্যান্য পার্টির চাইতে অনেকটা পশ্চাৎপদ। অথচ এই গ্রেট বৃটেনই Communist International-এর জন্মভূমি। ১৮৩৪ সালে এখানেই সব প্রথম "International Workingmens' Association"এর প্রতিষ্ঠা হয়।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কম্যিউনিষ্ট পার্টিগুলো কী ভাবে এবং কতদূর অভ্যুন্নতি লাভ কোরেছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা গেলো। এ সকল রাষ্ট্রের পার্টিগুলো ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের পার্টিগুলোর মতো নিজ নিজ অগ্রগতির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়নি। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের সক্রিয় প্রতিদ্বন্দীতার মধ্য দিয়ে সেখানকার পার্টিগুলো কী ভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

জার্মানী জাপান এবং ইতালীই ফ্যাসিষ্ট বাদের পূজারী। এদের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই কম্যিউনিজম্-এর মূলোৎপাটনে বদ্ধ পরিকর।

বলশোভিজম্ অথবা সোস্যালিজম্-এর সাংঘাতিক শত্রু জার্মানীর মত বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার রূঢ়তম আত্মপ্রকাশ জার্মানীর প্রতিটি কর্মের মাঝে। কেবল মাত্র কম্যিউনিজম্ সোস্যালিজম্ ভীতিই জার্মানীকে আতঙ্কগ্রস্ত করেনি, যে কেহ নাৎসীবাদ সমালোচনার চোখে দেখবেন, জার্মানীতে তাঁর স্থান নাই; আর স্থান থাকলেও মুক্ত আলো বাতাসে নয়—তাঁর স্থান কারাকক্ষের অন্ধকার 'সেল' এর মাঝে। সেই জন্য নাৎসী রূঢ়তার

* R. Michel in "The Popular Front in France"

আঘাতে আইনষ্টাইন, টমাসম্যান, আর্ণষ্ট টোলার, রাইনহার্ট, স্নাবেল এবং পরিশেষে ফ্রয়েড জার্মানী হ'তে বিতাড়িত। অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই এমন একজন মানুষ যাঁদের যে কোনো একজনকে বুকে গ্রহণ কোরতে পারলে, যে কোনো দেশ নিজেকে ধন্য, গৌরবান্বিত মনে করে। কিছুদিন আগেও তাঁদের দিয়েই ছিলো জার্মানীর পরিচয়—তাঁদের কর্মশক্তিতেই ছিলো জার্মানী সমৃদ্ধ তাঁদের সৃষ্টিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিলো জার্মানীর সমৃদ্ধি। কিন্তু সেই জার্মান হতেই আজ তাঁরা নির্বাসিত—বিতাড়িত; এর চাইতে বর্বরতা আর কী হ'তে পারে। কিন্তু তাঁদের কেহই কমিউনিষ্টও ছিলেন না—সোস্যালিষ্টও ছিলেন না: কোনো বিশিষ্ট মতবাদের পূজারী না হয়ে, বিশ্বের চিরন্তন সত্যানুসন্ধানেই ছিলেন, তাঁরা ধ্যানমগ্ন। কিন্তু যাঁরা ফ্যাসিজম ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদের পূজারী তাঁদের ত কথাই নেই—তাঁদের ভাগ্যে হয় গুলির আঘাত না হয় কারাবাস। সেই জন্যেই জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির নায়ক কমরেড থালম্যান (Comrade Thaelmann) ছ' বৎসর যাবৎ নাৎসী শাসনের বর্বরতার পায় মাথা নত কোরে কারাকক্ষের রুদ্ধ নির্জনতার মাঝে সহস্র প্রকার অপমান অত্যাচার সহ্য কোরে আসছেন। যদিও জার্মাণীতে কমিউনিজম্ ধ্বংসের নিত্যনূতন পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তবুও লোকচক্ষুর অন্তরালে তা' শক্তি সঞ্চয় কোরে আসছে। নাৎসীবাদের পাশবিক রূঢ়তা কমিউনিজম্‌কে জার্মানী হ'ত ধ্বংস করতে পারেনি—আর পারবেও না। জার্মাণীর বর্তমান সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী দুর্বল মুহূর্তে, সেই কম্যিউনিজম্ যদি আত্ম-প্রকাশ কোরে মাথা উঁচু কোরে' দাঁড়ায়, তবে জার্মানীর ইতিহাস কী ভাবে রূপান্তরিত হবে কে জানে! ফ্যাসিষ্টবাদ বনাম নাৎসীবাদ ব্যতীত জার্মাণীতে আর কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নেই—কেবলমাত্র কম্যিউনিজম্ ছাড়া। জার্মানীর কম্যিউনিষ্ট পার্টিই সেখানকার গণকল্যাণব্রতী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতে যদি সেখানে গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তবে তার উদ্বোধন হবে, এই কমিউনিষ্ট পার্টির পৌরহিত্যেই। কেবলমাত্র কর্মতৎপরতার অভাবেই সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টি আজ বিপর্যস্ত। একনিষ্ঠ কর্মীর অভাবও তার শক্তিহীনতার অন্যতম কারণ।

ইহার পরই আমাদের মনে পড়ে, জাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির সংগ্রামের কথা, বিরুদ্ধবাদী জাপ-সরকারের অনুসৃত নীতি ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল অভ্যুন্নতিই জাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেখানেও কমিউনিজম্-এর উচ্ছেদ কল্পে জাপ-গভর্ণমেণ্টের সক্রিয় দমন নীতির মাঝে অলসতা নেই। কিন্তু সমস্ত বাঁধানিষেধের মাঝে পার্টি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। গণমতের সাথে আজও তার যোগাযোগ বর্তমান। যুদ্ধ-কালীন জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের মিথ্যা গর্বই প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কষ্টি পাথর। এ সময়ই আদর্শের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান চীন-জাপান সংঘর্ষের জাপানের বামপন্থী ও সোস্যালিষ্টগণ জাতীয়তা-বাদের উগ্রতায় পথভ্রষ্ট—আদর্শচ্যুত। তারা জাপানের ধ্বংসলীলার বর্বরতাকেই শেষ পর্য্যন্ত সমর্থণ করেছেন; কিন্তু সুখের বিষয় জাপ-কমিউনিষ্ট পার্টি তার আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হয় নি।

জনসাধারণের উপর জাপ-কমিউনিষ্টদের প্রভাব দিনের পর দিন বর্ধিত হচ্ছে দেখে, জাপ-সরকার গণবিপ্লবের ভয়ে সন্ত্রস্ত। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যিউনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ অধিবেশনে কমরেড ম্যানুলিয়স্কি (D. Z. Manuilsky) বলেছেন :

"জাপানের কম্যিউনিষ্ট পার্টি সেখানকার সমরবাদীদের বিরুদ্ধে অবিছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। নিদারুণ নিষ্পেষণ সত্বেও জাপ-কম্যিউনিষ্ট পার্টি জনগণের মাঝে তার সম্বন্ধ বজায় রাখতে পেরেছে"

ইহা কম গৌরবের কথা নয়! প্রথম থেকেই জাপ-কম্যিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। প্রথম থেকেই ফ্যাসিজম্-এর পূজারী জাপ-গভর্ণমেণ্ট ইহার ধ্বংসের জন্য নিষ্পেষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। বর্ত্তমান জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ও জাপানের ফ্যাসিজম্-এর ধ্বংসসাধন কল্পে গণশক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য অতি সন্তর্পণে কাজ কোরে আসছেন। এ' ব্যাপারে পার্টির মুখপত্র "Against the Storm" (ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধই) তাদের সহায়তা কোরছে। "Against The Storm" এই তূর্যধ্বনি আজ জাপানের নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, নিনাদিত। কেবলমাত্র জাপানেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নহে। যুদ্ধের সূচনা হ'তে আরম্ভ কোরে জাপ-কম্যিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধ-রত জাপ-সৈনিকদের মাঝে যুদ্ধবিরোধী প্রচার-কার্য পরিচালনা কোরে আসছে। ইস্তাহারের পর ইস্তাহার তারা চীনে সংগ্রামলিপ্ত সৈনিকদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছে। কম্যিউনিষ্ট প্রচারকার্য রণক্লান্ত সৈন্যদের মাঝে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জাপানী সৈনিক জাপানের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করেছে এবং করছে। সৈনাধ্যক্ষ-দের মাঝেও ইহার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি তাদের অনেকে চীনাদের সাথে যোগ-দান করেছেন। তাদের মাঝে "নাকোজামা টেইকোকু"র নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে চীনের পক্ষে যোগদান করেছেন তখন তিনি বলেছিলেন—"চীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্বরোচিত অভিযানের কোনো দায়িত্বের ভার নিতে আমি অক্ষম।"

সে সময় তিনি যে বিবৃতি প্রচার কোরেছেন, তার বিস্তৃত আলোচনা করা অনাবশ্যক মনে করি। তাঁর এই সমস্ত বিবৃতি ছাপিয়ে জাপানী সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দে'য়া হ'য়েছে। শুধু তাই নয়। জাপ কম্যিউনিষ্ট পার্টির এই দুঃসাহসিক কার্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে ও গ্রামের ভিতর সীমাবদ্ধ তা' নয়,—"জাপানীগণ যুদ্ধ চায় না"—"সমরবাদ ধ্বংস হউক"—"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক" প্রভৃতি লেখা সমরবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান ঘাঁটি টোকিও সহরের অনেক ঘরের সম্মুখে মাঝে মাঝে দেখা যায়। জাপানী ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেণ্টের শত অত্যাচার, উৎপীড়নের ভিতরেও জাপ কম্যিউনিষ্ট পার্টি তার সুমহান আদর্শকে আঁকড়ে ধরে কাজ কোরে' চলেছে, একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়!

ইতালীর কম্যিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন কোনো তথ্যই জানা যায়নি : কম্যিউনিষ্ট আন্দোলনের দিক নিয়ে ইতালীই সর্বপশ্চাৎ—স্পেন আর চীন সর্বাগ্রগন্য।

এইতো গেলো কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের উপর প্রত্যহ আক্রমণের কথা। এর মাঝে কোনো লুকোচুরি নেই। কিন্তু আরও একদল বিরুদ্ধবাদী আছে, যারা ফ্যাসিজম্ এর গুপ্তচর এবং এজেন্টরূপে কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের মাঝে প্রচার কার্য চালিয়ে আসছে মনে প্রাণে যারা কম্যিউনিজম্ এর ধ্বংশ কামনা করে। তা' না কোরলেও, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিপত্তি লাভের দুরভিসন্ধিতে কম্যিউনিজম্ এর বিরোধিতা কোরে। নাৎসীবাদ অথবা ফ্যাসিষ্টবাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন কোরে। তাদের মাঝে ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কাইটগণই উল্লেখযোগ্য তাদের শত্রুতাই মারাত্মক। অথচ আমরা যদি রাশিয়ার অতীত ইতিহাস আলোচনা করি তা' হ'লে দেখতে পাই, এই ট্রটস্কীই ছিলো—বলশেভিক পার্টির মন্ত্র গুরু লেনিনের প্রিয় সহচর। তার পৌরহিত্যেই একদিন রাশিয়ার "লাল ফৌজ" এর (Red Army) সৃষ্টি হ'য়েছিলো। তার বাহুবল, অন্তরের দৃঢ়তা, এবং তেজস্বীতাই কম্যিউনিজম্‌কে বিদেশী শত্রুর সক্রিয় আক্রমণ হাত রক্ষা করেছিলো। কিন্তু সে দিনের সে ট্রটস্কী—আর বর্তমানের ট্রটস্কী এ' দু'য়ের মাঝে কতো প্রভেদ !

ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের গুপ্ত কার্যাবলী কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের যে অনিষ্ট সাধন কোরেছে, তা' বড়োই সাংঘাতিক। কেবলমাত্র বাইর থেকে' আক্রমণ এবং ষড়যন্ত্র পরিচালনা কোরেই তারা ক্ষান্ত হয়নি—কম্যিউনিষ্ট পার্টির মাঝে কম্যিউনিষ্ট রূপে প্রবেশ লাভ করে'—তার মাঝে বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার অবিরাম চেষ্টা করেছে। গত ক' এক বৎসরের মাঝে জাপানে ষাট হাজার কম্যিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। এর ফলে গত ১৯৩৪ সাল হ'তে জাপানের কম্যিউনিষ্ট পার্টির Central Committee পর পর চার বার গঠন করতে হ'য়েছে। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের গুপ্তচর বিভাগ আগাগোড়াই ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কীপন্থীদের সহায়তা লাভ করেছে। জার্মানী, জাপান, ইতালী, পোলাণ্ড, প্রভৃতি রাষ্ট্রে কারারুদ্ধ কম্যিউনিষ্টদিগকে পথভ্রষ্ট কোরবার জন্য ট্রটস্কীর কম্যিউনিষ্ট বিরোধী পুস্তক সমূহ তাদের মাঝে বিস্তারিতভাবে প্রচারিত করা হ'য়েছে। ফ্যাসিষ্ট গুপ্তচর বিভাগের প্ররোচনায় ট্রটস্কী পন্থীগণ Peoples Front এবং অন্যান্য প্রগতিশীল গণ আন্দোলনের মাঝে প্রবেশ কোরে তাদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। জাপানে ট্রটস্কী পন্থীরা "the brain trust of the secret service" রূপে প্রসিদ্ধ। জার্ম্মানী অথবা ইতালীর চাইতে সেখানেই তাদের হীন কার্যাবলী অধিকতর বিস্তৃত। জনসাধারণ ধ্বংস লীলার পরিবর্তে শান্তির জন্যই আজ আকুল। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই জাপানে সাংঘাতিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পণ্যের মূল্য বেড়ে চলেছে—উৎপাদন শক্তি কমে, যাচ্ছে; শোষণের নিত্য নূতন পথ জন সাধারণের মাঝে নিদারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। জন সাধারণের এই শান্তির আগ্রহ অবদমন এবং অসন্তোষ ধামাচাপা দে'য়ার জন্য জাপ সরকার সদাতৎপর। গেলো বছর Dangerous Thougts এর প্রবর্তক সন্দেহে ডজন খানেক প্রফেসার এবং ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতেই পুলিশ এবং গোয়েন্দাবাহিনী বিচারের

উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার অব্যবহিত ছু' চারটা ঘটনা হ'তে বুঝা গেলো—না, Dangerous Thoughts জাপান হ'তে উৎপাটিত হয়নি। জাপ সরকার যে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট এবং সোস্যালিষ্টদেরই সংশয় এবং সন্দেহের চোখে দেখে, তা' নয়; তারা ভ্রাম্যমান নাট্য সম্প্রদায়, যাযাবর দল, শিল্পী, ঔপন্যাসিক অথবা জন সাধারণের সাথে যাদের যোগাযোগ আছে, তা' যে কোনো কারণেই হোক না কেন, তাদের ভয় করেন তথাকথিত Dangerous Thoughts এর প্রবর্তক সন্দেহে। এ জন্য এদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পুলিশ বিভাগ এই সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের জন্য Pass-Port এর ব্যবস্থা করেছে। তবে সকলকেই যে এই পাশ-পোর্ট দেয়া হয়, তাহা নহে। পুলিশ যাদের কার্যাবলীকে নিরাপদ মনে করবে, তারাই এই পাশ-পোর্ট পাবে, সোজা কথায়—ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং গণমতের কণ্ঠরোধ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ' সম্পর্কে জাপানের বিখ্যাত অধ্যাপক Kawai-র দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের মনে পড়ে। ক'এক বছরপূর্বে উদার মনোভাব নিয়ে তিনি ক'এক খানা বই লিখেন, সেন্সর বিভাগ তাঁর সেই সমস্ত বই সামরিক নীতির বিরোধী বলে স্থির করল। ফলে তাঁকে ইউনিভার্সিটি হ'তে বিতাড়িত করে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর মতবাদকে তিনি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন এই তাঁর অপরাধ; যদিও-টোকিও ইউনিভার্সিটির কলেজ সমূহ—তাঁর বইগুলোতে যে কোনো Dangerous Thoughts-এর আমদানী নেই, এ' একবাক্যে সমর্থন করেন। আসলে কিন্তু Prof. Kawai একজন মার্কস্ বিরোধী। ছাত্র মহল যাতে কমিউনিজম্ হ'তে মুক্ত থাকতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই তিনি বইগুলো লিখেন। কিন্তু হ'লে কি হ'বে—'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। কি কোরে কমিউনিজম্ এবং মজুরদের শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়তে হ'বে, তা' শিক্ষা দে'য়ার জন্য জাপানে পুলিশ বিভাগ পরিচালিত কতোগুলো শিক্ষাকেন্দ্র আছে ট্রটস্কী পন্থীগণ সেখানে কাজ কোরে থাকে। চীন দেশে আবার তারা সামরিক বিভাগে গুপ্তচররূপে কাজ কোরে আসছে। প্রথমত ষড়যন্ত্রকারীরা অনায়াসে, নির্বিবাদে জনসাধারণ এবং কমিউনিষ্টদের মাঝে প্রবেশ করে; কমিউনিষ্টগণ তাদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিলোনা বলে—সহজে তারা তাদের কার্য পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু অচিরেই তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হ'তে থাকে; মস্কো-বিচার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইহাতেই তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে।

কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক কার্যই কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের ইতিহাস সীমাবদ্ধ নহে। প্রোপাগাণ্ডামূলক প্রচার কার্য ব্যতীতও নতুন নতুন কর্মপ্রণালী নির্ধারণে ইণ্টারন্যাশনাল মনোযোগী হ'য়েছে। কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের গঠনমূলক কার্যের নবতম অবদান—ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড্। (International Brigade) বায়ান্নটি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি হ'তে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগদানের জন্য সদস্য পাঠানো হ'য়েছে। তাদের মাঝে কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য এবং সুকর্মা কর্মীরও অভাব নেই।

"The formation of the International Brigade has been an indication of the maturity of the world communist movement, an expression of Bolshevik tempering, attained by sections of the Communist International. It was the testing of the communist cadres in the fire of battle. *

গত পাঁচ বছর কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের শক্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। বে-আইনী বলে ঘোষিত পার্টিসমূহও জনসাধারণের মাঝে প্রতিপত্তি এবং প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হ'য়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সমূহের মাঝে মিলনের আভাষ ফুটে উঠেছে। শ্রমজীবিদল আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনে মনোনিবেশ করেছে। দুনিয়ার মজুরদের মাঝে এই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তাদের সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিকে যে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলবে—ইহাতে আর সন্দেহ নেই। United International Working Class Front অদূর ভবিষ্যতে ফ্যাসিজম্-এর ধ্বংস সাধনে সমর্থ হবে এ' বিশ্বাস দৃঢ়তর রূপে শ্রমিকদের মাঝে বদ্ধমূল হয়েছে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে এই আত্মসচেতনাই তাদের বিজয় অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

"Working people want a united front of the working class of the capitalist countries with the soviet working class, with the armed soviet people, who have at their disposal, a powerful state,—material power of victorious socialism, This front will be the real guarantee of peace. World re-action will shatter itself against the impregnable rock of such a front," * *

কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দুনিয়ার বুর্জোয়াদের স্বপ্ন-সৌধের বনিয়াদও দিনের পর দিন শিথিল হ'য়ে উঠছে। দিনের পর দিন যতোই সর্বহারা মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—কমিউনিজম্ও ততো শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে। তারপর দুনিয়া হতে শ্রমিকদের লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার যেমন কোনো কারণই থাকতে পারেনা, তেমনি কমিউনিজম্-এর ধ্বংসেরও কোনো হেতু থাকতে পারেনা। কারণ, মজুর-সমস্যা এবং কমিউনিজম্ অথবা সোস্যালিজম্ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একের বৃদ্ধির সাথে, শক্তিশালী হওয়ার সাথে অন্যটিও বর্ধিত এবং শক্তিশালী হ'বে। ধনতন্ত্রবাদী বুর্জোয়ারা এই জন্যই আজ সন্ত্রস্ত, ভীত। কারণ, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন,—কমিউনিজম্ শুধু লেনিনের মানসলোকের স্বপ্ন নয়—মাটির পৃথিবীর রূঢ়তার মাঝে তা' রূপায়িত। বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের শোচনীয় পরিণতির আভাষ প্রত্যেক রাষ্ট্রে পরিস্ফুট হ'য়েছে। সেই জন্যই বুর্জোয়াদের চিন্তার শেষ নেই।

দুনিয়ার বিবর্তনশীল পরিস্থিতির মাঝে অদূর অথবা দূর ভবিষ্যতে ধনতন্ত্রবাদের পতন যে অবশ্যম্ভাবী ইহার অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস। কারণ ঃ

* Manuilsky. * * The New Age.

"No system does ; for the basic social and economic forces are not of such a nature as to allow permanance. Every socialist is Maxist enough to accept that, and to be well-assured that capitalism, like feudalism before it, is destined some decay and dissolution." **

প্রতিযোগিতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন সমাজ ব্যবস্থাই সোস্যালিষ্ট অথবা কমিউনিষ্টদের কর্মাদর্শ। দুনিয়ার ভ্রাতৃত্ববন্ধন নিবিড়তর হোক, সমষ্টিগত প্রাণরসের প্রাচুর্য বিশ্বের সংস্কৃতি অভ্যুন্নতি লাভ করুক, যুদ্ধ বিগ্রহের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক,—কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল তাই চায়। কিন্তু ক্যাপিটালিজম্ এই আদর্শের পথে অন্তরায় বলে' ইন্টারন্যাশনাল ইহার ধ্বংস কামনা কোরে। বার্ণার্ড শ' বলেছেন :—

"Capitalism makes all men enemies all the time without distinction of race, color or creed." *

বহু বৎসর যাবত ক্যাপিটালিজম্ বনাম সোস্যালিজম্ অথবা বুর্জোয়া বনাম প্রোলিটারিয়ানদের মাঝে সংগ্রাম চলে আসছে। অনেকদিন হ'লো শ' লিখেছেন :—

"Thus it is true that socialism will abolish private property and freedom of contact ; indeed it has done so already to a much greater extent than people realise for the political struggle between capitalism and socialism has been growing on for a centuary past, during which capitalism has been yielding bit by bit to the public indignation roused by its worst results and accepting installments of socialism to palliate them." *

শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের রূপ কি ভাবে রূপান্তরিত হ'বে—এর নির্দ্দেশ দেবে কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল। ইন্টারন্যাশনালের গত বিশ বছরের ইতিহাস বৈচিত্রময়। উত্থান-পতন, সফলতা নিষ্ফলতার মাঝে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হ'য়েছে সুমুখের দিকে।

** Socialism in Evolution—G. D. H. Cole.
* The Intelligent Woman's Guide—Shaw.

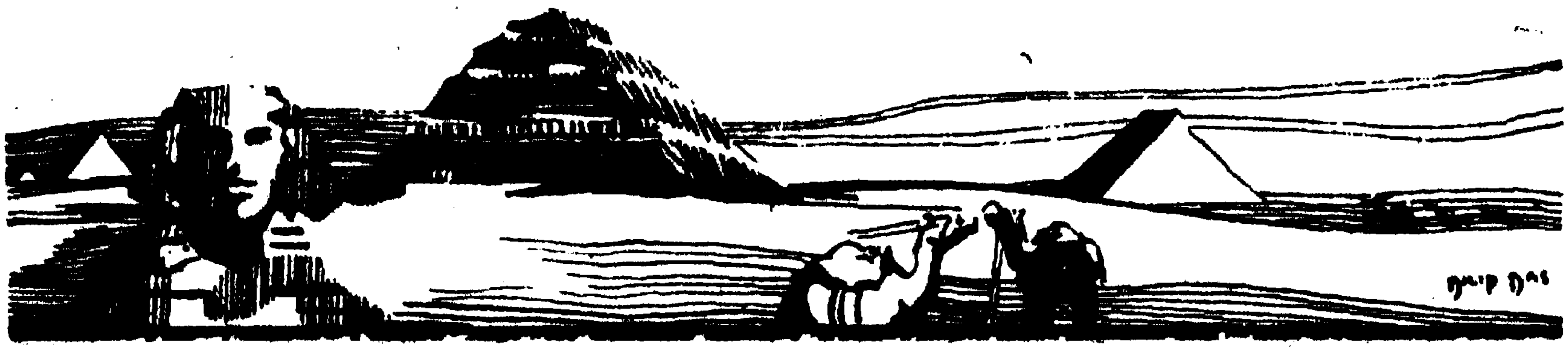

বয়ঃসন্ধি

আর্য্যকুমার সেন

নমিতা আমার সহিত আড়ি করিয়া দিয়াছে।

কারণটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বাড়ী ফিরিব বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিলাম, নমিতা বলিল, "যাবেন না, বৃষ্টি পড়ছে।" বসিলাম। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও যখন বৃষ্টি থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বাধ্য হইয়াই উঠিলাম। নমিতা বলিল, "উঠলেন যে? বৃষ্টি পড়ছে দেখতে পাচ্ছেন না?"

বলিলাম, "দেখতে খুব পাচ্ছি, কিন্তু এমন কিছু জোরে ত নয়! আর রাত সাড়ে তিনটের আগে বৃষ্টি থামার কোনো সম্ভাবনা নাই। অতএব যাচ্ছি।"

নমিতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "বেশ! তবে আড়ি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা।" নমিতাকে একটু ভালো করিয়া চিনিলে এ ভুলটা করিতাম না।

অবশ্য এ মুহূর্ত্তেই বাহির না হইলেও হয়ত চলিত। তবে এ কলিকাতা নয়, এখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যেই নগরবাসীদের সান্ধ্যজীবন শেষ হইয়া যায়, রাস্তায় পথচারী বিরল হইয়া আসে।

শুধু ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলোর সামনে দিয়া অবিরাম বারিধারা পড়িয়া চলে।

এককালে এখানে স্থায়ী বাসিন্দাই ছিলাম। বছর তের চৌদ্দ আগে এখানকার পাঠ উঠাইয়া দিয়াছি। দীর্ঘ দশ বৎসর এদিকের ছায়া মাড়াই নাই। বছর তিনেক আগে আসিয়াছিলাম দিন দশেকের জন্য! তাহার পরে আজ।

অবশ্য এবারকার অবকাশে নমিতাই যে একটি প্রধান বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা একবারও ভাবি নাই। সপ্তমী পূজার দিনে ভোরে পৌঁছিয়াছি। বেলা বাড়িলে নমিতাদের বাড়ী গেলাম। অবশ্য নমিতার অস্তিত্ব প্রায় মনে ছিল না বলিলেই চলে, আমি গিয়াছিলাম তাহার বাবা মার সহিত দেখা করিতে।

মাঝের এই কয়বৎসরের ব্যবধানে সবই যেন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহাদের নিতান্ত ছোট দেখিয়াছিলাম, তাহারা ইহারই মধ্যে অনেকখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে তিন বছর আগে বড়ই দেখিয়াছিলাম, শুধু তাহাকেই একটু ছোট মনে হইল, স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়াও স্বাস্থ্যহীন চেহারা, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। সে নমিতার দিদি।

সুমির বয়স বছর আট নয়। তাহাকেই প্রথমটা নমিতা ভাবিয়াছিলাম। পরে হিসাব করিয়া দেখিলাম নমিতার বয়স চৌদ্দর কাছাকাছি গিয়াছে।

আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে নমিতা প্রতিমা দেখিয়া ফিরিল। চিনিতে সময় লাগিল। বয়সের সঙ্গে চেহারাটা ফিরিয়াছে, শ্যাম বর্ণ খানিকটা উজ্জ্বল হইয়া গৌরের কোঠায় উঠিয়াছে। পরিধানে ফ্রকের বদলে শাড়ী। চোখে কাজল। মাথার দুই ধারে বেণী।

খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিলাম, "এই কি নমি নাকি?"

নমিতা প্রথম দর্শনেই আমাকে চিনিয়াছিল। সহসা একেবারে আমার সামনে আসিয়া বলিল, "সন্দেহ হচ্ছে নাকি? এই দেখুন!" বলিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিল।

অনামিকার আংটিতে ছোট্ট করিয়া লেখা আছে, "নমিতা।"

বলিলাম, "এর থেকে প্রমাণ হয় না যে তুমিই নমিতা। নমিতার আংটি চুরি করে তুমি হাতে পরনি, তার প্রমাণ কি?"

উত্তরে নমিতা শাড়ীর একটা দোলা দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

অবাক হইয়া বলিলাম, "তিন বছর আগের সেই নোংরা মেয়েটার কি পরিবর্ত্তন, বাপ্‌রে!"

উত্তর দিল নমিতার দিদি, বলিল, "অল্প বয়েসের সুবিধে হচ্ছে, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেহারার উন্নতি; বেশী বয়েসের অসুবিধে, বয়েস—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "বুঝেছি।"

নমিতার দিদির বয়স প্রথম যুগ পার হইয়াছে। চেহারার অবনতি ঘটিতেছে।

কিন্তু সেই যে নমিতা আড়ি দিল, সে আড়ির প্রাচীর ভাঙ্গা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

পরদিনই চেষ্টা করিয়াছিলাম। একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলাম, "শোন্, আড়ি দিলি কেন?"

সে এক ঝটকায় হাত সরাইয়া লইল। বলিল, "খবরদার, মনীশদা, আমার গায়ে হাত দেবেন না!" ভালো করিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই সে উপরে চলিয়া গেল। আরো যেন কি বলিয়াছিল, ভালো করিয়া কাণে যায় নাই।

উপস্থিত সকলে হাসিতেছে। থতমত খাইয়া বলিলাম, "এ আবার কি হ'ল?"

নমিতার দিদি শুধু একটু মুচকি হাসিল। চটিয়া বলিলাম, "ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছ যে?"

সে আবার তেমনি করিয়া হাসিয়া বলিল, "মজা মন্দ নয়! নমিতা যে ভালো ভালো কথাগুলো শুনিয়ে গেল, তাতে রাগ হ'ল না, আমার একটু হাসিতেই দোষ? বুঝতে পারছেন না? ওর অভিমান হয়েছে!"

অভিমান হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং তের চৌদ্দ বছরের মেয়ের অভিমান তেমন মারাত্মকও নয়। নমিতার বয়স আর বছর চার পাঁচ বেশী হইলে ভয়ের কারণ ছিল। তবু এমনিতেই যথেষ্ট সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম।

তাহার পর হইতে ক্রমাগত তাহার রাগ ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

আমাকে দেখলেই সে হয় উপরে চলিয়া যায়, না হয় রান্নাঘরে গিয়া ঢুকে। আমি একটু জোরে কথা বলিলে উপর হইতেই জানাইয়া দেয়, পড়ার ব্যাঘাত হইতেছে।

ফেরার আগের দিন শেষ চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, "বাপু কাল ত চলে যাচ্ছি, আজ অন্তত ভাব কর!"

অন্যদিনের মত সে চলিয়া গেল না, শুধু দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িল।

আমি মুখ চোখ যতদূর সম্ভব করুণ করিয়া বলিলাম, "তুই যা চাস্ করতে রাজি আছি। কি করলে ভাব করবি বল্। এই ঠাণ্ডায় সাঁতরে গঙ্গা পার হতে রাজি আছি—"

এইবার নমিতা হাসিয়া বলিল, "এখানে গঙ্গা কোথায়?"

"আচ্ছা, ওটা না হয় নাই হল। ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়ো ভেঙ্গে নিয়ে আসতে হবে? পাগলা হাতী আটকাতে হবে?"

এ সব কিছুই সম্ভবতঃ করার প্রয়োজন হইবে না। নমিতা ভাবিতেছে।

নমিতার দিদি একটু আপনমনে হাসিতে আর কথা কহিতে ভালোবাসে। বলিল, "আশ্চর্য্য, এইটুকু মেয়ের রাগ ভাঙ্গানোর জন্যে কি চেষ্টা! আর আমরা—"

অভদ্রভাবে দাঁত খিঁচাইয়া বলিলাম, "থাম তুমি। ওকে ভাবতে দাও।"

সুমি বলিল, "বল্না ছোড়দি, 'আমাদের সকলকে বায়েস্কোপ দেখাও।' তাহলে বেশ—।" এইবারে সুমি দাঁত খিঁচুনি খাইল।

কম্পিত বক্ষে আশা আশঙ্কার দোলায় দুলিতেছি। না জানি মেয়েটা আবার কি চাহিয়া বসে। নন্দন কাননের পারিজাত, বেহেস্তের—

কিন্তু মেয়েটা এসব কিছুই চাহিল না। বলিল, "গোপাল পাঁড়ের দোকানে এমন চমৎকার পান্তুয়া ভাজে, তাই যদি একসের এনে দিতে পারেন, তবে বিবেচনা করব।"

বুকটা ধ্বসিয়া গেল। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এর চেয়ে যে নন্দনকাননের পারিজাত চাহিলে ভালো ছিল! আনিয়া দিতে পারিতাম না বটে, কিন্তু মেয়েটার উপর শ্রদ্ধা জন্মিত।

একসের পান্তুয়া আনিয়াই হাজির করিলাম। টাট্কা পান্তুয়া, নিজেরই জিভ জলে ভরিয়া উঠিল।

নমিতার চোখ উজ্জ্বল দেখাইল। বিনাবাক্যব্যয়ে গোটাদশেক পান্তুয়া শেষ করিয়া এক গেলাস জল খাইয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। একটা ঢেঁকুরও বুঝি তুলিয়াছিল, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, শুনিতে পাই নাই।

খাওয়া শেষ করিয়া নমিতা চলিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "ভাবের কি হ'ল ?"

সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ভাব ? একসের পান্তুয়া দিয়ে ভাব কেনা যায় ?"

নিস্পন্দ হইয়া রহিলাম। নমিতার মনে বোধহয় একটু দয়া হইল, কহিল, "এজন্মটা আড়িই থাক, আস্‌ছে জন্মে চেষ্টা করে দেখা যাবে ভাব হয় কিনা।"

উপরে একটা ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজিল। চুপ করিয়া বসিয়া আছি।

নমিতার দিদি মুচকি হাসিতেছে।

সুমিতা একটার পর একটা পান্তুয়া গিলিয়া চলিয়াছে।

রান্না ঘরের নিকট হইতে নমিতার গলার স্বর কাণে আসিল, "মা, ক্ষিদে লেগেছে যে, রান্না হয়নি এখনও ?"

সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

(এমিল্ বার্ণস্ অবলম্বনে)

চিন্মোহন সেহানবীশ

মানস স্বর্গ সৃষ্টি মানুষের একটা অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তির প্রকৃষ্ট স্থান যে কল্পলোক এ কথা মনস্তাত্ত্বিকেরাও বলেন। স্বপ্নবিলাসীর যদি আবার লেখনী সঞ্চালনের অভ্যাস থাকে তবে ছাপাখানার কল্যাণে আমরা নানারকমের স্বর্গের অথবা ভবিষ্য জগতের হদিস পাই। প্লেটো, টমাস্ মোর থেকে আরম্ভ করে হাক্সলি, ওয়েল্‌স্ পর্য্যন্ত সকলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোন ও রুচি অনুযায়ী আপন আপন স্বর্গ বানিয়েছেন।

ভবিষ্য সমাজ সম্বন্ধে এঁদের কল্পনার দৌড় দেখে অবাক হতে হয়। সমাজের যা কিছু গলদ আছে সেগুলোকে তাঁরা বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের কল্পলোক বানিয়েছেন। আমাদের ধরাছোঁওয়ার সমাজ ও তাঁদের সেই মানস স্বর্গের মধ্যে কোন বাঁধা সড়ক নেই যে পথে পা বাড়ালে সেই স্বর্গে নিশ্চিত পৌছন যেতে পারে। বর্ত্তমান সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির গতিপথ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে তাঁদের চিন্তা অবাস্তব, উদ্ভট কল্পনায় পরিণত হয়েছে।

প্রাক-মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যেও এ ধরণের স্বপ্নবিলাসের অভাব ছিল না। সাঁসিমো, ফুরিয়ে, আওয়েনের কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠী গঠনের প্রয়াসের মধ্যেও সমাজ বিকাশের মূলসূত্রগুলিকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

মার্ক্সের সময় থেকে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সুরু হল তার সঙ্গে পূর্ববর্তনদের চিন্তার প্রধান পার্থক্য এইখানেই। মার্ক্স বলেন—কল্পনা ভাল, কিন্তু সব কল্পনার মধ্যে বাস্তবে পরিণতির সম্ভাব্যতা নেই—আছে শুধু তারই মধ্যে যে কল্পনা সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সজাগ রাখতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্নবিলাসের পরিবর্ত্তে প্রয়োজন বিজ্ঞানের।

মূলধনী সমাজ ধ্বসে গেলে অমনই এক নিমেষে সমস্ত অতীতকে ধুয়ে মুছে দিয়ে একদম নতুন বনিয়াদের উপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাও কিন্তু ঐ স্বপ্নবিলাসেরই সামিল। আগে যা ছিল তার স্পর্শমাত্র না রাখার ইচ্ছা অবাস্তব চিন্তামাত্র। বরঞ্চ এ কথা বলা যেতে পারে যে বিধ্বস্ত মূলধনী সমাজের পরে যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে তখন জন্মকালীন পরিবেষ্টনী অনেকখানি ছাপ রাখবে নবাগতের পরে। সমাজতন্ত্রেরও একটা ক্রমবিকাশ আছে। এই ক্রম-বিকাশের প্রথম পর্য্যায়ে মূলধনী সমাজের কিছু কিছু স্মারকচিহ্ন দেখলে ঘাবড়ালে চলবে না—সেটাই স্বাভাবিক।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য কতগুলি শক্তির জন্ম ও বিকাশ হয় মূলধনী সমাজের বুকে। এরই আওতায় উৎপাদন ব্যক্তিগত ভিত্তি থেকে ক্রমশঃই একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণত হয়—অর্থাৎ যে কোনো একটি সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য ক্রমেই বেশী লোকের—এমন কি শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সমাজের প্রত্যেকটী লোকের প্রয়োজন হয়—কারখানা বা উৎপাদন কেন্দ্রগুলির আকারও স্ফীত হয়ে ওঠে। যন্ত্রের প্রাচুর্য্য ও মধ্যযুগসুলভ নিশ্চেষ্ট আত্মকেন্দ্রতার অবসান সমাজতন্ত্রের পক্ষে এই দুই অত্যাবশ্যক আনুসাঙ্গিকেও মূলধনী সমাজের বিকাশের সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এ সব সত্বেও মূলধনী সমাজে সমগ্রের উৎপন্ন সামগ্রী ব্যক্তিগত ভোগের উপাদান হয়ে ওঠে মূলধনী শ্রেণীর উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার জোরে। কাজেই সমাজতন্ত্রের প্রথম কাজ হবে সমাজ যা উৎপাদন করছে সমাজকে তা' প্রত্যার্পণ করা অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের বা কারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তিসাধন।

কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্ত্তে সামাজিক মালিকানার প্রবর্ত্তন যেমন খুসী করলে চলবে না। যে সব বড় বড় মূলধনী প্রতিষ্ঠানে মালিক ও পরিচালকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে—যেখানে মালিক মুনাফা ছাড়া আর অন্য কোনও দিক দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়—সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই সমাজতান্ত্রিক পরিচালনার সবচেয়ে উপযোগী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাই প্রথমেই এগুলির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাবে।

কিন্তু যে সব ছোট, ছোট প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মালিকের কাজ এখনও ফুরোয়নি—সেই সব অসংখ্য, বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানের কি ব্যবস্থা হবে? শ্রমিকরাষ্ট্র গোড়া থেকেই এগুলির সংযুক্ত ভাবে পরিচালনা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তার কাজ হবে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে এদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমবায় নীতির প্রচার। কিন্তু প্রচার শুধু খবরের কাগজে, বর্ক্তৃতা মঞ্চ, বেতার বা সিনেমা মারফৎ করলে চলবে না। প্রচার করতে হবে হাতে কলমে ঐকত্রিক প্রচেষ্টার সুফল দেখিয়ে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী আদর্শ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সমাজ বিপ্লবের ঠিক পরেই ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে ও বড় বড় কারখানাগুলির পরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু শ্রমিকেরা সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য হস্তগত করছে না। বিপ্লবের ফলে তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না—বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য্য রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দিচ্ছে। সমস্ত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠতে আরও সময়ের প্রয়োজন।

কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের পরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ত' হল—তার পরে কি হবে? মূলধনী সমাজে মুনাফার লোভেই উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। ব্যক্তিগত মুনাফা যদি লুপ্ত হয় তবে উৎপাদম হবে কি উপায়ে? এইখানেই সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় কথা উৎপাদন-পরিকল্পনা বা প্ল্যানিংএর প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

উৎপাদন পরিকল্পনার দু'টী দিক আছে। প্রথম নুতন উৎপাদন যন্ত্র নির্ম্মান—দ্বিতীয়, সরাসরি ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন। অবশ্য দ্বিতীয়ের জন্য প্রথমের প্রয়োজন আছে। কাজেই এই দুই মূল বিভাগের পরস্পর সম্বন্ধ ও বিভিন্ন শিল্পের পরমুখাপেক্ষিতার ফলে পরিকল্পনার কাজ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রথম কয়েক বৎসরের অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে ক্রমশঃই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে।

মূলধনী সমাজের "পরিকল্পনার" উদ্দেশ্য মোট উৎপাদন হ্রাস করা। সমাজতন্ত্রের আমলে কিন্তু পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবে অতিক্রত উৎপাদন বৃদ্ধি। কারণ এই বৃদ্ধির পরেই সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাম্যবাদী (communist) সমাজে পরিণতি নির্ভর করছে। কারণ সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের বণ্টননীতি "কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক", উৎপাদনের অপ্রাচুর্য্য নির্দ্দেশক। পরিকল্পনা দ্বারা উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে আমরা এই স্বল্পতার অর্থনীতি থেকে সাম্যবাদী সমাজের প্রাচুর্য্যের অর্থনীতি দিকে অগ্রসর হ'বো। সেই সমাজের বণ্টননীতি হচ্ছে—"প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক"

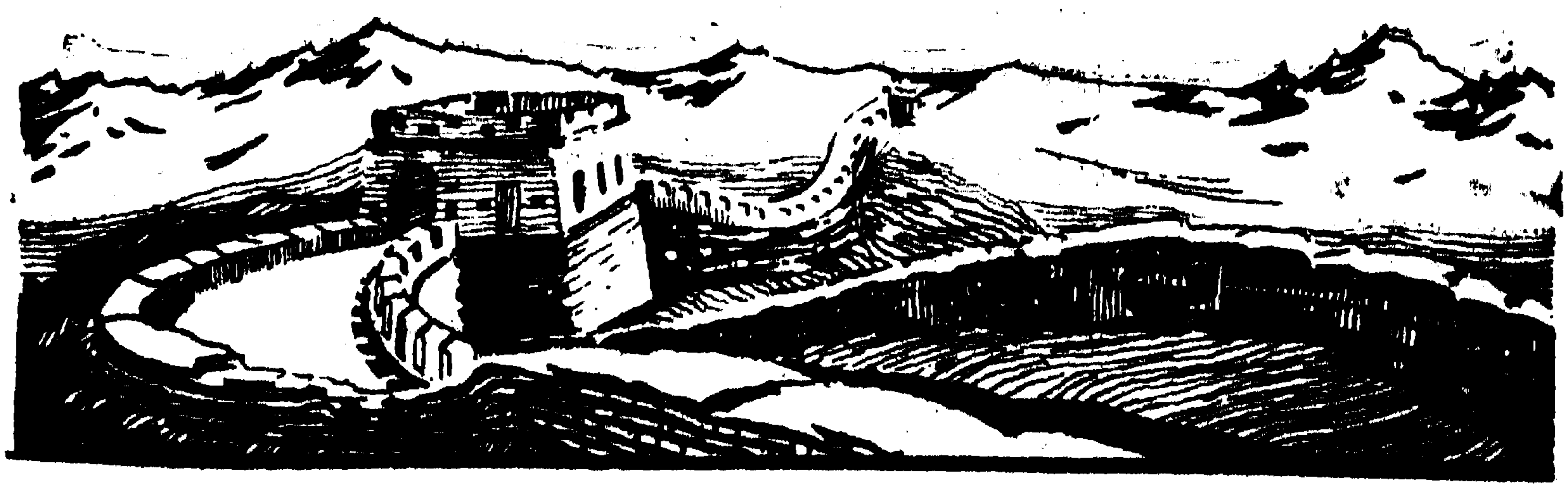

অজ্ঞাতবাস

মৃণালকান্তি দাশ

উন্মুখ প্রতীক্ষা কতো,
এ কী দ্বন্দ্ব আলো ও ছায়ার।
(কোন অন্ধ নির্বাসনে)
অন্ধকারে ভ্রূণ হয়ে ভবিষ্যৎ কাঁদে,
এ কী দহন দুঃস্বপ্ন দুরাশার।

এ জীবন ক্লান্ত হয়ে এলো
এলো শ্রান্ত হয়ে :
লোভ-হিংসা কান্না-হাসি অনেক সংঘাত।
দিনের পর দিন
তিক্ত দিন আসে রিক্ত রাত
অনেক সংঘাত।
বিবর্ণ ধূসর দিন আসে ঘুরে ঘুরে।
(মরীচিকা মায়ামৃগ ঘুরে দূরে দূরে)
এখানে আকাশে ফুল
ফোটে না তারার।

এখানে ফোটে না ফুল, সোনার মতন চাঁদ
এইখানে শুধু অন্ধকার।
এইখানে ভ্রষ্টলগ্ন কাহাদের
নিঃশব্দ বিহার :
চোরের মতন কারা চুপি চুপি আসে আর যায়—
এরা ভয় পায় ?
এই আশা, এই স্বপ্ন—ভয়ে ভয়ে এরা কথা কয়।
ভিক্ষুকের মত তারা প্রতারিত আসে আর যায়
(শেষহীন আনাগোণা)
ঝিলিমিলি আলো ছায়া
এলোমেলো ভূত হয়ে সহসা মিলায়।

অন্ধকারে পলাতক পদধ্বনি শুনি।
নিরুদ্দেশ কারা ডাকে,
নিরুপায় কারা চলে যায়—
মেরু নিশীথের স্তব্ধ পারাবারে জীবন যৌবন সবি
ইসারায় ডেকে নিয়ে যায়।
অন্তহীন আবর্তন তার ঃ
এর পর আরবার দিবারাত্রি কতবার
এলো ফিরে ফিরে—
শিশু সূর্য্য, বহু সন্ধ্যা, ছায়াবিথী, নীল অন্ধকার—
এর পর বহু স্বপ্ন পিছু পিছু যায় চলে
যতদূর আছে চলিবার।

দিকে দিকে শুনি
বিদীর্ণ আকাশে শুনি হাহাকার ধ্বনি।

এই দিন নামহীন, ইতিহাস হারা,
গেলো যারা—কোনখানে হয়ে গেলো হারা।
একা একা নষ্ট নীড় নির্জন ছায়ায়
চোরের মতন যারা
আর যারা—আসে আর যায়—
কোন দূর সীমাহীন সাগরের গানে
এ মাটীর ঘরে সবে ঘুমায় তাহারা।
মেঘের ঘুমন্ত দেশে—ভেসে যায় তাদের স্বপন।
রিক্তক্ষণ আসে যায় মুছে যায় প্রেতের মতন।

একে একে হয়ে,
দিবারাত্রি স্বর্গ হতে নিতেছে বিদায়।

প্রেম

কানাই সামন্ত

সুরদাস বলেন, জীবনের সারসত্য ভালোবাসা। সকল মানবের জ্ঞান নাই; সকল মানবের শক্তি নাই। সকল মানবের পুণ্য নাই; তবে ভালোবাসাই পুণ্য হয় যদি, সেই পুণ্যবলে স্বর্গে আপামর সকলেরই দাবী আছে। পৃথিবীতে বুদ্ধিহীন লোকের অভাব নাই; কিন্তু প্রাণহীন জীব, হৃদয়হীন মানুষ অসম্ভব। অতি বড় পাষণ্ড—চুরি-ডাকাতি খুন-জখম অবাধে সবই যে করিয়া থাকে, তাহাকে নরাকারে রাক্ষস বলিতে পার; কিন্তু সেই দুর্জয় রাক্ষসের কোমল প্রাণটী কোন্ বিহংগরূপে কোথায় লুকানো আছে জানিতে যদি, তবে ইহাও জানিতে সে প্রাণ কত অসহায়, বেদনাকাতর, স্নেহের কাঙাল; তাহার অতি ক্ষুদ্র বুকের কাঁপনে কী অপূর্ব সঙ্গীতের কী করুণ তাল বাজিতেছে। রূপকথা মিথ্যা নয়। ফলতঃ মানবীয় অথবা দানবীয় বলেই হউক যে পৃথিবী জয় করিয়াছে, তাহাকেও প্রেম সহাস্য কটাক্ষমাত্রে নিমেষে জয় করিয়া থাকে। তাই সে হয়তো কোন নরের, হয়তো কোন নারীর, হয়তো কোন শিশুর, হয়তো বা কোন পালিত শুকের স্নেহে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবে। জ্ঞান নাই যে অন্তরতম আলোকে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে। বিবেক নাই যে তুষ হইতে তণ্ডুলকণা খুঁটিয়া লওয়ার মত চিরধৈর্যসহকারে অসৎ হইতে সৎ বাছিয়া লইব। শক্তি নাই যে মরিব তবুও সত্যসংকল্প ত্যাগ করিব না, এবং অন্ততঃ মৃত্যুতেও জয়ী হইব। কিন্তু মানুষের প্রাণ যত মহৎ যতই হীন হউক না কেন, তাহাতে প্রেম আছে, প্রেমের চিরকাঙাল ক্ষুধা আছে: তাই অন্ধও সহসা সাত-রাজার-ধন মাণিকটি খুঁজিয়া পায়, নির্জীবও জীবনজীবনান্তরের যাত্রাপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, এবং ভীরুও একদিন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে। সংসারে এমন আশ্চর্য ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে।*

ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল মানুষ কী চায়, ইহার শেষ জবাব: আনন্দ। কিন্তু বাক্যমনের অগোচর আনন্দ হয়তো ভগবান জানেন, তিনি আনন্দস্বরূপ: সেই আনন্দেরই মানুষের ও দেবতার সত্তায় যে সচেতন ও সলীল বিথার তাহাই প্রেম।

প্রেমের বহু স্তর আছে। একান্ত পাশবিক কামনা হইতে আত্মার আত্মীয়তা পর্যন্ত কত যে সোপান তাহার সংখ্যা নাই। এই অশেষ প্রেমের যে-কোনো পৈঠা হইতে যেমন সহজে রসাতলে অবতরণ করা যায়, তেমনি অবলীলায় দিব্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। অথবা, শাশ্বত

---

* বিচার বিতর্কে মানুষ যেটুকু জানে, তাহাতে তাহার অপরিসীম না-জানার দুঃখ বাড়িতে থাকে। বহু চেষ্টায় মানুষ যেটুকু করিতে পারে, তাহাতে তাহার অপরিসীম অক্ষমতার বোধ প্রসারিত হয়। কিন্তু মানুষ যেটুকু ভালোবাসে, তাহাতেই সে নিশ্চিতভাবে অনুভব করে, আমি আরো অপরিসীম ভালোবাসিতে পারি। সেজন্যও বলা চলে, সকল মানবের জ্ঞান নাই, সকল মানবের শক্তি নাই, মানুষ নির্বিশেষে প্রেমধনে ধনী।

দেবতার আকাশে যে মন্দির আছে, তাহারই অশেষ সোপানপরম্পরা না ভাবিয়া প্রেমকে আনন্দের আন্দোলিত পারাবাররূপে কল্পনা করিতে পারি। তাহার ঢেউএর পর ঢেউ আলোকে বর্ণের পর বর্ণের চমক দিতে দিতে অবিরাম ঊর্ধ্ব হইতে আরো-ঊর্ধ্বের পানে জাগিয়া ভাসমান নির্মাল্যের ফুল মানবের অসহায় প্রাণ উৎসৃজন করে; অবশেষে অসীমের দুয়ারী ধ্রুবতারা সেইটিতে নত হইয়া ভাইএর স্নেহচুম্বন আঁকিয়া দেয়। প্রেমে আকাশের তারা ও পদধূলির ফুল ভাইভগিনীর মতো এ কথা মিথ্যা নয়। সাগরে একটি ঢেউ হতে আরেকটি ঢেউএর এতটুকু বিচ্ছেদ নাই, ঢেউটি এখানে মিলাইয়া গেল সেখানে জাগিবে বলিয়া, একই ঢেউ সাগরের অকূল হইতে আসিয়া কূলে আছাড় খাইতেছে এবং কূল হইতে ফিরিয়া অকূলে ধাইতেছে, এ যেমন, তেমনি কামনা, তেমনি প্রেম।

তাই প্রেমের সাধনা সকল মানুষের সাধনা। অন্য সব সাধনায় যাহা মিলে, এক প্রেমেও তাহাই মিলে।

প্রতিদিন কত বিবাহের উৎসবযাত্রা কত বরবধূকে কত পথের পারে গৃহে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। তখন যুগল নরনারী পরস্পরের নিকট কী চায় কেহ কি জানে? প্রতিদিনের কর্তব্য কাজ আছে, আর চিরদিনের মিলনাবেগ। সেই আবেগে নর নারীকে চুম্বন করে, আলিংগন করে, বর্ষণমুখর সারা শ্রাবণরাত্রি বুক হইতে নামাইয়া শয্যায় রাখিতে পারে না। সেই আবেগেই তাহারা পরস্পরকে নির্যাতন করে, এমন কি সর্বনাশকে ডাকিয়া আনিতেও দ্বিধা করে না। অথচ সর্বনাশের মুখেও কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতে চায় না; সর্বসমর্পণের দুর্লভ লগ্নেও প্রিয়-জনের বুক চিরিয়া বুকে প্রবেশ করা যায় কৈ?—একের তনুমন অপরের তনুমন হয় না। শুধু বিধাতা মুখ ফিরাইয়া গোপনে হাসেন এবং তেমনি গোপনে দুই দেহ দুই মন দুই হৃদয় মিলাইয়া মিশাইয়া একটি দেহ একটি মন একটি হৃদয় গড়িয়া একটি মুকুলমানব উভয়ের উৎসংগে দান করেন। তখন আর কল্পনায় নয়, স্বপ্নে নয়, বুকে কোলে যুগল নিজেদেরই নিজেরা নূতন করিয়া পায়;—তবুও নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারে কি? শিশুর চকিত চক্ষুতারায় তারায় বিধাতা আবার হাসেন।

দুইটি ঢেউ মিলিয়া একটি ঢেউ জাগে: সে ঢেউ চলিয়া যায়। দুই জীবন মিলিয়া একটি জীবন হয়: পরে আর চেনা যায় না। তাই পথ হইতে গৃহে, গৃহ হইতে পথে অশেষ পরিক্রমণ। এইভাবে গৃহে পথে অনেক সুখদুঃখ মেলিয়া, অনেক চেতনা দিয়া, অনেক ভুলাইয়া, অবশেষে প্রেম একদিন বলিয়া দিবে: সাগরে সকল ঢেউএ একটি ঢেউএর খেলা, সংসারে সকল জীবনে একটি জীবনের মেলা; আর, এই আপনাতে নিখিলকে ও নিখিলে আপনাকে পাওয়ার বেশি চেতনা নাই, সুখ নাই, সত্য নাই।

দ্বন্দ্ব

(নাটক)

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

প্রভাত দেব সরকার

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য : সুচারুর শয়নকক্ষ।

[এ দৃশ্যটা অভিনয়ের পূর্ব্বের বিরামটিকে বেশ খানিকটা বিলম্বিত করে' নিতে হ'বে। এবং সেই সঙ্গে এটাও ভেবে নিতে হ'বে যে, ইতিমধ্যে অবিনাশবাবু তারিনী সামন্তর মামলা নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার আর কলিকাতায় ছুটোছুটি ক'রচেন॥ "সংসারের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকলেও তার ঘটনাবলীর ওপর তাঁর হাত কান কোন কিছু নেই, এমন কি চোখদুটোও তাঁর সজাগ নয়। হৃত সম্মান এবং মর্য্যাদাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা ক'রতে আমরা মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখি, অবিনাশবাবুর কার্য্যকলাপ এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে আমাদেরও সে-বস্তুর কল্পনা ক'রে নিতে হ'বে। প্রতিষ্ঠাকে গোড়ে তোলার চেষ্টা এক, আর একদালব্ধ সেই প্রতিষ্ঠাকে খোয়ান'র ভয়ে চির-কালীন করার চেষ্টা আর এক। এ দুয়ের ব্যাকুলতা যদি আমরা বুঝে থাকি, তা হ'লে অবিনাশবাবুকে ভুল বুঝব না।

সুতরাং এ দৃশ্যটা পূর্ব্ব দৃশ্যের একদিন পরেও ঘটতে পারে, পাঁচদিন পরেও ঘটতে পারে আবার পনের দিন পরেও ঘটা বিচিত্র নয়। তাতে অবিনাশবাবুর কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

বেলা আন্দাজ চারটে। ঘরটা যতদূর সম্ভব বাহুল্য বর্জ্জিত। মাঝে একটা আবলুষ কাঠের সিঙ্গেল-বেড় খাট। ঘরে ঢুকলেই প্রথম নজরে রবিঠাকুরের ফটোগ্রাফ চোখে পড়ে। দক্ষিণ এবং উত্তর দেওয়ালে র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তি আর অখ্যাত কোন চিত্রকরের অখ্যাত কয়েকটি মনোজ্ঞ ল্যাণ্ডস্কেপ। দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ করা একটা ছোট টেবিল খান দুই চেয়ার সমেত। উত্তর দিকে একটা কৌচ জাপানী ফুলপাতা-কাটা আচ্ছাদনে আবৃত। পূব দিক দিয়ে ঘরে ঢোকবার একমাত্র দরজা। পশ্চিমের পর্দ্দা-ওয়ালা জানালা দিয়ে তখন দিনের শেষ রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'চ্চে অত্যন্ত সন্তর্পণে। আমরা চেষ্টা করলে দূর-থেক-ভেসে-আসা রবিঠাকুরের 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়' গানটা শুনতে পাই।

সুচারু কৌচে বসে আছে। তার কোলের ওপর একখানা খোলা চিঠি। তাকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে। শূন্যদৃষ্টিটা তার সামনের খোলা জানালা দিয়ে দিগন্তে প্রসারিত। অত্যন্ত ভাবনার জন্যেই হোক বা নিজেকে অসহায় মনে ক'রেই হোক, তার বক্ষস্পন্দনটা এলিয়ে পড়া সাড়ির মধ্য দিয়ে বেশ অনুভূত হয়। গণ্ডবাহী অশ্রুবিন্দু শরতের প্রথম প্রভাতের শিউলি বনে শিশির বিন্দুর আভাষ দেয়। সদ্য বৃন্তচ্যুত চাঁপার সঙ্গে সুচারুর তুলনা চলে। চিঠিটা কোলের ওপর পড়ে থাকলেও দৃষ্টিটা বার বার তাতেই ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর মেনকা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকবে। প্রথম দর্শনে বোনের বিষাদঘন মুখটা দেখে থমকে দাঁড়াবে। কিন্তু চিঠিটায় চোখ পড়ে সে ভাব কেটে যাবে, পরন্তু চাপা হাসির হিল্লোলে তার সারা অঙ্গ ঢাকনা-চাপা ফুটন্ত কেট্‌লীর মত স্পন্দিত হবে। কাছে সরে এসে ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিটা তুলে নিয়ে বার কয়েক পড়ে' সুচারুর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে অনুপস্থিত সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ বর্ষিত করবে।]

মেনকা

জানি, পুরুষ জাতগুলেই ঐ রকম! গোড়াতেই খুব—কাজের বেলায় সরে পড়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞান এমনি ওদের টনটনে! যত সব সুবিধেবাদীর দল!

(সুচারু চোখ তুলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে বোনের মুখের দিকে চাইলে)

(থেমে) ঘুরিয়ে কথা ওঁরা খুব বলতে পারেন।...এখন তো অনেক নজির দেখান হচ্ছে: গুরুজনদের অমতে যাই কী করে? তুমি আমায় মাপ কর ইত্যাদি। (থেমে) উঃ, কী ভীষণ এরা, অথচ মুখে মেয়েদের এক ঝুড়ি নিন্দে না ক'রলে ভাত হজম হয় না! (সুচারু চঞ্চল হ'য়ে উঠচে). .(থেমে) এদিকে আবার স্তোকবাক্যের অন্ত নেই: তোমার যে মূর্ত্তি আমি অন্তরে রেখেচি...জাত-মিথ্যেবাদীর দল! মেয়েদের ভুলিয়ে বেড়ানই হ'লো ওদের পেশা—বড় বড় বুক্‌নি শিখে রেখেচেন বই তো নয়!! (থেমে) উঃ, কী সাংঘাতিক লোক এই পুরুষগুলো!

সুচারু (বিহ্বল হয়ে)

কিন্তু-উ সত্যিই উনি আর কী করবেন? বাবা যে—

মেনকা

তুই থাম, ওদের হ'য়ে আর ওকালতি করতে হ'বেনা। এখনো তোর শিক্ষা হ'লো না? (থেমে) বাজে কথা! বাবার অমত বলে' উনি বিয়ে করবেন না, না, এখন আর কোথায় কতক-গুলো বেশী টাকা পাচ্ছেন তাই তোকে আর মনে ধরচে না! সেই কথাটাই সোজাসুজি বললেই পারতেন! জানি, ওরা শুধু চেনে পয়সা!

সুচারু

কিন্তু, তিনি তো আর—

মেনকা

চুপ্ কর, চুপ কর, ঢের হ'য়েছে! ভালবাসার কদর ওরা যদি বুঝ্‌তো তা হ'লে আর কথাই ছিল না। (থেমে) কেন সোমেশ্বরবাবুর কী এমন ক্ষমতা নেই যে তোকে জোর করে' বিয়ে করেন? আর বাবার অমত সে-কথা উনি নিজের কানে শুন্‌তে গেছেন নাকি! কেন নিজে একদিন বাবার কাছে আসতে পারেন না? মুখে এদিকে লম্বা চওড়া কথা আছে! (থেমে) তুই এখনো শক্ত হ' দেখিয়ে দিই মজাটা।

[সুচারু নতমুখে সাড়ির আঁচল পাকাতে লাগল]

—কিরে, তুই যে কোন কথাই বলিস্ না? উনি নিজে এলেই তো ব্যাপারটা চুকে যেত!

সুচারু (মৃদু কণ্ঠে)

ওঁর ওভাবে আসায় গৌরব নেই। সে-যে নেহাৎ কাঙালীপনা হয় দিদি!

মেনকা

বাব্বা! তুই এতো-ও জানিস্!! (থেমে) তুই তো দেখ্‌চি বেশ্ বুলি শিখেচিস্!

কাঙালীপনা তুই কোনখানটায় দেখলি শুনি? চোরের মত এ কাণ্ড না-করে ওঁর কি উচিত ছিল না, বাবাকে স্পষ্ট করে' নিজের মতটা জানান? চুরির চেয়ে কাঙালীপনা ঢের ভাল কিন্তু।

[একখানা কাগজ হাতে ছুট্তে ছুট্তে গোবিন্দর ঘরে ঢুক্লো]

গোবিন্দ

হুঁ হুঁ, বাবা! চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা!! কিন্তু আজ ধরা পড়েচে চোর একেবারে বামাল শুদ্ধ...ছোড়দি, ছোড়দি—ই—ই।

মেনকা

এই ষাঁড়ের মত অত চীৎকার করচিস্ কেন? খাচ্চো-দাচ্চো আর নাদুস-নুদুস সঞ্জীবক হ'চ্চো যে!

গোবিন্দ

খুঁড়োনা বলচি ভাল হবেনা। দাঁড়াও যাচ্চি মার কাছে, বলি তার বাঁশ পাতার মত ছেলেটিকে খুঁড়ে কেঁচো বানাতে চায় তার বড় বোন!

মেনকা

থাম, থাম, ডেপোমী করিস পরে। চোর ধরলি কোত্থেকে শুনি?

গোবিন্দ (হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে)

এ ছদ্ম নামটা জান?

মেনকা

কেন জানবো না, উনি ও কাগজের একজন পুরোণ লেখক! আসল নামটা তো জানি না।

গোবিন্দ

এই জন্যেই তো বলচি পাকা চোর! এতদিন আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে এসেচেন। উনিই স্বয়ং আমাদের সোমেশ্বর বাবু!

মেনকা (কিছুমাত্র অগ্রাহ্য না দেখিয়ে)

তাতে আমাদের কী? ভারিতো লেখা তাই নিয়ে তুই আবার লাফালাফি করতে সুরু করেচিস। যা যা নিজের কাজে যা।

গোবিন্দ

কিন্তু এ লাইনগুলো দেখেচো? Our life is but a long tragedy. And the spark of comedy is seen through it, when we are dead! The sweetest of our lives are the most saddest possible imaginable...কত বড় সত্যি কথা একবার ভাব দেখি!

মেনকা (ঠোঁট উল্টে)

ভারি! শেলী ঢের আগে ও কথা বলে গেচেন।

গোবিন্দ

তা হ'লেও—Great minds think alike!

মেনকা

যা যা তোর Great mindকে তুই পূজো করগে যা। চুরি করে' যে পরের কথা বলে সে আবার—

গোবিন্দ

তা' হ'লেও—

মেনকা

ফের সেই তুই গেলিনা। দাঁড়া বাবার কাছে যাচ্ছি!

গোবিন্দ (যেতে যেতে)

কিন্তু ভেবে দেখ: We smile when we are really sad and cry when we are happy. Paradox কিন্তু খুব সত্যি। [প্রস্থান

মেনকা (সুচারুর পাশে কৌচে বসে' পড়ে)] (থেমে) যাক্‌গে, যা হবার তা হ'য়েছে। মিথ্যে হৈ-চৈ করে' আর কি হ'বে বল? (সুচারুর মাথায় হাত বুলতে বুলতে)

এখন একটা মজা হয়েচে শোন; বাবা তোর জামাইবাবুর ওপর তোর পাত্র পছন্দ করার ভার দিয়েচেন,—পাত্র তিনি নিজেও দেখতে চান না, আমরা পছন্দ কর'লেই হ'লো। ওঁতো সোমেশ্বরকে চেনেন, পাকে-প্রকারে বাবাকে সেই কথাই জানিয়েচি। একবারটি পাকা কথা দিলে বাবা আর তার নড়চড় করতে পারবেন না—সেকেলে লোক ওঁদের কাছে কথার দাম আপন প্রাণেরও বড়ো।...এদিকে দাদাকে সব কথা জানিয়ে উনি চিঠি লিখচেন। দাদা শুধু বিলেত থেকে লিখ্‌বেন পাত্র অতুলনীয়, হাজারে একটা। পাকা দেখার দিন দাদার আর একটা চিঠি আসবে যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা যেন শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। আর জানিস্ তো বড় ছেলের আব্‌দার বাবা কিছুতে ঠেল্‌তে পারেন না। দেখিস্ এত যে রাগ ঐ একখানা চিঠিতে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এ আমি তোকে বলে দিচ্চি। বাবাকে কিন্তু এর মধ্যে ঘুণাক্ষরে জানান হবে না যে তুই মনে মনে সোমেশ্বরকে ঠিক করেচিস্। (থেমে) আমরা-ই ঠিক করেচি। বুঝলি?

চারু

কিন্তু উনি যদি রাজী না-হন।

মেনকা

না হ'বে না! বললেই হলো আর কি! তার হাড় হবে। ভদ্রলোকের মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লজ্জা করে না! যাব না আমি তা হলে ওঁর মার কাছে! ভয়টা কি শুনি? (থেমে) আরে তুই যে দেখি ভয় পেয়ে গেলি! না রে না, তাকি আমি কখনো যেতে পারি?

আচ্ছা বোকা মেয়ে তুই যাহ'ক। তোর জামাইবাবুই সব ঠিক করবেন। কে জানতো তাঁর আবার এ সব ব্যাপারে অতো মাথা খোলে!

[বলতে বলতেই বিজনবাবু ঘরে ঢুকলেন, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ।]

চারু

জামাইবাবু অনেক দিন বাঁচবেন কিন্তু, এই আপনার কথাই হচ্ছিল।

বিজনবাবু (চেয়ার টেনে বসে)

তেমন তো আপাততঃ বোধ হ'চ্চে না। মনে হচ্ছে এই বেরসিকটিকেই বাদ দিয়ে দু বোনে সলাপরামর্শ কিছু হচ্ছিল। (থেমে হাঁফ ছেড়ে) দৌত্য কাজে পক্ক না থাকায় এই রোগা শরীর আমার ছেক্‌রা গাড়ীর ঘোড়ার মত একবার গড়পাড়, একবার আলীপুর করে নাজে-হাল। ধন্য এ যুগের অবলাগণকে, বোল তাঁদের নাই ফুটুক, বুদ্ধির দৌড় তাঁদের অনেকটা এগিয়ে গেচে— আমরা বেচারা ভগ্নিপোতেরা পেছনে পড়ে হাঁপাতে থাকি। সত্যি বলচি তোমার দিদিটির যদি অমন চোখা 'ফার সাইট' থাকতো! উঃ—

মেনকা

কি যে বাজে বক!

বিজনবাবু

বাজে কি কাজের, তা শ্রীমতী চারুবদনাই বেশ বুঝ্‌চেন। কেমন ঠিক নয় দিদি?

মেনকা

কাজের হ'লে ঘটক বিদেয় নিশ্চয়ই পাবে।

বিজনবাবু

তা আগে থেকেই বেশ মালুম হ'চ্চে। শেষটা দেখ্‌চি ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম-এর ব্যবস্থা হ'য়ে আছে।

মেনকা

যাক্। এ দিকের কদ্দুর কী ক'রলে তাই বল। [সুচারু ওঠ্‌বার চেষ্টা ক'রলে]

বিজনবাবু

আহা-হা, চারুদি যাবেন না। এতে আর লজ্জাটা কি? জিনিষ আপনার; আমরা তো কেবল খোঁজার ভার নিয়েচি—উচিত মূল্য পেলে বর্ত্তে যাই। ভোগ-দখলের ইচ্ছে আমার বা তোমার দিদির কারুরই নেই, বলেন তো এখনি লিখে পড়ে দিই।

সুচারু

ভারি অসভ্য!

বিজনবাবু

আরো একটা বিশেষণ দিন ঐ সঙ্গে, ছেঁচ্‌ড়াও বটে! তা না হ'লে stupid সোমেশ্বরের

হ'য়ে করি কিনা ঘটকালী! কুকুরের লেজ আর কি, কিছুতেই সোজা হ'তে চায় না! (থেমে) ও যে আবার কবে থেকে নীতিবিদ্ হয়ে উঠলো, তা তো জানা ছিল না। কথার মাঝে মাঝে কেবলই বলছিল: ফাঁকি দিয়ে যা পাওয়া যায় তা ফাঁকি-ই! কিন্তু ভায়া ভুলে গেলেন যে—তার প্রেমটাও আগাগোড়া ফাঁকি! ভাবুক হ'লে না হয় কথা ছিল, দু কথা ঘুরিয়ে অতি ইতর জিনিষ সরস ক'রে বলতে পারতুম। তা আর হ'লো না। বলে এসেছি, এর জবাব কালই দিয়ে যাব। ভরসা আছে তোমার দিদির ইংরেজী-সাহিত্যে অনার ছিল। নাঃ এখন দেখছি অর্থনীতির গুরুগিরি ক'রে আগাগোড়াই ভুল ক'রে এসেচি! কিছুতেই বুঝতে পারচি না, গাঁটছড়া না-বাঁধলে প্রেমটা চরিতার্থ হয় কিসে?

মেনকা

ফের সেই যত রাজ্যের বাজে কথা! শেষ পর্য্যন্ত কি হ'লো তাই বল'না!

বিজনবাবু (করুণ ভাবে)

কি হ'য়েচে শুনতে চাও? তোমার এই এঁর অপমান হয়েচে!

মেনকা

তোমার আজ হ'লো কি? একেবারে কথার জাহাজ!

বিজনবাবু

ঠিক বলেচো। Word-cargo নিয়ে এসেচি। সে কী আমার দোষ, ভুলে যাও কেন ভায়া আমার উকিল, সংসর্গ জিনিষটা এমনই সাংঘাতিক! (থেমে) ভায়াকে আজ সাতদিন ধ'রে ক্রমাগত বোঝাচ্ছি শ্রীমতী চারুবদনার রূপ অতুলনীয়, তা গাধাটা কিছুতেই শুনবে না। কেবলি বলে সুচারুর মতটা কী? আমার তো ধারণাই হ'য়ে গেছে ছোক্রা উকীলগুলো একেবারে নিরেট—যত সব Implicit ব্যাপারগুলোকে নিয়ে Explicit করতে চায়। উঃ, কদিন আচ্ছা ভুগিয়েচে যা হোক! (থেমে) কি আর করি, রাধা হ'য়ে ধন্না দিলুম তার মার কাছে, সমস্ত ব্যাপার তাঁকে বল্লুম। তিনি শুনেই রাজী হ'য়ে গেলেন। সার্থক নাম তার দয়াবতী! আর ঐ দেখ না, সোমেশ্বর না, বাঁকা মদন? উঃ, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে!

চারু

জামাইবাবু ভারি বাজে বকেন।

বিজনবাবু

না ব'কে উপায় কি ভাই—যে দিনকাল পড়েচে গৌরচন্দ্রিকা না-হ'লে আজকাল আবার মিলনপর্ব্ব সমাপ্ত হয় না। এ কালে মাথুর যখন নেই, তখন গৌরচন্দ্রিকাটাকে প্রশস্ত না ক'রলে প্রেম-নাটক ছোট হয়ে পড়ে।

চারু

ভারি অসভ্য!

বিজনবাবু

নিশ্চয়ই, একশ'বার। কিন্তু দিদি বখ্শিষের কথাটা ভুললে চলবে না।

চারু

আক্ষেপ থাকে কেন বলে ফেলুন না!

বিজনবাবু

পরে পরে জ্ঞাতব্য। গোপন কথা, অন্ততঃ তোমার দিদির সামনে নয়।...এই যে গোবিন্দ-দাও দেখছি এসে পড়েছেন! কি সংবাদ দাদা—কিছু গোপন?

গোবিন্দ

মা আপনাদের জরুরি তলব করচেন। আমার ওপর আজ্ঞা আছে, আর কেউ না-আসুতে চাইলেও শ্রীযুক্ত জামাইবাবুকে যেন বেঁধে নিয়ে আসি।

বিজনবাবু (উঠে পড়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে)

তাই বাঁধ ভাই! দেখ, যেন আবার ফস্কে না যাই! কি বলেন চারুদি?

চারু

ভারি অসভ্য! কেবল এক কথা!!

বিজনবাবু

কী আর করি, হাওয়া যে ভাবে বইচে! কইলেও রাগ, না কইলে মুখ হাঁড়ি!

মেনকা (এগিয়ে গিয়ে)

কি যে কেবল বক! চল, চল মা বোধ হয় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচেন।

ক্রমশঃ

শৃঙ্খল

লতিকা গুপ্ত

নদীর এককূল ভাঙ্গে, অপরকূল গড়িয়া উঠে। ফল ঝরিয়া পড়ে, বীজ নূতন গাছের জন্ম দেয়। মৃত্যুর হাহাকারে পৃথিবীর বুক নিরন্তর ব্যথিত হইয়া উঠে, জন্মের আনন্দ তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে চায়। শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষতি জগতের বিধি নয়, তাহাকে পূর্ণ করিবার, সার্থক করিবার জন্য আছে নূতন সৃষ্টি, নূতন প্রাপ্তি, নব আনন্দ !

মানবের মানস রাজ্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দুঃখ তাহাকে আহত করে, পীড়িত করে, চূর্ণ করে, এ ক্ষতির স্থূলতঃ কোন পূরণ বা উপশম নাই, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এই ক্ষতিতেও শান্তির প্রলেপ দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে একটী শান্ত অনাবিল উন্নয়ন, একটী সুদূর প্রসারী দৃষ্টির উন্মেষ, যাহা একটী নূতন ধরণের আনন্দ দিতে পারে এবং যে আনন্দ অর্জ্জনের ভার কতকটা মানুষের নিজের উপরে নির্ভর করে।

কপিলাবস্তুর যুবরাজ যেদিন ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া একবস্ত্রে রিক্তহস্তে পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেদিন সেই ত্যাগের পথে তিনি কি কোন সাফল্যের ইঙ্গিত পান নাই ? ভাবী কাল কি তাঁহাকে সেই ত্যাগের পরিবর্ত্তে জ্ঞান ও সত্যান্বেষণের অমৃতময় আনন্দ ভোগ করায় নাই ? তাঁহার একজীবনের ভোগত্যাগের ক্ষতি এক নূতন ও আনন্দময় ভোগে পর্যবসিত হইয়া সকল ক্ষতি সকল রিক্ততাকে সফল ও পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

অহল্যার পাষাণ জীবনপ্রাপ্তি অতি করুণ সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল তাহাকে জীবনহীন জীবন বহন করিতে হইয়াছিল, সে জীবন মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক ও চিতাভস্মের চেয়েও করুণ। কিন্তু এ বেদনারও ক্ষতিপূরণ করিবার মত সম্পদ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার অন্তরলোকের মণি-কোঠায়। তিলে তিলে সেখানে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারই শেষ বিকাশ তাহার শ্রীরামচন্দ্রের চরণলাভের যোগ্যতায়। ভগবানের পাদস্পর্শে যেদিন সে জাগিয়া উঠিল, সেদিন সে বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত শুচি ও সমুজ্জ্বল হইয়াই দেখা দিয়াছিল। পঙ্কের বুক মথিত করিয়া দীর্ঘ সাধনায় সেদিন ফুটীয়া উঠিয়াছিল এক অম্লান শতদল !

এই যে ত্যাগের রূপান্তর লাভে, ক্ষতির রূপান্তর প্রাপ্তিতে, এই রূপান্তর সকল ক্ষতির মধ্যেই

আপন কাজ করিয়া চলিতেছে। সঙ্কীর্ণ সীমা, নিকটের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া যদি আমরা দূরের দিকে দৃষ্টিপাত কতি, অথবা দূর হইতে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবেই এই সত্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। যখন আমরা অপরের জীবন লইয়া চিন্তা করি, ইতিহাসের ক্রমবিবর্দ্ধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তখন কোথাও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় বা ক্ষতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, দেখা যায় সে তাহাকে কোমল করিবার জন্য, ভরাইয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সূক্ষ্মগতি ক্রিয়াশীল রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষয় ক্ষতি বা ক্ষতকে আমরা অসহনীয় বলিয়াই আকুল হইয়া পড়ি, নিরবচ্ছিন্ন গভীর কৃষ্ণমেঘের কোন এক সূচীপ্রমাণ ছিদ্র দিয়াও আমাদের নিকট আলোর কলিকা আসিয়া পৌছায় না। তার স্থূল আঘাতে সে আমাদের মানসদৃষ্টির অবরোধ সৃষ্টি করে, তার একান্ত নৈকট্য দিয়া সে আমাদের সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘিরিয়া আছে। আমরা খণ্ডিত, আমরা আচ্ছন্ন, তাই আমরা মায়ামুগ্ধ।

নিজেকে যে আপন বলিয়া ভাবে না, নিজের জীবনকে যে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, সে তো অমৃত পায়। তার কাছে মৃত্যুই অমৃত, অমৃতই মৃত্যু, ক্ষতিই লাভ, লাভই ক্ষতি, হারাণোই প্রাপ্তি, প্রাপ্তিই হারাণো। সে দেশ কাল পাত্রাতীত, সে মানুষ হইয়াও মানবাতীত, তার আত্মানুভূতি বন্ধনহীন ও মুক্ত। তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

'যে তাপস আপনারে ভুলে যায় একেবারে
অহঙ্কার মায়া মোহ দেয় বিসর্জ্জন,
হৃদয় তাহার সদা ভক্তিরসে ডুবে থাকে,
মুক্তিপথে গতি তার হয় সর্ব্বক্ষণ'

(২য় অধ্যায় ৭১)

কিন্তু এইরূপ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে নিজের জীবনকে গ্রহণ করা তো সহজ নয়, ভগবানের অমিত করুণা যাঁহাদের মধ্যে নিকটের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও বেশী নয়, তাই যুগে যুগে এত বেদনার ভার মানবকে পীড়িত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাই তার করুণ সুর প্রতি মানবের হৃদয়েই করুণতম হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। লক্ষ্মীস্বরূপা জানকীর বেদনায় আজও, এতদূর হইতেও দ্রষ্টার দৃষ্টি খুজিয়া পাওয়া যায় না, কুরুকুলবধূ উত্তরার দুঃসহ বেদনা আজও অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত সমস্ত মহাভারত ছাপাইয়া চক্ষু আর্দ্র করিয়া তোলে। শুনিয়াছে ফুল্লরা কালকেতুর পূর্ব্বজন্মকাহিনী, মৃত্যুই তাহাদের শাপমুক্তি, তবু তাহাদের বিরহদীর্ণ মহাপ্রস্থানে অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠে। জানিয়াছি, মানিয়াছি ও অমৃত আনন্দে সিঞ্চিত হইয়া বারবার আবৃত্তি করিয়াছি—

সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী হে বিরাট তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,
তাই এ ধরারে
জীবন উৎসবশেষে দুইপায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে—

তবুও অনেক ক্ষেত্রেই সান্ত্বনা মেলে না।

আত্মার যে গভীর চৈতন্যে সকল আত্মা একাত্ম হইয়া যায়, সে অনুভূতি গভীর সাধনাসাপেক্ষ অথবা ভগবানের অসীম করুণাসাপেক্ষ, সকলে তাহার স্বাদ পায় না। যেও জানে যে নৈকট্যের সীমা পার হইলেই মানব জীবনের ক্ষয় ক্ষতির উজ্জ্বল ও সার্থক একটী রূপের আভায় 'সকল কাঁটা গোলাপ' হইয়া ফুটীয়া উঠিবে, নিকটের বন্ধনে, স্বয়ের ব্যথায় মুহ্যমান তাহারও সেই দূরপারে ছলছল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা ব্যতীত উপায় থাকে না। যাহাকে পাইলে সে সার্থক হইবে বলিয়া মনে করে' তাহাকে পাইতে পায় না, অতীতে ডুবিয়া থাকিতে চাহিলে ভবিষ্যৎ সম্মুখে আকর্ষণ করে বর্তমানে স্থির হইতে চাহিলে অগ্রপশ্চাৎ উভয় দিক হইতে টান পড়ে, ভবিষ্যৎ-কে পাইতে চাহিলে অতীতের বন্ধন পায়ে জড়াইয়া ধরে, অশুভ জানিলেই ত্যাগ করা চলে না, শুভ বুঝিলেই গ্রহণ করা যায় না, 'করিব না' বলিলেই না করিলে চলে না, করিবার ইচ্ছা করিলেই করা যায় না, আমিত্বের ও অস্তিত্বের চক্রনেমীবদ্ধ মানুষ এতই নিরুপায়!

ব্যবসায়ে রাস্‌কিন্‌

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক রাস্‌কিন্‌ লণ্ডনে একটি চায়ের দোকান চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো "গরীবদের কাছে খাঁটি চা যত ছোটো পুরিয়ায় তারা কিনতে চায়, তত ছোটো পুরিয়ায় বিনালাভে বিক্রী করা"। লণ্ডনের প্যাডিংটন ষ্ট্রীটে ছিলো রাস্‌কিনের এই চায়ের দোকানটি। দুঃখের বিষয় অল্প দিনের মধ্যেই দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার কারণ শোনা যায় যে পাশে অন্য যে-সব চায়ের দোকান উজ্জ্বল আলো আর চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে খদ্দেরের মন ভোলাতো তাদের সঙ্গে ঐ সব বিষয়ে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাস্‌কিন্‌ নাকি একেবারেই নারাজ ছিলেন।

মাদ্রাজে সংখ্যা-সম্মেলন

অতীন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজে ভারতীয় সংখ্যা-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গেল। দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হইয়াছে যে দেশের যাঁরা ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্তা তাঁদের সঙ্গে এই দুই সম্মেলনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল না। ভূতপূর্ব মন্ত্রী রাজাজী ও গিরি অভ্যর্থনা সমিতির পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা কোন কোন শাখার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সাধারণ আলোচনায় এবং কার্যপরম্পরায় যোগদান করেন নাই।

অথচ মাননীয় গিরি তাঁর অভিভাষণে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন :—

As former minister of Industries, Labour, Commerce and Co-operation, I had to deal with important economic problems, and I have felt that this is an age when statistics in all walks—whether industries, labour or commerce—will play an important part.

"শিল্প, শ্রমিক, বাণিজ্য ও সমবায় বিভাগের ভূতপূর্ব মন্ত্রী হিসাবে আমাকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাতে আমি দেখিয়াছি যে এ যুগে শিল্প, শ্রমিক অথবা বাণিজ্য যে কোন বিভাগে সংখ্যাবিদ্যার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।"

শ্রমিক সংখ্যার (Labour Statistics) আলোচনা দিবসে তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন—"আমাদের অনেক শ্রম-সংস্কারক আইন প্রবর্তন করিবার সঙ্কল্প ছিল—কিন্তু সংখ্যার অভাবে আমরা পদে পদে ব্যাহত হইয়াছি।" তিনি মত প্রকাশ করেন যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভায় আইন পাশ হওয়া উচিত যাহাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাস্থান হইতে খবর সংগ্রহ করিতে পারে।

ইতিপূর্বে Economic Enquiry Committee ও Whitely Commission এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছে। Whitley Commission Reportএ আরও বলা হইয়াছে যে আইন করিয়া মালিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও অধিক পরিমাণ সংখ্যা ও তথ্য রাখিতে বাধ্য করা উচিত। যে কোন শিল্পোন্নত দেশে এরূপ আইন আছে। ঐ সমস্ত দেশের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত ঐ সব সংখ্যা ও তথ্যের সহায়তায় আইন রচনা করে এবং জীবনযাত্রার মান (standard of living) স্থির করে। আমাদের দেশে মালিক প্রতিষ্ঠানগুলির এরূপ সংখ্যা রক্ষণের কোন বাধকতা নাই—কাজেই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের অধিকতর অর্থ ও সময় ক্ষয় করিয়া এই সব খবর সংগ্রহ করিতে হয়। সংখ্যাবিদ্যার এই সমস্ত কাঁচা মালের অভাবে শ্রমিক সংস্কারক আইন প্রবর্তন আমাদের দেশে কঠিন হয়।

শুধু সংস্কারক আইনের জন্য নয়,—আইনের ফলে উন্নতির (বা অবনতির) পরিমান করিতে হইলে সংখ্যার প্রয়োজন। সুতরাং যে কোন সংস্কারক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সংখ্যা-সঙ্কলনকে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে।

আমাদের দেশে সংখ্যাবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা অস্পষ্ট। সংখ্যা বা statistics বলিতে আমরা সাধারণতঃ কাঁচা মালগুলিকে বুঝি! আসলে এই কাঁচামালগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া সহজবোধ্য ও কার্যকরী আকারে প্রকাশ করিবার উপায়ই সংখ্যাবিজ্ঞান। সম্মেলনের সম্পাদক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলনবিশ তাঁর অভিভাষণে বলিয়াছেন ঃ—

"......the basic purpose of statistical science is to device efficient methods by which information may be collected, usually and preferably in a quantitative form, for being used in all spheres of human knowledge and activities. The aim is to gather the largest amount of relevant information with the smallest expenditure of time, energy and money : and also to do this in such a way that the information may be assessed with scientific precision and the reliability of the material may be usessed with objective validity. From this point of view statistical science is a pre-requisite for all other sciences in which information in a quantitative form is necessary for progress.

"মানুষের যাবতীয় জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের জন্য পরিমাণিক আকারে তথ্যসঙ্কলন করার সমর্থ প্রণালী আবিষ্কার সংখ্যাবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। স্বল্পতম সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে যথা-সম্ভব অধিক তথ্য সংগ্রহই লক্ষ্য—কিন্তু এ কাজ এমন ভাবে করিতে হইবে যে তথ্যকে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার সহিত কাজে লাগানো যায় এবং তথ্যের সত্যতা নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে নিরূপন করা যায়। যে সমস্ত বিজ্ঞানে প্রগতির জন্য পারিমাণিক তথ্যের আবশ্যক এ দিক দিয়া তাহারা সংখ্যাবিজ্ঞানের সর্তাধীন।"

গণিতাধীন theory of Probability হইতে theory of Random Samplesএর আবিষ্কার সংখ্যাবিজ্ঞানের এক যুগ-প্রবর্তন। কোন বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে তাহার অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি বা unitএর খবর লওয়াই ছিল চিরাচরিত পদ্ধতি। আদমসুমারী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু Random Sampleএর সহায়তায় ইহার আংশিক পরিমাণ অর্থ-ব্যয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়। Random Sampleএর আবিষ্কারে সাংখ্যিক জ্ঞান সহজলভ্য হইয়াছে এবং ক্ষেত্রানুসারে Random Sampleএর প্রয়োগপ্রণালী হইতে Design of Experimentsএর উদ্ভব হইয়াছে। কলিকাতা Statistical Instituteএর

এই কীর্তি বিজ্ঞানজগতে আদৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে সমাজকল্যানে প্রযুক্ত হইতেছে।

বাঙ্গলাদেশে এই পদ্ধতিতে Statistical Institute হইতে পাটের জমীর আয়তন নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গত দুই বৎসরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য এ বৎসর পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল যুড়িয়া বাঙ্গলার আটটী জিলায় তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু শুধু আবাদী জমীর আয়তন হইতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বোঝা যায় না—এজন্য বিঘা প্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ জানা দরকার। এ উদ্দেশ্যে এ বৎসর পূর্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের দুই স্থানে ধানের উৎপত্তি লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। যুক্ত প্রদেশেও আখের চাষের উপর এরূপ একটী অনুসন্ধানের পরিকল্পনা শীঘ্রই কাজে লাগানো হইবে এবং ছ' সাতটী প্রদেশ যুড়িয়া তুলার উৎপত্তি নিরূপণ করিবার একটী পরিকল্পনা Indian Central Cotton Committeeর বিচারাধীন আছে। ফসল নির্ধারণ এবং শস্যোৎপাদনের পরিকল্পনায় (planning) samplingএর পদ্ধতি শীঘ্রই অপরিহার্য হইয়া উঠিবে।

কৃষিবিজ্ঞানে sampling ও সংখ্যাবিদ্যার আরও অনেক দিক হইতে প্রয়োজন হয়। আখের ভিতর পোকা হইয়া যে আখ নষ্ট হয় তা' সকলেই জানে। ইহাতে চাষীর, চিনি শিল্পের এবং ইক্ষুপ্রধান দেশের অনেক ক্ষতি হয়। যে কোন প্রতিকার-ব্যবস্থার পূর্বে জানা দরকার এই কীটের মাত্রা কোন স্থানে কত। এই উদ্দেশ্যে আটটী প্রদেশ যুড়িয়া sample পদ্ধতিতে একটী অনুসন্ধান সুরু হইয়াছে।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ কলিকাতা Statitical Instituteএ অধ্যাপক মহলনাবিশ এবং রাজচন্দ্র বসু, সমরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ তাঁর সহকর্মী ও শিষ্যদের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেরল্ড্ হটেলিং* সভাপতির অভিভাষণে বলেন :—

The superior standards of work exemplified by the Statistical Laboratory...... have made an impression in all parts of the world where statistics is cultivated as a scholarly subject. Official and semi-official inquiries on a variety of subjects, such for example as that relating to the acreage under jute, bid fair soon to attain a reliability in this country surpassing that of corresponding inquiries in countries in which statistical investigations have been carried on over a longer period.

* লণ্ডনের অধ্যাপক আর, এ, ফিসার'এর পর ইনি অদ্বিতীয় সংখ্যাবিদ্। কলিকাতায় প্রথম সংখ্যা-সম্মিলনে ফিসার সভাপতিত্ব করেন।

"পৃথিবীর যেখানে যেখানে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে সংখ্যাবিজ্ঞানের চর্চা আছে সে সমস্ত জায়গায় ষ্টাটিষ্টিকেল লেবরেটরির উদ্ভাবিত উচুদরের কাযগুলি বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এদেশে পাট চাষের মত অনেক বিষয় লইয়া সরকারী এবং আধা-সরকারী অনুসন্ধান চলিতেছে। এ সমস্ত অনুসন্ধানে শিঘ্র এমন নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় যা অনেক দেশে বহু পূর্ব হইতে গবেষণা করিয়াও পাওয়া যায় নাই।"

লেবরেটরীর উদ্যমের ফলে এবার সেনসাস্ কমিশনার ইয়েট্‌স্ তাঁর বক্তৃতায় Sampling পদ্ধতির কার্যকরীত্ব স্বীকার করিয়া বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাহিয়াছেন। আগামী বৎসরের আদম-সুমারীতে ব্যাপক অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিতে কয়েকটী পরীক্ষা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সংখ্যাবিজ্ঞান ও তাহার সামাজিক প্রয়োগকে ফলপ্রদ করা শুধু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হয় না। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাধারণের এবং সংখ্যালব্ধ জ্ঞানকে কাযে লাগানোর জন্য সরকার পক্ষের সচেতন হওয়া দরকার। কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের চেষ্টায় সরকারী স্নায়ুতে নাড়া পড়িয়াছে—কিন্তু অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অধীনতার ফলে সাধারণ এখনো এদিকে বিমুখ হইয়া আছে। চাষী মজুরের কাছ হইতে খবরাখবর সংগ্রহ করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। ইয়েট্‌স্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—ইংলণ্ডে গৃহস্থ নিজেই তথ্য ঠিক রাখে, সরকারী এনিউমারেটর শুধু সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনে এবং সাধারণের গোচর করে। এরূপ সামাজিক বোধ আমাদের দেশে জাগরিত হইলে সংখ্যানুসন্ধান, সংস্কারক আইন, এবং সব রকম রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সুসাধ্য হইবে।

লোকসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বা প্রসার করিবার জন্য যে কোন প্রকার পরিকল্পনা প্রবর্তন করিতে হইলে এবং তাহার ফলাফল বিচার করিতে হইলে সংখ্যাবিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই ভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথিবীর বৃহত্তম কৃষি-পরিকল্পনার অনুষ্ঠান চলিতেছে। ভারতবর্ষে কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের জন্য কংগ্রেসের National Planning Committee আয়োজন করিতেছে। এই National Planকে কার্যকরী করিবার জন্য একদিন সংখ্যাবিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। এখন হইতে কংগ্রেসের মনে রাখা প্রয়োজন যে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের মত সংখ্যাবিজ্ঞানও একটী যন্ত্র বা tool। একই রাসায়নিক উপকরণ হইতে যেমন বিষ ও ঔষধ তৈয়ারী হইতে পারে, সেইরূপ একই তথ্যের ভিন্নরূপ সন্নিবেশে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-পরিকল্পনা রচিত হয়। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সযত্নে বর্ধিত এই elixirএর প্রতি আমাদের বিদেশী সরকার ও ধনিক-প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি পড়িয়াছে,—সরকারী দপ্তর এবং কল-মিল-সম্প্রদায় অর্থ দিয়া technician গড়িতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে ইহাদের শরণাপন্ন না হইতে হয়, সে জন্য কংগ্রেসের নিজস্ব technicianএর cadre গড়া উচিত কিনা ইহা এখন হইতে ভাবিবার কথা।

"গেঁও বৌ"

টুনটুন্ ঘোষাল

অস্ত রবির শেষ রেখাটী মিলিয়ে গেছে হোথা
কৃষ্ণা নদীর কূলে কূলে জল,
আলো ছায়ার পথটী ধরে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে
আল্‌তা পরা কচি পায়ে বাজিয়ে চলে মল ॥
অশ্রু আসে দুটী নয়ন ছেপে ;
ছোট্ট মাটীর কলসীটীকে শক্ত করে বুকে চেপে,
এলোমেলো আঁচল দিয়ে ঘোম্‌টা খালি টানে,
নয় বছরের কচি-মেয়ে কিবা-বোঝে জানে ॥
ঘোম্‌টা যেন পড়ে না'ক কভু,
নতুন মায়ের মন্ত্র বাজে কানে ॥

হেথায় বাবলা গাছের ঝোপে, ভুতুম পেঁচা ডাকে,
পাতার ফাঁকে ফাঁকে ;
চম্‌কে ওঠে কচি মেয়ে এদিক ওদিক চক্ষু মেলে চায়,
নদীর পারের শূন্য নিরালায়।
বাপের বাড়ী যায়নি সে যে অনেক দিনের কথা,
যদি বা কেউ জানিয়ে দিতে পারে,
শুধু একটী দুটী কথা
এই না ভেবে কচি মেয়ে রোজই আসে নদীর ধারে
শোনেনা'ক নতুন মায়ের মানা, শুধায় যারে তারে ॥

ওগো তোমরা কি কেউ জানো ?
সেই যে তালিবনের সারি, তলা দিয়ে গাঁয়ের রাঙা পথ
আষাঢ় মাসে ওপথ দিয়ে, এসেছিল মস্ত সোনার রথ,
কত গাঁয়ের ছেলে, বুড়ো, দলে দলে
ছুঁয়ে গেল রথের মোটা দড়ি,
করল প্রণাম ধূলির পরে, রথের চাকার তলে।
তোমরা কিগো যাওনি হোথায় কেউ ?
পুকুর ভরা পদ্ম পাতায় যেথায় খেলে কাল জলের
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউ।

গেঁও বৌএর কথা শুনে যাত্রীরা সব হাসে,
কেউ পারে না খবর দিতে কত কে যায় আসে॥
মদনপুরের বুড়ো মাঝি—কি কাজে আজ এল হেথায়!
ছোট্ট ডিঙ্গি লাগিয়ে রেখে কূলে,
হেলে দুলে পথ দিয়ে সে যায়!
আজ রাত হয়েছে বেশ, মেঘে মেঘে আকাশখানি ছাওয়া
মিলিয়ে আছে ঝিঁঝিঁ পোকার রেশ, বইছে ঝড়ো হাওয়া,
কচি মেয়ে কলসী কাঁখে নিয়ে, হয়ে কাঁচুমাচু,
বুড়ো মাঝির পথটী ধরে, হাঁটে পিছু পিছু॥
—খানিক পরে একটি ছড়ার পায়ে,
কচি মেয়ে পিছলে পড়ে সাঁঝের অন্ধকারে
বুড়ো মাঝি পিছন ফিরে দেখে পথের বাঁকে,
কচি মেয়ে হাত ছানি দে ডাকে।
কাছে এসে বুড়ো মাঝি
হাতটী ধরে তোলে তাকে,
নরম সুরে বলে "খোঁজো কাকে—"
কে গো বাছা এই আঁধারে কেমন করে এলে?

ভীরু নয়ন মেলে,
কান্না-চাপা ধরা গলায় কচি মেয়ে বলে
"—আমি নয়া বাড়ীর বৌ,—ছিলাম মদনপুরের মেয়ে।
বাপের বাড়ীর খবর নিতে যেয়ে,
পথ গেছি যে ভুলি।"
তুমি চিনলে না কি মোরে? আমার নাম যে 'কাজলী!'
চমকে গিয়ে বুড়ো বলে,
—"চিনেছি গো, নাত্নী আমার,
তুমি আমার স্নেহভাজন বৃদ্ধকালের সাথী।
মা যে তোমার, ভাবনা ভেবে সারা, কাঁদে যে দিনরাতি
তোমার তরেই পাঠিয়ে দেছে মোরে।
—বৃদ্ধ বলে গভীর সুরে,—
"রাত পোহালে তোমায় নিয়ে
যাবো মদনপুরে॥"

সভ্যতার বাইরে

ভবানী প্রসাদ সেনগুপ্ত

নারিকেলডাঙ্গার একটা জনহীন মাঠের একপ্রান্তে রাত্রির গভীর নির্জ্জনতায় পথ-চলা ভিখারিণী মায়ের সন্তান জন্ম নিলে পৃথিবীর কোলে।

মায়ের বিপদের সময় সাহায্য করতে সঙ্গে ছিল আর একটী ভিখারিণী মেয়ে। খানিক পরে ক্রন্দনরত শিশু পুত্রকে মায়ের কাছে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে সে বল্লে, নে, তোর খোকা নে।

রাংতা ওর মায়ের নাম। রাংতা অবশপ্রায় হাত দুখানি বাড়িয়ে খোকাকে একবার ধরতে গিয়ে থেমে গেল। ওর হঠাৎ মনে হোলো, পাশে যে আছে শুয়ে সে একজন পুরুষ। মুহূর্ত্তে ভয়ে ও ঘৃণায় ওর হৃদয়ের অন্তঃস্থল পাথর হ'য়ে যেতে চাইলে যেন। ওর মনে পড়ে গেল আর একটা পুরুষের কথা, সেই তো এই শিশুর বাবা। কোথায় সে? কোনো খোঁজ নেই তার। নিজের প্রকৃতি চরিতার্থ করবার জন্যে একটা মেয়ে মানুষের ঘাড়ে একটা সন্তানের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স্বার্থপর পাশবিক পুরুষ কোথায় চলে গেছে—কে তাকে আর ফিরে পায়? অর্দ্ধাহারে অনাহারে যার জীবন কাটে, তার ওপর আর একটা প্রাণের ভার দিতে তার কোনো সংকোচ হয় নি! রাংতা ভাবে সেই পুরুষের রজ নিয়ে শুয়ে আছে তার পাশের শিশু-পুরুষটী।

আবার কোথাকার বিরাট স্নেহের বাধাহীন প্লাবনে ওর বুক ভ'রে আসে। ওর পাশের প্রাণটী পুরুষের প্রাণ নয়, ওর শিশু সন্তানের প্রাণ। পুরুষ হোতে তো ওর অনেক দেরী...

ধীরে ধীরে পাশ ফিরে একবার ও ছোট পুতুলের মতো সদ্যজাত খোকাটীর পানে তাকায়। মাথায় কালো কালো কতগুলি চুল...কি সুন্দর বড় বড় চোখ দুটো...মিট মিট করে তাকাচ্ছে.... রংটা কালো?...

অস্পষ্ট লাইটের আলোয় ভালো ক'রে দেখা যায় না।

হঠাৎ ছোটো খোকা তার প্রতিবাদের সুরে কেঁদে ওঠে। রাংতা কালো ছেঁড়া কাঁথাটা ওর গায়ে জড়িয়ে বলে, না, না, না, কেঁদো না, কেঁদো না।

* * * * *

রাংতা ছেলের নাম রেখেছে ছট্টু।

টুংরী বললে, নামটী ভালোই হয়চে কিন্তু; তা তোর এখন শরীর ভালো তো?

রাংতা ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়, ভালোই।

রাংচি বুড়া নাক সিঁটকিয়ে বলে, 'নে মাগী, এক ছেলের মা হোয়েই যদি গতর ভেঙে পড়ে, তবে আর হোলো কি? আরো হোক দু' দশটী!'

রাংতা সভয়ে ঘাড় নেড়ে একবার বুড়ার দিকে তাকায়। মিশ কালো মুখের উপর সাদা সাদা এক জোড়া চোখ ওর মনে কি একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

নিটু বলে, হ্যা লো, তোর সেই বেটা কোথায় গেল? ছেলে হ'য়েচে তাকে দেখাতে হ'বে তো!

রাংতা কিছু বলে না, ঠোঁট উল্টে জানাতে চায়, সে কোথায় আছে, কোনো খবরই ত রাখে না।

রাংচি বুড়া আর একটা কিছু বলবার জন্যে মুখ ভেংচাতেই রাংতা বলে উঠে, আমি যাই, আজকার আমার খাবার কিছুই নেই। কিছু পেতে হবে তো! ছেলেটাকে একটু ময়দা গু'লে খাওয়াব, তারও যোগাড় নেই।

রাংচি বুড়ার ভেতরটা ভালো, এ কথা ভিখারী দলের সবাই জানে। ওর কেউ নেই তিন ভুবনের কোথাও। বিকৃত দেহ ওকে চিরদিন লোকের হাসি ও দয়ার পাত্র ক'রে রেখেচে। হেঁদুয়ার ধারে একটা ঘোড়ার-জল-খাবার বাঁধানো কূয়ার মতো আছে, একটা বড়ো গাছের নীচে। তারই কাছে ওর আবাস—অনেক দিন থেকে। হাটুর পরে পায়ের নীচে অংশটা আর ওর ভালো রকম গড়ে উঠেনি। তাই হামাগুড়ি দিয়েই ওর জীবনটা কেটে গেল। শিশু বয়সে যখন প্রথম হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল, কার অভিশাপে সে অবস্থা আর পেরুলো না ওর জীবনে। আবলুশের মতো কালো দেহে মাংসের অভাব নেই। চুলগুলি ছোটো ছোটো করে ছাঁটা—সাধারণতঃ একখানা ছোটো কাপড় ওর কোমরে জড়ানো থাকে—দেহের উপরিভাগকে রাংচি জড়িয়ে রাখবার আবশ্যকতাও বোধ করে না এবং অসুবিধেও আছে যথেষ্ট। ওর আসবাবের মধ্যে কোথা থেকে কুড়িয়ে আনা একখানা নতুন অয়েলক্লথটাই আগে চোখে পড়ে। একখানা বস্তার চটে আবৃত অনেক ছেঁড়া কাপড় একধারে গোছান থাকে। সকালে একখানা ছোটো লালপেড়ে কালো কাপড় গায়ে ও মাথায় দিয়ে লাইট-পোষ্টের কাছে ব'সে ও বলতে থাকে, 'বাবু একটা আধলা, চা খাবো!'

সত্যপরায়ণতাকে প্রশংসা করতেই হয়।

ওর ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূরণ করতে অনেকেরই বাধে না; বিশেষ করে 'চা খাওয়ার' জন্য পয়সার অর্দ্ধভাগ হাসতে হাসতেই অনেকে ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেই আধলা একত্র ক'রে রোজ ওর বেশ কিছু রোজগার হয়।

ভিখারী মহলে খ্যাতি আছে ওর একজন ছোটো খাটো মহাজন বলে।

রাংচি হামাগুড়ি দিয়ে ওর পুটুলি-বাঁধা ন্যাকড়াগুলোর কাছে আসে। দুটো পয়সা বের করে রাংতার হাতে দিয়ে বলে, এক পয়সার ময়দা নিয়ে আয় গে যা। ছেলেটাকে রেখে যা এখানে। মিশ্রী আনিস আর এক পয়সার। টুংরী তো রান্না করচে। ওখানেই খাওয়া হবে 'খন তোর।

রাংতা একটু ইতস্ততঃ করতেই হাতের কাছে একটা কাঠির টুকরো নিয়ে তেড়ে উঠে— যা না মাগী, হাঁ ক'রে রইলি কেন ?

রাংতা চলে যায়। ওর চোখের কোনে দুই বিন্দু জল সঞ্চিত হয়ে আসে।

রাংচি বুড়া ছোটো ছেলেটাকে পাশে শুইয়া দেয়। ওর মনে হয়, যদি নিজেও মা হতে পারতো ! যেন একটা হিংস্র হাসি ওর মনের গূঢ় দেশ থেকে জেগে উঠে। হো, হো, হো, করে হেসে উঠে ও।

রান্নায় ব্যস্ত টুংরী জিজ্ঞেস ক'রে হাসছিস্ কেন লা ?

রাংচি বলে: হাসবো না ? একটা ছেলে হোলো সবে ! মাত্র একটা...ওর হাসি আবার উথ্‌লে উঠে।

টুংরী ভাবে ওর মাথার উত্তাপ বর্দ্ধিত হোয়েছে। তার রান্নায় সে মন দেয়।

রাংচি ভাবে, মা হ'তে ও চায় কেন ? ওর কাছে কতো পুরুষ এসে কতো হাসি গল্প করে। কিন্তু ওর বিকৃত দেহ দেখে, মা-হবার জন্যে হয়তো কেউ ওকে পছন্দই করে না।...

টুংরীকে হঠাৎ একবার জিজ্ঞেস করে রাংচি, হ্যাঁলা টুংরী তোর বড় ছেলেটা কোথায় ?

টুংরী মাংস রান্নায় ব্যস্ত থাকতে থাকতেই উত্তর দেয়, গোল্লায়। কাল দেখা হোলো ঐ বড়ো রাস্তার পাশে তাড়ির দোকানের কাছে। রাত্তিরে বেটা নেশা করবে আর যাবে ঐ মুখপোড়া মাগীদের কাছে। বললাম দেখ্......ফুঁ দিয়ে জ্বালটা একবার জ্বেলে নিয়ে বলে...আমার খাওয়া হয়নি আজ, একটা পয়সা দে।' ব্যাটা এমনি কটমটিয়ে চাইলে .আমি তো ভয়েই অস্থির।

পাশ দিয়ে স্কটিশ কলেজের সুসজ্জিত ছেলে মেয়েরা বই হাতে চলে। রাংচি অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকে। ফিটফিটে মেয়ে, ফুটফুটে ছেলে। তারা যেন কোনো অজ্ঞাত জগতের বাসিন্দা। একটি মেয়ে হয়তো ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসে। রাংচি হেসে বলে, মা একটা পয়সা ...

মেয়েটি একবার ওর পাশের শিশুটির পানে তাকিয়ে দেখে আবার হাসে। রাংচির হাতে একটা পয়সা দিয়েই সে চলে যায়। রাংচির বুকে একটা অজানা আনন্দের শিহরণ জাগে...

মেয়েটি হয়তো ভেবেচে রাংচিই এই শিশুটির মা।...

লজ্জার বয়সটা আর রাংচির নেই...এখন ওর কেবল হাসি আর আনন্দ। দুঃখেও যেন হাসিই পায়। ব্যাথা কাকে ব'লে আর জানতে পারেনা যেন।

রাংতা ফিরে এলে ও বলে, 'দেখ রাংতা তুই এখানেই থাক, কয়েকটা দিন। জায়গাটা ভালোই। বেশ আরামের। তুই বরং ঐ বড়ো বাড়ীটার নীচে রাত্তিরে থাকবি।

এই ব'লে সে বিপরীত দিকের বড়ো কবিরাজী ঔষধালয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়।

রাংতা ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

রাংতার মুখের কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। আজই সকালে বড়ো রাস্তার সিনেমা ঘরের কাছে ওর দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। সে, কে, সে যে তার কি হয়, রাংতা জানে না। এককালে সে লোকটার কৃত্রিম ব্যবহারে রাংতা ভুলেছিল। সে শুধু জানে, সে লোকটা ছট্যর বাবা।

পালাতে পারলেই লোকটার আনন্দ হতো। ধরা প'ড়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে দাঁড়ালো ওর কাছে। ও বললে, 'এই দেখ, তোমার খোকা হোয়েছে।'

লোকটা এমনি কটমটিয়ে চাইলে ওর দিকে, ভয়ে ওর গলা জড়িয়ে এলো। হটাৎ ওর কানে এলো—যদি আর আমার কাছে আসবি একেবারে খুন ক'রে ফেলবো। খবরদার!

রাংতা ব'সে ব'সে ভাবে। আমার কাছে আসবি...কে এসেছিল কার কাছে? সেই যে শ্যামবাজারের বাবুদের বাড়ী ভিক্ষার সময় কে এসে ভাব করেছিল আগে?...

রাস্তার গায়ে বড়ো গাড়ীর ঘর্ষণ ধ্বনি ... মোটরের গদীতে সুখদৃপ্ত, নরনারীর দ্রুত গতি... রাংতা শুষ্ক চোখে অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকে।

পাশ দিয়ে চলে যায় কোনো স্বামী আর তার স্ত্রী। ঝকঝকে কাপড় ও গয়নায় মেয়েটির দেহ সজ্জিত। রাংচি বুড়ীর দিকে তাকিয়ে তারা হাসচে। রাংচি তখন কি ভেবে যেন ঐ ছোট খোকাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কেবল নিজের মনে হাসছিল।

রাংতা ভাবে ঐ মেয়েটির আর ছেলেটির কথা...ওর কানে বেজে ওঠে...ফের যদি আমার কাচে আসিস, একেবারে খুন ক'রে ফেলবো।

একধারে স্কটিশ কলেজের বিপরীত দিকে টুংরী রন্ধন রত। তিনটে ইট সাজিয়ে উনুন করা হোয়েছে। রাস্তা থেকে একরাশি কাগজ আর খড়কুটো জোগাড় করা হোয়েচে। দশ বারো রকমের শাক পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখা হোয়েচে একখানা কাগজের ওপর। এদের সেদ্ধ হবে। ভাত শেষ হোয়ে গিয়েচে...মাটির একটা হাঁড়ির ভেতরে তাকে সযত্নে ঢেকে রাখা হয়েচে। রাংচি চার পয়সার মাংস আনতে দিয়েছিল...টুংরী ফেলে দেওয়া একরাশ পচা মাংস এনে হাজির করেচে—তারই রন্ধনে সে একেবারে ব্যস্ত।

সাজপোষাকের উপর টুংরীর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। ওর গায়ে মাংসের অভাব শিঁটকে চেহারা...রং মিশ কালো...অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ দুটি মিট মিট করে। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। তবু কোথাথেকে টিপ জোগাড় করে আটা দিয়ে কপালে লাগিয়ে রাখবে...

টিপ না পেলে গাছের পাতা তুলে নিয়ে ছোটো ক'রে ছিঁড়ে তা দিয়েই টিপের কাজ চালাবে ও। গলায় কোথাথেকে কুড়িয়ে আনা বড়ো বড়ো পুঁতির এবং কাঁচের মালা। হাতে লোহা, রাংতা এবং শাঁখের একরাশ চুড়ি। যে কয়গাছা চুল আছে তাকেই রোজ ও দড়ি দিয়ে সযত্নে বাঁধে।

হেদুয়ার ঘাটে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ ওর স্নান হয়। রাংচি বুড়ীর এক পয়সার সাবানখানা কখনো বা লুকিয়ে, কখনো বা অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে যায়। অতি সযত্নে গায়ে সাবান মেখে নিজের আরাম নিজেই উপভোগ করে।

রান্না শেষ হ'লে খাবার পালা আসে। ময়দা গুলে রাংচি বুড়ীই ছট্টুকে খাইয়ে দেয়। তিনজনে একসঙ্গে খেতে ব'সে রাংচির গল্প শোনে। রাংচি অনেক আজগুবি গল্প বলতে পারে।

রাংচি বলে ..অনেকদিন আগে.. অনেক রাত্তিরে আমি তখন শ্যামবাজারে একটা জায়গায় থাকি। রাত্তিরে ঘুম আসেনি আমার। হঠাৎ দেখি দুটো লোক দৌড়ুচ্ছে। একটা লোক আর একটাকে ধ'রেই গলায় এক কোপ্...মাথাটা লুটিয়ে পড়লো রাস্তায়—লোকটা তবু দৌড়োয়। তার পরে খানিক দূর গিয়ে টিপ্...

মাথাহীন লোক কি ক'রে দৌড়োয় রাংতা ভেবেই পায় না...রাংচি বলে..."পরদিন পুলিশে পুলিশে রাস্তা লালে লাল..."

হঠাৎ তার চোখ পড়ে হেদুয়ার গেটের কাছে বুড়ো লোকটার দিকে। লো'কটা প্রায় সারাদিনই শুয়ে থাকে। রাংচির কেমন যেন মনটা ব্যথা করে। চেঁচিয়ে বলে, ও বুড়ো এদিকে এসো দিকি।

দুপুরের রৌদ্রে রাস্তা আগুনের মতো গরম। গ্রীষ্মের গরমকে রাস্তায় দ্বিগুণ মনে হয় যেন। রাস্তা জনবিরল। দুএকটা লোক মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। বাস ও লরীর ঘর্ষণে দিগন্ত কেঁপে ওঠে।

বুড়োটা ধীরে ধীরে অতি কষ্টে উঠে আসে...ওর মুখে আতংকের চিহ্ন।

রাংচি বুড়িকে যেন সবারই ভয়।

রাংচি মাথা নেড়ে বলে, বলি, দু' আনা পয়সা যে ধার নেওয়া হোলো...দেওয়াটির নাম নেই যে...

বুড়ো কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে : 'ভিক্ষা পাইনে যে, আজ দুদিন খেতে পাইনে...'

রাংচি হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে যায়। দুদিন বুড়োটা খেতে পায় না...ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। চোখ দুটো বসে গেছে। মুখ ভেঙ্গে হাড় ক'খানা শুধু কোনমতে জায়গা ক'রে আছে। গ্রীষ্মের দুপুরে ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মতো ওর চেহারা।

রাংচির চোখের কোণটা জ্বালা ক'রে ওঠে। বলে, বোসো, এই আমার পাতে...দেতো টুংরী, আমার ওবেলার ভাতটা ওকে।

বুড়োর সংকোচ কাটে না...ক্ষুধার তাড়নায় ও ভেতরে দৈত্য জেগে ওঠে...তবু বলে, তুমি খাবে না...

রাংচি মুখ ভেংচিয়ে বলে...'আ মলো, বুড়োর আধান নাই ঠাঠান আছে তো। নিজের কথা ভাব্ বেটা। আমার দুদিন না খেলে কি হয়? মরতে তো বসেছিস্।' ব'লে বিশ্বাসের সহিত নিজের মাংসল দেহের প্রতি একবার।

বুড়ো খেতে ব'সে...আনন্দের আতিশয্যে তার হাত পা কাঁপতে থাকে...দুগ্রাস ভাত মুখে দিয়ে বলে...আ, খাসা রান্না। আর অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই; পেটে খানিকটা ভাত গেলে বুড়ো রাংচি বুড়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, পয়সা তোমার আমি রাখবো না। দুদিন সবুর করো, দিয়ে দেবই। হঠাৎ মুখ খিঁচে বুড়ো উঃ করে ওটে। রাংচি বলে, কি হোলো। বুড়ো, 'বড় ব্যথা পেটে ও বুকে আজ দুদিন' বলেই আবার খেতে সুরু করে।

রাংতার মুখে ভাত রোচে না। কি বিশ্রী মাংস ... দুর্গন্ধে চারদিক ভ'রে গেছে...টুংরী কুক্কুরীর মতো তাই দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্চে। শুধু ভাত খানিকটা খেয়ে রাংতা উঠে প'ড়ে। ওর মনে হয় বুড়োর কথা।

রাংতার ভেতরে এখনো মানুষের কোমলতা আছে অবশিষ্ট তার যৌবন এখনো যায়নি পেরিয়ে, সবে হয়েচে সুরু। বুড়োর মতোও ওকে হ'তে হ'বে নাকি?...

ছেলেটা ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে। খাওয়া নেই...একটু দুধ নেই ওর বুকে ... ছেলেটা যেন নিস্তেজ হয়ে পড়চে দিন দিন। আট মাসের ছেলে দেখলেই মনে হয় যেন দু'মাসের।

....উদাস নিস্পৃহ ভাবে রাংতা ভাবে।

তার পরদিন সকালে দেখা যায় বুড়োটা মুখ থুবরে পড়ে আছে পথের এক ধারে। রাংচি ওর কাছে চুপ করে বসে আছে।

রাংতা বলে, কি হোলো গো, রাংচি-মাসী?

উদাসভাবে রাংচি বলে, 'কি আবার হবে...ম'রে গ্যাছে।'

রাংতা ভাবে ম'রে গ্যাছে? কাল দুপুরে মানুষটা ভাত খেলো...তাজা শক্ত জ্যান্ত মানুষ—আজই সে ম'রে গেল?

রাংচি হামাগুড়ি দিয়ে এক পাশে স'রে আসে। কোনো দুঃখই যেন ওর গায়ের পুরু কালো

চামরা ভেদ ক'রে আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। বলে, কাল রাত্তির প্রায় ছুটো হবে... বুড়োর গোঙানি শুনে আমি তো জাগলুম...দেখি কেমন ছটফট কচ্চে!

বললুম .... কি গো, এমন কচ্চ কেন?

বুড়ে যেন একবার আমার দিকে চাইলে: চি চি ক'রে বললে, 'বড়ো ব্যাথা বড়ো জ্বালা... রাত চারটা হবে, ম'রে গেল।

রাংতা ভাবে, বুড়ীর ভেতরে মানুষের হৃদয় নেই...একেবারে পাষাণ।

কতো লোক যায়, মরা দেহটার কাছে একটু দাঁড়ায়:—কেউ হয়তো, আহা, ব'লে সহানুভূতি জানায়। আবার নিজের পথে চলতে সুরু করে। রাংচির ভীষণ একটা হিংস্র হাসি বুকের ভেতর তোলপাড় ক'রে। যারা বেঁচে থাকতে বুড়োর পানে তাকিয়েই দেখেনি কোনো দিন, আজ মরার পরে বলচে, আহা। লোকটা মরে গিয়ে লোকের দয়া দিয়ে কি করবে!

হো হো হো ব'লে রাংচি হেসে ওঠে হটাৎ ওর চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে।

রাংতা ভাবে, এতো হাসচে বুড়ী, হাসতে হাসতে কেঁদেই ফেল্লে ... পাগল ...।

বিনয় ঘোষ

সমরকালীন আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে লিখতে বসে' আজ প্রথমেই বহু প্রচারিত একটী কথা মনে হয় যে "When war is declared, truth is the first casualty." —অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সত্যের মৃত্যু ঘটে। আর্থার পন্‌সন্‌বি বলেছেন: There must have been deliberate lying in the world from 1914 to 1918 than in any other period in the world's history. In war time, failure to lie is negligence, the doubting of a lie is a misdemeanour, the declaration of a truth is a crime." এবারও যুদ্ধ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যার জয়জয়কার হ'চ্ছে, সাধারণ লোক যাদের বৈজ্ঞানিক সুচিন্তার কোন বালাই নেই তারা এই সব মিথ্যা বস্তা বস্তা হজম করছে, আর যারা নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসংখ্য নরবলি দিচ্ছে তাদেরও কাজ হাসিল হ'চ্ছে। আর যাই হোক্ অন্তত মিথ্যা প্রচারের কৌশলের জন্য বাহবা না দিয়ে উপায় নেই, কারণ এই প্রচারের সব যন্ত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজান আছে যে যেখানেই চাবি ঘুরুক না কেন, তৎক্ষণাৎ দেশবিদেশে "রয়টার" তাকে ঢাক পিটিয়ে দেবে, সহরে সহরে বার্ত্তাজীবীরা কোন বিচার না করেই তার তালে তালে নর্ত্তনকুর্দ্দন সুরু করবেন, ঘরে ঘরে অফিস ফেরত চাকুরেরা রেডিওর মারফত শুনবেন যে জার্ম্মানির মধ্যে হিটলারের সঙ্গে গোয়েরিংএর মনোমালিন্য হয়েছে, হিটলারের পতন কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র—আর ওদিকে সোভিয়েটের লালফৌজ ফিন্‌ল্যাণ্ডে কেবল পিছু হটছে, হাজারে

মরছে, ষ্ট্যালিন্ হতভম্ব হ'য়ে সেনাপতিদের তলপ করেছেন, রীতিমত সাজা দেওয়া হবে, মুরমান্স্ক বা লেনিনগ্রাডের সমর কর্ত্তাদের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে ফিনিশ সমস্যার সমাধান সম্ভব হ'ল না, সেইজন্য জার্ম্মানিতে সমর বিজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে—এইরকম আরও কত কি তার কি অন্ত আছে? শুধু তাই নয়, আজকাল ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগও সুরু হয়েছে—এখানেই সিনেমাতে দেখা যাবে সোভিয়েট বালিকা প্যারীতে এসে জীবনের অপূর্ব্ব হাস্যমুখর আলোক দেখে চমৎকৃত হ'য়ে গেল, সেখানকার একজনকে বিয়ে করে' সে ফ্রান্সেই থাকতে চাইল, সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের লৌহবাঁধুনির মধ্যে আর ফিরে যেতে চাইল না। কোন দিকে নিস্তার নেই। ভোরে উঠে খবরের কাগজ নিয়ে বসবেন, সেখানে দেখবেন News Editor এর কৃতিত্ব. "রয়টারের" সংবাদটিকে কেমন সুন্দর তিনি ছোটমেয়েদের পুতুল সাজানোর মত করে' সাজিয়েছেন "রুষ সৈন্যবাহিনীর চল্লিশ মাইল পশ্চাৎগমন"—"দেড় হাজার রুষ সৈন্য নিহত"—"অকস্মাৎ রুষ সৈন্যের হেল্‌সিঙ্কির শ্রমিক বস্তির উপর বোমাবর্ষণ"—ইত্যাদি। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলেন, পথে লাউডস্পীকারের মুখ দিয়ে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি হ'চ্ছে, না দাঁড়ালেও, চলতে গিয়ে শুনতেই হবে। পার্কে, কাফেতে, সব জায়গায় ঐ সংবাদ নিয়ে মাতামাতি। সিনেমায় ঐ একই দৃশ্য পর্দ্দায় অভিনীত হ'চ্ছে। সুতরাং ঘরে ফিরে এই সংবাদ সত্য না ভেবে আর উপায় কি? চোখদিয়ে, কান দিয়ে, মুখ দিয়ে ঐ সংবাদ মাথায় ঢুকছে, অতএব বারবার শুনে এ সব উক্তি যুধিষ্ঠিরের কথার মত সত্য মনে হয়। তা ছাড়া আমাদের দেশের সাধারণ লোকের খবরের কাগজ পড়া এমনিই অনভ্যাস, তার উপর দৈনিক কাগজের ছাপা সংবাদের সঙ্গে মনুসংহিতার উক্তির মধ্যে তাদের কাছে কোন প্রভেদ নেই। খবরের কাগজে লিখেছে অতএব তাকে অবিশ্বাস করা তাদের স্বভাবের বাইরে। এই অবস্থার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির সাময়িক গতি বিশ্লেষণের যে কত অসুবিধা তা সহজেই বোঝা যায়। তবু লিখতেই হয়, বিশেষ করে' মিথ্যাকে বোঝবার শক্তি যতদিন থাকে এবং সত্যের জয়ে বিশ্বাস যতদিন না হারানো যায়।

রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড

একজন বললেন "রাশিয়া সম্বন্ধে সব তো প্রশস্তি গান, দিলে তো এইবার ফিন্‌ল্যাণ্ড ঘায়েল করে'? অতবড় একটা বিরাট দেশ এতদিনে ফিন্‌ল্যাণ্ডের এক ইঞ্চি জায়গাও তো নিতে পারলে না?" বুঝলাম "রয়টারের" manufactured product, শান্তভাবে কথা বলাই উচিত। বললাম: হেল্‌সিঙ্কির ইস্তাহার পড়ে' বল্‌ছেন বুঝি? আচ্ছা, বলতে পারেন যুদ্ধ যখন রাশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ড দুই দলের মধ্যে হ'চ্ছে, তখন শুধু ফিন্‌ল্যাণ্ডের ইস্তাহার জারী করা হ'চ্ছে কেন? রাশিয়ায় কি সংবাদ দেবার মত কিছু নেই? গোপনের কি হেতু থাকতে পারে? নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর কিছু আছে, না হ'লে লেনিনগ্রড্ বা মুরমান্‌স্‌ক্ মস্কো থেকে ইস্তাহারগুলো আমাদের

জানান হয় না কেন?" আবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন হ'ল অল্ রাইট! এতদিন সময় লাগবার কি কারণ আছে রাশিয়ার? শ্রমিক কৃষক দিয়ে সৈন্য গড়লে এই হয়, বুঝলেন?" বুঝলাম জবরদস্ত বুদ্ধিজীবী। বললাম: "রাশিয়া তো জার্ম্মানি নয়, যুদ্ধের উদ্দেশ্যও দু'জনের এক নয়! প্রথমতঃ শীতকাল, মেরু অঞ্চলের শীত সম্বন্ধে ধারণা থাকলেই বুঝবেন সেখানে এই সময় রীতিমত যুদ্ধ করা কত কঠিন। তা ছাড়া প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ করা লাল ফৌজের কৌশল নয়। রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নয়, সে সাম্রাজ্য লুঠ করতে আসে নি। ফিনিশ জনসাধারণকে সে যতদূর সম্ভব নিরাপদ রাখতে চায়, শুধু ম্যানারহাইম্—কালিও-ট্যানার প্রমুখ বর্ত্তমানের যে শাসকগোষ্ঠী তাদের বিতাড়িত বা ধ্বংস করতে চায়। এ-কথা জানেন যে ফিন্ল্যাণ্ডে আর একটি গবর্ণমেণ্ট নূতন গঠিত হ'য়েছে, সাধারণের গবর্ণমেণ্ট, কুইসিনেন্ তার মন্ত্রী। ফিনিশ জনগণের এই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রাশিয়া পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করেছে। সুতরাং তাকে সাহায্য করবার রাশিয়ার নৈতিক কর্ত্তব্যও আছে। যুদ্ধ যে গৃহযুদ্ধ নয় তাই বা কে জানে? যুক্তিমত তাই হওয়া উচিত। রাশিয়া ফিনিশ জনগণকে সাহায্য করেছে, সেখানে সাধারণের মধ্যে People's Army গঠন করেছে, এবং পাশাপাশি লাল ফৌজ যুদ্ধও করেছে। ফিন্ল্যাণ্ডকে ধ্বংস করা রাশিয়ার উদ্দেশ্য নয় তাকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। ফিন্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠী রাশিয়ার শত্রু এবং ফিনিশ জনগণের শত্রু। এই শাসকগোষ্ঠী অন্যান্য রাষ্ট্রে হাতের পুতুল। মানে আছে নিশ্চয়ই, গত মহাযুদ্ধের সময় এই শাসকগোষ্ঠীই অন্যান্য চোদ্দটি রাষ্ট্রের সৈন্যকে অনুমতি দিয়াছিল ফিন্ল্যাণ্ডের বুকের উপর দাঁড়িয়ে নূতন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। এই ম্যানারহাইম্ ১৯১৭ সালে তাঁর 'হোয়াইট্ গার্ড' সেনাবাহিনী দিয়ে ফিন্ল্যাণ্ডের ১৫,০০০ নরনারী শিশুকে হত্যা করেছিলেন, প্রায় ৫০,০০০ সোস্যালিষ্ট্ ও কম্যুনিষ্ট-দের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন, বন্দী করেছিলেন। এই যে ৭০।৭৫ হাজার লোক এরাই তো ফিন্ল্যাণ্ডের জনগণ, এদেরই দেশ। অথচ এই শাসক গোষ্ঠী যতদিন থাকবেন ততদিন এদের মুক্তি নেই, রাশিয়ারও বিপদের সম্ভাবনা থাকবে। সেইজন্যই ফিনিশ জনগণের মুক্তির জন্য রাশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সেইজন্যই এই যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে করতে পারছে না। কৌশলে প্রধান স্থান ও ঘাঁটিগুলো আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে বৃটেনের মূলধন নিয়ন্ত্রিত পেট্সামোর নিকেল খনিগুলো রাশিয়া দখল করে' নিয়েছে এবং উত্তর দিকে অনেকখানি এগিয়েছে। তারপর রাশিয়ার সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে নরওয়ের নার্ভিক বন্দর পর্য্যন্ত আয়ত্তে আনবার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, কারণ এই বন্দর নিলে আত্লান্তিক মহাসাগর থেকে উত্তর সাগরে আসার পথ রাশিয়া আগ্লে থাকবে। এই সব কারণেই প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা রাশিয়া প্রয়োজন মনে করে না, কারণ ফিনিশ জনগণকে যদি সে বিপ্লবের জন্য তৈরী করে' দিতে পারে এবং ফিনিশ প্রতিক্রিয়াশীল বণিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার মত তাদের ইতিমধ্যে শক্তিমান্ করে' দিতে পারে তা হ'লেই রাশিয়ার উদ্দেশ্য

সিদ্ধি হয়। অবশ্য উত্তর দিক থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পথ বন্ধ করবার জন্য কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও স্থান রাশিয়ার আয়ত্তে থাকা আবশ্যক। এ-ছাড়া রাশিয়ার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং যুদ্ধ দ্রুতবেগে করবার তার দিক থেকে কোন তাগিদ নেই।" আর একদিন আর একজন প্রশ্ন করলেন: "শীতকালে রাশিয়ার যুদ্ধ করবার কি দরকার ছিল? পরে করলেই তো হ'ত।" খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। উত্তর দিলাম: "তা ছাড়া রাশিয়ার কোন গত্যন্তর ছিল না। কারণ দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণসাগর দিয়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করার পথ খোলা রইল। তুরস্কের শাসক গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রাশিয়ার সঙ্গে পরস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করতে রাজী হ'ল না। রাশিয়া চেয়েছিল যে একমাত্র কৃষ্ণ সাগরের রাষ্ট্রগুলি ভিন্ন অন্য সব রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজের বস্‌ফোরাস্ থেকে কৃষ্ণসাগরে আসার পথ বন্ধ করে দিতে হবে। তুরস্ক রাজী হল না এবং মলোটভের ভাষায় "Turkey...thereby definitely discarded the policy of strict neutrality and entered into the orbit of the developing European war."—অর্থাৎ তুরস্ক নিরপেক্ষতা বর্জ্জন করে' বর্ত্তমান যুদ্ধে জড়িত হবার পথ উন্মুক্ত রাখল। রাশিয়ার বিপদ দূর হল না, দক্ষিণদিকে ব্ল্যাক সি দিয়ে আক্রমণের তার যথেষ্ট আশঙ্কা রইল এবং সেইজন্য উত্তরে ফিন্‌ল্যাণ্ড দিয়ে আক্রমণের পথ বন্ধ করা এত বেশী জরুরী। সুতরাং রাশিয়াকে সত্বরই মীমাংসা করতে হল, কোন উপায় নেই।"

ইতালী ও বল্‌কান্ এলাকা

প্রশ্ন। যুদ্ধ ভবিষ্যতে কি ভাবে গড়াতে পারে? ইতালীর ভূমিকা কি?

উত্তর। বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে প্যারী পৌঁছানর আর না হয় সুইজারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সের পূর্ব্ব দিকে প্রবেশ করা জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য হতে পারে। সম্প্রতি বেল্‌জিয়ম্ ও হল্যাণ্ডে সমর সজ্জা সুরু হয়েছে, সমস্ত সৈন্যদলের ছুটি বাতিল করে' দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে এক চাঞ্চল্য পড়ে' গেছে যে জার্ম্মানি বেল্‌জিয়াম্ বা হল্যাণ্ড আক্রমণ করতে পারে। বেল্‌জিয়াম্ ও হল্যাণ্ড দখল করতে পারলে জার্ম্মানি এমন কতগুলো ঘাঁটি আয়ত্তে আনবে সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে বোমা বর্ষণ করা সুবিধা হবে। কিন্তু বেল্‌জিয়াম্ বা হল্যাণ্ড যে কোন দেশ আক্রান্ত হ'লেই দু'টি নিরপেক্ষ দেশকেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হবে। কিছুদিন আগে সেইজন্য বেল্‌জিয়ামের প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন যে ডাচ্ সীমান্ত লঙ্ঘন করবার অর্থ হ'চ্ছে বেল্‌জিয়াম্ নিরপেক্ষতাও ভঙ্গ করা।

সুইজারল্যাণ্ড ফ্ল্যাঙ্কে আক্রমণ জার্ম্মানি নয়ত এখন না ও করতে পারে। কারণ সেখানে ইতালীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের আশঙ্কা আছে এবং সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তিও আছে।

জার্ম্মানি হাঙ্গেরীর সীমান্ত লঙ্ঘন করে' দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রবেশ করতে পারে। বর্ত্তমানে

এই বিষয় ইতালীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে। কেউ কেউ বল্‌ছেন যে ইতালী বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে জার্ম্মানি ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে। এ ধারণার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এক সময় জার্ম্মানির বোল্‌শেভিক্‌-বিরোধী বুলিতে বৃটেন ও ফ্রান্স আত্মহারা হয়ে যেমন পৃথিবী ব্যাপী ঢাক পিটিয়েছিল এবং হিট্‌লারের কাছে পদে পদে মাথা হেঁট্‌ করেছিল, আজ ইতালীকে নিয়ে সেই অভিনয়ই হ'চ্ছে, সেই একই বোল্‌শেভিক্‌ বিরোধী যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কিন্তু এই বল্‌কানও বৃটিশ কূট নীতির ডিগ্‌বাজী খাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তার কারণ গত মহাযুদ্ধে ইতালীর নামমাত্র মিত্র অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ইতালীর কিছু দাবী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে জার্ম্মানির বিরুদ্ধে ইতালীর কোন দাবী নেই। ইতালীর সমস্ত দাবী এখন বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রয়েছে এবং সে সব দাবী এখনও তার মেটে নি। সেই জন্যই আবিসিনিয়া, আলবেনিয়া ও স্পেনে ইতালী যে নীতি অনুসরণ করেছে, সে-নীতি আজ তার পরিবর্ত্তন করবার কোন হেতু নেই। জার্ম্মানির সঙ্গে একত্রে লুণ্ঠনে যোগদান করলে এখন তার যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে এবং বলকানে সে-ইচ্ছা তার রীতিমত ভাবে পূরণ হ'তে পারে। এর আভাষ সেনর গেয়ডা ও কাউণ্ট সিয়ানো সম্প্রতি দিয়েছেন। ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের সাম্প্রতিক অধিবেশনে গেয়ডা বলেছেন বল্‌কানের নিরাপত্তা ইতালীর কাম্য হ'লেও, কোন রকম ব্লক্‌ গঠন ইতালী পছন্দ করে না। কথাটা বল্‌কানের যে সব রাজনীতিকরা একটি বৃটিশ ও ফরাসী পন্থী বল্‌কান্‌ ব্লক্‌ গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের লক্ষ্য করেই বলা হ'য়েছিল। ইতালীর এই মনোভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় যুগোশ্লোভিয়ার পক্ষে এই ব্লকে যোগদান করা সম্ভব হবে না এবং বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তার নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করবার জন্য কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র চেষ্টা করলে সে তাতে বাধা দেবে। জার্ম্মানি দক্ষিণ পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রবেশ করলে, রাশিয়ার পক্ষে রুমানিয়ায় প্রবেশ করাও আশ্চর্য্য নয় এবং ইতালী যতদূর সম্ভব এই সময় একত্রে তার ঐতিহাসিক দাবী পূরণের চেষ্টা করবে।

চীন ও জাপান

প্রশ্ন। চীন ও জাপানের ভবিষ্যৎ কি ?

উত্তর। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধবার পরে চীনের যথেষ্ট সুবিধা হ'য়েছে এবং তার জয়ের পথ ক্রমেই সুগম হ'য়েছে। জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই খারাপ এবং য়ুরোপের যে সব রাষ্ট্র তাকে নিকেল, টিন্‌ প্রভৃতি সরবরাহ করত তারা এখন সে সব কিছু রপ্তানি করতে পারবে না। জাপানের চারিদিক দিয়ে বিপদ। ইতিমধ্যে আর একবার মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে এবং মিতুমাসা ইয়োনাই নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আরিতা হ'য়েছেন বৈদেশিক মন্ত্রী। ইয়োনাই যখন হিরান্নুমা মন্ত্রিসভার নৌ-সচিব ছিলেন তখন তিনি কোমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিকে

সামরিক চুক্তিতে শক্তিশালী করে' পরিণত করবার প্রস্তাবের ভীষণ বিরোধিতা করেছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার নীতি moderate হওয়াই সম্ভব। চীনের ব্যাপার গুছিয়ে নেওয়া কঠিন হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চীং ওয়াই এর যে দলের উপর জাপানের আশা ভরসা ছিল সেই ওয়াং এর দলে ভাঙ্গন ধরেছে। তাঁর তিনজন সমর্থক পলায়ন করেছেন। ইতিমধ্যে চীনের নূতন অস্ত্রশস্ত্র তৈরী পূর্ণোদ্যমে চলেছে, নূতন সৈন্য গঠন চলেছে। কোয়ানটুং-এ নূতন কুয়োমিনটাং-এর যে সভা হ'য়ে গেল তাতে 'Resistance' ও 'Reconstruction' এর যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করলে চীনের দ্রুত জয় অবশ্যম্ভাবী। সোভিয়েট্ রাশিয়ার সাহায্যও এই সময়ে চীনের অনেক উপকারে আসবে।

১৭ই জানুয়ারী, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

বড়লাটের বক্তৃতা—

বড়লাটের বিভিন্ন বক্তৃতাগুলির পরস্পরের মধ্যে এতই সাদৃশ্য যে—বড়লাট না হোয়ে বক্তা অন্য কেউ হোলে সর্বসাধারণ দুই একটি বক্তৃতা পড়বার পর আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো। কিন্তু যেহেতু বক্তা স্বয়ং বড়লাট—পুনরুক্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও--লোকে আগ্রহ কোরে তা পড়ে—আমরাও পড়েছি ও অন্যের মত আমরাও হতাশ হোয়েছি।

তিনি পুনরায় বলেছেন যে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ দানই লক্ষ্য এবং মহাত্মাজীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে—এ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বাজে মার্কার নয়—একেবারে বিশুদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার মার্কার মাল। তবে যুদ্ধ শেষ হবার আগে এর আমদানির কোন সম্ভাবনা নেই, যুদ্ধের পর "যথা সম্ভব সত্বর" ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন সম্পর্কে পুনরালোচনা হবে এবং সে আলোচনার সময় "ভারতীয় জনমতের" সহায়তা নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার আগে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে তাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া হবে।

কংগ্রেসের দুইটী দাবীর একটীও এতে স্বীকৃত হয়নি। প্রথমতঃ কংগ্রেস দাবী কোরেছিলেন শাসন-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বীকার, ২য়তঃ কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের মুখপাত্র স্বরূপ স্বীকার কোরে তার সঙ্গেই মীমাংসার আলোচনা। দ্বিতীয় দাবীর উত্তরে সেই মামুলি জবাব পাওয়া গেছে যে যতদিন না মুসলমান ও তপশীল মাইনরিটী প্রশ্নের মীমাংসা হোয়ে ঐক্যবদ্ধ দাবী উত্থাপন করা হোচ্ছে ততদিন কংগ্রেসকে মুখপাত্ররূপে স্বীকার করা চলবে না।

কাজেই বর্তমান অচল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখছিনা—বড়লাট কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আশা করছেন তার কোন হেতু নেই, কারণ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল বর্ত্তমানের চাইতে বেশী ক্ষমতা না পেলে পুনরায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন না এ স্পষ্ট কোরে জানিয়েছেন। ২য়তঃ আমরা বহুবার বলেছি—আবারও পুনরুক্তি করছি—তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় মাইনরিটি প্রশ্নের

মীমাংসা হবে না কোনকালে—বর্ত্তমান মাইনরিটি প্রশ্নের মীমাংসা যদি বা কোন ভাবে হয়—অন্য কোন মিঃ জিন্না নূতন এক মাইনরিটি প্রশ্ন নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পথরোধ কোরে দাঁড়াবেন।

এ ছাড়া সমস্ত বক্তৃতার মধ্যেই রয়েছে চমৎকার অস্পষ্টতা। যুদ্ধের পর ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন সম্পর্কে পুনরালোচনার সময়—"ভারতীয় জনমত গ্রহণের যে প্রচুর আশ্বাস দেওয়া হোয়েছে তাতে আশঙ্কান্বিত হবারই কারণ ঘটেছে। "জনমতের সহায়তা" যে কী ভাবে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার নির্দ্দেশ নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মনে করবার প্রচুর হেতু রয়েছে যে আবার এক গোলটেবিল বৈঠকের মারফতে জনমত গ্রহণের আর এক দফা অভিনয় হওয়া অসম্ভব নয়। History repeats itself. কিন্তু এ প্রাণান্তকর repitition—অতিধৈর্য্যশীল ভারতীয়ের পক্ষেও বড় বেশী হোয়ে পড়ছে। এই প্রহসনের অবসান ঘটাতে পারে জাগ্রত জনসংঘ তার দাবীকে অপ্রতিহত করে। ১৯৪০ এর ভারত কি তার জন্য প্রস্তুত নয়?

নূতন স্বাধীনতা-সঙ্কল্প—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গত ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনে—আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের জন্য যে নূতন সঙ্কল্প বাক্যের ব্যবস্থা কোরেছেন সে সম্পর্কে দেশব্যাপী সমালোচনা হোয়েছে। এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে চরকা ও সূতাকাটা সম্পর্কে এতটা অহেতুকী আগ্রহ দেখিয়ে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করা কেন যে মহাত্মা গান্ধী প্রয়োজন মনে করলেন বেশীর ভাগ লোকের কাছেই তা দুর্ব্বোধ্য ঠেকেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এর পেছনে সুচিন্তিত সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের সংকল্পে, অন্যান্য জাতির মত ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার—এবং তা লাভ করবার জন্য অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার অংশ সম্পর্কে কারো অভিযোগ নেই। কিন্তু তারপরেই রয়েছে "আমরা বিশ্বাস করি যে, সাধারণভাবে অহিংস হইতে হইলে, বিশেষতঃ অহিংসার পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে খাদি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এই তিনটী গঠনমূলক কার্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক।" উপরোক্ত কাজগুলি সম্পর্কে আমাদের বিরুদ্ধতা নেই—অন্যান্য অনেক প্রকার ভাল গঠনমূলক কাজের মধ্যে এই তিনটীও অন্যতম—কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈন্যদলকে প্রস্তুত হবার জন্য এ তিনটী কাজ অত্যাবশ্যক তা আমরা বিশ্বাস করিনা। গত ২০ বৎসর যাবৎ চরকা আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বরাজ আজ পর্য্যন্ত করতলগত হয়নি। বৃটিশ অধিকারের পূর্ব্বেও ভারতবাসী চরকা কাটতো, চরকা অধীনতা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারেনি। তারপর খাদি পরিধানই অহিংস মনোভাবকে জন্ম দেয় না—খাদি পরে না এমন অহিংস ও বিশুদ্ধ খাদি-পরিহিত অনেক ঈর্ষ্যাকলহপরায়ণ লোকের খবর আমরা সকলেই দিতে পারি। সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রশংসাযোগ্য কাজ সন্দেহ নেই—

কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় প্রথমটী অসম্ভব বলে মনে করি আর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ না হোলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চল্‌বে না এ যুক্তি মানা কঠিন। কাজেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে উপরোক্ত কাজগুলির উপযোগিতা দেখছি না।

তারপর মহাত্মাজীর শিষ্যদের মধ্যেও এ সম্পর্কে ভাষ্যের পার্থক্য রয়েছে, পণ্ডিত জওহরলাল বল্‌ছেন সংকল্পের ভেতরে চরকার বিষয় ঢোকানো হোয়েছে এমন একটী "মানসিক ও আত্মিক পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির জন্য যাতে যথার্থ সত্যাগ্রহ সম্ভব" এবং তিনি এই পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করেছেন সূতা কাটা সুরু কোরে। সর্দ্দারজী বলছেন "চরকা ব্যতীত আর কোন উপায়ে দেশকে সংহত ও শক্তিশালী করা যাবে না এবং যাদের এতে বিশ্বাস নেই তাদের উচিত সরে যাওয়া এবং অন্যকে কাজ করতে দেওয়া।" এক্ষেত্রে সর্দ্দারজীর অবস্থা "রাজা যত বলে, পারিষদ বলে শতগুণ।" চরকা সম্পর্কে যাদের আপত্তি রয়েছে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত তাদের জন্য পুরোণো সংকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়েছেন—কিন্তু কংগ্রেসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সর্দ্দারজী "নিকাল যাও" সুরে তাদের জন্য করেছেন অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। ডাঃ পট্টভি বলছেন "যন্ত্র ও খদ্দর পরস্পর বিরোধী দুই বস্তু। ভারতবর্ষকে যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে কারণ যন্ত্র হিংসার প্রতীক।" জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতি একদা সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিতজী কিন্তু বল্‌ছেন "চরকা ও যন্ত্রের মধ্যে কোন বিরুদ্ধতা নেই, ভারতের অর্থনীতিতে কুটীর শিল্পও বৃহৎ যন্ত্রোৎপাদিত শিল্প উভয়েরই পাশাপাশি স্থান হবে।" এখন সর্ব্বসাধারণ এই বিভিন্ন ও কোন কোন স্থানে পরস্পরবিরোধী ভাষ্যের মধ্যে কোনটী বিশুদ্ধ গান্ধীমার্কা ভাষ্য তা বুঝবে কিভাবে? আমাদের অবশ্য বিশ্বাস যে ডাঃ পট্টভির ভাষ্যেই মহাত্মাজীর কথা পাওয়া গেছে। এবং এইজন্যই এই চরকার বিষয়টীতে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গান্ধীবাদের যে দার্শনিক ভিত্তি ও সমাজগঠনের পরিকল্পনা তাতে শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার করা হয়নি—শ্রেণীসহযোগের ভিত্তি তার আশ্রয়। কাজেই বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতা ও তার আনুষঙ্গিক শ্রেণী সংঘাতকে তিনি আশঙ্কার চক্ষে দেখেন, এই শ্রেণী সংঘাতকে তিনি জন্ম দিতে চান্ না—কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী সংঘর্ষ রয়েছে—প্রজা ও জমিদার, মালিক ও শ্রমিকে যে স্বার্থের বিভেদ রয়েছে তাকে তিনি কিভাবে চরকায় সুতো কেটে দূর করবেন আমাদের বোধগম্য হয়নি। আমরা যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করি যদিও তার সঙ্গে কুটীরশিল্প চলতে পারে। যন্ত্র যদি ব্যক্তিবিশেষের শোষণের উপায় না হয়ে সমগ্র সমাজের ধনোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে তবে শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর উদ্ভবের কারণ নেই। সে ক্ষেত্রে যন্ত্র হিংসার প্রতীক না হোয়ে কল্যাণ ও প্রাচুর্য্যেরই বাহক হবে। দোষ যন্ত্রের নয়—যন্ত্র ব্যবহারকারী মানুষের।

স্বাধীনতা সংকল্পে চরকার একটী বিশিষ্ট স্থান থাকবার আমরা হেতু দেখিনা—যারা চরকায়

বিশ্বাস করে না তারা সর্দ্দারজীর হুমকিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থাকবে তাও সম্ভব নয়—এই সঙ্কটময় সময়ে এই বিষয়টী উত্থাপন করে নূতন সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হোয়েছে মাত্র! তবে মহাত্মাজী বলেছেন কংগ্রেসকর্মী সকলে চরকা ও খদ্দরে বিশ্বাসী না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সংগ্রামের দায়িত্ব নেবেন না। তিনি যদি আমাদের মত অবিশ্বাসীদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী না হন আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু তারজন্য আমাদের সংগ্রামের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—কবির ভাষায় বলি

"আগে চল্, আগে চল্, আগে চল্ ভাই
বেঁচে থাকা মিছে পড়ে থাকা পিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই"

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও কংগ্রেস—

শুধু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নয়—ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থিতি সম্বন্ধেও গুরুতর দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে। অন্যান্য দেশগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের ইতিকর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছে অনেক আগে কিন্তু যে দেশের ভাগ্য এই যুদ্ধের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত—সেই দেশই এখনো ভেসে চলেছে অবস্থার সঙ্গে। এর জন্য দায়ী ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে বে-সর্ত্ত সহযোগিতার পরামর্শ দিলেন—তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু হরিপুরার যুদ্ধপ্রস্তাব ও ত্রিপুরীর জাতীয় দাবীর অসুবিধাজনক প্রস্তাব স্মরণ করে তাঁর শিষ্যরা জনমতকে অতটা অগ্রাহ্য করতে সাহস পাননি। ফলে বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারত সম্পর্কে তাদের নীতি কি তা প্রশ্ন করবার ব্যবস্থা হোল। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বড়লাট বহু বাক্যজাল বিস্তার করে এমন একটী ধোঁয়াটে উত্তর উপস্থিত করলেন যে অনভিজ্ঞের চোখে ধাঁধাঁ লাগবার কারণ হোলেও, হতাশ হতে অভ্যস্ত আমাদের কাছে তার মর্ম্ম জাজ্জ্বল্যমান হোয়ে দেখা দিল। আশ্চর্য্য, এরপরও কংগ্রেস তার কর্ত্তব্য স্থির করতে পারলো না জাতির মুখপাত্র হিসাবে। জনমতের চাপে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী—গদি থেকে নেমে দাঁড়ালেন—কবে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হবে অধীর আগ্রহে সমস্ত জাতি প্রতীক্ষা করে করে হতাশ হোল—দিন, সপ্তাহ, মাস যায়—সংগ্রামের আহ্বান এলোনা। তার পরিবর্ত্তে এলো চরকা কাটা, হরিজন উন্নয়ন এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করবার নির্দ্দেশ। ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম স্থগিত রেখে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সুরু করলেন—এক দিকে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য সংবাদপত্র মারফৎ জাতির কাছে আবেদন এবং আর একদিকে ভিন্নমতবাদী কংগ্রেসকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের উপর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা চলতে লাগলো। সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কে অতিধৈর্য্যশীল কংগ্রেস নেতৃবর্গ কংগ্রেসের মধ্যে

বিশুদ্ধ গান্ধী-পন্থী ব্যতীত অন্য সকলের সম্পর্কে ঘোরতর অসহিষ্ণু হোয়ে উঠলেন—এবং কংগ্রেসের অন্দরে ও বাইরে ঐক্যের অভাব, এই দোহাই দিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে বিরত রইলেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান স্বাধীনতাকামী মাত্রেই চাইবেন। কারণ জাতির স্বাধীনতা—সংগ্রাম এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াতে পারে না—হয় তা এগিয়ে চলবে, না হয় তার গতি হবে পশ্চাৎমুখী। অন্য দিকে, কিছুদিন যাবৎ স্বরাজের পরিবর্তে গণ-পরিষদের দাবী সম্পর্কে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছেন—অথচ অল্পদিন আগেও এ ছিল "half-baked faddists" দের আব্দার মাত্র। এই গণ-পরিষদ আবার হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় তার স্নেহচ্ছায়ায় আহূত। কিছুদিন আগে রাজাজী গণ-পরিষদ সম্বন্ধে বলেছেন,

"A regularly elected Constituent Assembly cannot come into being unless there is state-help or a new state created. In a vacuum created by a revolution we can make a new state......"

কিন্তু যে শূন্যে নূতন রাষ্ট্র জন্মলাভ করবে—বিপ্লব দ্বারা তেমন শূন্য সৃষ্টি করবার তিনি বিরোধী। পুরোণো রাষ্ট্রের মৃত্যু না ঘটলে নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হোতে পারে না এবং যথার্থ গণ-পরিষদ আহ্বান করাও সম্ভব হবে না। তবে মহাত্মাজী যে গণ-পরিষদের স্বপ্ন দেখছেন তা ঐতিহাসিক গণ-পরিষদ নয়—তাঁর নিজস্ব এক বিশিষ্ট রূপের গণ-পরিষদ যা "ভারতীয় ও বৃটিশ জনগনের মধ্যে এক সম্মানজনক চুক্তির ফলে পাওয়া যাবে"। এবং এ পাওয়া সম্ভবপর হবে যদি বৃটিশ সরকার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেন। কাজেই আর একটী বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুর্ভাগ্য ভারতের নেতৃবৃন্দ স্থির করতে পারছেন না—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করবেন, না, ইংরেজের "স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবার" জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবেন। এতদিন ধরে হাজার হাজার বর্ক্তৃতায় সংগ্রামের কথা বলে এসে সংগ্রামের সুযোগ লাভ কোরেও এরা সংগ্রাম করছেন না কেন? শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু এর কারণ নির্দ্দেশ করেছেন যে সংগ্রাম আরম্ভ হোলে এমন সব নূতন শক্তির আবির্ভাব হবে যাদের হাতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব চলে যাবে এই আশঙ্কায় "যেন তেন প্রকারেণ" এঁরা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখছেন। বাস্তবিক এটাই কারণ কিনা জানি না—তবে সংগ্রাম সুরু না করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা। কারো ইচ্ছাঅনিচ্ছার উপর জাতির ইতিহাস নির্ভর করেনা—ঘটনা পরম্পরার দুর্লঙ্ঘ নিয়মে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা কোথায় ভেসে যাবে—সমস্ত বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে ইতিহাসের রথ জাতির বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে—তাকে রোখবার সাধ্য কারো হবে না। বর্ত্তমান অবস্থা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবস্থা—এই সংগ্রাম দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে আসবে সংগ্রামের ২য় স্তর—ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন। কাজেই যদি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সংগ্রামের এই সুযোগ হারান—তবে উচিত বামপন্থী

কংগ্রেস কর্মীদের সম্মিলিতভাবে সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর কিছুর জন্য না হোলেও অন্ততঃ তাদের অস্তিত্বের যুক্তিযৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্য। কিন্তু বামপন্থীদের অবস্থা কি? বামপন্থী সংহতির অবস্থা আজ ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হোয়েছে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর মৃত্যু ঘটে। তারপর ফরওয়ার্ড ব্লকের বয়সও প্রায় একবৎসর হোল—এই একবৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে—কিন্তু এসত্বেও সুভাষ বাবু বলছেন এবার "রামগড় কংগ্রেসে বামপন্থীরা সুবিধা কোরতে পারবে না—রামগড় কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের কংগ্রেস হবে"। যদি এ ধারণা যথার্থ হয় তবে—বামপন্থীদের সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ রয়েছে প্রচুর। গত ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আশা হোয়েছিল বামপন্থীরা আত্মরক্ষার জন্য সংহত হবে এবং আগামী কংগ্রেসের পূর্ব্বে এতটা শক্তি সঞ্চয় করবে যে কংগ্রেসে বামপন্থী সভাপতি নির্বাচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে বামপন্থী সভাপতি নির্বাচিত হওয়া একবৎসর পর দুঃসাধ্যতর হয়েছে—এর কারণ কি? সুভাষ বাবু বলছেন "কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন করা পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হোয়েছে। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, দক্ষিণ-পন্থী নেতাদের নানারূপ শাসনতান্ত্রিক কৌশল ও অনুশাসন এর জন্য দায়ী"। এরূপ অবস্থায় তিনি মনে করেন সমগ্র কংগ্রেসের মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন করবার জন্য অপেক্ষা না কোরে—সংগ্রামে বিশ্বাসী বামপন্থীদের অবিলম্বে সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন। ক্ষমতা যার হাতেই থাক স্বেচ্ছায় কেউ কখনো ছেড়ে দেয় না—সে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারই হোক বা অহিংসপন্থী দক্ষিণী নেতাই হউন। ক্ষমতাকে কায়েমী করে রাখবার চেষ্টাও আত্মরক্ষা নীতির মতই প্রাথমিক ও সার্বজনীন। কাজেই বামপন্থীদের এই বাধাকে অতিক্রম করতেই হবে। এজন্য বামপন্থীদের যা করা উচিত তা তাঁরা করছেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন বামপন্থীদের মধ্যে অন্ততঃ ন্যূনতম ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপন ও সব্বত্রশক্তিশালী বামপন্থী সংস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কোন সুশৃঙ্খল সংস্থা ব্যতীত কোন নীতিকে বিশেষতঃ সংগ্রামের নীতিকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা ব্যর্থ হোতে বাধ্য। এদিক্ দিয়ে বামপন্থীরা যতদিন না আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হবেন ততদিন দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সরাবার কোন উপায় নেই—মহাত্মাজী বল্‌ছেন "যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠদলের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির উপর বিশ্বাস আছে ততদিন পদত্যাগের (abdication) প্রশ্ন ওঠে না।" কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানসিক পরিবর্ত্তন ছাড়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে হাতে আনবার সুবিধে নেই—আর রাজনৈতিক কর্ম্মীমাত্রেই জানেন—কোন গুরুতর পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন state machinery আয়ত্ত করা—বামপন্থীদের সংহতশক্তি সৃষ্টি করে তার চেষ্টাই করা উচিত।

খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

গত ৩০শে অগ্রহায়ণে কল্‌কাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে শুধু বাঙ্গলার নয় ভারতের প্রথম খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন অভিভাষণে স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয়

ভাষায় কয়েকটী যথার্থ সমালোচনা করেছেন। তিনি বল্‌ছেন, "আমাদের জাতির ইতিহাসে বিনাশের বীজ কোন্ ঔদাসীন্যের মধ্যে নিহিত হয়ে, দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যহ প্রশ্রয় পেয়ে আসচে সেকথা ভেবে দেখতে হবে। কেননা, তার প্রতিকার একমাত্র আমাদের নিজের হাতে।" একথা যে কত বড় সত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপ্রণালীকে সমালোচনার মাপকাঠিতে যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন। আমরা বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝি কার্য্য দিয়ে তাকে স্বীকার করি না। বুদ্ধি ও অভ্যাসের এই পরস্পর বিচ্ছেদ—আমাদের জাতীয় জীবনের এক নৈরাশ্যকর সত্য। পরাধীন শোষিত জাতিকে আত্মরক্ষা করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ তার বাঁচবার উপকরণ নিতান্তই অ-প্রচুর—তার উপর "নির্ব্বাচন-শক্তি"ও যদি শত্রুতা করে তবে এ জাতির ভাগ্যে "নিশ্বাস নেওয়াই" বাঁচবার নামান্তর হোয়ে থাকবে চিরকাল। আমাদের যে অভ্যাস "চালের ছালকে" বিদেশে পাঠায় ও ভাতের ফেনের সঙ্গে জাতির "প্রাণশক্তিকে ঢেলে দেয় রান্নাঘরের নর্দ্দমায়"—তাকে বুদ্ধির খবরদারীতে রাখতে হবে—যদি বাঁচা সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই আগ্রহশীল হই। কবি বল্‌ছেন, "শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশী—কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে চিরজীবন সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মত আহার পায় না সেইটেই দুঃখ।" আমরাও বলি এ হতভাগ্য দেশে যে শিশু মরে বাঁচলো তার সৌভাগ্যের জন্য হিংসে হয়, কিন্তু যে বেচারি ভাগ্য-দোষে বেঁচে রইলো পিতামাতা থেকে আরম্ভ করে সমাজ, রাষ্ট্র কেউ যে তাকে যথার্থ বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নেয় না—তার তবে হবে কি? কবি বল্‌ছেন, "কি করে আমরা বাঁচব একথা ভাববার কথা নয়,—কেননা কোনমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। কী করে আমরা পুরোপুরি বাঁচব সেই ভাববার কথা"।

কিন্তু ভাববে কে? ব্যষ্টি ভাবতে জানে না, যারা জানে তারাও ভাবে না—কাজেই সমষ্টিকেই এর জন্য ভাবতে হবে এবং ব্যষ্টিকে সচেতন করবার জন্য ক্রমাগত "ইন্‌জেক্‌সন" দিতে হবে! এই জন্যই কল্‌কাতার পৌরসভার এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ করছি! জীবনধারণ করতে যারা শিখলো না দেহমনের সমস্ত কাজেই তাদের ঘটে ফাঁকি। তাই কবি বল্‌ছেন, "য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক কাজে শৈথিল্য করে, তাদের কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখতে হয়।...........এ দেশে কর্ত্তব্য এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতঃই শরীর-পোষণের অভাব হতে।"

কবি যথার্থ বলেছেন, "শরীর-মনের উপবাসজাত যে অবসাদ, যে ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদের ধূলিসাৎ ক'রে রেখেছে তার ভার কি সামান্য?" এ ভার থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে সমস্ত দেশ জুড়ে জাতির বুদ্ধিকে, বিচারকে জাগ্রত করবার জন্য এক অভিযান। বাঙ্গলাদেশ এদিক দিয়ে পথপ্রদর্শন করেছে, অন্যান্য প্রদেশ বিশেষতঃ কংগ্রেসী প্রদেশগুলির এ কাজে অগ্রণী হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রনীতি সম্মেলন

লাহোরে রাষ্ট্রনীতি সম্মেলন হ'য়ে গেল। সভাপতি ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জীর অভিভাষণটিতে নানা দিক্ দিয়ে নতুনত্ব রয়েছে। থিওরির সঙ্গে ব্যবহারের (practice) সামঞ্জস্য করবার একটা চেষ্টা এতে স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যাগুলোকে থিওরীর আলোকে দেখবার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। তত্ত্বের দিক্ থেকে কয়েকটী আলোচনা আমাদের ভালোই লেগেছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্বন্ধ নিয়ে যে চিরন্তন তর্ক ও সমস্যা, সে সম্বন্ধে ডাঃ ব্যানার্জ্জীর মত যুক্তিপন্থী। উগ্র সমষ্টিবাদ বা উগ্র ব্যক্তিবাদ উভয়কেই তিনি একদেশদর্শী বলেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ, এ দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ নেই, বিবাদ নেই : "no real conflict between the two rival theories." আমাদের মতেও সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তির স্বার্থের পরিপোষক, হানিকর একেবারেই নয়। সমাজজীবন যুগে যুগে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যদিয়ে আন্দোলিত হয়ে চলে। আতিশয্যকে এড়িয়ে চলবার কৌশল প্রকৃতি এবং সমাজ, দুইয়েরই জানা আছে। কোনো যুগে ব্যক্তিবাদ অত্যধিক প্রবল হয়ে উঠলে পরের যুগ সমাজবাদকে প্রবল করে তোলে। এই রকম সূক্ষ্ম ভারসাম্যের মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে।

তবে ডাঃ ব্যানার্জ্জীর কোন কোন মতবাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছিনে। ভারতের বিশিষ্টতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব খুব স্পষ্ট কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি তিনি দেন নি। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য চিরকালই সহজভাবে সিদ্ধ হয়ে এসেছে। আমাদের মতে ভারতবর্ষে কেবল নয়, অন্যত্রও সমাজজীবনে এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মত স্পষ্ট হয়নি। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য কি, তা অভিভাষণে পাওয়া যায় না। কম্যুনিজম্ এবং সমাজতন্ত্র যে পৃথক মতবাদ তা' তিনি স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রের মধ্যে মার্কসীয় কম্যুনিজম্‌কে তিনি এক রকমের উগ্রতর সংস্করণ বলে মনে করেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি আবার মার্কসীয় আর্থিক ব্যাখ্যাকেই সমাজতন্ত্র বলে ধরে নিয়েছেন। আর্থিক ব্যাখ্যাকে সকল সমাজতন্ত্রবাদ স্বীকার করে না, তা কি তিনি জানেন না? তৃতীয়তঃ তাঁর মতে ভারতবর্ষ এমন দেশ যে এখানে ইতিহাসের আর্থিক্ ব্যাখ্যা চলবেই না এবং কখনো চলেওনি, কারণ ভারতের লোক ইহবিমুখ। আমরা বলি, ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা কেবল ভারতে কেন, পৃথিবীর কোন সমাজেই চিরকালের সত্য নয়। ভারতবাসী জড়ধর্ম্মী নয়, অতএব ভারতে আর্থিক ও জড়শক্তির প্রভাব নগণ্য, এ কথা ঠিক নয়। জড়শক্তির প্রভাব ভারতে ও পৃথিবীর অন্যত্র সকল সমাজেই কার্য্যকর। তবে জড়শক্তি বা আর্থিক শক্তির দ্বারা ভারতীয় কেন—কোন সমাজেরই পরিপূর্ণ জীবনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই আর্থিক ব্যাখ্যান একদেশদর্শী। এ কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই সত্য। চতুর্থতঃ তিনি ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে একদিন আপোষ এবং সামঞ্জস্য হবে বলে

কল্পনা করেন এবং তাকেই আদর্শ সমাজ বলেন। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী, এ কথা কি তিনি জানেন না? তাঁর ক্রমবিকাশ ও বিপ্লব সম্বন্ধে মত যুক্তিসঙ্গত। তবে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হাস্যকর। অহিংসা, ভাষাসমস্যা, গণতন্ত্র, ভারতীয় জাতীয়তা, আন্তর্জাতীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয়েছে সন্দেহ নেই।

অর্থনীতি সম্মেলন

এলাহাবাদে সভাপতি ডাঃ জৈনের মতে, দুটো সমস্যা অর্থনীতিবিদ্‌গণের সামনে রয়েছে। প্রথমতঃ যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া। যন্ত্র বেকারসমস্যা বাড়ায়—মানুষের মুখের রুটি কেড়ে নেয়। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করা মানুষের কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ শোষিত এবং শোষকের স্বার্থবিরোধ আছে, এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাও অর্থনীতিজ্ঞের একটা প্রধান সমস্যা। যন্ত্রকে যদি মহৎ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত করা যায় তবে মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। যন্ত্র মানুষের পরিশ্রমকে লাঘব কোরে অবসরের সৃজন কোরবে। সেই অবসরে মানুষ কলা ও কৃষ্টির চর্চ্চা কোরে জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে পারে। কিন্তু এ আদর্শ কী কোরে সহজসিদ্ধ হবে? সমাজতন্ত্রে নয়, ডাঃ জৈনের মতে। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র দুইই সুন্দরভাবে মিলে মিশে থাকবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে তখন বিরোধ থাকবে না। সভাপতি ম'শায় স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি—কেবল কতকগুলো বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে একত্র করে দেশের সামনে পরিবেশন করেছেন। এতে চিন্তাশীলদের যে বিশেষ কোন উপকার হবে তা মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র বর্ত্তমানে উপেক্ষিত ও নিন্দিত মতবাদ, একথা তিনি কোথায় পেলেন? আমাদের মতে পৃথিবীতে বরং ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের আধিপত্য দিনে দিনে নিশ্চিত ভাবে বেড়ে চলেছে। ডাঃ জৈনের মতামত অস্পষ্ট। অর্থনীতি সম্মেলনের সভাপতির নিকট আমরা আরো স্পষ্ট এবং কার্য্যকরী মতামত আশা করেছিলাম।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

২রা জানুয়ারী মাদ্রাজে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হোয়ে গেল। ডাঃ বীরবল সাহ্‌নী সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়েছেন তাতে বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অধোগতির উল্লেখ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের ওপরে বহু লোক আজকাল সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন। মানুষের অকল্যাণ এসেছে বিজ্ঞানের সাথে সাথে, এই অভিযোগ আজকাল প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে গান্ধীজীও নববিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসাহী নন এবং তাঁর সমাজ-দর্শন এদেশে বিজ্ঞানের আমদানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের শান্ত ও সহজ জীবনপ্রণালী। চরকা হো'লা তাঁর ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতীক। ভবিষ্যৎ ভারতে কলকব্জা ও

বৈজ্ঞানিক উৎপাদনরীতিকে বর্জ্জন করা হবে। আমরা বহুবার এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি, কারণ আমরা বিজ্ঞানের পক্ষে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নানা জটিলতা সমাজে আসবে জেনেও আমরা সমাজকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠন করবার সমর্থক। যে জটিলতা আসবে ও যতটুকু অকল্যাণ সৃজন হবে, তার কারণ বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের অপব্যবহার। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই মানুষের ভালমন্দ-নিরপেক্ষ (neutral)। হিত ও অহিত করবার ক্ষমতা প্রত্যেক বস্তুরই রয়েছে। তাকে ব্যবহার করবার প্রণালীর ওপরে নির্ভর করে তার শুভ বা অশুভ কার্য্যপরতা। বিজ্ঞান-বিরোধীদের বিশৃঙ্খল চিন্তাপ্রণালী থেকেই তাদের এই বিজ্ঞান-ভীতি জন্ম নিয়েছে। যা' হোক ডাঃ সাহ্‌নীর অভিভাষণের প্রতি আমরা এ দেশের বিজ্ঞান-ভীরু প্রতি-ক্রিয়া-পন্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলেছেন " some of these things we can use, as we like, for good or for evil." কিন্তু সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে পারলে, বহুতর মঙ্গল বিজ্ঞানের থেকে আমরা পেতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে জানা চাই। তবেই এর থেকে উৎসারিত হোয়ে উঠবে বহু শ্রেয় এবং বহু প্রেয়—"much that is good and noble and beautiful."

দ্বিতীয়তঃ ডাঃ সাহ্‌নী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধিকে বর্ণনা করেছেন অনবদ্য ভাষায়। আমরা এ সম্বন্ধে ডাঃ সাহ্‌নীর সঙ্গে একমত। আমরা বিজ্ঞানের সমর্থক, কিন্তু বিজ্ঞানের অহমিকার পক্ষপাতী আমরা নই। মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের স্থান নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন আছে, কারণ বিজ্ঞানও ভূত হোয়ে আমাদের স্কন্ধে চাপ্‌তে পারে। বিজ্ঞানের প্রতি ভক্তিও মানুষকে "অন্ধং তমঃ"র দিকে নিয়ে যেতে পারে। সেই অন্ধ ভক্তির আতিশয্যের বিরুদ্ধেও সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানের চারদিকে একটা গণ্ডী রয়েছে, যার বাইরে তার এখ্‌তিয়ার নেই। তাই ডাঃ সাহ্‌নী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন "Study of fragments" ; বিজ্ঞান বিশ্বের সংকীর্ণ একটী খণ্ডকে বিচার ও বর্ণনা করে ; অখণ্ড সত্যকে ধরবার উপায় তার নেই। বিজ্ঞানকে নিয়ে যারা অহমিকা করে থাকেন যে বিজ্ঞান সব তত্ত্বকে জেনে ফেলেছে এবং এই জড় পৃথিবীর অন্তরালে অজ্ঞাত কোনো রহস্য বাকী নেই,—তাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। সাহ্‌নী বল্‌ছেন, অখণ্ড সত্যকে বিজ্ঞান কোনোদিনই জানবে না : "Not that we ever get at the real & complete whole; nor ever shall." বিজ্ঞানের অহমিকাকে সাহ্‌নী আত্মপ্রতারণা বলে অভিহিত করেছেন, "Some of us may boast that we have got at that one Truth : we only delude ourselves."

তৃতীয়তঃ সভ্যতা সম্বন্ধে ডাঃ সাহ্‌নী অর্থপূর্ণ উক্তি করেছেন। তাঁর মতে "সভ্যতা" এবং "কৃষ্টি" এক জিনিষ নয়, এরা দুটি একেবারে বিভিন্ন বস্তু। বর্ত্তমান জগৎ 'সভ্য' হয়েছে বটে, কিন্তু 'কৃষ্টিমৎ' হোতে পারেনি। মানুষ উপকরণকে আয়ত্ত করেছে কিন্তু নিজের স্বভাবকে আয়ত্তে

আনতে পারে নি। মানুষের ভিতর যে পশু রয়েছে সে আজো মানুষকে চালায়। তাই সাহ্‌নী বল্‌ছেন "For all that science may have done to civilise him, man, it seems, can still be no less of a brute then he was." উপকরণ বা প্রাকৃতিক শক্তির ওপরে কর্ত্তৃত্বকে বলা যেতে পারে "সভ্যতা"। যাঁরা বলেন প্রকৃতিকে বশে আন্‌লেই মানুষের আত্মিক স্বর্গ রচনা হোয়ে যাবে তাঁরা ভ্রান্ত। বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের দ্বারে স্তুপীকৃত হোয়ে উঠ্‌লেও আত্মিক ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌বে না। তার জন্যে চাই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। এই উন্নয়নের সাধনাও পৃথক, অনুশীলনও বিভিন্ন। এই আধ্যাত্মিক অনুশীলনকেই বলা চলে 'কৃষ্টি' বা culture. তাই সাহ্‌নী বলেছেন যে মানুষ ১৫ হাজার বছরের চেষ্টায় সভ্য হয়েছে বটে কিন্তু কৃষ্টি আসেনি। সভ্যতা এবং কৃষ্টি এক নয়। "In the lurid light of happenings we see that civilisation is not the same thing as culture." তাঁর যুক্তিপ্রতিষ্ঠ উদারতা এ দেশের বিজ্ঞানবিরোধী এবং বিজ্ঞানের অন্ধ স্তাবক উভয় দলেরই চক্ষু খুলে দেবে।

হিন্দুসভা

২৭, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন হোয়ে গেল কোলকাতায়। সাভারকার তৃতীয়বার সভাপতি হোয়ে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেছেন। কোলকাতায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে এবার যে উত্তেজনা, উৎসাহ, কোলাহল এই উপলক্ষ্যে দেখা গেছে, তাতে চিন্তা করবার অনেক উপকরণ দেশের কল্যাণকামীদের সামনে উপস্থিত হোয়েছে। জনসাধারণ বলতে যা বুঝি তার হিন্দু অংশ নগণ্য নয়। কোলকাতা এবং বাংলার সর্ব্বত্র হিন্দু সাধারণের মনে হিন্দুমহাসভার প্রভাব বর্দ্ধিত হয়েছে, এ কথা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। কংগ্রেসকে আজ বাংলাদেশে নিষ্ক্রিয় কোরে এমন অবস্থায় রাখা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক প্রচার, উদ্যম এবং প্রকাশ সব কিছু আজ অন্তর্হিত হবার উপক্রম হোয়েছে; এই রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনবোধ আজ প্রবল হোয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। হিন্দুমহাসভার জন্ম-ইতিহাস দেখলেই এই ঐতিহাসিক সত্য চোখে পড়বে। আমরা বারবার বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে যখন তৃতীয়পক্ষ পক্ষপাতিত্ব করতে সুরু করেন তখনই সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘ'টে থাকে। পক্ষপাতিত্বের ফলে একপক্ষের সম্প্রদায়-বোধ প্রলুব্ধ ও প্রখর হয়ে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষও প্রতিক্রিয়ার নিয়ম অনুসারে প্রাবল্য সঞ্চয় করেন। ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের শক্তিশালী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলীম লীগের জন্ম হোলো ঢাকায়। ১৯০৬ সনে লীগ স্থাপিত হোলো। স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুমহাসভাও জাত হোলো ১৯১০ সনের ডিসেম্বর মাসে। সেই যুগ থেকে আমাদের দেশে এই কৃত্রিম সাম্প্রদায়িকতা আমদানী হোয়েছে যাতে আমাদের

রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বারম্বার ব্যাহত হচ্ছে। ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট থেকে হিন্দু মুসলমানের সন্ধির চেষ্টা চলেছে। ১৯২১ সনের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের সংযোগকে অনেকে স্থায়ী মৈত্রীর সূচনা বোলে মনে করেছিলেন। কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিপুল আকার ধারণ কোরেছে। তারপরে ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সনের জাতীয় সংগ্রামের পরে আবার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি মারাত্মক হোয়ে উঠেছে। জাতীয় সংগ্রামকে যুদ্ধের অজুহাতে আজ পঙ্গু কোরে রাখা হোয়েছে; ফলে আজ মোসলেম্ লীগ এবং হিন্দু মহাসভা প্রবল হোয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংগ্রাম দুর্ব্বল হোলে কিংবা অন্তরালে সরে গেলে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তীব্র হবেই। যাঁরা জাতীয় সংগ্রামের বিরোধী—অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ—একে তীব্রতর করবার স্বার্থ তাঁদেরই রয়েছে। বল্লভভাই প্যাটেল সেদিন বলেছেন যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি থাকতে সাম্প্রদায়িক মিলন হোতে পারে না। আজকে হয়তো তাঁর এ শুভ বুদ্ধির উদয় হোয়েছে যে জিন্না সাহেবের সঙ্গে আপোষ রফা কোরে লাভ হবে না। বহুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেস ঘোষণা কোরেছিল যে গণসংযোগের সাহায্যে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে হিন্দু ও মোসলীম গণসাধারণকে একই প্রাঙ্গনে এনে মেলান যাবে। কিন্তু আপোষের পথ কংগ্রেসী নেতাদের ডাক দেওয়ায় তাঁরা এতদিন সেই পথে কিঞ্চিৎ ঘুরে এসেছেন। এ ঘোরা ঘুরি ব্যর্থ, তাঁরা আজ বুঝতে আরম্ভ কোরেছেন। আজ যদি আবার তাঁরা গণসংযোগকে গঠন কোরে তুলতে সচেষ্ট না হন, তবে ভারতের রঙ্গমঞ্চ আবার সাম্পদায়িক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে এ কথা নিশ্চিত। হিন্দু মহাসভার নব অভ্যুদয় ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেছে—এ ইতিহাসের ইঙ্গিত যদি আজ নেতারা না বোঝেন তবে বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপেক্ষানীতির জোরেই তারা সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটাবেন, একথা কল্পনারও অতীত। তবে কংগ্রেসের প্রভাবও যে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলীম লীগের ওপরে কার্য্যকরী হয়েছে সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কংগ্রেসী সংগ্রাম ও আদর্শের প্রবল চাপ এঁদের ওপরে পড়েছে; তাই "পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে" (Complete Independence) এরাও আদর্শ হিসাবে নিতে বাধ্য হোয়েছেন। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবি এবং নির্ব্বাসিত ভারতীয়দের প্রত্যাবর্ত্তনের দাবি হিন্দুমহাসভার এবারকার অধিবেশনে পেশ করা হোয়েছে। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে এই সব রাজনৈতিক দাবি নিতান্তই কাগজে-কলমের দাবি মাত্র, কারণ দাবির পেছনে সংহত সংগ্রামের আয়োজন নেই। যা হৌক হিন্দুসভার কার্য্যতালিকায় ও আদর্শে কংগ্রেসের আদর্শের ও কর্ম্মপদ্ধতির ছাপ পড়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের যুগধর্ম্ম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম তাতে মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করলেও হিন্দুমহাসভা ও মুসলীম লীগ ইত্যাদির সংগ্রাম প্রবর্ত্তন করবার কোন তাগিদ নেই। সে সংগ্রাম করতে হবে কংগ্রেসকেই। এবং সে সংগ্রাম কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও বটে। অগণিত মুসলমান এই সংগ্রামে পূর্ব্ব থেকেই আছেন। গণসংযোগ কার্য্যকরী হলে হিন্দুর সঙ্গে আরো অগণিত মুসলমান ভারতীয় সংগ্রামে আসবে। হিন্দু-

সভা কিংবা লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি—গণসংযোগকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তবে কংগ্রেস যদি গণসংযোগে মনোনিবেশ না করে এবং জাতীয় সংগ্রাম প্রবর্ত্তন না করে, তবে কংগ্রেসের অস্তিত্ব শূন্যগর্ভ হয়ে দাঁড়াবে।

অ্যাড্ হক্ নির্ব্বাচন কমিটী—

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ওয়ার্দ্ধায় অধিবেশন হয়। বাংলা দেশের কংগ্রেস সম্বন্ধে এই অধিবেশনে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোয়েছিল তার ফলে বাংলার রাজনৈতিক জীবন অচল হোয়ে উঠেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটী "নির্ব্বাচনী সংসদ" (Election Tribunal) গঠন কোরে বলেন এঁরা কোন দলেই নেই, এঁরা নিরপেক্ষ এবং নির্লিপ্ত—"unconnected with any party." কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক জগতের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে "নির্ব্বাচনী সংসদের" সভ্যগণকে নিরপেক্ষ বলা মোটেও চলে না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এই কারণে এই সংসদকে স্বীকার করতে অসম্মত হন। নির্ব্বাচনী সংসদ এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিরোধের ফলে ওয়ার্কিং কমিটী ২১ ডিসেম্বর তারিখে বাংলার প্রাদেশিক কমিটীকে উপেক্ষা কোরে এক "অ্যাড্ হক্ কমিটী" বাংলার উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। এই কমিটীর সভ্য আট জন এবং সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। আগামী কংগ্রেস নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ও কর্ত্তৃত্ব করবার সম্পূর্ণ ভার এই কমিটীর ওপরে দেওয়া হোয়েছে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বাংলার কলহে যে দুই দল রয়েছে তাদেরই একটী দলকে বিচারকের আসনে বসিয়ে ওয়ার্কিং কমিটী দাবি করছেন যে এঁরা নিরপেক্ষ। ফরোয়ার্ড ব্লকের ও অপর বামপন্থীদের সঙ্গে এই ওয়ার্কিং কমিটীর বিরোধ ও মতানৈক্য বহুখ্যাত হোয়ে পড়েছে। সবাই এ কথা জানেন। বাংলাদেশের যারা ওয়ার্কিং কমিটীর দলভুক্ত বা সমর্থক তাদের ওপরই বাংলার কংগ্রেসের নির্ব্বাচন চালাবার ভার দিয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটী। এতে চক্ষুলজ্জা নামক সভ্যবৃত্তিটীকে সমুদ্রপারে পাঠান হোয়েছে। এবং দলগত সংকীর্ণতার প্রকাশ্য পূজা করা হোয়েছে। মুখোসের আর প্রয়োজন নেই, গণতান্ত্রিক বাক্যবিস্তারের দায়ও শেষ হোয়েছে। এখন কেবল দলগত নগ্ন আধিপত্যস্পৃহার জয়গান, বাক্যেও কার্য্যে, করলেই চলবে। এই মনোবৃত্তিকে বড়ো বড়ো বিবৃতিতে বিনিয়ে বিনিয়ে অহিংসার সাধনা বলে প্রচার করা হোচ্ছে। সমস্ত দেশকে ও দেশসেবার প্রতিষ্ঠানকে একটী মাত্র দলের কুক্ষিতে আনবার এ এক বিস্তৃত অভিযান মাত্র। বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা অধিকাংশ এই "অ্যাড হক্ কমিটীকে" স্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁদের অমতে তাঁদের ওপরে গায়ের জোরে চাপান এই কমিটী বাংলাদেশে কেবল বিশৃঙ্খলাই আনবে—শৃঙ্খলা নয়। অথচ আসন্ন সংগ্রামের ছায়ায় সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ঢাকা পড়েছে। যুদ্ধের আবহাওয়া ও ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা, সবমিলে সমগ্র জাতির প্রাণে এনেছে চাঞ্চল্য। কিন্তু

ওয়ার্কিং কমিটীর নেতারা এ চাঞ্চল্যকে আত্মকলহের পথে নিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত করে তুলছেন। যদি আজো নেতৃবৃন্দ বাংলার এই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে কৃত্রিম উপায়ে আরো বিশৃঙ্খল কোরে রাখবার চেষ্টা করেন তবে কংগ্রেসকে আত্মহত্যার পথে পাঠানো হবে মাত্র। আশা করি কংগ্রেসের উচ্চতন কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে কংগ্রেসকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেবেন।

সুক্কুরের বীভৎস কাণ্ড

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতা কতোদূর পর্য্যন্ত পৌচেছে তার চরম দৃষ্টান্ত সুক্কুরের ঘটনা। সিন্ধুদেশকে নূতন শাসনতন্ত্রে পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হোয়েছে। সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার বহুদিন ধরে চলেছে, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না কোরেছে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, না কোরেছে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট। আজকালকার সভ্য জগতে দিনে দুপুরে এমন ধরণের হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা নির্ব্বিবাদে অনুষ্ঠিত হোতে পারে তা' কেউ কল্পনা কোরতে পারেনি। সরকারী রিপোর্ট অনুসারেই যে বিবরণ পাই তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হোতে হয়। ১৪১ জন হিন্দুকে হত্যা করা হোয়েছে, ১০ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোয়েছে, ৫৮ জন আহত হোয়েছে। সম্পত্তিও ধ্বংস করা হোয়েছে বিস্তর : ৪৬৭ খানা বাড়ীতে লুঠপাট করা হোয়েছে—তাতে ৬৫৩০০০ টাকার ক্ষতি হোয়েচে। এছাড়া ১৬৪ খানা বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে,—তাতে ১৪৮০০০ টাকা ক্ষতি হোয়েছে। ৬ জন হিন্দু নারীকেও হরণ করা হোয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য আবদুল কায়ুম্ সিন্ধু দেশে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে ও সমস্ত শুনে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে আমাদের দেশের লোকের চক্ষু খুলে যাবে। তিনি বলেছেন যে পাশবিকতার এতো বড়ো নারকীয় দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কম দেখা গেছে! মানুষ যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বশে এতখানি নীচে নাব্‌তে পারে তা' কল্পনা করাও কষ্টকর।

এখন আমাদের প্রশ্ন এই অসহ অবস্থার প্রতিকার কী? দীর্ঘ দিন ধরে সংখ্যাল্প হিন্দুদের ওপরে এই যে অত্যাচার চলেছে তাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব হয়নি—উদ্ভব হোয়েছে মানুষের প্রাথমিক অধিকারের সমস্যা। মানুষের বাঁচবার অধিকার আছে—অদ্যকার সভ্য জগতে, বিংশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত যুগসন্ধিকালে সে অধিকার আজ ক্ষুণ্ণ হোয়েছে। উপায় কী? সর্দ্দার আলাবক্স পরামর্শ দিয়েছেন, গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে। গান্ধীজী পরামর্শ দিয়েছেন, সিন্ধুদেশ ছেড়ে চলে আস্‌তে। কিন্তু তাতে কোন সমাধান হয় কি? হয় না। মানুষের জীবনকে আজ কোটী সজাগ চক্ষুর সমুখে নির্ব্বিবাদে বলি দেওয়া হচ্চে—কোটী কোটী মানব-আত্মাকে এই অসম্মানের হাত থেকে কে রক্ষা কোরবে! প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, পুলিশ, আদালত, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট—সব আজ নিরুত্তর। যে প্রদেশ তার নাগরিকদের প্রাথমিক অধিকারকে রক্ষা

কোরবার সামর্থ্য রাখে না, তার সরকারী ব্যবস্থার কোন মানে আছে কি ? তার অস্তিত্ব নিরর্থক প্রমাণিত হোয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করছি এই অসহ অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য। আর আবেদন করছি ভারতের জাগ্রত জনশক্তির কাছে, এই সঙ্কটের প্রতিকারে অবহিত হোয়ে উঠবার জন্য।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় অদল বদল

কিছুদিন থেকে কানাঘুঁসা চলছিল যে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় অদল বদল আসন্নপ্রায় হোয়ে এসেছে। ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট্ থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা করা হোয়েছে যে যুদ্ধ-সচিব মিঃ হোর-বেলিশা পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর পরিত্যক্ত গদীতে মিঃ ওলিভার ষ্ট্যান্‌লী বহাল হোয়েছেন। এ সংবাদে চাঞ্চল্য সৃষ্ট হোয়েছে চারদিকে। চাঞ্চল্যের কারণ বিশেষ কোরে এই যে এই আকস্মিক ওলট্ পালটের ভিতরের কারণ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ থেকেই কেউ কিছু বলেন নি। সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটা রহস্যের আবরণ রয়েছে। বড়ো বড়ো ইন্দ্রচন্দ্রদের স্থানচ্যুতি ঘট্‌লে আবহাওয়াতে কোনো না কোনো দিকে একটা পরিবর্ত্তন ঘট্‌বেই। তাই এই পরিবর্ত্তনের ফলে পররাষ্ট্রনীতিতে কী নতুনত্ব আসে তা' দেখ্‌বার জন্য সবাই প্রতীক্ষা কোরে আছে। মিঃ চেম্বারলেন সজোরে ঘোষণা করেছেন যে মিঃ হোরবেলিশার পদত্যাগের পেছনে কোনো মতান্তর বা মনান্তর নেই. "is not now and never has been any difference." চারদিকে রব উঠেছে যে মিলিটারি উচ্চ কর্ম্মচারিদের ('Brass Hats') সঙ্গে চাকুরিতে প্রমোশনের ব্যাপার নিয়ে মতান্তর ঘটেছে। মিঃ চেম্বারলেন এ কথা অস্বীকার কোরেছেন। কিন্তু মিঃ হোরবেলিশার একটা কথায় সকলেই সন্দিগ্ধ হোয়ে উঠেছেন। তিনি আক্ষেপ কোরে বোলেছেন 'আমরা গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই কোরছি কিন্তু সৈন্যদলের ভেতরে গণতন্ত্রের আমদানীকে সইতে পার্‌ছিনে।' এতে সংশয় এসেছে যে খবর ভালো নয় মোটেও। এবং এ সেই পুরোণো সংঘর্ষ—সিভিল ও মিলিটারীর মতান্তর। যা হোক্, আমাদের 'জাহাজের খবর' দিকে দরকার কি ? তবে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরীক হোতে বাধ্য হোয়েছি, এবং যুদ্ধের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত আছে। সেই কারণেই বাতাস কোন্ দিকে বইছে, তার সঠিক নির্দ্ধারণে আমাদের কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য আছে।

জমিদারি প্রথার বিলোপ

ফ্লাউড্ কমিশনের কাজ প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার এবং পরামর্শ দেবার জন্যে এই "ভূমি রাজস্ব কমিশন" নিযুক্ত হোয়েছিল, এ কথা হয়তো

সবারই স্মরণ আছে। আগামী এপ্রিল মাসে কাজ শেষ কোরে স্যার ফ্র্যান্সিস্ ফ্লাউড রিপোর্ট বাংলা সরকারের কাছে পেশ কোরে, বিলাত ফিরে যাবেন। কমিশন তিনজন ইউরোপীয়, তিনজন হিন্দু, একজন তপশীল শ্রেণীর হিন্দু, এবং পাঁচজন মুসলমান সভ্য নিয়ে গঠিত হোয়েছিল। শোনা যাচ্ছে জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে এঁদের রায় তৈরী হোয়ে গেছে। এঁরা নাকি জমিদারী প্রথাকে বিলুপ্ত করবার প্রস্তাব সমর্থন কোরেছেন। জমিদারী উঠিয়ে দিয়ে সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে। তবে জমিদারদের উচিত মূল্য দিয়ে জমি সরকার গ্রহণ করবেন—বিনা মূল্যে জমি কেড়ে নেওয়া হবে না। জমির জন্য এই ক্ষতিপূরণ কী হারে নির্দ্ধারিত হবে সে খবর এখনো জানা যায়নি। এটুকু শোনা যাচ্ছে যে সভ্যদের মধ্যে অনেকেই নাকি হাল খাজানার দশ থেকে পোনের গুণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দেবার পক্ষে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যে জমিদারী প্রথা আজকার অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকে একেবারেই অর্থহীন হোয়ে পোড়েছে। লক্ষ লক্ষ প্রজার বেঁচে থাকবার পথ কোরবার জন্য এবং জমির উৎপাদন-শক্তির উৎকর্ষ সাধন কোরবার জন্য আজ জমিদারী প্রথাকে অবিলম্বে উঠিয়ে দেবার প্রয়োজন অনিবার্য্য হোয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকে এই মধ্যযুগীয় প্রথার স্থান নেই। এ কথা আজ বহুজন-স্বীকৃত। অবশ্য জমিদারগণ এ কথা স্বীকার কোরবেন না। কারণ স্বীকার কোরতে হোলে তাদের স্বার্থকে বিসর্জ্জন কোরতে হয়। আর স্বার্থকে বিসর্জ্জন করা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সহজ নয়, কোন শ্রেণীর পক্ষেও তেমনি সহজ নয়। কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায় যদি জমিদারী প্রথাকে বিচার করতে রাজী হন তবে জমিদারগণ নিজেরাই দেখ্বেন ও স্বীকার কোরবেন যে জমিদারী প্রথাকে বিলুপ্ত করলে তাদের স্বার্থহানি না হোয়ে, স্বার্থরক্ষাই হবে। অর্থনীতির অব্যর্থ নিয়মে, সমাজের অমোঘ গতির ফলে এই পুরাতন ব্যবস্থা অতি দ্রুত অচল হোয়ে পোড়ছে, এ অতি প্রত্যক্ষ সত্য। কিছুদিন আগে আগ্রা-অযোধ্যার জমিদারগণ সরকারের কাছে দরখাস্ত কোরেছিলেন এই বোলে যে জমিদারী ছেড়ে দিতে তারা স্বয়ং স্বীকৃত আছেন কারণ এতে তাঁদের ক্ষতি বই লাভ হচ্ছে না। এই জরাজীর্ণ প্রথাকে আক্ড়ে না থেকে ধনদৌলত অর্জ্জনের ও উৎপাদনের আরো অধিকতর লাভজনক ও আধুনিক পন্থাগুলোর দিকে জমিদারদের নজর দেবার সময় এসেছে। আমাদের আশা আছে তাঁরা যুগানুযায়ী উদ্যমের সাহায্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে জাতিকে শক্তিশালী ও বিত্তশালী করবার সহায়তা কোরবেন। বাংলা দেশে রায়তী খাজনার হার খুব কম (প্রতি একর ৩।/০ হারে), জমিদারের অধীন থেকে সরকারের অধীনে গেলে দুর্দ্দশা কম্বে না, এবং প্রজা-জমিদারে ভালবাসা ও মৈত্রী বন্ধনকে দৃঢ় কোরে তুল্লেই প্রজার স্বর্গসুখ ফিরে আস্বে—এই সব ভিত্তিহীন যুক্তি এবং অমূলক আশার ওপরে নির্ভর স্থাপন কোরে জমিদারগণ যদি পুরোণো গানকেই পুনর্ব্বার সুরু করেন, তবে আত্ম-স্বার্থেরই হানি ঘটাবেন।

ডিগ্‌বয় ধর্ম্মঘট

য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ভারতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ—এই ছুটা ঘটনার ফলে ডিগ্‌বয় ধর্ম্মঘটের কথা চাপা পড়ে গেছে। নতুন পারিপার্শ্বিকের উদ্ভব হেতু আজ দেশবাসীর মন থেকে ডিগ্‌বয়ের শ্রমিকদের লাঞ্ছনা ও দুঃখসহনের কাহিনী হয়তো অপসারিত হোয়ে গেছে, কিন্তু ডিগ্‌বয়ের পরাজয় যে ভারতের সকল শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয় একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। আজ ভারতব্যাপী অর্ডিনান্সের ছায়ায় সমস্ত জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত হোয়ে আছে, আসামে আবার নূতন কোরে সাদুল্লা মন্ত্রীসভা গদীতে বসেছেন,; তাঁরা যে ভাবে শ্রমিক-স্বার্থের বিরুদ্ধে "সার মন্মথ কমিটী"র রিপোর্টকে ব্যবহার কোরছেন তাতে শ্রমিক আন্দোলনের স্থায়ী ক্ষতি হবে। গত ১০ই জানুয়ারী "বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" এবিষয়ে যে সব প্রস্তাব পাশ কোরেছেন আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি। বিশেষ কোরে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ করছি, তাঁরা এসম্বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অবলম্বন করুন।

"পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য" ও "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্"

ভাইস্‌রয়ের সেদিনকার ঘোষণার পরে আবার "পূর্ণ-স্বরাজ" এবং "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" সম্বন্ধে তর্ক উঠেছে। ভাইস্‌রয় বোলেছেন যে ভারতকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্ট্যাট্যুট্ অনুযায়ী "ঔপনিবেশিক" মর্য্যাদা দান করাই ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য। কিছুদিন আগে রাজাজী এবং শ্রীযুক্ত পট্টভী এ সম্বন্ধে যেসব অর্থ কোরেছেন তাতেও সকলের মধ্যে সন্দেহ উৎপন্ন হোয়েছে। গান্ধীজীও ইতিপূর্ব্বে বোলেছেন যে স্বাধীনতার সারপদার্থটুকু (substance) পেলেই তিনি সন্তুষ্ট, নামে কিছু আসে যায় না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিখ্যাত সিরাজগঞ্জ বক্তৃতায়ও এই ধরণের আভাস ছিলো। এদিকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিন্তু পরিষ্কার ঘোষণা কোরেছেন যে কংগ্রেস চায় "পূর্ণ স্বাধীনতা" (complete independence). 'ঔপনিবেশিক' 'স্বায়ত্ত শাসন' নয়। জনসাধারণের মধ্যে এই দুইটী পরিভাষার অর্থ সম্বন্ধে অনেক ঘোলাটে ধারণা আছে। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের মত কি,—সে সম্বন্ধে সঠিক ও স্পষ্ট ঘোষণা দেশবাসী দাবি কোরবে সন্দেহ নেই।

আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর বোলে এসেছি যে "ঔপনিবেশিক শাসন" আমরা চাইনে, আমরা চাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি—নিঃশর্ত্ত সম্বন্ধচ্ছেদ। আমাদের এ দাবির কারণ এই যে "ঔপনিবেশিক শাসন" শব্দটার অর্থ অতি অনিশ্চিত ও অনির্দ্দেশ্য। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্ট্যাট্যুটেও এই

শব্দটীর মানে খুব স্পষ্ট ভাবে বিবৃত হয়নি। কতকগুলো রাষ্ট্র ওখানে "ডোমিনিয়ান" বোলে স্বীকৃত হোয়েছে এই মাত্র। কিন্তু এই "উপনিবেশ" গুলিরও ওপরে নানা প্রকারের বাধা নিষেধ চাপানো হোয়েছে; যথা, কানাডা নিজের শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন কোরতে পারে না এই ষ্ট্যাটুটের জোরেও। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রায় তাই। বিশেষতঃ একথা স্মরণ রাখা উচিত যে উপনিবেশগুলিকে যতটুকু স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হোয়েছে এই ষ্ট্যাট্যুটের দ্বারা, তাও পার্লা-মেণ্টের আইন কোরেই দিতে হোয়েছে। যে পার্লামেণ্ট ষ্ট্যাট্যুট্ গড়তে পারে সেই পার্লামেণ্ট আবার নতুন ষ্ট্যাট্যুট্ও সৃষ্টি কোরতে পারে এবং পূর্ব্বতন ষ্ট্যাট্যুটের বিলুপ্তিও সাধন কোরতে পারে। কাজেই যারা "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্" এবং "পূর্ণ স্বরাজে" কোন পার্থক্য চোখে দেখতে পান না, তাঁরা প্রথমে এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান কোরে তার পরে উচ্ছ্বসিত হোলেই ভাল হয়।

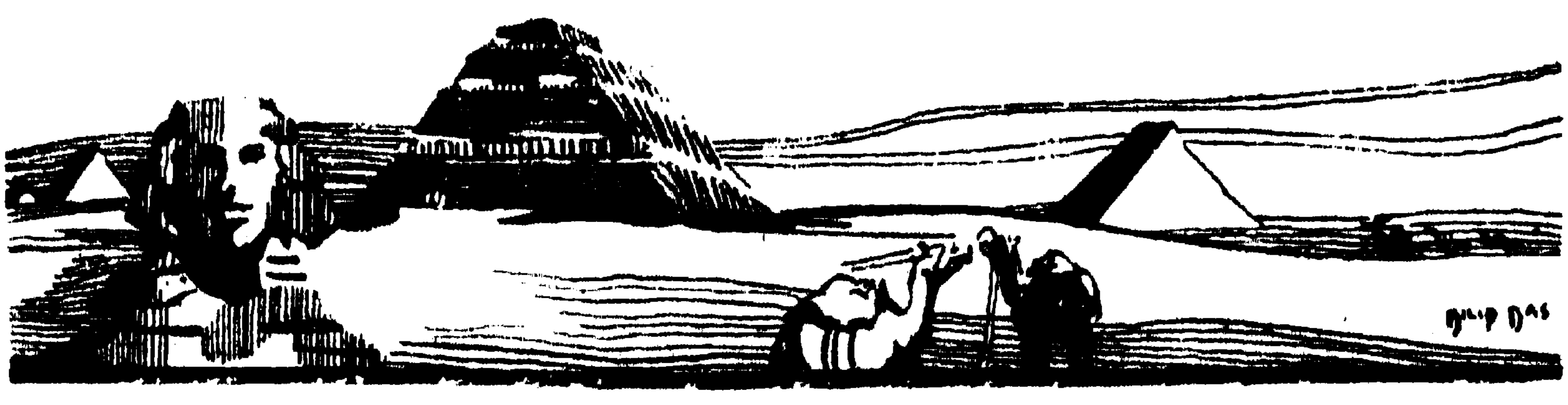

COOCH BEHAR.

জয়শ্রী

অষ্টম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৬ | নবম সংখ্যা

গান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ

অনিল চন্দ্র রায়

চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে কেবল নয়, সংঘাত প্রবল ও প্রখর হয়ে উঠেছে। এ যে দিনে দিনে আরো প্রখরতর হবে, তাতে কারুরই সন্দেহ নেই; অন্ততঃ চক্ষুষ্মান যাঁরা তাঁদের নেই। কিন্তু বহু লোক আজো আছেন যাঁরা তত্ত্ব বা থিওরী নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, তাঁরা বিব্রত থাক্‌তে চান আশু ব্যবহার (practice) নিয়ে। তাঁরা বলে থাকেন, ভারতবর্ষে অনেক প্রাথমিক কাজ বাকি রয়েছে, সেই সব কাজকে প্রোগ্রাম ক'রে দৈনন্দিন কৃত্যগুলোকে করাই যথেষ্ট। তত্ত্বের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে পরস্পরকে হানাহানি ক'রে লাভ নেই; ওতো কেবল বাগাড়ম্বর। কিন্তু ব্যবহার যে তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না এবং উভয়েই যে জড়াজড়ি ক'রে পরস্পরকে আশ্রয় দিচ্ছে, একথা অনেকেই ভুলে যান। তাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক জগতে অহরহ ঘট্‌ছে অর্থহীন মিলন এবং সংখ্যাহীন জোড়াতালি। কেউ বল্‌ছেন, স্বাধীনতা চাই, আর কিছু সম্প্রতি চাইনে; কারণ কাণ টান্‌লে মাথা আসে যখন তখন স্বাধীনতার সাথে সাথে সব অপবর্গই এসে যাবে। কাজেই আগে "স্বরাজ" চাই, তার পরে তত্ত্ব নিয়ে বোঝাপড়া হবে।

গান্ধীজীও এই দলের। তাঁর মতে, 'স্বরাজ' হবে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রাথমিক ধ্যান, পরে হবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে বিচার। গল্পে আছে, মূর্খদের কাহিনী। মোষ কেনবার নাম নেই,

অথচ কাল্পনিক মোষের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া, মারামারির অন্ত নেই।* গান্ধীজীর মতে, আমরাও এই ধরণের মূর্খ। গান্ধীজী নিজের বেলায় কিন্তু তত্ত্ব এবং প্রোগ্রাম উভয় সম্বন্ধেই অতিমাত্রায় সতর্ক। তাঁর নিজের দর্শন-তত্ত্বের এলাকার বাইরে তিনি "পদমেকং"—ও চল্‌তে অনিচ্ছুক। এ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর। স্বরাজ যদি চুলোয় যায় যাক্, তবু তাঁর দার্শনিক মতবাদের চুলমাত্র বিকৃতিও গান্ধীজী সহ্য করতে রাজী নন। আমরা কিন্তু তত্ত্ব (theory) নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের মূর্খ বলিনে। তবে যাঁরা তত্ত্বের (theory) সঙ্গে ব্যবহারকে(practice) আলাদা ক'রে দেখেন তাঁরা অবৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই। তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারের, চিন্তার সঙ্গে কার্য্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বহু লোক আছেন যাঁরা এই দুয়ের মধ্যে কৃত্রিম বিচ্ছেদকে দিব্যি বজায় রেখে কাজ ক'রে যান। তাঁরাও কাজ করেন, কারণ কাজ মানুষকে করতেই হয় এবং "শরীরযাত্রাপি চ...ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ" ইত্যাদি। তবে হয় তাঁদের চিন্তা বা তত্ত্বের বালাই নেই, নতুবা কার্য্যের সঙ্গে থিওরীর সামঞ্জস্য রাখবার দায়িত্ব তাঁরা বোধ করেন না। অনিবার্য্য ফল হয় জোড়াতালি। আজো আমাদের দেশে তাই এমন বহু দল ও উপদল পরস্পরের সঙ্গে মিতালি করে, যাদের মধ্যে চিন্তা বা মতবাদের কোনই সামঞ্জস্য নেই। মুখে বল্‌লাম, আমি বামপন্থী, কার্য্যে চললাম দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে। তত্ত্বের দিক থেকে হলাম কম্যুনিজমের বিরোধী, কিন্তু সুবিধাবাদের দিক্ থেকে যোগ দিলাম এম্ এন্ রায়ের দলে। এমনি অনেক হচ্চে। চিন্তা সংঘাত বা ideology'র ওপরে ভিত্তি করে' দল গঠন করার রীতির আজো তেমন রেওয়াজ হয়নি। তাই আমাদের রাজনৈতিক সুর-সাধনার অনেক অঙ্গই বেসুরো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা তত্ত্ব ও ব্যবহার, থিওরী ও কার্য্যক্রম এই দুইয়ের ভিত্তিতে দল গঠনের সমর্থক। তবে আশার কথা, জোড়াতালি আর বেশীদিন চলবে না। কারণ মানুষের জানবার ও বোঝবার তাকিদ প্রবল হয়ে উঠেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমশই সজাগ হয়ে উঠছে। পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত শক্তিসংঘাত দ্রুতভাবে জমাট বেঁধে উঠছে; এমন ভাবে উঠছে যে, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব আর বিকোবে না। বেড়ার ওপরে বসে দুপক্ষের লড়াই দেখবো এমন সুবিধা আর থাক্‌ছে না। হয় এ পক্ষে নয় ওপক্ষে, একদিকে সামিল হতেই হবে। চিন্তায়, কার্য্যে আজ সুনির্দ্দিষ্ট, পরিষ্কার পথের ওপর এসে সবাইকেই দাঁড়াতে হবে। ফলে যে সব মতবাদ হালকা মেঘের মতন অস্পষ্ট ছিল, তাদেরও জমাট বেঁধে স্পষ্টরূপ ধারণ করতে হচ্চে। শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই।

গান্ধীজী যে দর্শন পৃথিবীর সামনে ধরেছেন, তার পূর্ণরূপটী এতদিন প্রকট হয়নি। তত্ত্বের দিক থেকে তার সুবিন্যাস বৈজ্ঞানিক আকারে কেউ করেনি। কিন্তু বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকের প্রবল

---

*Like the fabled men who quarrelled over the division of the buffalo before it was bought, we argue & quarrel over our different programmes before Swaraj has come." (Harijan, 27-1-40)

চাপে গান্ধীবাদকেও একটী সমাজদর্শন গড়ে তুলতে হচ্চে। গান্ধীবাদীরা বলেন, গান্ধীবাদকে যুক্তি তর্কে পাওয়া যায়নি; একে পাওয়া গেছে সহজ অন্তর্দৃষ্টি থেকে, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা থেকে। কিন্তু তবু আজ গান্ধীবাদকে বিচার ও যুক্তির মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হয়েছে, কারণ জিজ্ঞাসুকে জবাব দিতে হবে। নতুবা টিঁকে থাকা দায়। এ যুগ হচ্চে বিচার ও প্রশ্নের যুগ। কান্ট বলেছিলেন —"Our age is an age of criticism, a criticism from which nothing need hope to escape." এ কথা এ যুগেও সত্য। জবাবদিহি না করে কেউ মর্য্যাদা পাবে না, তা' সে মহাত্মালোকের বাণী কিংবা পণ্ডিতজনের তত্ত্ব, যাই হোক না কেন।

আজকের দিনে মানুষের চোখ খণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে চায় না। দেখতে চায় বৃহৎ ভূমিকায়। সংকীর্ণ ভূমিতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীটাকে দেখে তার তৃপ্তি নেই। তার তৃপ্তি বৃহৎ চক্রবালকে আয়ত্তে এনে। বিচ্ছিন্ন ক'রে জীবনকে যাচাই করবার প্রবৃত্তি আজ নেই। বিশ্বসংসারের সঙ্গে যেখানে মানুষের যোগ সেইখানে জীবনকে রেখে পরখ করবার আগ্রহ আজ মানুষকে পেয়ে বসেছে। বিশ্ব-দৃষ্টিতে তাই সবকিছুকে বিচার করে' আজকের মানুষ, গড়ে তোলে 'বিশ্বদর্শন' বা Weltanschauung. এই বিশ্বদর্শনের আলো ফেলে সে জীবনকে এবং সমাজকে দেখে। সে আলোতে রঞ্জিত হয়ে প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান ধরে একটা বিশিষ্টরূপ, প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান দেখা দেয় একটী বিশিষ্ট অর্থ নিয়ে। পৃথিবীতে আজ কয়েকটী এমনি 'বিশ্বদর্শন' (world outlook) গড়ে উঠেছে। গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত সমাজ-দর্শনও তার মধ্যে একটী।

এই সমাজদর্শনের একটী বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। জীবনের প্রত্যেকটী ছোট বড়ো অনুভূতি বা অনুষ্ঠানকে বিচার করবার এর একটী বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভালমন্দ, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করবারও একটী স্বতন্ত্র মাপকাঠি আছে। কোন্ বস্তুটীর মূল্য কতোটুকু, সে মূল্যনিরূপণের আদর্শ এর নিজস্ব। গান্ধীবাদকে যারা নেবেন তাদের সমস্ত ধারণা বদলে যাবে এই স্বকীয় আদর্শের প্রভাবে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "Our changed attitude changes all our conceptions...." গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শ একটী বিশেষ 'বিশ্বদর্শন' থেকে জাত হয়েছে।

একথা সবাই স্বীকার করেছেন যে আজকের সমাজ-ব্যবস্থা পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে নি। মানুষের জীবনে অশান্তির আগুন নির্ব্বাণ হওয়া তো দূরের কথা, "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কাজেই এ সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজকে গড়তে হবে। এ সম্বন্ধে কারুরই দ্বিধা নেই। সবাই কামনা করছে একটা আমূল বিপ্লব, একটা ব্যাপক প্রলয়। সেই প্রলয়ের ভস্ম থেকে রচনা করতে হবে নতুন বিশ্বলোক। যারা এই নবসৃজনের বিশ্বামিত্র হতে চান তাঁরা সবাই প্রলয়কামী বিপ্লবী। কিন্তু তাঁদের বিপ্লবের পরিকল্পনা সবারই একরকমের নয়। কার্ল মার্ক্স, মুসোলিনী, গান্ধী, এরা প্রত্যেকেই পৃথক ধরণের বিশ্ব সৃজন করতে চান। এঁদের বিপ্লবের পরিকল্পনাও তাই পৃথক।

আচার্য্য কৃপালিনী গান্ধীবাদের একজন নামকরা ব্যাখ্যাতা। তিনিও বলেছেন যে গান্ধীজীও

সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করতে চান। গান্ধীজী যে আদর্শ স্থাপন করতে চান, তাকে গ্রহণ করলে মানুষের জীবনের সব অনুষ্ঠান গভীরভাবে বদ্‌লে যাবে। মানুষের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ ও ন্যায়-অন্যায়ের ধারণায় আস্‌বে প্রলয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক চিন্তায় নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল আদর্শে ঘট্‌বে বিপর্য্যয় যেমন ঘটেছিল ফরাসী ও রুষ বিপ্লবে। * মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে দিতে হবে বদ্‌লে—কেবল রাষ্ট্রীয় অদল-বদলে কিছু হবে না। আদর্শের ঐকান্তিক পরিবর্ত্তন চাই, "Some revaluation of life values" (Kripalini).

গান্ধীজী বর্ত্তমান সমাজকে চান না;—একে ভাঙ্গতে চান কিন্তু যে নতুন সমাজ তিনি সৃজন করবেন তার স্বরূপ কী? সেই স্বরূপ সম্বন্ধে কৃপালিনী বল্‌ছেন যে ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়তে হবে কয়েকটী মূলনীতিকে ভিত্তি ক'রে। সে মূলনীতি হলো "অহিংসা ও সত্য"। এই নীতিগুলোই মানুষকে নিয়ে যাবে দিব্যজন্মের দিকে; এবং এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় থাক্‌বে না শোষণ এবং অত্যাচার, অসাম্য ও অভাব।† কৃপালিনীর মতে গান্ধীজীও শ্রেণীহীন সমাজ কামনা করেন। জনৈক সোস্যালিষ্ট প্রশ্নকর্ত্তার উত্তরে গান্ধীজী নিজেও তাঁর ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে সোস্যালিজ্‌ম্ এবং গান্ধীবাদের উদ্দেশ্য (motive) অভিন্ন,—"the greatest welfare of the whole society and the abolition of the hideous inequalities resulting in the existence of millions of have-nots and a handful of haves." (Harijan, 27-1-40), বর্ত্তমান সমাজে মুষ্টিমেয় লোক ধনদৌলতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর কোটী কোটী মানব বুভুক্ষিত হয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধনীর ভোগ জোগাচ্ছে, একথা গান্ধীজী মানেন। পুনশ্চ এই অসাম্য যে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র হতে উদ্ভূত হয়েছে সে কথাও তিনি স্বীকার করেন। তাই ক্যাপিটালিজ্‌ম্ বা ধনতন্ত্রের তিনি মহাশত্রু। "...I desire to end capitalism almost, if not quite, as much as the most advanced socialist or even communist. But our methods differ,..." (Harijan, 16-12-39) কাজেই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে গান্ধীজীর কোনই ভেদ নেই। কেবল প্রভেদ আছে কর্ম্মপন্থায়।

গান্ধীবাদের সকল কর্ম্মপন্থার মূল কথা হলো "অহিংসা"। প্রকৃত সাম্য এবং শান্তি আস্‌তে পারে কেবল অহিংসার মধ্য দিয়ে, "only when non-violence is accepted by the

* "I believe the revolution for which Gandhiji is responsible is of the former type, that is, it is primarily a revolution of ideas and ideals and is not merely political but an all-round revolution changing the values of life as did the French and Russian revolutions" (J. B. Kripalini ; Hindusthan Standard, 27-1-40)

† The social organisation is to be built upon Nonviolence, Truth and Justice. What Gandhiji contemplates is a casteless and classless society based upon co-operative service..." (Kripalini, Ibid)

সবগুলো সত্বাই জটিল বীণাধ্বনি; যাতে অনুবিদ্ধ হয়ে রয়েছে বহু তারের বহুবিধ সুর। অরবিন্দের ভাষায়, "for even unity, exclusively pursued, ceases to be a true oneness. Yet this error we perpetually commit." প্রাকৃত মানুষ সেই ভুলই করে। বিশ্বসংসারের বিচিত্র-বীণ যে মিশ্ররাগ বাজিয়ে চলেছে, তাকে সে ধরতে পারে না; তার সহজ জ্ঞানে প্রতিভাত হয় কেবল একটানা একটি ধ্বনি। পৃথিবীকে সে বুঝতে চায় একটী মাত্র নীতির সাহায্যে। হিংসা-অহিংসা, ভালো-মন্দ, আত্মপর,—বিশ্বভরে সর্ব্বত্র আছে জড়িয়ে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরকে অবলম্বন মানুষ করতে পারে না; একটী থেকে অপরকে ছেদন ক'রে আনা অসম্ভব। সংসারে কেবল হিংসা নেই, অহিংসাও নেই; যেমন কেবল সুখ বা কেবল ভালো নেই। দুটো নীতিই সর্ব্বত্র কাজ করছে। প্রাকৃতিক জগতে যেমন, মানুষের সামাজিক জীবনেও তেমনি। একদিকে দেখতে পাই সহযোগিতা, অন্যদিকে আছে প্রতিযোগিতা। জীবজগতে জীবনসংগ্রাম আছে, আবার সংঘবদ্ধতাও আছে। মানুষসমাজেও যেমনি আছে প্রতিদ্বন্দ্ব, তেমনি আছে মৈত্রী। ডারুইনের প্রতিবাদে হাক্সলির নৈতিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বও রয়েছে। হিংসা ও অহিংসা দুই শক্তিই জীবনে ক্রিয়াশীল। একেকে বর্জ্জন করে একান্ত ভাবে অন্যটীকে পূজা করবার দাবী মানুষ করতে পারে—কিন্তু তাতে চলমান জীবন-প্রবাহকে প্রতিরোধ করা হবে, সহায়তা করা হবে না। অরবিন্দ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর Essays on Geeta নামক পুস্তকে। প্রেমের (Love) প্রভাব জীবনে অতি বিপুল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু স্থূলশক্তি বা তাকৎ (power) এর স্থানও সংসারে স্বীকার করতেই হবে। প্রেমশক্তি ও দেহশক্তি—দুয়েরই অবদান প্রচুর। "What can be more divine than Love? But followed exclusively it is impotent to solve the world's discords. The worshipped Avatar of love & the tender Saints leave behind them a divine but unfollowed example, a luminous and imperishable but ineffective memory." (Aravinda) হৃদয়কে প্রাধান্য দেবার মূল্য আছে, কিন্তু হৃদয়বৃত্তিই মানবের একমাত্র বৃত্তি বা প্রয়োজন নয়। মানুষের আছে আরো বিচিত্র বৃত্তি এবং বিবিধ প্রয়োজন। মানুষের আছে দেহ, আছে মন; অন্নময় কোষকে প্রবল করে তুল্লে যেমন হবে একপেশে বৃদ্ধি, তেমনি প্রাণময় কোষকে বাড়িয়ে তুললেও হবে একই একঘেয়েমী। দেহে, প্রাণে, জ্ঞানে, আনন্দে মানুষ যখন হয় সম্পূর্ণ তখনই তার হয় সত্যিকার উন্নয়ন। মানুষের অপর গুণ ও বৃত্তিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে "প্রেম" ও "হৃদয়বৃত্তি" যদি বিকশিত হয় তবেই মনুষ্যত্বের সাধনা হয় পরিপূর্ণ। * জীবনের একটা দিক যেমন মধুর, আরেকটী দিকও আছে ভয়ঙ্কর। শুভ ও

* They have added an element to the potentialities of the heart but the race cannot utilise it effectively for life because it has not been harmonised with the rest of the qualities that are essential to our fullness." (Superman, Arabinda)

কল্যাণকর আছে, সুন্দরও আছে; কিন্তু অশুভ আছে, অসুন্দরও জীবনেই আছে। মধুর ও শান্তরসের পাশাপাশি রয়েছে বীভৎস রস ও ভয়ঙ্কর। সৃজনের সঙ্গে আছে প্রলয়। আমাদের প্রাণ চায় মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য; কিন্তু চারিদিকে রয়েছে মৃত্যু, মহামারী আর নির্ম্মম ধ্বংস। জীবনের এই দিককে আমরা চাই চোখ বুজে এড়াতে, চাইনে আমরা জীবনের প্রলয়ঙ্কর ভয়াল সত্যকে, বিশ্বরূপ আমাদের চোখে সয়না, আমরা চাই বংশীধারীকে। মহাকালের করাল ছায়া পড়েছে আমাদের জীবনে; আমরা কামনা-চালিত হয়ে বল্‌তে পারি, চাই প্রেমকে, চাই মৈত্রীকে; কিন্তু চোখের সামনে শ্মশানের "কাড়াকাড়ি-গীতি" বজ্ররোলে বেজে ওঠে, সমস্ত প্রেম, সমস্ত মৈত্রীকে শুকনো খড়ের মতো ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে আসে ভৈরবের অট্টহাস্যের ঝড়; ওঠে কান্নার রোল, ওঠে নিষ্ঠুরতার জয়ধ্বনি। জীবনের একটিকে যাঁরা এড়াতে চান তাঁরা দার্শনিক বিচার করেন না, হৃদয়বৃত্তির মুগ্ধ পূজায় একপেশে আদর্শকে প্রচার করেন। আসল কথা হৃদয়ের শক্তি, প্রেমের শক্তি যেমন জীবনে প্রয়োজন, দেহের শক্তি, পশুশক্তিরও তেমনি আছে প্রয়োজন। বিদেহী মানুষ নেই; দেহকে ছাড়া চলে না; তেমনি পশুশক্তি, দেহশক্তি ছাড়াও চলে না। আত্মিকের যেমন প্রয়োজন আছে, স্থান আছে, দৈহিকেরও তেমনি স্থান ও প্রয়োজন আছে। মূল্য নিরূপণের মাপ-কাটিতে হয়তো দুটো একই স্তরে স্থান পাবে না; কিন্তু যার যার স্তরে উভয়েই মূল্যবান।

পশুশক্তি ও প্রেমশক্তি এরা দুইই অসম্পূর্ণ সত্য; অদ্বিতীয় সত্য কেউই নয়। প্রেমশক্তি কেবল মিলনকে দেখে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষকে এড়িয়ে যায়; তেমনি পশুশক্তি কেবল বাহ্য ব্যবস্থাকে বড় করে, অন্তরকে করে উপেক্ষা। পশুশক্তি সাম্রাজ্য গড়েছে, ঐশ্বর্য্যকে সৃষ্টি করেছে, কিন্তু মানবীয় অসম্পূর্ণতাকে দূর করতে পারেনি। এই দুই শক্তিকে পরস্পরের সহযোগিতায় সংযত ও বিকশিত হতে হবে, তবেই হবে পূর্ণতা। সত্যিকার ঐক্য হবে জটীল ও বিবিধ শক্তির সামঞ্জস্য; কোন একটী শক্তিকে বর্জ্জন ক'রে একটীমাত্র সত্তাকে আতিশয্য দান করা দার্শনিক বিচারে অযৌক্তিক ও একপেশে গণ্য হয়। কারণ "Unity is the secret, a complex, understanding and embracing unity" (Aravinda) *

(খ) তারপরে প্রশ্ন হচ্চে, অহিংসাকেই বা বরণ করবো কেন? মানবজীবনের আদর্শ কি? শান্তি ও আনন্দ; সত্যিকার শান্তি ও অদ্বিতীয় আনন্দ, কবরের শান্তি ও আফিমের আনন্দ নয়। শান্তি ও আনন্দ কোন্ পথে আসবে? কেবলি অহিংসার পথে আসে, একথা ঠিক নয়। আদর্শের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া এরা সিদ্ধ হয়।

গোড়ার আদর্শ হলো আত্মবিকাশ, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ বিকাশ। আত্ম বল্‌তে কেবল হৃদয়-বৃত্তি নয়, দেহ-বৃত্তিও বটে, মনোবৃত্তিও বটে। হৃদয়বৃত্তির বিকাশেই বা অহিংসাবৃত্তির

* "Love fails because it hastily rejects the material of the world's discords or only tramples them underfoot in an unusual ecstasy; Power because it seeks only to organise an external arrangement. The world's discords have to be understood, seized, transmuted." (Ibid).

পূর্ণতাতেই কেবল আত্মবিকাশ পূর্ণ হয় না। সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশেই মানুষের সার্থকতা। দেহশক্তি বা হিংসাশক্তিকেও বর্জ্জন ক'রে নয়, আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে ব্যক্তি ও সমাজ বিকশিত হয়। হিংসাশক্তি যখন মহদাদর্শের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই হিংসা হয় রূপান্তরিত, "transmuted," অহিংসাকে fetish করে তোলা হলো যুক্তিহীন। নৈতিক বিচারে অহিংসাই একমাত্র কর্ম্মযোগ নয়। নৈতিক বিচারের মাপকাটী হলো আত্মবিকাশ। পাপ পুণ্য নির্দ্ধারিত হয় এই মানদণ্ডের তৌলে। হিংসা বা অহিংসাকেও সেই মাপকাটীতে বিচার করতে হবে। আদর্শের সঙ্গে যদি খাপ খায় তবে হিংসাও পুণ্যব্রত হতে পারে; কারণ হিংসা সেখানে আত্মবিস্তারের সহায়ক। অহিংসা যদি আদর্শের পরিপন্থী হয় তবে অহিংসাও পাপব্রত। হিংসা যেখানে দাক্ষিণ্যশক্তিতে প্রাণের পরিপোষক হয় সেখানে হিংসাই নৈতিক প্রশংসার পাত্র। নৈতিক বিচারের শাশ্বত (absolute) মাপকাটী নেই। দেশকাল পাত্র অনুসারে নৈতিক আদর্শ বারম্বার পরিবর্ত্তিত হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসই তার সাক্ষী। একথা বল্‌ছিনে যে ইতিহাসের একাদিক্রম (continuity) নেই। কিন্তু প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানের ওপরে মহাকাল তার পদচিহ্ন রেখে গেছেন; প্রত্যেকটী অনুষ্ঠানের ওপরে পড়েছে অতিক্রান্ত যুগের চিহ্ন। যুগাতিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, ব্যক্তি, ধর্ম্ম, নীতি, এক কথায়, সবকিছুই তাদের রূপ বদলেছে। কোনো পারিপার্শ্বিকে হয়তো অহিংসা কুনীতি—অপর পরিস্থিতিতে অহিংসাই হবে সুনীতি। বাঁধাধরা কাষ্ঠকঠিন ছাঁচে ফেলে জীবনকে পরিমাপ করা চলে না। জীবন যে কোন ফর্ম্মূলা থেকে ব্যাপকতর ও গভীরতর। সক্রেটীস ডায়ালেকটীকের বিচারে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানকে প্রতিপন্ন করেছেন সাম্প্রতিক বলে, কারণ সকল দেশের, সকল কালের কোন শাশ্বত নৈতিক আদর্শ জগতে নেই। যদি থাকেও তবে অহিংসাকেই বা সেই শাশ্বত আদর্শ ব'লে মান্‌বো কেন? অহিংসার নিকষে কষে সব কিছুকে পরখ করবো কেন? বরং অহিংসাকেই পরখ করে দেখ্‌বো বৃহত্তর আদর্শের নিকষপাথরে। মহদাদর্শে অনুপ্রাণিত হিংসা বা দেহ-শক্তিও সেই নিকষে হবে পুণ্য।

দেহকে পাপ যারা বলেন, তারা ভ্রান্ত। কারণ পাপ পুণ্যের মাপকাটী হলো স্বতন্ত্র। দেহ কখনো পাপভাক্ হতেও পারে, পুণ্যভাক্‌ও হতে পারে কখনো। স্বয়ং দেহ বা দেহশক্তি পাপও নয়, পুণ্যও নয়। দেহ হচ্চে সত্য, দেহ হচ্চে বাস্তব। তেমনি হিংসা ও অহিংসার বেলায়। হিংসা ও অহিংসা দুইই সত্য ও বাস্তব। তবে এরা পুণ্য বা পাপ হবে আদর্শ ও পারিপার্শ্বিকের বিচারে। হিংসা ও অহিংসা পুণ্য না পাপ, তার নির্দ্ধারণ হবে অপর একটী আদর্শের মাপকাটী দিয়ে। কখনো হিংসা পাপ, কখনো পুণ্য। অহিংসা সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই পাপ বা পুণ্য হতে পারে না।

(গ) অহিংসাকে কোন দিক দিয়েই ন্যায় অন্যায় বিচারের শাশ্বত মাপদণ্ড বলা চলে না। আমরা বলেছি পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সহায়ক হলেই তাকে ন্যায় বলা চল্‌বে। আত্মবিকাশ হয় স্বধর্ম্মপালনে। স্বধর্ম্ম কি? এখানে মানব চরিত্রের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে। লোহার যন্ত্রে ফেলে সকল বৈচিত্র্যকে মেরে ফেলা চলতে পারে, কিন্তু তাতে স্বধর্ম্মবিকাশের সাহায্য হয় না।

মানুষ সবাই এক ধাতের নয়। এই সাদা সহজ কথাটী গান্ধীজী স্বীকার করতে চান না। মানুষের ভেতরে আছে নানা তন্ত্রী; আছে তার ইচ্ছাবৃত্তি (volition) ভাববৃত্তি (emotion), ও জ্ঞানবৃত্তি (cognition). আছে ভাল, আছে মন্দ, আছে ঔদাসীন্য। আছে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি, আছে বহির্জ্জগৎ থেকে আহরিত নানা উন্মুখতা। সব কিছুর সমবায়ে হয়ে দাঁড়ায় সে একটী বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের আছে নানা প্রকারের শ্রেণীভেদ। তাই হিন্দুশাস্ত্রে আধার ভেদে ব্যবস্থারও তারতম্য স্বীকৃত হয়েছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনটে স্তর হিন্দুরা বর্ণনা করেছেন। স্তরভেদে ধর্ম্মভেদ ও তাই স্বীকৃত হয়েছে। যিনি যে ধাপের লোক তাঁর স্বধর্ম্মও তদনুযায়ী। "What is sauce for the gander... ..." ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্রেও মানব জাতিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে, যথা, দিব্য প্রকৃতি, বীর প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতি। একদিকে বলা হচ্চে "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ" ইত্যাদি; আবার অন্যদিকে আছে "অহিংসা সত্যমস্তেয়... ইত্যাদি। কখনো কারুর পক্ষে হিংসা স্বধর্ম্মানুযায়ী, কখনো বা অহিংসাই কারোর প্রকৃষ্ট সাধন। অর্থাৎ হিন্দু দর্শনে একই শাশ্বত নৈতিক আদর্শ স্বীকৃত হয়নি। বৌদ্ধধর্ম্ম মৈত্রী ও করুণার জয় গাথা পৃথিবীকে শুনিয়েছিল সবার আগে। কিন্তু বৌদ্ধ অহিংসারও একটা সীমা স্বীকৃত হোতো। জৈন ধর্ম্মেও অহিংসাদি পাঁচটী পালনীয় ধর্ম্ম বলে আদৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁরাও গৃহস্থের জন্য "অনুব্রত" এবং সন্ন্যাসীর জন্য "মহাব্রত" স্বীকার ক'রে আধার ভেদকে স্বীকার করেছেন।

(ক্রমশঃ)

ঘরে বাইরে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আঁধারে উধাও পথ : অন্ধকারে নির্ব্বাপিত বাতি।
সোনালী গন্তব্য-পথ নিরুদ্দিষ্ট দুর্গমের মাঝে।
অবরোধে ব্যর্থতায় আজো কাটে উৎসবের রাতি।
প্রশান্তির উৎসমুখ খুঁজে-ফিরি কোথায় বিরাজে।

নগরীতে বাঁধি বাসা ভাগ্যান্বেষী আমরা সকলে।
সঙ্কল্প সুদৃঢ় করি পরক্ষণে অতলে তলাই।
আমাদের ম্লান চোখে প্রত্যহের শেষ দীপ্তি জ্বলে।
জটিল জীবনস্রোতে পাদপীঠে মেলেনা কো ঠাঁই!

উদ্যত মুহূর্ত্ত কাটে ট্রামে-বাসে অট্ট হট্টগোলে।
মুদ্রিত নয়নে জাগে কল্পনায় বিস্তীর্ণ সাগর।
নতুন যুগের আলো আমাদের রক্ত-কলরোলে।
এখানে তো চোখ খুলে প্রতি পদে কণ্টক-কাঁকর।

হায়রে, অবোধ মন বঞ্চনায় বৃথা ঘুরে মরে।
হয়তো অলক্ষ্যে মৃত্যু অবরোধে আজ বাদে কাল।
যুদ্ধ তো বেধেছে কসে' দৈনিকেতে সে-খবর পড়ে
নিরুপায় নর-নারী, রক্তমেঘে নীলাকাশ লাল।

ত্রস্তভাবে আজো খুঁজি সঙ্কটের শেষ সীমারেখা।
গান্ধীমার্কা অহিংসায় কোনোক্রমে যাপি দীর্ঘ দিন।
মৃত্যু চলে পায়ে-পায়ে, অতর্কিত নভোনীলে দেখা
বোমারু বিমান কোনো—বিষবাষ্পে অবস্থা সঙীন।

রাজভক্ত নাগরীক, আছি খাসা বৃটিশ শাসনে।
প্রত্যহ কাগজে পড়ি ইংরেজের জয়-জয়কার।
যদি প্রভু আজ্ঞা দেন শ্রীরামের মতো যাবো বনে।
যতোক্ষণ আছে প্রাণ চিরবৈরী হোক্ হিট্‌লার!

নেপথ্যে অবশ্য মানি দুর্য্যোগের নেই আর বাকী।
কী যেন বহ্নির জালা শ্রমিকের কৃষকের চোখে।
কৌশল স্থগিত থাক্ ধরা পড়ে গেছে সব ফাঁকী,
বণিকের নাভিশ্বাস জ্বালা ভুগে সে বহ্নি-আলোকে।

হে সৈনিক, আমি নহি নগরের শেষ নাগরীক।
তোমার কৃপাণ তোলো করো ছিন্ন সঙ্কটের জাল।
আবার আসুক দিন বর্ষে-বর্ষে উদ্যত নির্ভীক।
মাটীতে উর্ব্বরা ক্ষেতে স্বর্ণবর্ণ ফসলের কাল॥

জল আর আগুন

আশাপূর্ণা দেবী

এই লইয়া মায়ের সঙ্গে সরযুর নিত্য কলহ। শোকের অত বাড়াবড়ি তাহার অসহ্য লাগে। মেয়ে বিধবা হইল বলিয়া, বিমলা নিজে, সধবা মানুষ বিধবার আচার পালন করিতে চায় কোন হিসাবে?

—"মেয়ে তো কারুর বিধবা হয় না"—সরযূ রাগিয়া বলে—"তোমারই এই নতুন হ'ল? অনাসৃষ্টি আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বালা করে"।

মেয়ে হইয়া মায়ের মুখে মুখে এমন কটু কথা শুনাইয়া দেওয়া খুব সঙ্গত না হইলেও বাড়াবাড়ি বিমলার সত্যই আছে। অল্পবয়সের মেয়ে বিধবা হওয়া অল্পশোকের ব্যাপার নহে—কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সেও পান ছাড়িবে, নিরামিষ ধরিবে, শাড়ী পরিতে চাহিবে না, আলতা, সিঁদুর দিতে গেলে কাঁদিয়া হাট বাধাইবে, এই বা কেমন কথা?

মুখটা সরযুর বরাবরই আলগা, রাগিলে—গুরুজন বলিয়া কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেনা—বলে—জামাই ম'লে যে মানুষে হবিষ্যি করে—এই প্রথম দেখছি—খুব যা'হোক কীর্ত্তি-রাখা কাজটা করছো মা—তা' বসে বসে আর সেই ভালমানুষের ছেলের অকল্যাণগুলো নাই করলে—চোখে সহ্য হয়না বাবু।

"ভালমানুষের ছেলে—" অর্থে সরযুর বাবা জিতেন। এক সৃষ্টিছাড়া দেশে পড়িয়া থাকে, সামান্য কয়টী টাকার বন্ধনে—বৎসরান্তে একবার বাড়ী আসা—তা'ও কদাচিৎ ঘটিয়া উঠে।

খেয়ার কড়িও তো সামান্য নয়।

মেয়ের মুখের কাছে বিমলা দাঁড়াইতে পারেনা, চুপ করিয়া থাকে, নিজের "কীর্ত্তি রাখা কীর্ত্তি"—গোপন করিতে পারিলেই বাঁচে যেন, তবু সরযুর এই শ্রীহীন সজ্জাহীন মূর্ত্তি চোখের সামনে রাখিয়া চুলে চিরুণীটা দিতেও তাহার বাধে।

মাছের ঝোলের বাটী লইয়া খাইতে বসেই বা কোনপ্রাণে! অথচ নিরামিষ ভাত গলা দিয়া নামিতে চাহেনা বিমলার।

তখনো শেষের ভাত কয়টী লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে দেখিয়া সরযূ খানিকটা কুলের আচার আনিয়া পাতে ফেলিয়া দিয়া তীব্রস্বরে কহিল—ফের যদি তুমি এই ছাই পাঁশ খেতে আসবে মা—ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি। আমিই যদি তোমার গলার কাঁটা হয়ে থাকি দাওনা বিদেয় করে? আপদের শান্তি হোক। শ্বশুরের ভিটেখানা তো আমার তার সঙ্গে চিতায় ওঠেনি—বেশ থাকবো গিয়ে।

বিমলা বামহাতে চোখের জল মুছিয়া কাতর স্বরে বলে—তুই আমার আপদ—! কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করিস কি করে সরো—

—তা বৈ আবার কি! আমার জন্যে তোমার খাওয়া ঘুচলো পরা ঘুচলো দিনে রাতে স্বস্তি নেই আপদ কাকে বলে আর? বলিয়া ভিজাচুলের রাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া সরযু রৌদ্রে পিঠ দিয়া গা মেলিয়া বসে।

উঠানের দুয়ার ঠেলিয়া চৌধুরী গিন্নি আসিয়া দাঁড়াইলেন নাতি কোলে করিয়া।

ছেলেটাকে কোল হইতে নামাইয়া হাসিয়া কহিলেন—মায়েঝিয়ে কি হচ্ছে গো—ঝগড়া!

ভদ্রমহিলাকে সরযু দেখিতে পারে না আদৌ—কিন্তু মানাইয়া চলা চাইতো—কথার উত্তর না দেওয়াই বা কেমন হয়? মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে—ঝগড়া কি দুঃখে হ'তে যাবে—হচ্ছে শাসন।

শাসন?

পৃষ্ঠবল বাড়াতে—বিমলার মুখ খোলে—নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, চব্বিশ ঘণ্টাই ওই হচ্ছে—মেয়ের শাসনে শাসনে—আমিতো দিদি চোর হয়ে আছি।

ঘরের কথা পরের কাছে বিশদভাবে বলা সরযুর দুই চোখের বিষ, কথাটা ফিরাইবার চেষ্টায় ছোট ছেলেটাকে লইয়া টানাটানি করিতে থাকে কাঁদাইবার ফিকিরে।

কিন্তু 'ঘরের কথা'র মত উপাদেয় বস্তু পরের পক্ষে অল্পই আছে—কাজেই উক্তবস্তুর আঘ্রান পাইয়া চৌধুরী গিন্নি হৃষ্টচিত্তে গুছাইয়া বসিয়া সস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কেন্ লা মাকে এত শাসন কিসের? সরোবালা—কি রে?

ভারী বিরক্ত হয় সরযু—গম্ভীরভাবে বলে—নাঃ বিশেষ কিছু নয়, আমার ভালমানুষ বাবাটীর দফা নিকেশের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন বলেই বাধ্য হয়ে দু'কথা বলতে হয়।

—দেখলে দিদি কথার ছিরি, মেয়ের—যা' মুখে আসবে তাই বলবে। বিমলা আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকায় যেন সুবিচারের প্রার্থনায় একনজর। বিমলার পাতের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলিয়া, চৌধুরী গিন্নি দুই চোখ কপালে তোলেন—আলোচালের ভাত কেনরে মেজবৌ? আঁশ হেঁসেলে বুঝি খাসনা আর! আহা মরে যাই মুখে কি রোচে? কপালের গেরো—তা'তেই মেয়ে বকছে?—তা' বকবে বইকি—বড় হয়েছে বোধশোধ হয়েছে তো—আপনার কপাল পুড়িয়ে খেয়ে ব'সে থাকলো এখন বাপভাইয়ের কল্যাণ অকল্যেণ দেখাই দরকার। ফেলার মা আমায় বলছিল কাল—চুলটা সুদ্ধু আর বাঁধিসনে নাকি—নরুন পেড়ে ধুতি সার করেছিস—?" বোঝা গেল, লোক মুখে বার্তা পাইয়াই তিনি সঠিক তদন্ত করিতে আসিয়াছেন।

বিমলা ছলছল্ চোখে বলে—মেয়ের পানে একবার তাকিয়ে দেখো দিদি, কপালের

লেখা খণ্ডাবার নয় বুঝলাম তাই বলে' এই বয়সে অমনিতরো বেশভূষা কে করে বলো—মা বাপের বুকের ওপর ? মা হয়ে কোন প্রাণে আমি—

কথাটা মিথ্যা নহে—সরযুর বয়সের মেয়ে কেহ কখনো স্বামী যাইতে না যাইতে সাদা থান ধরেনা।

ময়লা মোটা একটা সেমিজের উপর আধময়লা সাদা থান; অঙ্গে অলঙ্কারের আভাস মাত্র নাই।

লালিত্য লাবণ্য কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

চাহিয়া দেখিয়া সতৃপ্ত স্নেহঢালা সুরে চৌধুরীগিন্নি উত্তর দেন—তা' ভাই পারলেই ভালো, কথায় বলে "ভগবানের মার দুনিয়ার বার—" ওই করতেই থাকলো যখন, প্রেথম থেকে অব্যেস করা ভাল বই মন্দ নয়। গোবিন্দর মেয়েটা দেখনা—হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ির গোছা, এতখানি চ্যাটালো পেড়ে শাড়ী পরণে—ভাল দেখায় কি ? অতটা আবার ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ মায়ের প্রাণে দাগা লাগে বৈ কি। তা'তুই বাছা খাওয়া দাওয়া নিষ্ঠেকাষ্ঠা করিস খাসা করিস্ ও হতছাড়া কাপড়খানা এখুনিথেকে ধরিসনে মা—বলিয়া আঁচলের কোনটা তুলিয়া শুষ্কচোখের কম্পিত অশ্রুটুকু ঘসিয়া ঘসিয়া মুছিতে থাকেন।

সরযু ব্যঙ্গহাস্যে ঠোঁটটা ঈষৎ বাঁকাইয়া বলে—তবে কি পরবো "এতখানি চ্যাটালো পেড়ে শাড়ী ?"

উপহাসটা চৌধুরীগিন্নি বুঝিতে পারেন কি না বুঝিতে দেননা—অন্যকথার অবতারণা করেন বলেন—জীতু ঠাকুরপো চিঠিপত্তর দেয়নি মেজবৌ ? কই একবারতো এলনা ? কিজানি—মনকে কেমন করে বুঝিয়ে রাখতে পারে মানুষে—এই কাণ্ডখানা ঘটে গেল ? তোর বাপের কথা বলছি সরো—বলিয়া সরযুর নিকট সায় পাইবার আশাতেই বোধকরি সাগ্রহে তাকান।

কন্যার বিবাহ দিয়া জীতেন গত ফাল্গুনে সেই যে গিয়াছে এ যাবৎ আর আসে নাই। নিদারুণ সংবাদ পাইয়া হা হুতাশ—অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ইত্যাদি যাহা করিবার সবই করিয়াছে পত্রের মারফৎ—তবে আসার কথা স্বতন্ত্র—পতিবিয়োগবিধুরা কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে না আসিলে—যদি বা চলে, চাকুরী গেলে একদিনও চলিবে না।

সরযু উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে বলে—পান দেব জ্যেঠিমা ?

—পান ? তা দিবিতো দে দুটো—একটু দোক্তাও অমনি আনিস্ মা। হ্যাঁ, ননী বলছিল খবরের কাগজে নাকি লিখেছে—কি ছাই নামটা মনেও থাকে না—তোর বাবা যেখানে থাকে লো—ভয়ানক নাকি কলেরা হচ্ছে, যাকে ধরছে আর রাখছে না, মরে মরে দেশ ওজাড় হয়ে গেল—শুনে তো ভেবে মরি, ভয়ে হাতপা ঠক্ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগলো—চিঠিপত্তর ঠিকমত আসছে তো জীতু ঠাকুরপোর ? মা দুর্গা ভাল রাখুন, আহা।

বিমলার হয়তো বুদ্ধি তেমন ধারালো নয়, কিন্তু সরযু জানে কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এ চৌধুরী গিন্নীর একপ্রকার চিত্তবিলাস, মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি করিয়া করুণাবিগলিত সহানুভূতি প্রকাশ করা।

রোগী দেখিতে আসার ছলে তাহারই শিয়রের গোড়ায় বসিয়া বসিয়া বর্ণনা করিতে থাকেন; উক্ত রোগ কিভাবে মারাত্মক মূর্ত্তি ধরিয়া কতজনকে শেষ পর্য্যন্ত শেষ পরিণতির মুখে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারই কাল্পনিক ইতিবৃত্ত।

চৌধুরী গিন্নী বলিয়া নয়—অনেকেরই এ সখ থাকে।

হয়তো বিমলাও বোঝে মিথ্যা—তবু মনটা তাহার দমিয়া যায় নাকি? শঙ্কিত হয় না আপনার অন্যায় আচরণের জন্য? উঠিয়া গিয়া অলক্ষিতে যদি একতিল সিঁদুর ছোঁওয়ায় সিঁথিতে—একাদশীর দিন লুকাইয়া এক টুকরা মাছ ভাজিয়া মুখে দেয়—বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি তাহাকে—ভণ্ডামী বলিয়া?

এমনি করিয়া দিন কাটিতে থাকে, সরযু ভাবে—দোহাই তোমাদের, এমন অহরহ আমার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সহানুভূতি করিতে আসিও না তোমরা—। দুই দণ্ডের জন্য আসিয়া—যে আমাকে একেবারে মাটী করিয়া দিয়া গেল, তাহার জন্য কাঁদিয়া মাটী ভিজাইবার সখ আমার নাই।

বেশ কাটাইব আমি বর্ত্তমানের হালকা স্রোতে গা ভাসাইয়া—ভুলিব আমার অতীতের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের আশা।

শুধু তোমাদের—"আহা—উহু"গুলা একটু যদি কম খরচ করো।

বিমলা ভাবে—সন্তান যে কী বস্তু বুঝিলে না তো—চিরদিনের মত ভাগ্যের মাথা খাইয়া বসিয়া থাকিলে; সে সৌভাগ্য ঘটিলে বুঝিতে, কেন বিমলার চোখের জল শুকায় না—কেন তাহার আহার নিদ্রা ঘুচিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা মতবিরোধ ঘটে বলিয়া অন্তরঙ্গতা কমিয়াছে না কি? —পাগল! তাই কি হয়, মনের কথা বিমলা বলিবে কাহার কাছে? স্বামী পর্য্যন্ত কাছে নাই যাহার?

আপনার মনের মত মনের কথাই সে কহিতে জানে; বলে—তোর ছোটখুড়ির আক্কেলখানা দেখ্‌লি, সরো, ছেলেপুলে নিয়ে ঘরে দোর দিয়ে শুতে গেল—চোখে তো দেখলে—এই দেড় মণ তেঁতুলের ঝোড়া নিয়ে বসলাম আমি—

যেন দেড় মণ তেঁতুল এই দণ্ডেই কাটিয়া তোলার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বিমলা কাটিবেও সমস্তগুলা।

সরযু আর একখানা বঁটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একপাশে বসিয়া পড়ে নিঃশব্দে।

বিমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বলে—তোকে তো বলিনি বাছা, যা একটু গড়িয়ে নিগে, সকাল থেকে খাট্‌ছিস—'ছোটবৌর' কথা বলছি, এতটুকু বাড়তি কাজে পাবার জো নেই।

সরযু কি এখনি ক্লান্ত হইয়া পড়িল না কি? কথার উত্তর দিবার ইচ্ছা হয় না কেন তাহার? কণ্ঠস্বর এমন ম্লান নিস্পৃহ কেন?

—যাক গে মা, ছেলেগুলোকে নিয়ে না ঘুম পাড়ালে সারাদিন দস্যিপনা করবে তো? বাড়ীটা তবু একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

ঠাণ্ডা গরম বুঝিবার ক্ষমতা বিমলার নাই—অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলে—তুই তো তোর খুড়ির কোন দোষ দেখিস না—ছেলে দুরন্ত বলে গেরস্ত বুঝবে?

—আঃ যেতে দাও না মা, গেরস্ত বলতে তো তুমি আর আমি, একটু না হয় বুঝলামই।

—হুঁঃ ওই আস্কারাতেই তো গেল আরো—অমন ধারা বেয়াক্কেলে মেয়েমানুষ অন্য-সংসারে যদি পড়তো—তাহলে—"অন্য সংসারে পড়িলে"—কি যে অশেষ দুর্গতি ঘটিত, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার বদলে কথার পিঠে ড্যাস্ টানিয়া দিয়া অনুমানকে আরো বিস্তৃত করিবার সুযোগ দেয় বিমলা।

কিন্তু সরযু আর কথার উত্তর দিবে না। কথা—কথা—কথা! কথা কহিবার জন্য অজস্র সময় আছে—অজস্র সময় থাকিবে। শুধু, যখন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে দূর গাছের অন্তরালে—ক্লান্ত করুণ ভঙ্গীতে ঘুঘু ডাকিতে থাকে—কার্নিশের পায়রাগুলা একটানা ছন্দে বৃথা বকিয়া মরে, তখন সময়-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীরতায় ডুবিয়া যাইতে চাহে সরযু—ভুলিয়া যাইতে চায় সরযু বলিয়া কেহ ছিল, আজও আছে, হয়তো সুদীর্ঘকাল থাকিবে।

কিন্তু বিমলা কি ভুলিতে দিবে!

মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখিলেই তাহার প্রাণ কেমন করে—অন্যমনস্ক করিতে চায় নানা কথার অবতারণা করিয়া।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহে বিমলা সাংসারিক ব্যবস্থার; পরামর্শ করে—কাঁচা আমের আচার না করিয়া মোরব্বা করিলে অধিকতর উপাদেয় হইবে কিনা।

প্রশ্ন করে আগামী কাল কি কি রান্না হইবে। নিতান্ত চিন্তাকুল স্বরে—ভারী যেন সমস্যায় পড়িয়াছে এমনভাবে বলে—কাল তো তেরোদশী—বেগুন খেতে থাকলো না—সজনে ডাঁটার কি গতি হয় বল্‌তো?

যেন কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ নক্ষত্রালোকিত মৌন আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া—বেগুন-বিহীন সজিনাখাড়ার ভাবী দুর্গতির কথাই চিন্তা করিতেছে সরযু।

ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায় বিমলা এক সময় নিশ্বাস ফেলিয়া বলে—ছোট্ট থেকে এক রকমে গেল, বিছানায় পড়ল কি ঘুম। ঘুমটুকুই যাই রেখেছেন ভগবান তাই রক্ষে।

সত্যই কি বিছানায় পড়িবামাত্রই ঘুম আসে সরযুর?

অত স্থির হইয়া ঘুমায় মানুষ? নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পড়ে না?

সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত একখানা চিঠি আসে জিতেনের—ছুটীর দরখাস্ত করিয়া করিয়া অবশেষে মিলিয়াছে এতদিনে—আসিবে আজকালের ভিতরে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া সরযূ বলে—ওগো ছোটখুড়ি বাবা আসছেন আমার—ছুটী মঞ্জুর হয়েছে তিন হপ্তার।

ছোটখুড়ি মুখ তুলিয়া বলে—কি ভাগ্যি? চিঠি এল বুঝি?

মুখ তোলে বিমলাও—দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া ওঠে না কি সে মুখ! আনন্দ উপচাইয়া পড়ে না দুই চোখে! চিঠিখানার জন্য অধীর আগ্রহে হাত বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না?

কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করিবে সে কোন্ মুখে?

তাই হাতের কাজ ফেলিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

স্বামীর উদ্দেশে বিনাইয়া বিনাইয়া বলে—পোড়ামুখখানা তাঁহাকে কোন্ লজ্জায় দেখাইবে বিমলা?

সাত রাজ্য অন্বেষণ করিয়া—যে মাণিকটী সে বিমলার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে মাণিক বিমলা রাখিতে পারে নাই, হারাইয়া গিয়াছে—আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া। ব্যস্ত ছোটবৌ পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসে।

শুধু সরযূই পারে না সায় দিতে।

—ভালো জ্বালা হয়েছে বাবা—এলাম একটা সুখবর নিয়ে—দিলেন অমনি মড়াকান্না জুড়ে। কান্না তোমাদের আসেও তো! কেনা গোলাম যেন—ডাকলেই হল, চোখ তো নয়—নুনের নৌকো। বলিয়া বিরক্ত হইয়া সরিয়া যায়।

এ কথা সরযূ বলিতে পারে—নিজের তাহার কান্না আসিতেই চায় না।..................

ভীতসঙ্কুচিত জিতেন বাহির দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিতান্তই যখন সাহস সঞ্চয় করিয়া ঢুকিয়া পড়ে—সরযূ তখন রোয়াকে পা মেলিয়া বসিয়া দ্বাদশীর জলযোগ করিতেছে।

পিতাকে দেখিবামাত্র হাতের ঘটীটা সশব্দে মাটীতে বসাইয়া চীৎকার করিয়া বলে—ও বাবা তুমি এখন এলে? আমরা মনে করছি সন্ধ্যের গাড়ীতে আসছো।

আহা গো আরটু আগে যদি আসতে বাবা—পাঁপর ভাজাগুলো সব শেষ করলাম।

বৃহৎ একটা পাষাণভার নামিয়া যায় জিতেনের বুক হইতে। ভারী কৃতজ্ঞ হয় মেয়ের কাছে। সত্য বলিতে গেলে—তাহার শোকের চাইতে দুর্ভাবনাই হইয়াছিল অধিক; প্রথম সম্ভাষণটা তাহার—বিষম একরকম হৈচৈ কান্নাকাটির মধ্য দিয়া ঘটিবে—এই আশঙ্কা লইয়া সারা গাড়ী আসিয়াছে সে দারুণ উৎকণ্ঠায়। শুধু কতদূর গড়াইবে সেটা ইহাই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

তাহার পরিবর্তে কন্যার নিকট চিরপরিচিত কলকণ্ঠের সম্ভাষণ পাইয়া বাঁচিয়া যায় বেচারা।

হাতের মোটটা এক পাশে নামাইয়া সস্নেহে বলে—সব খেয়ে ফেললি বুড়ি! ছেলের জন্যে একটু রাখলি না বুঝি।

—কি করি বাবা যে পেটের জ্বালা—কাল থেকে কিচ্ছু খেতে দেয়নি,—ছেলেটেলের কথা কি মনে থাকে—বলিয়া ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম পিতার পায়ের কাছে ঠুকিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশে রওনা হয়।

বাঁচিয়া যায় জিতেন, কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য লাগে, অবাক হইয়া যায় সে।

ছেলেমানুষের মত এখনো সরযু সারাদিন তাহার কাছে কাছে ফিরিবে—অনাবশ্যক, অবান্তর সব প্রশ্ন করিবে—কি আনিয়াছে দেখিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে; অনুযোগ করিবে—অন্যান্য বারের মত—সে দেশের টাটকা ক্ষীরের পেড়া না আনায়। এতটা সে আশা করিতে পারে নাই।

সরযু সন্ধ্যাবেলা পাকা গিন্নির মত রান্নাঘরে আসিয়া মাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে—সরো বাছা সরো—আমার ছেলের জন্যে দুচারখানা ভাল ভাল রান্না করি আমি।

নিতান্তই হাসিয়া ফেলিতে হয় বিমলাকে—বলে—আর আমি বুঝি ছাই ছাই রাঁধবো—তোমার আদুরে ছেলের জন্য ?

—বিশ্বাস কি—পরের মেয়ে বৈতো নয় ? আহা মরে যাই ভাত চড়ানো হয়েছে—কেন গা দু'খানা গরম লুচি ভেজে দিতে গতরে কুলাবে না বুঝি! হয়েছে থাক—আমি যা পারি করছি—ওঠ—ওঠনা শিগ্‌গির।

—অগত্যা হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়ে বিমলা।

—অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকে দুয়ারের কাছে।

সরযু যেন ভারী রাগিয়াছে—তাড়া দিয়া বলে—বসে বসে চোখ দিতে তো বলিনি বাবু, ওতে আমার কাজ খারাপ হয়, যাও পালাও আমি আপন মনে করি।

তবু বিমলা দাঁড়াইয়া থাকে কেমন যেন বোকার মত।

আপন মনে বকিতে থাকে সরযু—বাবাঃ, দু' বছর পরে কত কষ্টে মানুষটা বাড়ী এল, তা' বড়মানুষের মেয়ে দেমাকে কথাই কইছেন না—মা, তোমার বাবা বুড়ো কি ছিল গা! নবাব—না বাদশা! সেই থেকে আমার বাবা যে একলাটী বসে রয়েছেন—তার কি! ছোটখুড়ি আর দিন পেলনা বাপের বাড়ী যাবার—খোকারা বাড়ী থাকলেও দুটো কথা কয়ে বাঁচতেন। যাও না গো বড়মানুষের মেয়ে—গরীবের ছেলেকে শুধিয়ে এস একবার কি খাবেন রাত্রে—ভাত না লুচি।

বিমলা কেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় মেয়ের মুখপানে—বলে—তুই জেনে আয়না।

—আমি! ও বাবা কত কাজ আমার এখন, নড়বার জো নেই। বলিয়া, ভারী একটা

মজার কথা মনে পড়িয়াছে এমনভাবে সহসা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে—ও মা শুনছো—বাবা কি বলছিলেন তখন ? বলছিলেন—"ওটীকে রাখা হয়েছে বুঝি খোকার জন্যে—কত করে দিতে হয় রে!" যা ছিরিছাঁদ হয়েছে তোমার ভাবা আশ্চর্য্য নয়। হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে সরযু।

বিমলা একবার আপনার পানে চাহিয়া ম্লানভাবে উত্তর দেয়—খোকার ঝি হ'লাম তার আবার কি! না—বাবু খোকার ঝি কে 'মা' বলতে পারবনা, নাও ধরতো এটা, তবু ভদ্রলোকের মেয়ে বলে বিশ্বাস হোক।

আঁচলের ভিতর হইতে চওড়া পাড়ের ধোপদস্ত একখানি শাড়ী বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয় সরযু মায়ের কাঁধের উপর।

শাড়ীখানা হাতে লইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণভাবে বলে বিমলা—তুই যেন আমায় পাগল পেলি সরো—বলে বটে—তবু পরিয়াও ফেলে আধময়লা নরুনপাড় ধুতিখানা বদল করিয়া।

এমন বাধ্য হইল বিমলা কবে! কই রাগিয়া তিরস্কারও করিল না—কাঁদিয়াও হাট বাধাইল না!

সুধু সরযুর হাতে সিঁদুর কৌটা দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—আর সং সাজাস্‌নে, সরো—আজ আমিই কোথায়—ক্রন্দনের উচ্ছাসে কথার শেষ করিতে পারেনা বিমলা।

চোখের জলকে বড় ভয় সরযুর, বাসনপত্র লইয়া এমন ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ সুরু করিয়া দেয়—ভারী যেন ব্যস্ত, তাকাইবার অবকাশ নাই।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একসময় সরিয়া যায় বিমলা—অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে—যাই দেখি ভাতই খেতে চাইবেন হয়তো—এত গরমে—

যেন নিতান্তই প্রয়োজনে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যাইতে হইল—স্বামী সম্ভাষণে।

সত্যই কি এত বুড়া হইয়া গিয়াছে বিমলা? এমন নিস্পৃহ? এতটুকু ঔৎসুক্য নাই তাহার স্বামীর জন্যে? সুদীর্ঘকাল পরে প্রবাসী স্বামী যাহার ঘরে ফিরিয়াছে?

কিন্তু সেই যে গেল বিমলা ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ নাই। হাতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেল সরযুর।

কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই এক ঝাপটা বাতাস আসয়া সহসা যেন এলোমেলো করিয়া দেয়।

এত বাতাস এতক্ষণ ছিল কোথায়?

সরযুকে কেহ জানাইয়া যায় নাই তো? চঞ্চল বাতাসে সদ্যফোটা বেলফুলের মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসে—পায়ের কাছে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে। দ্বাদশীর চাঁদ এত উজ্জ্বল? ভারী সুন্দর আর নূতন লাগে সরযুর।

পাড়ায় কাহারা নূতন একখানা গানের রেকর্ড কিনিয়াছে বোধকরি আশপাশের লোকের ধৈর্য্য পরীক্ষাকল্পে এবং দিনে-রাত্রে, সকালে-সন্ধ্যায়, চলিতেছে তাহারই একাগ্র সাধনা। তবু এই চন্দ্রালোকিত আকাশের নীচে বসিয়া—সে সুর নূতন ঠেকে—কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়।

বৈশাখের বাতাসে এত মাদকতা কেন?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে নেশা ধরিয়া যায় যে—যুগ-যুগান্ত এমনি বসিয়া থাকা যায় না! ভাসিয়া আসা গানের সুরে কাণ পাতিয়া।

না:—সরযূ অত ভাবপ্রবণ মেয়ে নয়—নিতান্তই সাংসারিক মানুষ সে—উনান নিভিয়া গেলে গরম লুচি ভাজিয়া খাওয়ান চলেনা এ জ্ঞান তাহার আছে।

কিন্তু বিমলা করিল কি? কোথায় গেল সে! দালানের ওপারে বাবার ঘরের পানে চাহিয়া দেখে—অনুজ্জ্বলশিখা লণ্ঠনটা দুয়ারের বাহিরে ঘুমন্ত প্রহরীর মত বসিয়া আছে একপাশে, ঘর অন্ধকার।

বাবার জন্য ভারী মন কেমন করে সরযূর—আহা হয়তো এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—কত আর জাগিয়া বসিয়া থাকিতে পারে মানুষ একা একা!

সরযূ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—আর বিমলা—অবুঝ বিমলা বোধ করি কোথায় পড়িয়া অকারণ অশ্রুব্যয় করিতেছে।

হাঁ কিসের যেন শব্দ আসিতেছে—চাপাকান্নার মত। উচ্ছসিত ক্রন্দন রোধ করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। মাকে লইয়া আর পারা গেলনা খোঁজ না করিলেই নয়।

দালান পার হইয়া ঘরের দুয়ারে কাছাকাছি আসিবা মাত্র সহসা থমকিয়া দাঁড়ায় সরযূ—দাঁড়ায় মুহূর্ত্তমাত্র, পরক্ষণেই দ্রুতপদে ফিরিয়া আসে—প্রায় ছুটিয়া।

ভূত তাড়া করিল নাকি সরযূকে?

ভূত? না—চাপা কান্না, চাপাহাসি হইয়া পিছন পিছন তাড়া করিয়া আসিতেছে তাহাকে।

চাপাহাসি-নয়, উচ্ছসিত হাসি চাপিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

*　　*　　*　　*　　*

চুপি চুপি গলার আওয়াজ—কে-যেন কাহাকে ছাড়িতে চাহেনা, ধরিয়া রাখিবে বলিয়া শাসাইতেছে—

উত্তরে বুঝি শাসিত ব্যক্তি, ছাড়াইয়া লইবার সৌখিন চেষ্টায় হাসিয়া সারা।

*　　*　　*　　*　　*

এই স্বর কি সরযূ চেনে? শুনিয়াছে কোন দিন—কোন সময়। বড় বেশী পরিচিত বলিয়া মনে হয় না।

না—না সরযু চেনেনা কোনদিনও শোনে নাই; অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভয় দেখাইয়াছে সরযুকে—তাই বুঝি ছুটিয়া পলাইয়া আসিল উর্দ্ধশ্বাসে?

কিন্তু সরযুর মত হিসাবি মেয়ের কি ভুলিয়া যাওয়া উচিৎ ছিল রান্নাঘরের কপাটে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ধাক্কা লাগিয়া কপাল কাটিলে কাহার দোষ!

আচ্ছা এখনতো সরযু ইচ্ছা করিলেই কাঁদিয়া লইতে পারে খানিকটা! হাসিয়া হাসিয়া বড় বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে বেচারা! কাঁদিবার উপযুক্ত ভাল কারণ একটা তো পাওয়া গেল! কাটিয়া রক্ত পড়িলে—কাঁদেনা মানুষ!

কিন্তু চোখের জল যাহার আসিতেই চাহেনা—তাহার উপায় কি!

হাসিয়া ফেলা ছাড়া করিবে কি সে?

এই মনে করিয়া হাসিতে থাকে সরযু—কপাল ভাঙ্গিয়া গেলে—অনায়াসে সহ্য করা যায়—অসহ্য হয় এতটুকু ধাক্কায়!

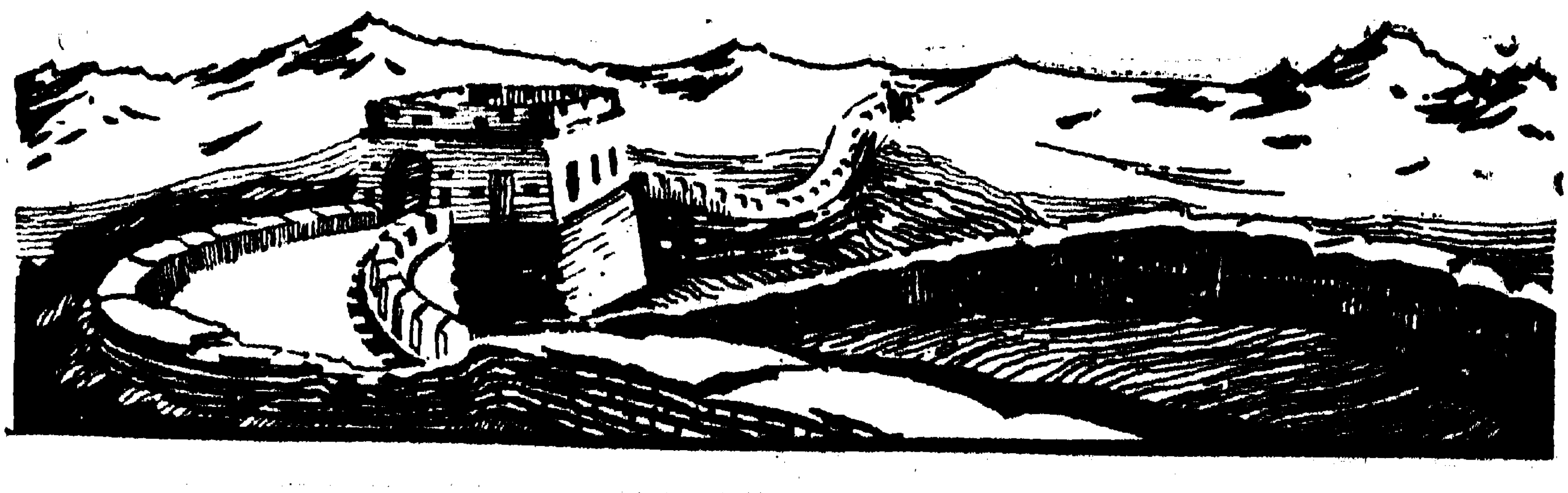

আধুনিকা

শৈলশ্রী দেবী

সুবিখ্যাতা আমেরিকান লেখিকা শ্রীমতী "পার্লবাকে"র লেখা America's gunpowder women নামে একটী প্রবন্ধ সেদিন পড়ছিলাম। এমেরিকান মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রধানত তিনটী ভাগ করেছেন—যাঁরা কোনও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন—যাঁরা যে অবস্থাতেই থাকুন সুখেই হোক, কি দুঃখেই হোক, সহস্র রকম সুবিধার মধ্যে হোক, বা অসুবিধার মধ্যে হোক, যে কাজের ভার প্রকৃতি তাঁদের দিয়েছে সে কাজ যাঁরা নিশ্চয় সুসম্পুর্ণ করবেন। তাঁদের পরিশ্রম করবার কোনও প্রয়োজন না থাকলেও বিলাসে আরামে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের সম্পুর্ণ সুযোগ থাকলেও তাঁরা অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে অন্তরে যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তার উদ্‌যাপন করবেন। তারপরে এলো দ্বিতীয় শ্রেণী—এঁরা সেই সুখী এবং পরিতৃপ্ত নারী যাঁরা তাঁদের আপন সংসারে স্বামী পুত্র এবং ভাঁড়ার ঘরের কাছে নিজেকে সর্ব্বদা নিযুক্ত করে দেহ মনের সম্পুর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন। যে সংসারে তাঁরা প্রবেশ করেছেন সেখানে অন্নের সঙ্গে তাঁদের মনের মাধুর্য্য মিশিয়ে তাঁরা পরিবারের সকলকে সুখী এবং নিজেকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পেরেছেন। সাংসারিক শোকতাপ অর্থকষ্ট ছাড়া তাঁদের মনের মধ্যে অন্য কোনও অতৃপ্তি অগ্নি-শিখার মত জ্বলেনা। সব দেশে এবং সবকালে এই দ্বিতীয় শ্রেণীই সংখ্যায় বেশী। এই উভয় শ্রেণীই চলেছেন তাঁদের নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে। দ্বিতীয় শ্রেণী নির্দ্দেশ পেয়েছেন সমাজের কাছ থেকে, প্রথম শ্রেণী নির্দ্দেশ গ্রহণ করেছেন আপন অন্তর্য্যামীর কাছ থেকে।

কিন্তু এঁরা উভয়েই সুসম্পুর্ণ এবং সার্থক কারণ এঁরা জানেন তাঁদের আপন উদ্দেশ্য, আপন স্থান এবং আপনার সার্থকতা।

তারপর এলো সেই তৃতীয় শ্রেণী—যাঁদের লেখিকা বলেছেন "America's gunpowder women" শুধু এমেরিকায় কেন সব দেশেই এই তৃতীয় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, অন্তত, আমাদের দেশে তাঁদের আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হয়ত সংখ্যায় কিছু কম কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে এবং বাড়বে। এরা হচ্ছেন সেই সব আধুনিক নারী যাঁরা মধ্যবিত্ত কিংবা ধনীর সংসারের পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে লালিত, যাঁদের সংসারের পরিশ্রমের কাজ ভৃত্যের দ্বারা এবং উপার্জ্জনের কাজ পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়—যারা সুস্থ সবল দেহ ও শিক্ষিত চিন্তাশীল সক্ষম মনের অধিকারী হয়েও কোনও কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে কেবল মাত্র আপন সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যতটুকু দান তার চাইতে বড় করে এবং তার চাইতে বেশী করেও তাঁদের দেবার কিছু আছে। অসংখ্য সুযোগ সুবিধার মধ্যে, কর্ম্মহীন সংসারের

মধ্যে, অলস জীবন ব্যর্থ করে দিচ্ছে তাঁদের সমস্ত শিক্ষা সমস্ত ব্যাক্তিত্ব। নিজেকে অপর্য্যাপ্ত ভাবে দান করবার যে আনন্দ, যে গৌরব তা নেই বলেই অন্তরের মধ্যে অতৃপ্তি ধূমায়িত হতে থাকে আগ্নেয়গিরির মত। খুব সম্ভব সেই জন্যই শ্রীমতী পার্লবাক এদের বলেছেন gunpowder women! রুদ্ধমুখ পাত্রের ভিতরে প্রত্যহ সঞ্চিত হচ্ছে যে শক্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তার পরিণাম!

আমাদের দেশেও কী এই তৃতীয় শ্রেণীর জীবন অনেক সৃষ্টি হয় নি? হয়ত সকলের উদ্দেশ্যহীন জীবনের শূন্যতা অনুভব করবার শক্তি নেই—তবুও অনেকেই হয়ত অনুভব করে থাকেন ও আরও অনেকে করবেন, যতই ব্যাপক হবে শিক্ষা। যদি না শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সার্থক করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরুষের জীবনে এ সমস্যা এমনভাবে কি উঠেছে! এর জন্য কি দায়ী নয় মেয়েদের অপর্য্যাপ্ত ছুটী? যেটুকু ঘরের কাজ তাঁদের করবার প্রয়োজন ঘটে তার বোঝা নিতান্তই অল্প। শুধু সেইটুকুর মধ্যেই তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে সুখী হতে পারেন না এবং পারলেও তাতে লাভ কী? কোনও মানুষকে তার প্রথম জীবনের দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটীতে ভূতত্ব, নৃতত্ব, গণিত, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র পড়িয়ে তারপর তাকে দিয়ে বাসন মাজালে সমস্তই ব্যর্থ করা ছাড়া লাভ কিছু হয় কি? অতএব কেন তারা বাসন মেজে, রান্না করে, কেবলমাত্র পতি পুত্রের সেবা করে নিজেকে চিরন্তন আদর্শ অনুযায়ী চালিত করে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক মনে করে না একথা বলা ভুল এবং ব্যর্থ, যেমন ব্যর্থ তাদের ছোট ছোট বিফল প্রয়াসের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি। যে ব্যঙ্গোক্তি আমরা প্রায়ই মাসিক পত্রিকায় কখনো বা গল্পের আকারে, কখনো বা উপদেশাত্মক প্রবন্ধে এমন কি মাঝে মাঝে কবিতাতেও প্রকাশ হ'তে দেখি। সে ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হয় মেয়েদের সভা সমিতি এবং স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে উপলক্ষ্য করে। সে ব্যঙ্গোক্তি ব্যর্থ, কারণ তার মধ্যে পথ নেই, নির্দ্দেশ নেই, কেবল আছে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ ও উপদেশ। সে দুর্ব্বল উপদেশে কেউ ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না, ফেরবার জন্য তারা চলতে সুরু করেনি। তবুও একথাও সত্যি যে চলাই চলার উদ্দেশ্য নয়। স্বাধীনতা দিয়ে কি লাভ, যদি না তার দ্বারা কোনও কাজের মধ্যে আপনাকে যুক্ত করা যায়। স্বাধীনতাই হোক, শিক্ষাই হোক বা সমান অধিকারই হোক এগুলি সবই প্রয়োজনীয় তবুও এদের মধ্যেই এদের স্বার্থকতা নেই। এগুলো শুধু পাওয়া কিন্তু পাওয়া ত ব্যর্থ, যদি না তাকে সার্থক করা যায় দেওয়ার মধ্যে। প্রাত্যহিক সংসারের কাজের মধ্যে মেয়েদের দানের একটা সুন্দর উজ্জ্বল দিক আছে সে কথা সত্য, কিন্তু আজ পুরুষের বৃহৎ কর্ম্ম জগৎএর দিকে তাকিয়ে অনুভব করা যায়, সে বড় ক্ষুদ্র। স্বেচ্ছাধীন কাজের বিলাসের মধ্যে মানুষ তার চরম দানকে প্রকাশ করতে পারে না। যে রকম অক্লান্ত নির্মম কাজের মধ্যে পুরুষ আপনাকে নিযুক্ত করে ঘূর্ণায়মান চাকার মত তার অহোরাত্রকে বেষ্টন করে চলেছে—সেই পরিশ্রমের পুরস্কার মেয়েরা কি করে পাবে? শিশুকাল থেকে পুরুষ জানে তাকে উপার্জ্জন করতে হবে, তাকে ভার বহন করতে হবে, ভাগ্যকে জয় করতে হবে, আমরণ তার নিরলস দিনগুলি

কর্ম্মের মধ্যে সার্থক করতে হবে। সেই কাজের গুরুভার পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। তাই তারা শাসক, তাই তারা কর্ম্মী, তারা লেখক, তারা শিল্পী, তারা বৈজ্ঞানিক, তারা দার্শনিক। ইংরেজ কবি বলেছেন :—

"When a man goes out into his work
He is alive like a tree in spring
He is living not merely working."

একথা মনে করবার কি কোন কারণ আছে যে সমশ্রেণীর পুরুষ এবং স্ত্রীর বুদ্ধির বা কার্য্য-ক্ষমতার বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে? কেবল মাত্র শারীরিক বল ছাড়া। অভ্যাসে তারও পরিবর্ত্তন সম্ভব। যদি আজ অবস্থা বদলে যেত, যদি পুরুষকে মেয়েদের মত নিশ্চিন্ত গৃহকোণে অপরের পক্ষছায়ায় আরামে দিন কাটাবার চরম অভিশাপগ্রস্ত হতে হত—তাহলে পুরুষের সৃষ্টি এমন প্রকাণ্ড, এমন জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠত কি? নব বিশ্বামিত্রর মত আজকের বৈজ্ঞানিক, এমন প্রচণ্ড বিশাল জ্ঞানের জগৎ গড়ে তুলতে পারতেন কি? তাহলে আধুনিকার মত সুদীর্ঘ নখরের উপর বিচিত্রবর্ণচ্ছটা এঁকে তাঁদেরও দিন কাটাতে হত।

মেয়েদের জন্য এতদিন যে কাজ নির্দ্ধারিত ছিল আজ সে কাজ তাদের পক্ষে উপযুক্তও নয় যথেষ্টও নয় আজ সে দিতে চায় পুরুষেরই মত নিজের কিছু দান, যে দানের দ্বারা প্রাত্যহিক জৈব-জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সে নিজেকে যুক্ত করতে পারবে একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে।

যদি প্রশ্ন হয় বাধা কোথায়? আমাদের দেশে সামাজিক বাধা কিছু কিছু থাকলেও পাশ্চাত্য দেশে ত বাধা কিছুই নেই তবে কেন তারা পুরুষের পাশে বহির্জগতে আপন কর্ম্মক্ষেত্রকে আবিষ্কার করেনি? বিশেষ বিশেষ দু একজন প্রতিভাশালিনী ছাড়া মেয়েদের কাজ তুলনায় কত কম। এই যে বৃহৎ সভ্যজগৎ, বৈজ্ঞানিক জগৎ পুরুষ সৃষ্টি করেছে এর মধ্যে মেয়েদের যথার্থ দান কতটুকু! স্ত্রীজাতির সাহায্যকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে একা পুরুষ যে বৃহৎ সৃষ্টি গড়ে তুলেছে তার মধ্যে রয়েছে নারীর দুঃসহ চরম অপমান! এর জন্য দায়ী কে? দায়ী তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, তাদের কর্ম্ম-ভারহীন জীবনের বিফল ভাগ্য। কোনও কোনও বিশেষ শক্তিশালী মানুষের কথা বাদ দিলে, কর্ম্মের প্রবল পেষণে নিজেকে পিষ্ট করবার একান্ত প্রয়োজন না ঘটলে কখনো মানুষের ক্ষমতা তার চরম পরিণতি লাভ করতে পারে না।

এই সমস্যা কি একান্তই আধুনিক নারীর সমস্যা? হয়ত তা নয়—তবে এতদিন মন সচেতন ছিল না। পার্ল বাক বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ মেয়ের জীবন তৃপ্তির সঙ্গে কাটত। কিন্তু তখনও ঘটেছে—tragedy, প্রত্যেক সংসারে। কেবল সংসারকে অবলম্বন করে যে জীবন, সংসারের প্রয়োজন যখন ফুরায় তখন কি নির্ম্মম ভাবে শূন্য হয়ে যায় না তাদের জীবন? সেই কারণেই কি শ্বাশুড়ী বৌএর নির্লজ্জ কলহ এমন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে নি? পুরাতন পারে না নূতন কে তার স্থান ছেড়ে দিতে, সে তাহলে কি নিয়ে দিন কাটাবে—আর নূতন কি করে

ছাড়বে তার অধিকার ? এতটুকু সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, এই ভাঁড়ার ঘরের চাবী ছাড়া তারও ত কোনও অবলম্বন নেই ?

আমাদের দেশে মেয়েদের বলেছে শক্তিরূপিণী—সে শক্তির রূপ কি রকম, কত গভীর এবং কতদূর তার ব্যাপ্তি, আজ তা বিবেচনা করবার সময় এসেছে—জৈব জগতের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি দিয়েছে নারীর উপর গুরুভার। কিন্তু কেবলমাত্র সেইটুকু দ্বারাই মানুষের চরম গৌরব লাভ করা যায় না। যে দুঃখ এবং যে কাজের ভার প্রকৃতি তাকে বহন করতে বাধ্য করেছে এবং যেখানে সে সর্ব্বপ্রাণীর সঙ্গে সমান সেখানে তার প্রয়োজন আছে, আনন্দ আছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের বিশেষ গৌরব নেই। মানুষ সেইখানেই সমস্ত জীব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেখানে সে আপন ইচ্ছাকে চালিত ক'রে নূতন সৃষ্টি করে। জৈব জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, কিন্তু তার চাইতে আরও অনেক বড় করে মানুষের জীবনের গণ্ডি।

তাই কবি বলেছেন ঃ—

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান
আমি গাই গান।

আমি যা পেয়েছি তাকে অবলম্বন করে আমাকে আরও কিছু রচনা করতে হবে—সেই নূতন সৃষ্টির মধ্যেই মানুষের সার্থকতা। যে বুদ্ধির প্রবল শক্তি মানুষের চরম গৌরব তাকে কি নারীও অনুভব করবে না নূতন নূতন কাজের মধ্যে ? কেবল কি ততটুকুতেই শেষ হবে তার শক্তি, যতটুকুতে শেষ হয় আমের মুকুল আর বসন্তে প্রজাপতির অভিসার ?

'সোণার তরী' বেয়ে জীবন দেবতা প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী হচ্ছেন—কি দেবে তার নৌকায় তুলে ফসল ? যেখানে পুরুষ অসংকোচে বলবে "রাশি রাশি ভারা ভারা—
ধানকাটা হল সারা"

কি বলবে অনারব্ধকর্ম্মা, অসমাপ্তকীর্ত্তি নারী ?

স্বপ্ন-শেষ

গোপাল ভৌমিক

শেষ হ'ল পৃথিবীর বসন্ত-বিলাস ঃ
কর্মহীন জীবনের ক্লান্তিময় অবসরে
নেমে এল ধূলিপূর্ণ রুক্ষ অবিচার।
বালুকীর্ণ মরুপথে যাত্রা হ'ল স্থরু ঃ
মাথার পরে প্রখর সূর্য
নীচে উত্তপ্ত বালুকণা—
আর সংশয়ের প্রবল ঝটিকা।
ক্লান্ত চোখে নৈরাশ্য ঘনায় ঃ
তবু দেখি—
সুদূর অতীতের অনাস্বাদিত স্বপ্ন
যার সম্ভাবনার বীজ
অংকুরেই গেছে বিনষ্ট হ'য়ে ঃ
আজও মনে পড়ে তার মদির দোলা—
আকাশ আর সমুদ্র
স্বপ্ন আর বাস্তব।
বালুকীর্ণ মরুপথে—
ধরণীর শ্যামল মাটির গন্ধ
আজও আমি অনুভব করি ঃ
তৃপ্ত হ'য়ে ভাবি—
সে-দিন কি আবার আস্‌বে ?
আস্‌বে কি উড়ে-যাওয়া স্বপ্ন-হাঁসের দল—
রৌদ্র-দগ্ধ আকাশের বক পাড়ি দিয়ে ?

জৈব বিজ্ঞান ও সমাজব্যবস্থা

জিতেন্দ্র গোস্বামী

তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এই ধরণের লোকেরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ যাহারা বোঝেন পৃথিবী থেকে অত্যাচার ও শোষণের উচ্ছেদ করিয়া সর্বপ্রকার নির্যাতন-নিপীড়নের হাত হইতে মানব-সমাজকে মুক্তি দিতে হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তথাপি তাহাদের বিশ্বাস ক্যাপিট্যালিজমই মানুষের প্রকৃতির সহজ নিয়ম এবং সমাজতন্ত্রবাদ তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাহাদের বিশ্বাস সমাজতন্ত্রবাদীর কল্পিত আদর্শ সমাজ কখনও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিতে পারেনা কারণ মানুষ যে তাহার প্রকৃতিজ দুর্বলতা—যেমন স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা—কোন-কালে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ মনো-বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডের মত প্রামাণ্য বিবেচনায় তাহার রচনা-সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বাক্যাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বিংশ শতাব্দীর বনিয়াদী ও রক্ষণশীল সমাজ-দর্শনের প্রাথমিক সূত্রগুলি লইয়া আমরা বিচার করিব সুতরাং তাহাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"Civilized Society is perpetually menaced with disintegration through this primary hostility of men toward one another."

"The tendency to aggression is innate, independent, instinctual disposition in man ... .and constitutes the most powerful obstacle to culture."

"Every individual is virtually an enemy of culture."

"Men feel as a heavy burden the sacrifice that culture expects of them in order that a communal existence may be possible."

"Culture must be defended against the individual and its organisation, its institution, its laws are all directed to this end."

"Every culture must be built on coercion and instinctual renunciation."

"There are in all men destructive anti-social, anti-cultural tendencies."

"As we have long known, Art offers substitutive gratification for the oldest cultural renunciations, still always most deeply felt, and for that reason serves like nothing else to reconcile men to the sacrifices they have made on culture's behalf."

বিংশশতাব্দীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদের মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ব্যক্তি আর সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে কি ঘোরতর বিরোধ! সমস্ত কৃষ্টি ও সভ্যতা ব্যক্তির মুক্তি ও বিকাশের পক্ষে কি দুরপনেয় প্রতিবন্ধক। ফ্রয়েড মানুষের জৈব প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন প্রতি-দ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর প্রাত্যহিক কোন্দলের মূল হইতে সুরু করিয়া বিশ্ব-ধ্বংসী সমরবহ্নির প্রাথমিক স্ফুলিঙ্গ।

ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাই নিম্নে আলোচিত হইবে। "মানুষ স্বার্থপর"—কথাটাকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা স্থুরু করা যাউক। যদি স্বার্থপরতা দ্বারা এই কথাই বুঝায় যে কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইবার জন্য মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে তবে নিশ্চিতই মানুষ "স্বার্থপর"। আমরা জানি একমাত্র জৈবিক তাড়নায়ই মনুষ্যেতর সকল প্রাণী এবং মানব-শিশু নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়। প্রাণীর জৈবিক সত্ত্বা বলিতে আমরা বুঝি যে তাহার স্পর্শ-নাড়ীতে ঘা দিলে সে টের পায়, পাকস্থলী শূন্য হইলে ক্ষুধাবোধ করে এবং যখন তাহার কাছে কেহ থাকে না তখন তাহার একলা লাগে। কাজেই স্বীয় সত্ত্বা সম্বন্ধে সচেতনতা জীবনীশক্তি বিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেরই বিশেষত্ব। স্বতঃসিদ্ধভাবে ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে নিজের প্রয়োজন বোধ হইলে তাহার যথাসাধ্য সমাধান-প্রচেষ্টাও জীবমাত্রেরই জৈব সচেতনতার অভিব্যক্তি। কাজেই নিজের প্রয়োজন-মিটান-সংক্রান্ত যে স্বার্থপরতা তাহা জৈব আচরণ (animal behaviour) বলিয়া স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। ইহা সত্য যে, আদিম মানুষ ও মনুষ্য-ইতর প্রাণী-জগতের ব্যবহারে কোন পার্থক্য ছিল না। যখন তাহার কোন জিনিষের প্রয়োজন হইত যে প্রকারেই হউক সে তাহা সংগ্রহ করিত—অন্য আর কেহ যে পরিশ্রম করিয়া নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকিতে পারে এ বিষয়ে তাহার খেয়াল ছিল না। বাধা দিলে দৈহিক শক্তিদ্বারা প্রতিপক্ষকে জয় করিবার চেষ্টা করিত। ক্রমে সে ইহা শিখিয়া লইয়াছিল যে যাহা দরকার তাহা পাইতে হইলে মালিকের মাথায় আঘাত করিয়া তাহাকে একেবারে সরাইয়া দেওয়াই সোজা পন্থা। কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং এ শিক্ষকের নির্দেশ কেহ অমান্য করিতে পারে না, তবে এ শিক্ষা গ্রহণ করিতে কাহারও কিছু বেশী সময় লাগে কেহ বা চট করিয়াই শিখিয়া লয়। প্রতিপক্ষের মাথা ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বামিত্ব পরিগ্রহ প্রক্রিয়াটা সোজা হইলেও অভাব-পরিপূরণের প্রকৃষ্টতম পন্থা নয় ইহা বুঝিয়া উঠিতে তাহার বেশী সময় লাগে নাই। আমরা ধরিয়া লই যে মানুষ সুপ্রাচীন কাল হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তখন হইতেই প্রাকৃতিক দুর্জয় শক্তিসমূহকে জয় করিবার কাজে নিজের একক চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অভাব পূরণ করিবার পূর্ববর্ণিত সোজা উপায়টি চূড়ান্ত ভাবে শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, কারণ এতদ্বারা মানুষ তাহার নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয় হইতে পারে না কেননা অপেক্ষাকৃত বলবান প্রতিপক্ষ যে তাহার বিরুদ্ধে তাহার আবিষ্কৃত পন্থাটিই আরোপ করিবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? সুতরাং পরিবার এবং গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ সম্মিলিতভাবে পরিবারও গোষ্ঠি তথা সমাজের জন্য নিয়মকানুনের প্রতিষ্ঠা করিল যাহাদ্বারা প্রতিটি সদস্যের সুখ ও সুবিধার উন্নততর বিধান হয়। প্রাথমিক সমাজের এই আইনকানুন রচনার ভার কালক্রমে মুষ্টিমেয় লোকের বিশেষ অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ-বর্ধন অপেক্ষা ব্যক্তিগত সুবিধার পরিপোষক হিসাবেই নিরঙ্কুশ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমাজ ব্যবস্থায় যখন শ্রেণীবিভাগ দেখা দিল

তখন এই আইন প্রণয়নও শ্রেণীবিশেষের হাতে বিশেষ অস্ত্র স্বরূপে দেখা দিল। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অনাগত-শ্রেণী আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় এই ক্ষমতা ছিল সার্বজনীন এবং প্রত্যেকটি বিধান সামাজিক প্রয়োজন-উদ্ভূত অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং বিজ্ঞান-সম্মত ছিল। সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস এই। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে প্রথমে সমাজ ব্যক্তির অনমনীয় প্রতিপক্ষ ছিল না। পক্ষান্তরে স্বীয় সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পরিপূরক হিসাবে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য সুখ সুবিধার আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করিবার কাজে সমাজের মিত্রতাই ছিল তাহার কাম্য। সমাজের শক্তিবৃদ্ধির কাজে তাহার ছিল পূর্ণ সম্মতি কারণ পরোক্ষভাবে সে বর্ধিত ক্ষমতা তাঁহারই অপ্রাচুর্যের দৈন্যকে ঘুচাইবার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ব্যক্তি ও সমাজের অচ্ছেদ্য সহযোগিতার সে পরিচ্ছেদ ইতিহাসের অস্পষ্ট কুহেলিকার আবরণে ঢাকা পড়িতে চলিয়াছে। ফ্রয়েড প্রমুখ বিংশশতাব্দীর সমাজ-দর্শনের বিশ্লেষণ-কর্তাগণ ব্যক্তি ও সমাজের চিরন্তন বৈরিতার আলেখ্য এবং সভ্যতার অগ্রগতির চক্রতলে ব্যক্তির আত্মাবলুপ্তির যে নির্মম অবশ্যম্ভাবিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ নয়। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল সমাজ-দর্শনের শিক্ষার্থীর কাছে তাহার গুরুত্ব সমধিক।

জীববিজ্ঞানের মূলসূত্র হইতে আমরা সামাজিক কাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়াটি পাঠ করিতে প্রয়াস পাইব। আধুনিক জীববিদ্যা ব্যক্তির জৈবিক চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে যে ইহার মূলে রহিয়াছে gene বা চরিত্রবৈশিষ্টের কতকগুলি সূক্ষ্ম বীজ। জীববিদ্যার এই তথ্য গোষ্টিগত বা সামাজিকভাবে কতখানি প্রযুজ্য তাহাই বিচার্য। এই প্রসঙ্গে একটী টেক্‌নিক্যাল কথার আমদানি করিতে হয়—"Population Distribution Curve" বা (জনসংস্থানের পরিমাপ-রেখা) আমরা সকলেই জানি নির্দিষ্ট জনকয়েককে লইয়া একই প্রকার শিক্ষা (সর্বাপেক্ষা উত্তম)—সে সঙ্গীত, উল্লম্ফন, চিত্রাঙ্কণ, ভূবিদ্যা বা যান্ত্রিক বিদ্যাই হোক্ না কেন—দিবার ব্যবস্থা করিলেও তাহারা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের পারদর্শিতা প্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীত বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে কয়েকজনের কণ্ঠস্বর অনবদ্য, জনকয়েক অগ্রাহ্য, বাকী অধিকাংশই চলনসই। যে কোন অন্য বৃত্তি সম্পর্কেও এই সংখ্যানুপাতই প্রায় খাটিবে। Population Distribution Curve বলিতে আমরা এই বুঝি—ধরুন, আমরা দৈহিক দৈর্ঘ্যের কথা বিবেচনা করিতেছি এবং এই সম্পর্কে আনুপাতিক বণ্টন সংখ্যা কি হইবে জানিতে চাই। দেখা যাইবে অতি কমসংখ্যক লোকই ৮ ফুট পর্য্যায়ের, কিঞ্চিদধিক ৭ ফুট, এই সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া সর্বাপেক্ষা অধিক দাঁড়াইবে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির কাছাকাছিতে। তারপর হইতে ক্রমে কমিয়া ৩ ফুট ৩॥ ফুটের পর্য্যায়ের কোন নমুনাই মিলিবে না। যে কোন প্রকার পারদর্শিতার বিচারেই এই বণ্টন-সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। টেনিস, পিয়ানো বা সমাজতান্ত্রিক গবেষণা ইহাদের যে কোন একটী অজ্ঞাত অবজ্ঞাত সমাজে প্রবর্তন করিয়া উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক ও শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিলে দেখা যাইবে সেই সমাজেও জনকয়েকের সত্যিকারের স্বাভাবিক

পারদর্শিতা রহিয়াছে; জনকয়েক একেবারেই অকেজো আর অধিকাংশই চলনসই পর্য্যায়ের। ইহা হইতে আমরা অপ্রতিবাদে এই কথা বলিতে পারি যে মানবগোষ্ঠি যে জৈবিক উপাদানে গঠিত সেই সকল উপাদানের মধ্যে সকল প্রকার পারদর্শিতার বীজ নিহিত আছে। স্থান-কাল বা প্রাচীন-নূতন বলিয়া যে সামান্য ইতরবিশেষ দেখা যায় তাহা ধর্তব্য নহে। এই প্রসঙ্গে একথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার আনুষঙ্গিক নমুনা সংখ্যার অসমতা, আকস্মিক আবির্ভাব, শিক্ষাপ্রণালীর দোষত্রুটী ও বিরুদ্ধবাদী সমাজতাত্ত্বিক প্রচার ইত্যাদি অপরিহার্য ত্রুটীর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হয়। তখন সন্দেহ থাকে না যে "These genes are multiple for each capacity and inevitably give different combinations which account for the distribution of variations in skill. Experience proves that any human community we may choose will contain a certain percentage of individuals especially gifted in one direction or another, with the vast majority capable of developing average skill in any task with slight advantage in one or another." এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মানুষের মানসিক যোগ্যতা বা আচরণ-বিশিষ্টতার বিচারে পৃথিবীর সর্বত্র একটা গুণ-সাম্য রহিয়াছে। "What is referred to as mental or behaviour characteristics of man, no significant differences in their occurrence or distribution have as yet been detected in different human groups."

ফরাসীরা "আমুদে", জার্মানরা "বেরসিক" ইংরাজেরা "বানিয়া" এই ধরণের উক্তির কোন বাস্তব সত্তা নাই, কারণ "Biology provides every human group with a wide distribution of kind and degree of capacity present in fairly equal percentages in all human groups." এই যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সাম্যবাদী প্রক্রিয়া ইহা কি প্রকারে সামাজিক প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইতে পারে এখন আমরা তাহার পর্য্যালোচনা করিব। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, মানুষে মানুষে এই প্রকার পারদর্শিতার তারতম্য রহিয়াছে বলিয়াই সমাজবদ্ধ জীবন সম্ভবপর হইয়াছে। সমাজের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য পর্যায়ের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যেখানে যাহাকে নিযুক্ত করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মানানসই হয় তাহাকে সেখানে কাজে লাগিবার সুযোগ দিলে অধিক পরিমাণে সামাজিক কল্যাণ সৃষ্টি করা সম্ভব। সমাজ ক্রমে যত জটিল এবং তাহার প্রয়োজন যত অধিক সংখ্যক এবং বিবিধ পর্যায়বিশিষ্ট হইবে, প্রত্যেকটী মানুষকে বাছাই করিয়া তাহার অনুরক্তি, ক্ষমতা ও পারদর্শিতার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ঠিক যে কাজটী তাহার পক্ষে যোগ্যতম সেটুকুর ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিবার অধিকতর সম্ভাবনা ঘটে এবং তদনুপাতে সামাজিক কল্যাণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলিয়া রাখা যায় যে নিজের জৈবিক গঠন লইয়া গৌরব বোধ করা

অশোভন তো বটেই অযৌক্তিকও। ইহা ব্যক্তিবিশেষের হাতে-গড়া কোন কিছু নয়—"a product of chance meeting of a particular sperm with a particular egg"--একটি পুং-বীজের সহিত একটী স্ত্রী-বীজের আকস্মিক মিলনমাত্র। পক্ষান্তরে, সমাজতাত্ত্বিকের চক্ষু নিয়া এই প্রক্রিয়াটিকে দেখিলে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না যে, যেহেতু মানুষের জৈবিক গঠনের ব্যাপারে ব্যক্তির নিজের কোন হাত নাই কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজের কল্যাণকর (socially useful) কাজ তাহার সাধ্যানুসারে করিয়া যাইতেছে ততক্ষণ তাহার আর সমাজের অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। কাজের সম্ভ্রম ও গুরুত্ব বিচার করিয়া মানুষের গুণানুক্রম নির্দেশ করা চলেনা কারণ সামাজিক বিচারে যাহা প্রয়োজনীয় যাহা কল্যাণ-কর তাহাতে আবার সম্ভ্রম-অসম্ভ্রম গুরুতা-লঘুতা কি? এই মন-গড়া শ্রেণীবিভাগ, ধনিকতন্ত্রের আত্মপ্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছিল; আসলে উহার কোন বাস্তব সত্বা নাই। সোজা কথা, যাহা প্রয়োজনীয় তাহা করণীয়, অপরিহার্য ও মহৎ এবং যাহা প্রয়োজনীয় নয় তাহা অকর্তব্য, পরিহার্য্য ও নীচ। ভাত রাঁধিবার কাজ, দাইয়ের কাজ, মঞ্চ-অভিনেতার কাজ, স্কুল-শিক্ষকের কাজ, মরু-আবিষ্কারের কাজ, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের কাজ, বন্যপশু-বশীকরণের কাজ সমাজের প্রয়োজনীয় বিধায় সমান দায়িত্ব-সম্পন্ন, সমান মর্যাদা-সম্পন্ন। জৈব-বিজ্ঞানের কাজ শুধু নির্দেশ করিয়া দেওয়া ক্ষমতা ও যোগ্যতার ঠিক উপযুক্ত স্থানটি কাহার কোথায়?—সে কি সংগঠনকারীর কাজ করিবে না শিক্ষকের, সৈন্যাধক্ষের না পাচকের, মরুদেশে উষ্ট্রযান চালনা করিবে না সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে? এখানে অবশ্যি একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন—আমাদের পূর্ববর্ণিত আনুপাতিক বণ্টনসংখ্যা অনুসারে কতকগুলি বিশেষ গুণ-সমন্বিত 'genetic types' অপেক্ষাকৃত সংখ্যা-স্বল্প এবং চাহিবামাত্র অনুরূপ যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া না যাইতে পারে।

আধুনিক জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান তেমন গভীর নয় তাহাদের অনেকে বলিয়া থাকেন এই যে মানুষে মানুষে অসমতা ইহাই শ্রেণী-বৈষম্য-বিরহিত সমাজগঠনের বিরুদ্ধে যোগ্য প্রমাণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি এই যুক্তি কিরূপ ভ্রমপূর্ণ। জৈবিক গঠনের পার্থক্য সাম্যবাদের পরিপন্থী নয়। গাত্রচর্মের শ্বেতরঞ্জক পদার্থ দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতার পরিমাপ হয়না, অক্ষিগোলকের নীলাভা ও কুন্তলদামের পিঙ্গলত্বের গভীরতা সাহস ও শালীনতার পরিচয় বহন করেনা। এইবার আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি মনীষী মার্কস্ জৈবিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার এই আপাত দ্বন্দ্বমূলক গভীর অর্থপূর্ণ সমাধানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই দীর্ঘ আশিবৎসর পূর্বে তাহার লেখনী হইতে সাম্যবাদের চরম শ্লোগান নির্গত হইয়াছিল "Each according to capacity to each according to his needs". তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রত্যেক মানুষ জৈবিক নিয়মে শক্তিসামর্থের বিচারে বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত কিন্তু যে আপনার শক্তিঅনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজটুকু সমাধা করিয়াছে সে

তাহার প্রয়োজনমত সমস্ত জিনিষ পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এমন করিয়া জীববিজ্ঞান ও সমাজ-ব্যবস্থার ব্যবহারিক রূপের সমন্বয় ইতিপূর্বে বা অতঃপর কেহ করিতে পারে নাই। বিশবৎসর আগে হইলে এই প্রশ্নটিকে থিয়োরেটিক্যাল বা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থপর বুর্জোয়া দার্শনিকদিগের অপচেষ্টার অন্ত থাকিত না। কিন্তু পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ লোকসংখ্যা লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ায় যে বিপুল পরীক্ষা চলিয়াছে তাহার ফলকে উপেক্ষা করা আজ আর চলিবে না, জারিষ্ট আমলের তথাকথিত "lower races" "inferior races" স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর পরিবর্তিত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া গেল। দীর্ঘকাল হইতে অধীনতা-বিমুক্ত ও অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশের তুলনায় সদ্য-অপনীত-শৃঙ্খল জাগ্রত জাতি সমস্তরকম ক্ষেত্রে সমপদক্ষেপে চলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, বৃত্তিবিশেষে তাহাদিগকে ডিঙ্গাইয়াও গিয়াছে। তাহার কারণ অবশ্য জৈবিক উৎকর্ষ নয়, ইহা মানসিক। এতদিনকার রুদ্ধদ্বার বিশ্বে তাহার প্রবেশাধিকার মিলিয়াছে তাই সেই বিশ্বকে জয় করিবার অত্যুগ্র আগ্রহ ও আকাঙ্খাই তাহাকে অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে। "As new scientific and cultural occupations were introduced to these liberated nationalities it was found that the poor shepherds, peasants and workers oppressed for centuries, contained among them the same number of poets, physicists, tennis champions, aviators, inventors, teachers etc. as any other group with a hundred or two hundred years of industrial development behind it." সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সর্বপ্রকার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, মানুষের উচ্চতা, গায়ের বর্ণ, চোখ-চুলের রঙ্ মানসিক বা শারীরিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের পরিমাণ-জ্ঞাপক নয় এবং "all talk about human nature and its possession-aggression instincts is simply manufactured blabber of the hired servants of imperialists and bankers who resort to any practice in their frantic efforts to stave off their inevitable end."

"গল্প নয়"

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

সহরেরই একাংশে পাড়াটি। দেখিলে মনে হয় নিম্ন মধ্যবিত্তরা এখানে বাস করেন। রেলের কেরাণী, সরকারি চাকরে, স্কুলের মাষ্টার কি কলেজের প্রফেসার। এমনি ধারা সব লোক বাস করে পাড়াটির আশে পাশে। সবাই বাঙ্গালী নয়। কয় ঘর পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীও বাস করে। পথ ঘাট নোংরা। ভদ্রলোকেরা কিরূপ অভদ্রভাবে থাকে তা ডাষ্টবিন আর নর্দ্দমা গুলো দেখলেই বোঝা যায়। একই পাড়ায় থাকলেও পাড়ার লোকেদের মধ্যে যে বিশেষ সম্প্রীতি আছে তা মনে হয় না; স্বামিদের অবর্ত্তমানে স্ত্রীরা তাঁদের দুপুরের মজলিসে যে কলহের সূত্রপাত করেন স্বামিরা এসে তা নেহাৎ ভদ্র ভাবেই মিটমাট করেন। পরস্পর পরস্পরের সামনা সামনি হ'লেই একরকমের দেঁতো হাসি হাসেন—যার অর্থ শুধু তাঁরাই জানেন। বলা বাহুল্য সে পাড়ায় একটা থিয়েটার ক্লাব আছে আর শীঘ্রই এরা একটা কিছু 'প্লে' নামাবে তা ক্লাবের পাশ দিয়ে গেলেই বোঝা যায়।

এই পাড়াতেই যে ঘরটি সবচেয়ে কম ভাড়া ও যাতে সবচেয়ে কম আলো বাতাস আসে এবং যার অবস্থান একেবারে একটেরে, এক কোণে—সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে মণি ও উষা। দু'খানি ঘর, ল্যাট্রীন ও বাথরুম বলে দু'টো জিনিষ আছে কিন্তু কিচেন বলে কিছু নেই। ভেতর দিকের ঘরটাতেই রান্নার কাজ চলে। ভেতরের ঘরটা কিছু বেশী অন্ধকার। একটা চারপাইয়ে কিছু বিছানা, একধারে টিনের ট্রাঙ্ক আর চামড়ার সুটকেশ। বাইরের ঘরটাতে একটা চারপাইয়ে একটা বিছানা। দু'টো হেলান দেওয়া চেয়ার আর মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। আপনি যদি হঠাৎ কোনদিন সে ঘরে ঢুকে পড়েন ত প্রথমেই বুক সেলফে আপনার চোখ আটকে যাবে—উচ্চারণ করা শক্ত এমনি সব লেখকদের বই আর কি চিত্র বিচিত্র সব মলাট। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বই খাতাপত্র দেখে আপনি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন এদের পড়াশুনায় ঝোঁক আছে। ও ঘরে কখনও আপনাদের প্রবেশ করবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হয় নি। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে বলেই এ খবর আপনাদের দিয়ে রাখলাম। কিন্তু এখন আপনারা আমার সঙ্গে ওদের ঘরে আসতে পারেন। এইমাত্র সকাল হোল, সূর্য্যের আলোর কয়েকটা টুকরো ওদের ঘরেও ঢুকে পড়েছে। চুপ চুপ দূর থেকে ওদের দেখতে থাকুন যতক্ষণ না আমি আবার আপনাদের সরিয়ে দিই।

ভেতরের ঘরে উষা ও বাইরের ঘরে মণি শুয়ে। সূর্য্যের আলোর আভা চোখে এসে পড়ায় মণির ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর উষা ঘুম ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবস্থায় এসে পৌঁচিছে—সম্ভবতঃ

তার ঘুম ভেঙ্গেছে কিন্তু এইমাত্র সে যা পেয়েছিল আর এইমাত্র সে যা হারিয়েছে তা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না বলেই তার ভেঙ্গে যাওয়া ঘুমকে, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এমন সময় মণির ডাক তার কাণে এলো---উষা, উষা। তুমি এখনও ঘুমুচ্ছো? উষা বিছানা থেকে উঠে পড়লো, কোন সাড়া না দিয়ে গায়ের কাপড় একটু গুছিয়ে নিয়ে সে এসে বসলো মণির ঘরের হেলান দেওয়া চেয়ারটায়। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো একটু রগড়ে নিয়ে ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে সে বললো, আজকে তাড়া কিসের আজ ত রোববার।

রোববার! মণি বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলো, আজ রোববার তোমার আমার দু'জনেরই ছুটি আজ। হঠাৎ নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে সে বললো, এই দেখ ভদ্র পাড়ায় থাকার কি জ্বালা, মনের আনন্দে একটু বেশী জোরে কথা কয়ে ফেলেছি এবং সম্ভবতঃ পাশের বাড়ীর লোক তা শুনে ফেলেছে।

উষার কাছ থেকে কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না—চোখ তুলে মণি দেখলো উষার খোঁপাটা একটু হেলে পড়েছে, তার মাথাটা এসে ভর করেছে চেয়ারের হাতলে আর তার চোখ বুজে এসেছে।

—উষা, উষা, মণি চাপা গলায় ডাকলো, তুমি কি আবার ঘুমুলে নাকি? উষা অল্প একটু চোখ মেলে বললো, আজ একটু বেশী ঘুমুবো এই ইচ্ছে নিয়ে শুয়েছিলাম কিন্তু তোমার জন্যে এই সকালেই আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল—আমি এমনি ভাবে অন্ততঃ আরো দশ মিনিট পড়ে থাকবো, তারপর তোমার কথা শুনবো—আমার এমন চমৎকার স্বপ্নটা তুমি মাটি করে দিলে---উষা আবার চোখ বুজলো। মণি বিছানা থেকে নেবে তোয়ালে আর টুথ ব্রাশ নিয়ে ঢুকলো বাথরুমে।

ঘরে রইল উষা আর ঘরে রইল শব্দ, ঘড়ির অবিরাম টিক্ টিক্ টিক্। উষা নিজেকে আরোও একটু এলিয়ে দিলো চেয়ারে। বাহিরের আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে' আসছে।

মণি যখন আবার ঘরে ঢুকলো তখন তাকে একটু চিক্‌চিকে দেখাচ্ছে, মুখের দু' এক জায়গা লাল হয়ে উঠেছে। কাপড় জামা সে বদলেই এসেছে। ঘরে ঢুকে দেখলো উষা তখনও ঘুমুচ্ছে। —এই তুমি ওঠো, উষাকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে সে বললো। উষা ধড় মড় করে উঠে বার হয়ে গেল ঘর থেকে।

তাজা খবরের কাগজটা জানলা দিয়ে কখন ফেলে দিয়ে গেছে। সেটা তুলে নিয়ে মণি হেড লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলোতে লাগলো। যুদ্ধ, গান্ধী, হরিপুরা রেসল্যুসন, সুভাষ বোস্, ফ্রয়েড মারা গেছে তারি উদ্দেশ্যে কয়েকটা মিটিং, এই সব। উষা কতক্ষণ গেছে। ঘড়ির দিকে মণি একবার তাকালো। মেয়েদের প্রসাধনে কতক্ষণ সময় লাগে? কখন সে আসবে ষ্টোভ জ্বাল্‌বে চা তৈরী করবে। এমন ছাই জায়গা যে কাছে কোন ভদ্র গোছের চায়ের দোকান নেই। মণি গোটা দুই হাই তুলে একটা সিগারেট ধরালো।

উষা এলো, সাড়ীটা সে বদলেছে—মণির ধারণা মিথ্যা নয়, একটু প্রসাধন করে পরিপাটি হয়েই সে এসেছে। মণির কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—দয়া করে আমাকে একটু চা করে দেবে উষা—সেই কোন ভোরে উঠেছি আর এখন কটা বাজে একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ।

উষা ততক্ষণ ষ্টোভে হাত দিয়েছে, বললো, আরও একটু ধৈর্য্য ধরো। মণির নির্লিপ্ত উদাস কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বেশ!

চা তৈরী হোল। ছোট টেবিলটাকে মধ্যে রেখে দু'জনে বসেছে, উষা পেয়ালায় চামচ দিয়ে নাড়ছে আর মণি সবেমাত্র একটা টোষ্টে একটু কামড় দিয়েছে এমন সময় রাস্তায় একটা ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—ও মশায় বাড়ী আছেন, ও মশায়।

উষা ফিস্ ফিস্ করে বললো, তোমাকে ডাকছে বোধ হয়।

আমাকে, মণি প্রায় চমকে উঠলো, পৃথিবীতে আমাকে এ সময়ে ডাকতে পারে কে? দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ শোনা গেল। মণি একমুখ বিরক্তি নিয়ে উঠে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বললো, কাকে চান? দরজার ওপার থেকে মোটা গলার শব্দ ভেসে এলো, এই আপনাকেই চাই নমস্কার—আমি এই পাশেই থাকি......। মণি দরজাটা খুলে দিয়ে বললো আপনি ভেতরে আসুন, বলেই সে এসে বসলো তার চেয়ারে। ভদ্রলোক দরজার মধ্য দিয়ে উষাকে দেখে একটু ইতঃস্তত করলেন—তারপর উঠে এলেন ঘরের মধ্যে। মণি চারপাইয়ে পাতা বিছানার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললো, আপনি একটু বসুন আমরা চা খেয়ে নি। তারপর উষার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললো, আপনি চা খাবেন? ভদ্রলোক আমতা আমতা করে' বললেন---নাঃ আমি চা খাই না। মণি তার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো, ততক্ষণ আসুন আমরা ভদ্রলোককে দেখি! বেঁটে আর কালো চেহারা, বয়স ৪৪। ৪৪ বললাম এইজন্যে যে ৪৪ বছর বয়সে মানুষের শরীরে বয়সের একটা বিশেষ রকম ছাপ পড়ে এবং যা দেখে বলতে পারা যায় যে ভদ্রলোকের বয়স ৪৪। মাথায় অল্প টাক্। পায়ে নিউকাট্ আর সৌখীন গোঁফ। মণি তার প্রথম পেয়ালা চা শেষ করে দ্বিতীয় পেয়ালা সুরু করেছে আর উষা আধ পেয়ালাও শেষ না করে আড় চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখছে মাঝে মাঝে আর ভদ্রলোক খেলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন উঠে ওটা বন্ধ করে আসবেন কিনা? যদি কেউ তাঁকে দেখে ফেলে এইসব, এমন সময় মণি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ আপনি কি জিগেস করতে এসেছিলেন?

তেমন কিছু নয় তবে আপনি একজন এত বড় সাহিত্যিক আমাদের পাড়াতেই থাকেন—প্রায়ই ভাবি একটু আলাপ করতে যাবো তা আর হ'য়ে ওঠে না। তা ভাবলাম আজ রোববার...। ভদ্রলোক হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন—মণিও যেন তন্ময় হ'য়ে শুনছে এই রকম ভাণ করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এবং দুজনেই রইল সেই ভাবে প্রায়

আধ মিনিট। উষা অতিকষ্টে হাসি সামলাচ্ছে। মণি স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো—বললো, আমি আন্তরিক সুখী হয়েছি। (সঙ্গে সঙ্গে উষা মনে মনে আওড়ায় এ মিথ্যা কথা।) মণি বললো, কিন্তু আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ? ভদ্রলোক প্রায় অবাক হ'লেন—বললেন আপনারা প্রায় মাস খানেক হোল এ পাড়ায় এসেছেন অথচ আমার নাম শোনেননি, আশ্চর্য্য। আমার নাম হোল নটবর রায়, রায় বাহাদুর না বললে আবার সকলে চেনে না—কিন্তু আমি মশাই আপনাদের খুব সাপোর্ট করি—এ সব বিষয়ে ভয়ানক লিবারাল। আপনারা আসার পরই আপনাদের কথা আমার কানে পৌঁচেছে। উষা এতক্ষণ নটবর রায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল—আর কথাগুলো একমনে শুনছিল, হঠাৎ কথার মাঝখানে সে বলে উঠলো—দেখুন নটবর বাবু, আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সুখী হয়েছি—কিন্তু আজ রোববার বলেই আমরা একটু বিশেষ ব্যস্ত। আপনি বরং অন্যদিন আসবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে, এই বলে সে দাঁড়িয়ে উঠলো—এবং হাত দুটো কপালের কাছে তুলে এমন ভাবে নমস্কার করলো—যার স্পষ্ট মানে হচ্ছে যে এখনই বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। ভদ্রলোকের মুখের ওপর রাগের বদলে একটা গভীর হতাশার চিহ্ন দেখা গেল। বার কয় 'আচ্ছা বেশ বেশ' এইরকম ২।৪টি কথা উচ্চারণ করে দরজা দিয়ে নেমে পড়লেন।

উষা চায়ের বাসনগুলো নিয়ে ভেতরে চলে গেল আর মণি একটা সিগারেট ধরালে।

একটু পরেই উষা ফিরে এসে চেয়ারে বসতেই মণি বললে, ভদ্রলোক কি বলতে এসেছিল বুঝলে ?

—হ্যাঁ বুঝেছি, উষা বললো, এরা এই রকমই।

মণি—এদের দেখলেই মানসিক শান্তি নষ্ট হয়।

উষা—তাহ'লে ত বাঁচা চলেনা। যেখানে যাও দেখবে এরা এদের কুসংস্কার, এদের সমাজব্যবস্থাকে এরা আঁকড়ে আছে আর সেখান থেকেই সকলকে সাপোর্ট করছে এ্যাডমায়ার করছে। ও কথা যাক্, আমি ভাবছিলাম আজকের রোববারটা কি করে কাটানো যাবে। মণি বললে, বেশ তুমিই বলো।

উষা, প্রথম হ'চ্ছে আমি কিছুক্ষণ কবিতা পড়বো আর তুমি তা শুনবে, তারপর তুমি তোমার গত সপ্তাহের লেখা গল্পগুলো একটা একটা করে পড়ে শোনাবে।

মণি বললো, বেশ, কিন্তু তুমি রাঁধবে না ?

উষা বললো, আমার ত ছুটি, মেয়েমানুষকে যদি রাঁধতেই হয় ত তার ছুটি কোথায় ? কাজেই কাছাকাছি কোন হোটেল থেকে আজকের খাবার আনিয়ে নিলেই চলবে।

মনি, বেশ, তার পর।

উষা, তারপর পড়া আর শোনা, যখন আর আমাদের ভাল লাগবে না তখন আমি একটু

গান গাইব আর আমার গান শেষ হ'লে তুমি একটু সেতার বাজাবে। আর তা শেষ হ'লে আমরা একটা বিষয় বেছে নিয়ে দু'জনে খানিকটা তর্ক করবো, তারপর সন্ধ্যায় সিনেমা।

মণি, তর্ক করবে? কিন্তু কি নিয়ে?

উষা, সে পরে হবে'খন, তা নিয়ে এখনই তর্ক সুরু কোরো না।

মণি উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলো, তুমি ধন্য, উষা।

কয়েক মিনিটেই ওরা ওদের প্ল্যানকে বাস্তবে রূপ দিল।

উষা 'অডেনের' একটা কবিতার বই খুলে বসল আর মণি—ভাল ভাবে শুনবে বলে একটা সিগারেট ধরালো।

চলুন এবার আপনাদের নিয়ে যাই এপাড়ায়ই অন্য জায়গায়। ওরা একমনে কবিতা পড়ুক আর শুনুক। 'অডেন' ছোকরা লেখে ভালো। এখন ওদের বিরক্ত না করলেই ওরা সুখী হ'বে।

এইবার চলে আসুন নটবর রায়ের বৈঠক খানায়—

নটবর রায়, জনার্দ্দন তালুকদার, গণেশ ভৌমিক, সুখেন্দু সেন আর রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্যি। এঁরা সবাই এপাড়ার মাতব্বর লোক।

—এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। অনুমানেই সব বুঝে নিতে হয়।

—কিন্তু এর প্রমাণত রয়েছেই। মেয়ে স্কুলে খবর নিয়ে জানা গেছে যে ওর নামের আগে 'মিস্' লেখা আছে।

—তবে ছেলেটি কে? স্বামী, না, ভাই? না, উপস্বামী?

'উপস্বামী' কথাটায় সকলেই একসঙ্গে হেঁসে উঠলো।

—ছেলেটি আবার নাকি সাহিত্যিক। লিখেই নাকি রোজগার করে, কয়েকখানা বইও আছে নাকি ওর, বাজারে বিক্রীও হয়।

—জানি জানি সেগুলো যেমন জঘন্য তেমনি অশ্লীল। চাবুক মেরে যাদের সমাজ থেকে বারকরে দেওয়া উচিৎ, কি আশ্চর্য্য তারা এই ভদ্র পাড়াতেই বাস করছে। আমি বাড়ীওলাকে বলে.........

—ও কোন কাজের কথা নয়, এবাড়ী ছাড়লে অন্যবাড়ী পেতে কতক্ষণ। ছোকরাটি লিখে রোজগার করে, না, হাতি, ঐ মেয়েটির রোজগারেই খায়। বরং স্কুল কমিটিকে বলে কিংবা এডুকেশন বোর্ডে লিখে মেয়েটির চাকরীটি নষ্ট করলেই সব গোল মিটে যায়।

—লিখলেই কি হয়, প্রমাণ করতে হয়, প্রমাণ কই?

—প্রমাণ! প্রমাণের আবার দরকার নাকি? এতবড় কেলেঙ্কারীর পিছনে। ওরা বিবাহিত নয় অথচ একই ঘরে রাত্রি বাস করে, এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কি? আর আমাদের কলমের কি কোন জোর নেই? নামের পেছনে খেতাবগুলো কি বাজে নাকি? ইংরাজ রাজত্বে

এ অনাচার সহ্য করতে হ'বে নাকি ? আমি বরং বড়সাহেবকে বলে......

—নটবর বাবু ত স্বচক্ষে সব দেখে এসেছেন, তিনিই বলুন না।

সকলে নটবর রায়ের দিকে তাকাল।

নটবর রায় এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে সিগারেট টান্‌ছিলেন। আর তাঁর মনের কোনে উষার ছিপছিপে গড়নটি বার বার ঘোরাফেরা করছিল।

নটবর রায় বললেন, কিন্তু একটা কথা—ওরা ভাইবোন আমার এমনি সন্দেহ হয়।

সকলের উৎসাহ হঠাৎই নিস্তেজ হয়ে এলো।

—ওরা ভাইবোন হ'তে পারে। আমার মনে হয় ওদের মুখের সাদৃশ্য আছে।

—ভাইবোন! অসম্ভব! বেশ যদি তাই হয় ত অত বড় বোনের সঙ্গে এক ঘরে বাস করা তাও কি ঠিক নাকি ?

—ভাইবোন তারি বা প্রমাণ কি ?

—সত্যি কথা নটবর বললেই কিছু হোল না—

যাহোক ভাইবোন একথা ওঠায় কিরকম করে জানি এদের কথার স্রোতে ভাঁটা পড়ে এলো। নটবর বাবু আশ্বাস দিলেন প্রমাণ তিনি আজই যোগাড় করবেন। সভা গেল ভেঙ্গে। স্কুল থেকে মেয়ে ছাড়িয়ে নেওয়া, ছেলেরা যাতে কোন উপায়েই না এদের সঙ্গে মেশে সে দিকে দৃষ্টি রাখা, লাইব্রেরীতে ওর লেখা বইগুলো যাতে আর 'ইস্যু' না করা হয় সে বিষয়ে লাইব্রেরীয়ান-কে এক চিঠি লেখা, এক কথায় পাড়ার লোকের নৈতিক চরিত্র যাতে না কোন রকমে স্খলিত হয় সে বিষয়ে সচেতন হওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে সকলে বাড়ী গেলেন।

আপনারা এদৃশ্যটি দেখলেন। এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে ছুটি চাইছি। গল্প লেখা ছাড়াও আমার যথেষ্ট কাজ রয়েছে। ওদের সম্পর্ক কি তাতে আমার কোন দরকার নেই। উষার সুন্দর মুখ আর মণির উদাস চাউনি আমার ভালো লাগে। একেই অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে, 'অডেন' শুনতে পেলাম না এতে তত দুঃখ নেই কিন্তু মণির লেখা নতুন গল্পগুলি শুনতে না পেলে আমার আফশোষের সীমা থাকবে না। মণির লেখা আমার ভাল লাগে, ভীষণ ভালো লাগে। অতএব—

শিল্প বিপ্লবের পথে অন্তরায়

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি: বড় কাজ করবার পথে বাধার অন্ত নেই। ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন অতি বড় ব্যাপার; কাজেই তার অগ্রপথে বাধা-ও আসছে পর্বত-প্রমান।

শিল্প বিপ্লবের পথের অন্তরায় গুলি প্রধানতঃ দ্বিবিধ: কতগুলি সংস্কারাত্মক (psychological), আরগুলি বাস্তব (material)।

যান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের আদর্শটা পাশ্চাত্য মনের ক্রমবিকাশ। পশ্চিমের শিক্ষা:—অভাব বাড়িয়ে দিয়ে, তাকে তৃপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা হ'তে মানুষের মনের, জ্ঞানের, বিজ্ঞানের ও শক্তির বিকাশ করা। শিল্প-বিপ্লব সেই আদর্শেরই ক্রমবিকাশ।

পাশ্চাত্যের সাধনা ক্ষুধার, অতৃপ্তির; প্রাচ্যের সাধনা তৃপ্তির। তীব্র অভাববোধের তাড়না পাশ্চাত্য জগতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আর ভারতীয় মনের অখণ্ড তৃপ্তি তাকে হীন হতে হীনতর রসাতলে তলিয়ে দিচ্ছে।

শিল্পবিপ্লবের জন্য জমিন তৈরী করবার কালে এই সকল সংস্কারের জংগলে নির্মম ভাবে কুঠার চালাতে হবে। আশার কথা, সংস্কারপরায়ণতার অচলায়তনে কোন ফাটল দিয়ে ইতিমধ্যেই নূতনের আলো প্রবেশ করেছে, যুগার্জিত সংস্কারের দেউলে ভাঙ্গন ধরেছে। নব অভিযানের তীব্র আক্রমণে পুরাতন ধ্বসে পড়বেই।

যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথে আর একটি অন্তরায় হচ্ছে, গোঁড়ামি। একশ্রেণীর লোকের বিশ্বাস কলের তৈরী জিনিষ অপবিত্র, এবং তা দিয়ে দেবপূজাদি হতে পারে না। পূজাপার্বনাদিতে তাহারা কুটীরজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা পছন্দ করেন। কুটীরশিল্প-জাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন, খুবই ভাল কথা; কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে, সেই সমস্ত কুটীরজাত দ্রব্যাদি ও আসছে জাপান-জার্ম্মানি-ইংলণ্ড থেকে; যেমন,...বিবাহ ও অন্যান্য পূজার সরঞ্জামাদি। তবে, এই গোড়ামি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আর থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীগণ এবং টলষ্টয়, রলাঁ প্রভৃতি প্রাচ্যভাবাপন্ন ইউরোপীয় মনীষীরা উনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখে আতংকিত হয়েছেন। তাঁহারা বক্তৃতায় ও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মানব সমাজের উপর যন্ত্র-বিপ্লবের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার করুণ চিত্র এঁকেছেন। তাঁহারা দেখিয়েছেন যে, যন্ত্র-দানবের আওতায় মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়; যন্ত্রের পেষণে মানুষও প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়। ভাবপ্রবণতার বশে অসম্ভব কাল্পনিক ছবি ঐ সকল মনীষীরা আঁকেননি। বাস্তবিকই যন্ত্র-বিপ্লবের প্রথম আবর্তনে পুঁজিপতিদের অত্যধিক ধনগৃধ্নুতা শ্রমিকদের প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত করেছিল। কিন্তু চক্র আবর্তিত

হয়েছে; শ্রমিকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। রাশিয়া-জাপান-জার্ম্মানী-ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকদের আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা হ'তেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, শ্রমিক-কর্মীদিগের মনুষ্যত্ব হনন শিল্প-বিপ্লবের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া নয়। এবং যন্ত্র-শক্তি প্রভাবেই শ্রমিক ও জনগণের সুস্থ সুন্দর-সচ্ছন্দ জীবন গড়ে উঠতে পারে।

শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম প্রতিবন্ধক—গান্ধীজী-প্রবর্তিত চরকা আন্দোলন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত চরকা-সংঘ ও নিখিলভারত-গ্রাম্য-শিল্প-সংঘ। অন্যতম কুটীরশিল্প হিসাবে চরকা শিল্প-বিপ্লব-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অংশবিশেষ হতে পারতো। সেই হতো সুন্দর ও স্বাভাবিক। কিন্তু চরকা আন্দোলনের প্রবর্তক ও তাঁর শিষ্যরা শিল্প বিপ্লবান্দোলনকে চরকা ও কুটীর শিল্পের পরিপন্থী বলে কল্পনা ক'রে, তারপরে প্রতিবাদ সুরু করেছেন এবং শিল্পবিপ্লবান্দোলনের পথকে রোধ ক'রে চরকাকে দাঁড় করিয়ে প্রবল বিরোধিতা আরম্ভ করেছেন। তাঁহারা প্রচার করে থাকেন যে, একমাত্র চরকায় সূতা কেটেই স্বরাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার লাভ করা যাবে। বহু চেষ্টা করেও কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিনি। গত বিশ বৎসর চরকা-খাদি আন্দোলনের ফলেও দেশের লোকের সত্যিকারের খদ্দর-প্রীতি মোটেই বাড়েনি। এমন কি বিশুদ্ধ গান্ধীপন্থী বর্তমান কংগ্রেস-কার্যকরি-সভ্যগণের সকলেই যে সর্বক্ষণ খাদি পরিধান করা পছন্দ করেন এমন নয়। তবে সম্প্রতি কংগ্রেসী শাসিত প্রদেশগুলিতে কর্তা-ভজার দলও খদ্দর পরা অভ্যাস করেছেন (সম্ভবতঃ ঠেকায় পড়েই)। আর বোম্বাই-কলকাতা-দিল্লী প্রভৃতি বড় সহরগুলির সৌখিন অভিজাত সম্প্রদায়ের কেউ কেউ নূতন রকমের বিলাসিতার জন্যে সূক্ষ্ম খাদি পড়ছেন। সম্ভবত: এই শ্রেণীর খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করবার জন্যেই চোখ ধাঁধান সো-কেস্ (show-case) এবং খদ্দরের দোকানেও নিয়ন সাইন (Neon sign) জ্বলছে দেখা যায়।

চরকার গুণে স্বরাজ কতটা এগিয়ে এসেছে জানিনা; তবে যে সকল স্থানে চরকা বেশী চলেছিল, হাজার হাজার টাকার খাদি যেখানে উৎপন্ন হয়েছিল, (অন্তুতঃ বাংলা দেশের কথা জানি) আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় ঐ সকল সূতাকাটিয়েদের বা তাঁতিদের কাউকে বড় দেখা যায় নি। বরং সূতা কাটার ও খদ্দর বুনার মজুরি পয়সা দিয়ে মিলের কাপড় কিনে পড়েছে। সম্প্রতি শুনছি, তাদের খদ্দর পরতে বাধ্য করা হচ্ছে।

তারপর গত পাঁচ-ছয় বৎসরে গান্ধীজীর নিঃ ভাঃ গ্রাম্য শিল্প সংঘ যে ভারতীয় গ্রাম্য শিল্প-গুলিকে কতদূর এগিয়ে দিয়েছে, তার হদিস তো এ পর্যন্ত পেলাম না। বাংলাদেশে তো দেখি দু-একশ রিম হাতে-তৈরী কাগজ আর কিছু তালের গুড়। খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশবাবু বরং খাদির নামে বাংলা দেশের খাঁটি গব্য ঘৃত, বিহারের ভৈষা ঘি, ঢেকী-ছাঁটা চাল ও ঘানির তৈল বাজার হতে চড়া দরে বিক্রি করে গ্রাম্য শিল্প এবং পয়সা দুই-ই করছেন।

তথাপি গান্ধীজি বলেছেন চরকার উপর বিশ্বাস রাখতে। বিশ্বাস আমাদের একান্ত যুক্তি-নিরপেক্ষ বলেই রক্ষা; নইলে আমরা তো দূরের কথা, একান্ত নিষ্ঠাবান খাদিকর্মীদেরও দেহের

স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ, প্রাণের তেজ ও মাথার বুদ্ধির সংগে, শেষ সম্বল খাদির উপর এই বিশ্বাসটুকুও উবে যেতো।

দেশের শিল্পোন্নতিতে চরকার কার্যকারিতা যাই হোক না কেন, যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা চরকা পন্থীদের সামান্য নয় এবং ইতিমধ্যে শিল্পোন্নয়ন-পরিকল্পনার কার্যে তাদের বিরোধিতা কম প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে আশার কথা এই যে, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই চরকা-দর্শনের উপর আস্থা সম্পন্ন নহেন এবং তাঁদের চেষ্টা উদ্যোগেই সর্বভারতীয় জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিটি গঠিত হয়েছে এবং বিস্তৃত ভাবে পর্যবেক্ষণ কার্য চলছে।

শিল্পবিপ্লবের পক্ষে সংস্কারগত অন্তরায়ের মধ্যে আর একটি হচ্ছে যে, দেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, যান্ত্রিক শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের সংগে অসম প্রতিযোগিতায় দেশের ছোট ছোট কুটীর-শিল্পগুলি সব উঠে যাবে, এবং ফলে ঐ সব শিল্পে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ কারুজীবি জীবিকা হতে ভ্রষ্ট হবে। এই ধারণার কারণ, বিদেশী যন্ত্র-জাত শিল্পপণ্যের প্রতিযোগিতায় ও শাসকশক্তির প্রতিকূলতায় ভারতের গ্রামে গ্রামে কামার-কুমার-তাঁতের কাজ, বাঁশ-বেত-কাঠের কাজ প্রভৃতি দেশবাসীর প্রয়োজন ও বিলাস দ্রব্য যোগানিয়া যে শত শত ছোট কুটীর শিল্প ছিল, তার বেশীর ভাগই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। এ ভাবে ভারতের রেশম-পশম-কার্পাস-বস্ত্রশিল্প, শর্করা শিল্প, ইস্পাত শিল্প, নৌ শিল্প, বিভিন্ন ধাতু শিল্প, চর্ম শিল্প, বিভিন্ন কারু শিল্প, ভাস্কর্য—স্থপতি-শিল্প প্রভৃতির সবই উঠে গেছে ; আর, কোটি কোটি শিল্পি নিরুপায় হয়ে একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

তারপরে, বিদেশীর প্রয়োজনে, প্রচেষ্টা ও পুঁজিতে যে সকল বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ দেশের বুকের উপরে গড়ে উঠেছে, তাদের সংগঠন বা পরিচালন ব্যাপারে দেশের শিল্প বা দেশবাসীর স্বার্থ সমস্যা বিবেচিত হবার প্রয়োজন হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন ;—ভারতের সরকারি ও বে-সরকারি রেলপথগুলি, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত জাহাজি কোম্পানিগুলি, কলিকাতা বা বোম্বাইর ট্রাম কোম্পানিগুলি, কলিকাতা-বোম্বাই-মান্দ্রাজ-রেঙ্গুন প্রভৃতি সহরের টেলিফোন ও ইলেকট্রীক কোম্পানিগুলি ; বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলি : বাংলার পাটকল, বাংলা, আসামের চায়ের বাগান, বিহার যুক্তপ্রদেশের চিনির কল, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কয়লার খনিগুলি ; ব্রহ্ম-আসাম-পাঞ্জাবের তৈলখনি, ব্রহ্ম-মালয়-মধ্যভারতের সোনা-রূপা-হীরার খনিগুলি, ব্রহ্ম-মালয়-সিংহলের রবারের চাষ প্রভৃতি সকলই বিদেশী পুঁজিপতির খেয়াল, প্রয়োজন এবং স্বার্থে স্থাপিত এবং চালিত হচ্ছে। কাজেই এই সকল বিরাট যন্ত্র-শিল্প দ্বারা কুটীরশিল্পের সর্বনাশ হয়েছে বলেই জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করা যায় না।

বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং পরবর্ত্তীকালে মান্দ্রাজ-যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার কাপড়কলশিল্প অনেকাংশে দেশবাসীর প্রচেষ্টা ও পুঁজিতে স্থাপিত ও পরিচালিত। বস্ত্রশিল্পের তুলনামূলক সূচক-

সংখ্যা (statistics) হ'তে দেখা যায় যে কাপড়কলগুলি প্রতিষ্ঠার পরে দেশীয় তাঁতশিল্পের ও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদিগের মত যে, জাতীয় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দেশের কুটীরশিল্পগুলির স্বার্থপরিপন্থী তো হোতেই পারেনা, বরং পরস্পর সহযোগিতাই করে থাকে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনাকারিরাও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, বৃহৎ শিল্পগুলি এমনভাবে গঠিত ও পরিচালিত হবে, যাতে সেগুলো মাঝারি ও ছোট কুটির শিল্পগুলির পরস্পরের পরিপূরক ও সহযোগি হতে পারে। সুতরাং বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প কুটিরশিল্পগুলির ধ্বংশের কারণ হবে, এ যুক্তি টিকে না। এবং উল্লিখিত সংস্কারগুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে শিল্পোন্নয়নের অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করলে দেশের স্বার্থেরই ক্ষতি করা হবে।

দেশের লোকের সংস্কারগত অন্তরায়গুলি ও গান্ধীপন্থীদের বিরোধিতা ছাড়াও শিল্পবিপ্লবের অগ্রপথিকদের আরও কতকগুলি বাস্তব অন্তরায়ের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। তার কতগুলি দেশের অভ্যন্তর হতে বাধা দিচ্ছে আর কতগুলি আঘাত আসছে বাহির হতে।

আভ্যন্তরীন অন্তরায়গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে দেশবাসীর মধ্যে শিল্পোদ্যমের অভাব: নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা এদেশে মোটেই দেখা যায় না। এযাবৎ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সরকারি, আধ-সরকারি বা বে-সরকারি কোনপ্রকার সুনির্দ্দিষ্ট প্রচেষ্টা হয় নাই। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুই সর্ব প্রথম দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সর্বভারতীয় একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার সূচনা করেন। তাঁহার নেতৃত্বে গত ১৯৩৮ সনের ২রা, ৩রা, অক্টোবর কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীরা দিল্লিতে সম্মিলিত হয়ে সর্বভারতীয় জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিটির সূত্রপাত করেন। কমিটির কাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন সাব-কমিটির পর্যবেক্ষণের ফল সংকলিত হয়ে জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই বের হবে আশা করা যায়। সর্বভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়ে, উক্ত রিপোর্ট অবলম্বনে কাজ আরব্ধ হবার কথা। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সংকটে কংগ্রেসীমন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন-পরিকল্পনার এখানেই পরিসমাপ্তি হবে কিনা, বা কোন্ দিকে কতটুকু অগ্রসর হ'তে পারবে,—এখানে বলা শক্ত।

আভ্যন্তরীন অন্তরায়ের দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রয়োজনীয় পুঁজির (capital) অভাব। এ পর্যন্ত যে সকল বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে, তার প্রায় সবটাই বিদেশীর প্রয়োজনে, পুঁজিতে ও পরিচালনায় বিদেশী পুঁজি বা পরিচালনায় জাতীয় শিল্পোন্নয়ন হতে পারে না।

ভারতের প্রায় চল্লিশ কোটী জনসংখ্যার শতকরা পচানব্বুই জন একেবারে নিঃস্ব, দরিদ্র; একমাত্র শারীরিক শ্রম (labour) ব্যতীত আর কোন পুঁজিই তাদের নেই। সমাজের উপরের শ্রেণীতে যারা আছেন, তারা হচ্ছেন ;—রাজন্যবর্গ, জমিদার, পুঁজিপতি (capitalist) ও অভিজাত শ্রেণী। এদের হাতেই দেশের বেশীর ভাগ অর্থ সঞ্চিত হয়ে আছে এবং তা রয়েছে গোটাকতক বিদেশী ব্যাঙ্কে, ভারতীয় বা বিদেশী সরকারী ঋণ-পত্রে, কোম্পানী কাগজ (G. P. Notes),

ট্রেজারি বিল, পোর্টট্রাষ্ট বা মিউনিসিপ্যাল ঋণপত্র (debenture) বা বিদেশী কোম্পানীর শেয়ারে। প্রধানতঃ এরাই ভারতবর্ষে বিদেশী প্রভুত্বের বাহন। দেশের কোন শুভ প্রচেষ্টায় এদের ক্বচিৎ দেখা যায় ; যদিও দেশের সম্পদের বড় অংশ এরাই গ্রহণ করেন। আর এই দুই স্তরের মাঝখানে যারা আছে তারা মধ্যবিত্ত , সুযোগ পেলে এরা অভিজাত, আর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এরাই সর্বহারা। সমাজের উপরিভাগে যে ধন পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তাকে সঞ্চালিত (mobilise) করতে পারলে খুব বড় পরিকল্পনা কার্যকরী করতেও অর্থের অভাব হতো না। অন্ততঃপক্ষে কংগ্রেসী জাতীয়-পরিকল্পনা-পরিষদ যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সহযোগে নির্দিষ্ট হারে সুদী ঋণপত্র (Debenture) বিক্রী করে, তা' হলেও প্রথমেই ৫০০ কোটী টাকা সংগ্রহ করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার হয় না। এবং তাহা দ্বারাই জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য আরম্ভ হতে পারে। তারপর "দেশের সমস্ত সম্পদকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী নিয়োজিত ও সঞ্চালিত করে মূলধনের কার্য চলবে।

জাতীয় শিল্পোন্নয়নের আভ্যন্তরীণ তৃতীয় অন্তরায়,—কুশলী যন্ত্রী (Expert) ও শিক্ষিত কর্মীর অভাব। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে, শিল্প-বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিদেশ হতে কুশলি যন্ত্রী ও বৈজ্ঞানিক কর্মী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। আমাদেরও প্রথমতঃ বিদেশী যন্ত্রীর সাহায্য নিতে হবে। টাটার বিরাট ইস্পাতের কারখানাও প্রথমতঃ বিদেশী যন্ত্রীর সহযোগিতায়ই চলেছিল। বিদেশী যন্ত্রীদের সহযোগিতা পেলে আমাদের দেশের শিক্ষিত ছাত্রদের যোগ্যতা অর্জন করতে বেশী সময় লাগবার কথা নয়। আর সামান্য যান্ত্রিক শিক্ষা পেলেই বহু সহস্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক শিক্ষিত কর্মীর অভাব পূরণ করবে।

যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে-বিবেচ্য, সর্বাগ্রগণ্য সমস্যা হচ্ছে ভারতের বিপুল জনসংখ্যা। সর্ব ভারতীয় যে কোন পরিকল্পনা করতে গেলেই সবার আগে এসে দাঁড়ায় নিঃস্ব, নিরন্ন, অশিক্ষিত প্রায় চল্লিশ কোটী কর্মহীন জনসাধারণ।

বর্তমানে বাৎসরিক যে পরিমাণ মাল দেশের লোক ব্যবহার (consume) করে, তার সবটাই যদি দেশী মাল-মসলা দ্বারা, অত্যন্ত উন্নত যান্ত্রিক-পন্থায় (in highly mechanised process) দেশেই তৈরী হয় ; তা হলে, যদিও দেশের সম্পদের মোটা অংশ দেশেই থাকে, তথাপি এই বিরাট জনসংখ্যার বড় অংশই কর্মহীন দরিদ্র থেকে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণের কর্ম ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হলে কুটীর শিল্পের উপরেও বেশ মনোযোগ দিতে হবে।

ভারতীয় জনগণের বর্তমান জীবিকার পরিমাপ অকিঞ্চিৎকররূপে হীন। জীবনধারণ ব্যবস্থায় (standard of living) পৃথিবীর আর সব দেশের লোকেদের সাধারণ সমাবস্থায় উন্নতি করতে হ'লে ভারতীয় জনসাধারণের সাধারণ জীবিকার পরিমাপ বর্তমান ব্যবস্থার অন্ততঃ বিশ গুণ বাড়ান দরকার।

বর্তমানে যে শিল্পজাত পণ্য এদেশে ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশ বিদেশী, সুতরাং ভারতবর্ষকে শিল্প-সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-sufficient) এবং ভারতীয় জনগণকে পৃথিবীর আর সবার সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হলে, দেশের শিল্পজাত পণ্যের পরিমাণ অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ বাড়াতে হবে। বর্ধিত পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচা মালের উৎপাদনও বহুগুণ বাড়ান প্রয়োজন হবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেমন বিপুল, সেই অনুপাতে প্রয়োজনও বিপুল। এই বিপুল জন-সংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত করবার জন্যে যে পরিমাণ শ্রম (labour units) প্রয়োজন ; সমগ্র দেশের কৃষি ও কুটির শিল্পকে যান্ত্রিক উপায়ে উন্নত (mechanised) করেই মাত্র আমরা তা পেতে পারি। জড়ের মত স্থবির জনসমাজকে যন্ত্রশিল্পে দীক্ষা দিয়ে তাদের দিয়ে লক্ষ লক্ষ শিল্প-প্রধান গ্রাম গড়ে তোলা, যন্ত্র-শক্তির সাহায্যে তাদের কর্মকুশলতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে প্রত্যেক কৃষক প্রত্যেক গ্রাম্যশিল্পী বর্তমান অবস্থার অন্ততঃ বিশ গুণ বেশী উৎপাদন করতে পারে। কুটির শিল্পগুলিই হবে জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি। মাঝারি, বড় এবং মূখ্য শিল্পগুলি ক্রমঃপর্যায়ে উপর দিকে যাবে ; একটি হবে অপরটির সহযোগি, পরস্পর পরিপূরক। একমাত্র সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প বিপ্লবের পথেই তা একদিন সম্ভব হতে পারে।

শিল্প বিপ্লবের অগ্রপথে বাহির হ'তে যে সকল শক্তি বাধা দিচ্ছে, তারমধ্যে বিদেশী, বিশেষতঃ বৃটিশ বণিক তথা ধনিক সমাজের নিহিত স্বার্থ (vested interest) সর্বপ্রধান। দৃশ্যতঃ, ভারতের পরাধীনতা রাজনৈতিক হলেও মূলতঃ তাহা অর্থনৈতিক। ইংরাজ বণিক-সংঘ (East India Company) সবার অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য হাত করে এবং শিল্পগুলি ধ্বংস করেই ক্রমশঃ রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার সব চাইতে সর্বনাশী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার অর্থনৈতিক পরবশ্যতায়। ভারতবর্ষের বার্ত্তা—বিনিময় —আমাদনি-রপ্তানি—বৈদেশিক আদান-প্রদান—সন্ধি-বিগ্রহ—বাণিজ্যিক-ব্যবহার, যান-বাহন—শুল্ক নীতি, সব কিছুই বৃটিশ বণিক-সমাজের স্বার্থে ও নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত। নূতন ভারত শাসন আইনেও বৃটিশ বণিক-সমাজের তথা ইংরাজ জাতির স্বার্থ বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। (Government of India Act. —1935 Part V. Chapter III, Sec. 111 to 121) এই শক্তিমান বণিক সমাজের তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিরোধিতার মুখে ভারতীয় শিল্পকে দাড় করান সহজসাধ্য নহে।

তারপরে দেশের শাসন ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রটীর বাহিরে কতকটা ভদ্রগোছের স্বায়ত্ব শাসনের অনুষ্ঠান থাকলেও আদতে তাহা বৃটিশ বণিকসমাজের হাতের যন্ত্র মাত্র ; তাদের খেয়াল ও স্বার্থই এর শাসননীতির নিয়ামক। কাজেই এখানে একমাত্র প্রতিকূলতা ছাড়া, আশা করবার কিছু নেই।

সুতরাং পরিকল্পনা নায়কদের যথেষ্ট দূর দৃষ্টি, সীমাহীন নিষ্ঠা, ও অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কাজ বড়, বাধা ততোধিক বড়; বাধা বন্ধক, আঘাতই অভিযান করবার পাথেয় যোগান দেয়, শক্তি বাড়ায়, বুকে সাহস যোগায়।

'জয় নিপীড়িত প্রাণ
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান।'

শুভক্ষণ

অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

কেউ ব'লোনাকো কুৎসিৎ মেয়ে সে;
দেখারও আছে তো একটি শুভক্ষণ।
ফাগুনের তার আগুন-ধরানো রূপ
উপেখি' দেখোনা জ্যৈষ্ঠের ঝরা বন।

আর বল,'— রূপ. সত্যি বা রূপ কী?
প্রেমই তো রূপ, রূপই তো ভালবাসা।
কাঁটার বক্ষে গোলাপই তো ফোটা প্রেম
অথবা, কাঁটা-ই ফোটায় সে ফুলে ফুলে।

প্রেমিক সে হোলো শিল্পি আফিম খোর;
প্রিয়ারে সে গড়ে কল্জের কম্পনে;
বেদনার রঙে রাঙায় প্রতিমা তার,
সিনান করায় সেরূপ চোখের জলে।

বোলোনাকো কেউ কুৎসিৎ মেয়ে সে;
দেখারও আছে তো একটি শুভক্ষণ।
প্রিয়ারে দেখিও আমি যবে তারে ভাবি
অথবা যখন সে আমারে ব'সে ভাবে।

ভারতে স্থলপথের যানবাহন

'পথচারী'

চীনদেশের একটি প্রবচন, 'The condition of a country's roads is a measure of its state of civilisation' অত্যুক্তির উগ্রভাববর্জিত নিরাভরণ সত্য। প্রস্তর যুগ ও যন্ত্র যুগের মধ্যে কালের দুস্তর ব্যবধান অন্যান্যক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থানের ন্যায় যাতায়াতের পথঘাটে ও ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন কোরেছে। সুদূর অতীতে বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে আত্মস্বাতন্ত্র্যের দিনগুলিতে নিরুদ্দেশ স্বাচ্ছন্দ্য ধীর-মন্থরতায় সরীসৃপের ন্যায় কাল অতিবাহিত কোরেছে। সমাজের গীতচ্ছন্দ মূর্ত হোয়ে উঠেছে সেকালের যানবাহনে। জনবিরল গ্রামের পথে কিম্বা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের পথে গো-শকট অথবা ভারবাহী পশুর দল সেকালের জীবনযাত্রার সুরটি স্মরণ করিয়ে দেয়। যন্ত্রযুগের আগমনে সমাজজীবনে বিপ্লব ঘটে গেছে—আত্মস্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়ে জীবনের পরিধি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত হোয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে। প্রতিপদে জীবনে এসেছে এস্তত্তা ও ব্যস্ততা, মন্থরতা নির্বাসিত হোয়েছে। এ যুগে গতিতে গতিতে প্রতিযোগিতা, নিত্যই নূতন গতিযোগের উদ্ভাবন।

গো-শকটের যুগে পথের পরিচর্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের সাথে ও পরবর্তীকালে বিজিত রাজ্যে আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিদেশে ও প্রতিযুগে বড় বড় পথঘাট নির্মিত হোয়ে এসেছে। রোমসাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে- সাম্রাজ্য রক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় উপায়ের বহুল ব্যবহার ইতিহাসে দেখা যায়। এমনি আজ পর্যন্ত প্রবাদ চলতি আছে 'All roads lead to Rome" যন্ত্রযুগের আমলে জাতির উপর জাতির আধিপত্যের লিপ্সা বেড়েছে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করবার প্রয়োজনও কমে নাই। পেশোয়ার, দিল্লী ও

কলিকাতা সংশ্লিষ্ট করার জন্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পরিকল্পনার পশ্চাতে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিল সজাগ। যন্ত্রযুগ গতির ভগীরথ, গতির প্রয়োজনে যানবাহনের জন্য সংস্কৃত পরিসর পথ চাই, গতিই যে মর্যাদার নিয়ামক।

ভারতবর্ষে রেলপথের প্রসার রাস্তাঘাটের বিস্তারে সাহায্য করলেও রেলপথ রাস্তার প্রতিদ্বন্দ্বী হোয়েছে। রেলপথ স্থাপনের সাথে সাথে প্রধান জনপদের সঙ্গে রেলপথের যোগাযোগের জন্য বহু শাখাপথের সৃষ্টি হয় ও স্থলপথে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কালক্রমে এই শাখাপথগুলি রেলপথের আয়ের অংশীদার হোলে পর রেলপথের কর্তৃপক্ষ স্থলপথে যানবাহনের প্রসারেব উপর বিরূপ হোয়ে ওঠে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে রেলপথের পরিপূরক কোরে স্থলপথে যানবাহনের উন্নতি রেলপথেরই কল্যাণ আনবে, অধিকন্তু রয়েছে বড় বড় আন্তঃপ্রাদেশিক রাস্তার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং রেল-রাস্তা দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য অধুনা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ দেখা গেছে।

সরকারের অনুগ্রহে বঞ্চিত হয়েও স্থলপথে মোটর যানের প্রসার খুব কম হয় নাই, উচ্চহারে আমদানী শুল্ক, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের শুল্ক, পেট্রোল শুল্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দফায় ট্যাক্স আদায় কোরে সরকার যানবাহন শিল্পের প্রসারে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ভারতে মোটর চলাচলের জন্য প্রায় ১০০,০০০ মাইল পথের ব্যবস্থা যার অধিকাংশ গো-শকট যুগের অসংস্কৃত অবস্থায় আছে। মোটর যানের উপযোগী পথনির্মাণে সরকারের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই, রবার টায়ারের উপযোগী মোট ৬৬,০০০ মাইল মাত্র সংস্কৃত পথ আছে। গ্রেটব্রিটেনে যেখানে প্রতি অর্ধমাইলে এক মাইল সংস্কৃত পথ আছে ভারতে সেখানে ১ মাইল পথ প্রতি ১২ বর্গমাইলে পাওয়া যায়। সরকারের ঔদাসীন্য ও রেল-রাস্তা দ্বন্দ্ব ছাড়াও স্থানীয় আধিপত্য (local control) উন্নতি বিরোধী হোয়েছে। প্রশস্ত রাজপথ বিভিন্ন স্থানীয় শাসনের এলাকার মধ্য দিয়ে বিসর্পিত হোয়েছে, তার কোথাও বা স্থানীয় আধিপত্যের প্রসাদে মোটরযানের ব্যবহারপযোগী আর কোথাও বা তার বিপরীত ফলে সারা রাজপথটাই হয়তো যানবাহনের জন্য অকেজো হোয়ে পড়েছে। ১৯২৭ সালে এম, আর জয়াকরের সভাপতিত্বে ভারতীয় পথ সংস্কার কমিটীর (Indian Road Development Committee) যানবাহন চলাচলের প্রসার সম্পর্কে আলোচনায় বলেন "It is

BOOKS

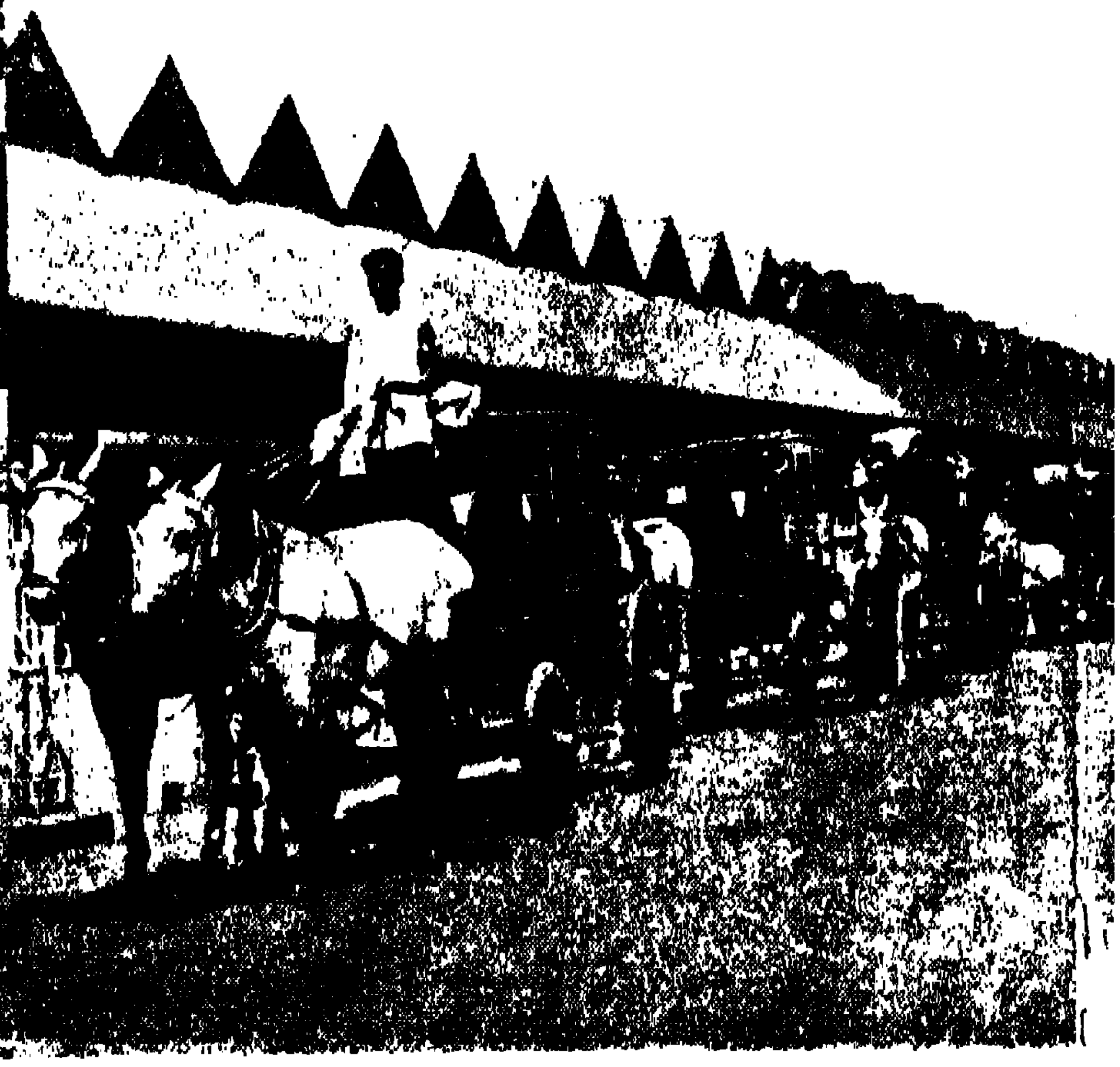

FOR 15

somewhat incongruous that there should be nearly 40,000 miles of Railway in India while the total mileage of surfaced roads in only 59,000." অর্থাৎ, যেখানে ৪০,০০০ মাইল রেলপথ বর্তমান সেখানে মাত্র ৫৯,০০০ মাইল রাস্তা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতের অধিকাংশ রেলপথই সরকারী ও মোটরযান ব্যবসা বেসরকারী।

রেল-রাস্তা কমিশন ও কনফারেন্স কোরে রেল-রাস্তা দ্বন্দ নিরসনের যে ব্যবস্থা হোয়েছে তার ফলে রেল-পথের পরিপন্থী রাস্তানির্মাণ বন্ধ কোরে রেলপথের পরিপূরক রাস্তা নির্মাণের বিধি দেওয়া হয়েছে। অন্য এক উপায়েও রাস্তা-প্রসারের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হোয়েছে। পেট্রোলের উপর আবগারী ও আমদানী শুল্কের শতকরা পঁচিশ ভাগ নিয়ে রোড-ফণ্ড (Road fund) নামে রাস্তা উন্নয়নের অর্থব্যবস্থা হোয়েছে। প্রতি প্রদেশে পেট্রোল খরচের অনুপাতে রাস্তা নির্মাণের জন্য এই ফণ্ড থেকে অর্থ সাহায্য করা হয় এবং সরকারের নির্দেশ প্রতিপালিত না হোলে যে কোন প্রদেশ এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে।

কেন্দ্রীয় রাস্তা উন্নয়ন ফণ্ডের (Central Road Development Fund) অর্থ-প্রাপ্তিতে রাস্তা নির্মাণে প্রাদেশিক সরকারের অর্থব্যয়ে কিছু কার্পণ্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু, ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হবার পর প্রতি প্রদেশেই আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার (self sufficiency) জোয়ার লেগেছে, প্রতি প্রদেশেই মোটার ট্যাক্সের আয়কর এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, কোন কোন প্রদেশ ঋণ কোরে রাস্তা উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছে। এ সম্পর্কে বাংলা ও বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় শিল্পপরিকল্পনায় মোটরশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কংগ্রেসের জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা সমিতিও এবিষয়ে অবহিত হোয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প-অবস্থানের দিক

থেকে বিচার কোরলে জাতির আর্থিক জীবনে স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই সুস্পষ্ট হোয়ে উঠবে। রাস্তার আয়ুষ্কাল বর্ধিত কোরে পরিমিত অর্থসংস্থানে অধিকতর বিস্তৃতি লাভের জন্য সকলপ্রকার স্থলযানে লৌহচক্রের পরিবর্তে রবার টায়ারের ব্যবস্থা কালবিলম্ব না কোরে করা উচিত। সিন্ধুপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশেও স্থলপথে যান-বাহনের প্রসারের সঙ্গে লৌহচক্র বনাম রবার টায়ারের সমস্যাটি উপলব্ধি কোরেছে। কয়েক বছর যাবৎ অত্যন্ত সচেষ্ট হোয়েও রাজ-পথের প্রসারে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই অনগ্রসর। যুক্তরাজ্যের প্রতি ১০০,০০০ লোকের জন্য ২,৫০০ মাইলের তুলনায় ভারতবর্ষে সমসংখ্যক লোকের জন্য ৮৪ মাইলের ব্যবস্থা আছে।

যা হৌক, মোটরযান গত পনের বছরে ভারতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজপথে ১৪৩,০০০ মোটারযান চলাচল করে, তন্মধ্যে বাংলাদেশে আছে ২৮,৩৭৫। পেট্রোল ট্যাক্স ও গত ছয়-সাত বছরে প্রায় ২৫০ লক্ষটাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এত উন্নতি সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় এ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমেরিকায় প্রতি ৫½ জনে, ফ্রান্সে প্রতি ২০ জনে ও গ্রেটব্রিটেনে প্রতি ২৩ জনে, জর্মানীতে প্রতি ৮৫ জনে ও ভারতবর্ষে প্রতি ১,৮৫৮ জনে একটি মোটরগাড়ী ব্যবহার করে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষে ভারতে শিল্প বিপ্লব শৈশবের পঙ্গুতা কাটিয়ে চীনের প্রবচন সার্থক করবে, স্থলপথে আধুনিক যানবাহন দ্রুত প্রসার লাভ করবে।

ছবিগুলি Dunlop Review হইতে D. J. Keymer & Co. Ltd.এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পরিচয়

ক্ষিতীন্দ্রমোহন মিত্র

প্রথম শিশুর প্রতি মায়ের যে অন্ধ মমতা সেই মায়া-কাজল চোখে, মা সন্তানকে হারানোর ভয়ে যেমন করিয়া বুকের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া, চোখে চোখে চাহিয়া থাকেন, ঠিক তেমনি, মৌন স্তব্ধ প্রকৃতি গৃহ-নীড় খানিকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া চোখের আড়াল হইতে দেয় নাই। নিঃশব্দ গৃহটিকে পোড়ো বাড়ি বলিয়া মনে হয়। এর অজস্র নীরবতায় মনোবেদনার আভাষ। এ নীরবতায় সম্পদ নাই, সজীবতাও নাই—আছে শুধু অন্তর গ্লানির নিবিড়তা। আবহাওয়ায় পরিব্যাপ্ত প্রচণ্ড অবসাদ—যে অবসাদ অব্যক্ত দুঃখের পরিণতি।

সন্ধ্যার ছায়ায় এই মায়াপুরীতে পা দিয়া পথিক কি ভুল করিয়াছে জানিনা, শুধু এইটুকু জানি সে বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কতটুকু চেতনা লইয়া সে এতদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই তা জানে। তাকে দেখিয়া মনে হইল, বোধহয় তার অন্তরের দীনতার সুযোগ লইয়াই আবহাওয়া অদ্ভুত ষড়যন্ত্রে তাকে আত্মভোলা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তার অন্তর মনের দুয়ারে কাকুতি মিনতি করিয়া মরিতেছে —যেন তা সবার চোখে ধরা পড়িয়া গেল।

মনের একান্ত দরদ দিয়া সে কি যেন চায়। সেই কামনাটুকু লইয়াই না সে এত পথ চলিয়া আসিয়াছে। হয়তো আরও চলিবে।

লোকটি বাড়িখানির সমুখে পা' দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পথ ভুলিয়া যায় নাই; হারাইয়া ফেলিয়াছে—আপনার চেতনা। সুখ দুঃখের আতিশয্যে যে বিহ্বলতা মানুষের জীবনে স্বাভাবিক।

আপনভোলা মনে উৎসাহিত দৃষ্টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে কত ভাবে প্রতিটি বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। অপরিচিতের মধ্যে পরিচয়ের গন্ধ পাইয়া কতই না তার উন্মাদনা।

পুরাতন দালানের গা চিড়িয়া ছোট বড় গাছ জন্মিয়াছে, ডান হাতের পোড়ো বকুল তলায় মস্ত ঝোপ-ঝাড়, বা হাতের ছোট্ট পানাপুকুরের জল চোখে পড়ে না, নাক বরাবর নিমের প্রকাণ্ড গুঁড়িটা একেবারে শুক্‌নো। এই অতি তুচ্ছ বস্তুগুলির প্রতি লোকটির এত মনের টান যে তারি আকর্ষণে অনেকক্ষণ এক পা'ও নড়িতে পারিল না। তারপর কি ভাবিয়া সোজা একটু আগাইয়া ঐ নিমের গুঁড়িটির গায়ে হাত ছোঁয়াইয়া ওর মাথার দিকে তাকাইয়া রহিল। আর শুনিতে লাগিল—কোথায় ঝি ঝি পোকাগুলি সদল বলে এর নিঃশব্দতার অবকাশে গলাবাজী করিয়া তাদের সুরবোধ ও সঙ্গীত কৌশল সকলকে জানাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; টিকটিকির দল 'ঠিক ঠিক' বলিয়া তারি তারিফ করিতেছে, এক ঝাঁক পাখী ও কিচির-মিচির শব্দে শুভেচ্ছা জানাইতেছে।

ইতিমধ্যে তার চোখ পড়িল একটি ঘরের জানালার উপর, কারণ ঘরের সেইদিকে দরজা ছিল না। লোকটি ধীরে ধীরে সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হইল। জানালা বন্ধ? সেই বন্ধ জানালায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অনেকক্ষণ সময় কাটাইয়া দিল, বোধহয় তার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা থাকে। তাকে হয়তো তারি জের টানিতে হইতেছে।

একটু পরে যেন হুঁস হইল। পাশ ফিরিয়া লইয়া সোজা মাতালের মত গা ছাড়িয়া দিয়া টলিতে টলিতে ভিতর বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে। চোখে এতটুকু ভয়ের চিহ্ন নাই, অপরিচিত বাড়ি বলিয়া একটিবার ইতঃস্ততঃ পর্যন্ত করিতে দেখা গেল না, মনে ঝুঁকিটাই সার হইয়া সকল চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

কারো চোখে পড়ে নাই বলিয়াই, কেহ বাঁধা দিল না, কোন প্রশ্নও করিল না। সে তির্ তির্ করিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ ঘরটির পিছন দিকের দরজার পাশে গিয়া একটু থামিল। দরজাটি ভেজানো, সামান্য ফাঁক দিয়া মনের কৌতুহলে ভিতরে এক দৃষ্টে চাহিয়া কাণ পাতিয়া রহিল।—স্তিমিত প্রদীপে চোখে পড়ে চোখাচোখি দুই খোকা—একটী ভোরের কাঁচা আলো। অপরটী দিবসের বিদায় বেলার নিস্তেজ রক্ত-রাগ; উভয়েই দুর্বল, দুজনেই নির্জীব, দুজনের মধ্যেই শৈশবের অক্ষমতা।

শিশুটীর প্রতি তাকাইয়া লোকটী চোখ খাড়া করিয়া কি দেখে। তার চোখে ইহা বড়ই রহস্যময় ঠেকিয়াছে, হয়তো অনেককাল ধরিয়া সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ সম্পদটী হইতে বঞ্চিত, শিশুর সরলতা, অকপট আলাপ, নির্মল আনন্দ—বহুদিন তার চোখে পড়ে নাই। তাই না অপূর্ব তৃপ্তিতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।...

অন্ধকারের সমুখে বৃদ্ধের শাদা খাড়া অবিন্যস্ত চুলগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। মুখের যে অংশে আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেটুকু ফ্যাকাসে সহস্র কুঞ্চনে পরিপূর্ণ। সর্বত্র দেহমন ভাঙিয়া পড়ার পরিস্ফুট আভাষ। তার এই দুঃখের মূলে কোথায় কোন্ ক্ষত রহিয়াছে কে তা' জানে! যদিও তা' না জানা থাকিলেও করুণ ইঙ্গিত প্রাণে লাগে।

ঘরের আসবাব যথেষ্ট, যদিও সমস্তই পুরাতন এবং ভাঙা। যে জিনিষগুলি কালস্রোতে ধ্বংসের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাকে আর আদর-যত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কেহ প্রচেষ্টা করে নাই। শুধু আসবাব বলিয়া নয়, দেয়ালের আস্তর আপন মনে ধ্বসিয়া যাইতেছে কেহ সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না। জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিলে মানুষ হয়তো এমনি নির্বিকার হইয়া পড়ে।

একটী প্রাচীন তক্তপোষের উপর বালিশে ঠেস্ দিয়া বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিতে গিয়া পিছন দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া আছেন। মুখে হুকার নল। সমুখে ছাত্রবন্ধু—শিশুটী।

পড়া হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনকার মত 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিবার জন্য খোকা প্রশ্ন করিল—দাদু, আমার কবিতা শুনবে ?

বৃদ্ধ একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—বল।

খোকা সুর করিয়া বিজ্ঞের মত বলিয়া চলিল—

'গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে লেখাপড়া করে যে।'

বৃদ্ধ আবার তেমনি হাসিয়া বলিলেন—হয়নি দাদু...শোন, আমি বল্‌ছি। বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

লেখাপড়া করে যে কারাগারে মরে...

বৃদ্ধ থামিয়া কাঠ হইয়া রহিলেন। মাত্র একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া বাহির করিয়া দিলেন খোকা 'যাই দাদু' বলিয়া ঘরের মধ্য দিয়া পার্শের ঘরে চলিয়া গেল।...

লোকটীর এতক্ষণে স্বপ্ন ভাঙিল। সে দরজা ফাঁক করিয়া ভিতরে আসিয়া দেয়ালে ভর করিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা বলিল না। শুধু নিস্পলক বৃদ্ধের প্রতি তাকাইয়া রহিল একখানি ছবির মতো।

বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এবার সমুখের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িলেন। মাথা তুলিলেন না বটে, হুকার নলটী যথাস্থানে রাখিয়া একটু একটু করিয়া বলিতে লাগিলেন—ওর খবর নিতে এয়েচ !...

শুষ্ক হাসিলেন। ক্রমে গলার স্বরও একটু ভারি হইয়া আসিল। কিন্তু তিনি বেশীক্ষণ থামিয়া রহিলেন না। কারো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—তোমরা ওকে ভালবাসতে।...বোকা ছেলে, ও কি আর বাড়ী আস্‌বে ?...সতীশ বলে—আমি হাসি।

সত্যি বৃদ্ধ হাসিল। বেশ একটু দীর্ঘ করিয়াই হাসিটী টানিয়া লইল।

লোকটীর কি হইল, একটু একটু করিয়া তার হাত পা যেন কাঁপিতে লাগিল।

বৃদ্ধ উত্তরের প্রতীক্ষায় নয় ভাবনার আবিলতায়, কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়াছিলেন, কী মনে পড়ায় পুনরায় বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—গোপাল খালাস হ'য়ে আস্‌বে, আর আমি তাকে দেখ্‌ব।...

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নীরব হইলেন। সমস্ত ঘরটী যেন তার কথা শুনিয়া সহানুভূতিতে হতবাক হইয়া রহিল। মাথাটী তার তেমনি নোয়ান লোকটী বোবার মত নির্বাক ছুটিয়া গিয়া তার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া অস্পষ্ট ভারি, ভাঙা গলায় উচ্চারণ করিল—আমি...আমি...।

এখানেই তার কথার পরিসমাপ্তি হইল।

বৃদ্ধ কথা কহিলেন না। একখণ্ড পাথরের মতো একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। চোখের দৃষ্টি হয়তো একটু ফাঁকা। শ্বাস প্রশ্বাস পূর্ব অপেক্ষা ঘন। লোকটির কথা তার কানে

পৌছিলেও বৃদ্ধের এখন কথা বলিবার সামর্থ্য নাই, স্বপ্নের দুঃখহীন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, যে স্বপ্ন আজ তার নতুন নয়, বহুকাল ধরিয়া তাকে পাইয়া বসিয়াছে।

দু'জনে কাছাকাছি পাশাপাশি বসিয়া, অথচ আলাপ নাই। বৃদ্ধ চোখ থকিতেও অন্ধ, লোকটী মুখ থাকিতেও মূক।

বৃদ্ধ ভুলে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন সতীশ, তুমি? বল্‌ব বাছা সত্যি কথা?

তারপর তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—ঠিক জানো। গোপাল বেচে নেই!

গলা ভাঙ্গিয়া স্বর বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চমকিয়া থামিয়া রহিলেন। মুখে উদাস-জড়তা

লোকটী তেমনি নীচু ভাঙ্গা গলায় বলিল, আমি গোপাল! আমি!

বৃদ্ধ উত্তর করিল না। শুধু মুখ হইতে হুকার নলটি খসিয়া পড়িয়া গেল। শ্বাস ঘন হইতে লাগিল। বহুক্ষণ যাবত জনৈক বিধবা পাশের ঘর হইতে লোকটিকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন পরম বিস্ময়ে বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিলেন—দাদা, তোমার পাশে কে দেখো?

বৃদ্ধ চঞ্চল হইয়া সর্বভাবে অক্ষম ও অসহায়ের মত চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন কে রে?

—গোপাল!

তিনি তেমনি 'হা' করিয়া রহিলেন। হয়তো ভাবিলেন ওরা পাগল হইয়াছে, নতুবা তিনি পুনরায় স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাস্তবিক এই স্বপ্ন কত আনন্দের, কত আত্ম প্রসাদের। এর বেদনাময় পরিণতির কথা? সেত স্বপ্ন ভাঙার বেলা। আগে উজানের উন্মত্ততায় সে বাঁচিবে, পরে সেই ভাটী বেলার আর্তনাদের প্রশ্ন। কল্পনায়ও কত সুখ—গোপাল তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, বাবাকে সে ভোলে নাই। সে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার নতুন করিয়া সংসার পাতিবে।—আশায় বৃদ্ধের বুক ভরিয়া উঠিল।

লোকটী এবার সকল জড়তা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুধু উচ্চারণ করিল বাবা, আমি গোপাল।

—না, না, তোমরা গোল করো না, আমি বেশ আছি।

বলিলেন বটে কিন্তু মুহূর্ত না কাটিতে এই প্রথম মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনেক কাল পরে আজ মুখ উচু করিয়া ধরিলেন। তারপর একটা বিশ্রী, বিকট শব্দে সমস্ত দেহ দুলাইয়া বলিয়া উঠিলেন—গোপাল! তুই।

ঝড়ের পরক্ষণে স্তব্ধতা। বৃদ্ধের এই নীরব ধ্যানমগ্নতা আর কাটিল না। লোকের ভিড়ে ডাক্তার বাবুও, আসিয়া ভিড়িলেন, কিন্তু চিকিৎসার অবকাশটুকু পাইলেন না। বৃদ্ধ ইতিমধ্যে নাকি 'হার্ট ফেল' করিয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু

শীতকাল কেটে গিয়ে যুদ্ধের আসল সময় ঘনিয়ে আসছে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঁশিয়ে দালাদিয়ে ঘোষণা করেছেন যে জার্মানির আক্রমণ প্রতীক্ষা করে' বৃটেন ও ফ্রান্স চুপ করে থাকবে না। বসন্তকালে যাতে ঘোরতরভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যায় তার জন্য রীতিমত প্রস্তুতি চল্‌ছে। গণতন্ত্রপ্রেমিক বৃটেন ও ফ্রান্স নাৎসীজম্-কে নির্ম্মূল করে' সমস্ত পৃথিবী থেকে সমরাতঙ্ক দূর করবে, গণতন্ত্রের বিজয় নিশান উড়িয়ে শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্য্যন্ত দালাদিয়ে ও চেম্বারলেন 'সহোদর'দের বিরাম নেই। চার্চ্চিল্ সাহেব বোধ করি সেইজন্যই গণতন্ত্রের জলুষে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে বলেছিলেন যে নিরপেক্ষ দেশগুলির এইরকম নির্বিকারভাবে নীরব থাকবার কোন অর্থ হয় না, নাৎসীজম-এর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তাদের সকলেরই উচিত বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ করা। চার্চ্চিল্-এর এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের পর বৃটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এত বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে গবর্ণমেণ্ট-পন্থী সাময়িক পত্রে এই হঠোক্তির তীব্র সমালোচনা করা তো হ'য়েছিলই, নিরপেক্ষ দেশগুলি পর্য্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অন্তত চার্চ্চিল্-এর মত একজন বিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিক ধুরন্ধরের দিক্ থেকে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমরোদ্দেশ্য যাই হোক, তাকে এইভাবে নিরাভরণরূপে বাইরে প্রকাশ করা বুদ্ধিসম্মত হয় নি। অবশ্য পরে চেম্বারলেন সাহেব সময়মত তাকে খণ্ডন করেছেন। সে যাই হোক্, এ-যুদ্ধ কি কারণে এবং কাদের স্বার্থ নির্ব্বাহের জন্য আরম্ভ হয়েছে তা পৃথিবীর কারও কাছে অবিদিত নেই, সুতরাং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে এর মধ্যে ভিন্নভাবে উস্কানি দেওয়া অত্যন্ত হাস্যকর।

সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশানালের শান্তিবাদী সোশ্যালিষ্টদের উষ্মা

International Transport Workers' Union-এর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ লণ্ডনের এক সভায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাশ করেছেন যে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে আক্রমণ করে' সোভিয়েট রাশিয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছে এবং রাশিয়ার শ্রমিকদের উচিত বর্ত্তমান ষ্ট্যালিন্ রেজিম্-কে ধ্বংস করা। ওয়াল্টার সিট্রাইন্, আট্‌লি, গ্রীণউড, মিশিয়ে ব্লুম প্রমুখ আরও অনেক সোশ্যালিষ্ট ও লেবর নেতারা সোভিয়েট্ রাশিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে অনেক কিছু কুকথা প্রয়োগ করেছেন। আট্‌লি "World Federation'-এর নূতন পরিকল্পনা করেছেন। যুদ্ধের আগে এঁদের খুব তর্জ্জনগর্জ্জন শুনা গিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেই এঁদের উপরের মুখোস খুলে' পড়ে' সত্যকার কদর্য্য আকৃতি বেরিয়েছে। এতে আমরা কিন্তু এতটুকুও বিস্মিত হই নি, কারণ এঁদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং সমস্ত বিপ্লবী মার্কসিষ্টরাও এঁদের ভুল চেনেন না।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এঁদের অর্থাৎ সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনালের এই সব শান্তিবাদী সোশ্যালিষ্টদের যা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাতে আর নূতন করে' বিশেষ কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। এই সব "Strait-laced Trade Unionists," "embourgeoised co-operators," "Pink Socialist"-দের নীতি হ'চ্ছে "hvotism" ও "Maniloffskyism"—গোগোলের "Dead Soul"-এর নায়ক ম্যানিলফ্‌স্কির মত এঁদের মজ্জাগত ধর্ম্ম হ'চ্ছে "to talk and not to do',—মুখে বড় বড় বুলি কপ্‌চানো, কিন্তু কাজের সময় কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পিছু হটে' এঁরা বুর্জ্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর গা চাটতে থাকেন। গত মহাযুদ্ধের আগে Basle Congress-এ Second International-এর সোশ্যালিষ্টরা "war against war" শ্লোগান তোলেন, অর্থাৎ বেস্‌ল্ কংগ্রেসে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তাঁরা সাহায্য তো করবেনই না, উপরন্তু যদি সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করে তা হ'লে তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তারপর দেখা গেল যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে উপদেশ দিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করতে। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবন উৎসর্গীত হ'ল, যার জন্য এই সব "গোলাপী সোশ্যালিষ্টরা" (লাল নয়) বললেন যে তাঁরা দায়ী নন, যা ঘটবার তাই ঘটেছে। কারণ Second International হ'চ্ছে "instrument of peace"—"weapon of war" নয়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে "level of production"-এর দিকে নজর রেখে এ-ভিন্ন অন্য কিছু কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ দোষ হ'চ্ছে "the forces of production"-এর (Kautsky-র অভিনব "Theory of the forces of production", পঠিতব্য), তাঁদের নয়। এই হ'চ্ছে Second International-এর স্বরূপ এবং আট্‌লি, সিট্রাইন্, ব্লুম ও International Transport

Worker's, Union-এর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ যখন সোশ্যালিজম কপচান তখন তাঁদের বিদ্রূপ না করে, উপায় কি। আজ এঁরা যে নিজেদের গবর্ণমেণ্টের প্রশস্তি গাইবেন এবং সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে গলাবাজি করবেন সে তো খুবই স্বাভাবিক। এঁদের ধ্রুব বিশ্বাস যে ভোটে জয়লাভ করে' পার্লামেণ্টের সভ্য হলেই সোশ্যালিজম এসে যাবে, আর সোশ্যালিজম-এর "Golden Apple"-টি একদিন তাঁদের কোলের উপর এসে পড়বে যখন আর কারও দুঃখকষ্ট থাকবে না। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে এঁরা বিশ্বাস করেন না, এঁরা ভাবেন চিম্‌টি কেটে এবং খুনসুড়ি করে' সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। সুতরাং বুর্জ্জোয়াশাসক শ্রেণীর পক্ষে এঁদেরকে 'tout' বানান খুব শক্ত ব্যাপার নয়, লেনিন তাঁর "Imperialism" নামক পুস্তকের মধ্যে এঁদের সম্বন্ধে বেশ চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন :—

"These persons are veritable agents of the bourgeoisie, active for the bourgeoisie in the ranks of the workers, the touts of the capitalist class, the modern protagonists of jingoism and reform."

সেইজন্য আজ আট্‌লি, সিট্রাইন্, ব্লুম প্রভৃতি যাই বলুন, বা International Transport Worker's Union-এর কার্য্যকরী সমিতি যে—প্রস্তাবই পাশ করুন তাতে Third International অন্তর্ভুক্ত সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থাৎ সত্যকার বিপ্লবী সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা ভয় পায় না। Second International-এর ভক্তবৃন্দেরা আজ isolated, চীৎকার তাঁদের অরণ্যে রোদনের সামিল হবে। বিশ্ব-বিপ্লবের যে-আদর্শে Third International অনুপ্রাণিত সেই পথে আন্তর্জ্জাতিক সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিরা আজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

সোভিয়েট য়্যুনিয়নের বৈদেশিক নীতি

সম্প্রতি জওহারলাল নেহেরু (তাঁর আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞানবৃদ্ধিকে ধন্যবাদ) ও "জুনে" সোশ্যালিষ্ট (এখন Renegade) রামমনোহর লোহিয়া "National Herald" পত্রিকায় সোভিয়েট য়ুনিয়ন্-এর (তাঁদের মতে Russia অর্থাৎ Czarist Russia) বৈদেশিক নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে "রাশিয়া" এতদিন যাই হোক তবু শান্তিকামী ছিল, এখন ফিন্‌ল্যাণ্ডে সে যে-নীতি অনুসরণ করছে তা সাম্রাজ্যবাদী (Imperialism-এর definition তাঁরা দেন নি) রাষ্ট্রগুলির মতই। সেইজন্য এঁদের আঁতে ঘা লেগেছে এবং ব্যাথায় মুশড়ে পড়ে' দু'জনেই বিলাপ করেছেন। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "ফরোয়ার্ড ব্লক" পত্রিকায় খুব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় নেহেরুকে জবাব দিয়েছিলেন। শ্রীযুত নীরদ চৌধুরী—"Briefed for Stalin" নামক এক প্রবন্ধে হীরেন বাবুর প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তরের প্রত্যুত্তর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, এত অল্প space-এর মধ্যে তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। মোটামুটি কয়েকটি কথা বললেই আশা করি বোঝা যাবে।

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর বক্তব্যের সার মর্ম হ'ল (১) ফিন্‌ল্যাণ্ড ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্র বলে' "রাশিয়া" যদি সেখানে "People's Republic" প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা হ'লে জার্মানিকে বা জাপানকে এতদিন আক্রমণ করেনি কেন? (২) "রাশিয়ার" বৈদেশিক নীতির কোন পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নেই এবং "রাশিয়া" সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেছে; (৩) Strategic importance-এর দিক থেকে ফিনল্যাণ্ডের ঘাঁটির "রাশিয়ার" কোন আবশ্যকতা ছিল না। সব কথার উত্তর দেব না, বিশেষ করে' তৃতীয় মন্তব্যের, কারণ তা' নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা এর পূর্ব্বে করা হ'য়েছে। সাধারণভাবে উত্তর দেওয়াই উচিত, কারণ সমালোচক উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। নিজের Petty-bourgeois মনোভাব ও সংস্কার তো ছাড়তেই পারেন নি, তা ছাড়া যে-বিষয়ের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা আছে বা যে-বিষয়কে তাঁর 'taboo' বলে' মনে হয়, তাকে অন্তত এইরকম handle করা তাঁর উচিত হয়নি। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির উপর বা সর্ব্বভাষায় ব্যুৎপত্তির উপর শ্রদ্ধা থাকলেও এই জাতীয় "Professorial Philistinism" ক্ষমার্হ নয়।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের সংগ্রামের একটা বিশেষ রীতি (strategy) আছে, কোন বিশেষ Phase-এ তার পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু সাময়িক কৌশলের (Tactics) পরিবর্ত্তন হয়। ষ্টালিনের ভাষায় "Strategy is the determination of the direction of the *main* proletarian onslaught *in this or that phase* of the revolution" আর "Tactics is the determination of the line to be taken by the proletariat during *a comparatively short period of ebb or flow of the movement, of advance or retreat of the revolution*; tactics are thus parts of strategy and subordinating thereto" (*Italics* আমার)। এই হ'ল মার্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ট 'Strategy' ও 'Tactics'-এর সংজ্ঞা। এখন দেখা যাক্ সোভিয়েট য়ুনিয়নের 'Strategy' কি।

বিপ্লবের দুটী phase পার হয়ে গেছে। প্রথম phase ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় phase ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব পর্য্যন্ত; তৃতীয় phase অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত চলে' আসছে। প্রত্যেক phase-এর strategy ও tactics আছে এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথম দুই phase-এর পরিচয় পাওয়া যাবে। তৃতীয় phase, অর্থাৎ বর্ত্তমান phase-এর strategy কি? বর্ত্তমান phase-এর strategy হ'চ্ছে (Stalin-এর Leninism দ্রষ্টব্য):—

"**Aim**: The consolidation of the dictatorship of the proletariat in one country, where it could be used *as a fulcrum for the overthrow of imperialism in all countries*. This revolution transcends the limits of one country, and begins the *epoch of world*

Essential force: The dictatorship of the proletariat in one country and the revolutionary movement of the proletariat in all countries.

Chief Reserves: The semi-proletarian and petty-bourgeois masses in the highly developed countries, the nationalist movements in colonial and dependent lands.

Chief Line of Attack: Isolation of the petty-bourgeois democracy; isolation of the parties affiliated to Second International.

Plan for distribution of forces: Alliance between the proletarian revolution and the nationalist movements in colonial and dependent lands.

এই হ'ল third phase-এর strategy—এবং এই strategy-র কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, উদ্দেশ্য অর্থাৎ World Revolution সফল না হওয়া পর্যান্ত পরিবর্ত্তন হবেও না। Tactics-এর পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, হ'চ্ছে, ভবিষ্যতে হবে, কারণ tactics নির্ভর করে বিপ্লবের জোয়ার ভাঁটার উপর, পরিস্থিতির dialectical পরিবর্ত্তনের উপর। Seeond Internationalist-দের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য য়ুরোপে ফ্যাশিজম্-এর অভ্যুদয় যখন হ'ল তখন সোভিয়েট য়ুনিয়ন এমন শক্তিশালী নয়, বা পৃথিবীর বিপ্লবী শ্রমজীবীশ্রেণীও এতদূর অগ্রসর হয়নি যে ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা সম্ভব। অর্থাৎ তখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভাঁটার সময়। সেইজন্য সোভিয়েট য়ুনিয়নের tactics হ'ল একটি দেশে অর্থাৎ সোভিয়েট য়ুনিয়নে সোশ্যালিজম্‌কে শক্তিশালী করে' প্রতিষ্ঠিত করা এবং বুর্জ্জোয়া ডেমক্রাসী, পেটী-বুর্জ্জোয়া প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত ফ্যাশিজম্ বিরোধী শক্তির জন্য 'United Front' গঠন করা। ডিমিট্রফ্ United Front-এর আবেদন এই সময়েই করেন। এই 'United Front' গঠনের জন্য সোভিয়েট য়ুনিয়ন্ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু বুর্জ্জোয়া ডেমক্রাসী-গুলির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সফল হয়নি। এদিকে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে যার ফলে যুদ্ধ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, এ্যালবেনিয়া, ডানজিগের ভিতর দিয়ে এই পরিস্থিতির crisis এল পোল্যাণ্ডে। 'United Front'-এর tactic কার্য্যকরী হ'ল না, অতএব "Kremlinian"রা dialectical বিচার-বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতির বিচার করে' দেখলেন যে চুপ করে' বসে' থাকা সম্ভব নয়, বিপদ এসে গিয়েছে, জার্ম্মান শত্রু ঘরের দরজায়, সুতরাং "Soviet-German Non-Aggression Pact" হ'ল। তারপর যুদ্ধ ঘোষিত হ'ল, পরিস্থিতির আবার পরিবর্ত্তন হ'ল—"the devil is there"—তাই পূর্ব্ব-পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানিকে বাধা দিয়ে Ukrainian ও Byelo-Russian-দের মুক্ত করে' 'Soviet-Republic' প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল। চারিদিকে সব পথ পরিষ্কার—দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রয়েছে Black Sea—তুরস্ককে আহ্বান করা হ'ল যুদ্ধ জাহাজের পথ বন্ধ করবার জন্য,

কিন্তু তুরস্ক নিজের নিরাপত্তা জলাঞ্জলি দিয়ে অসম্মত হ'ল। উত্তর দিকে ফিনল্যাণ্ড রয়েছে, ফিনল্যাণ্ডে Interventionist Army-র পায়ের চিহ্ন আজও রয়েছে, সুতরাং সেখানে কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলি রাজী হ'ল, কারণ যুদ্ধে না জড়িত হবার স্বার্থ তাদেরই, ফিনল্যাণ্ড রাজী হ'ল না। কেলিং-ম্যানারহাইম্‌-ট্যানার গোষ্ঠী যাঁদের হাতের ক্রীড়নক সেই সব "leading-string"-এর টান পড়তেই এঁরা নাচতে সুরু করলেন। অথচ ফিনিশ জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না, কোন দেশের জনসাধারণই চায় না, সুতরাং সোভিয়েট য়্যুনিয়ন নিজের আত্মরক্ষার ও কর্ত্তব্যের তাগিদে Red Armyকে marching order না দিয়ে পারল না। ফিনল্যাণ্ড ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্র বলে' সোভিয়েট য়্যুনিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, ফিনল্যাণ্ডের জনসাধারণ বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করতে চায় বলে' এবং সোভিয়েটের আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে বলে' এই tactics এবং এই সংগ্রাম।

আশকরি নীরদবাবু এইভাবে সোভিয়েট্‌ য়্যুনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিচার করবেন, অবশ্য যদি তাকে "Russia" না মনে করে, "U. S. S. R." মনে করেন।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের স্বরূপ—

আমরা এর আগে বলেছি যে ফিন্‌দের (ফিনিশ্‌ শাসকগোষ্ঠীর) তরফ থেকে ইস্তাহার প্রকাশ করা হ'চ্ছে, কিন্তু লাল ফৌজের তরফ থেকে কোন সংবাদ না পাওয়ার দরুণ যুদ্ধের স্বরূপ কি বোঝা যাচ্ছে না। তেরিজোকিতে যে Finnish People's Government প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, নিকোলাই ভিরতা নামক সেখানকার একজন Red Army-র বিশেষ সংবাদদাতা ৫ই ডিসেম্বর তারিখে লিখেছেন: "তিনদিন যাবৎ আমি লাল ফৌজের গতিবিধি লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি দলে দলে তারা মহা উল্লাসে ফিনিশ জনসাধারণের সাহায্যের জন্য অভিযান করছে। কোথাও তাদের নিজেদের মধ্যে এতটুকু বিবাদ বা মনোমালিন্য নেই। ...

"Finnish People's Army-র First Corps-এর সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করব স্থির করলাম। দেখলাম একদল ফিনিশ গণবাহিনী অভিযান করেছে। ফিকে সবুজ রঙের কোট গায়ে, কলারে ত্রিভুজাকারের ব্যাজ্‌, মাথায় কানঢাকা ফারের টুপি। সেনাপতি আমাকে বললেন 'এই গণবাহিনী কেবলমাত্র একটা অংশ, আমরা শুধু বেরিয়েছি আমাদের সৈনিকদের আশ্রয় স্থান ঠিক করতে।'

"জোসেফ্‌ কাট্রালা নামক একটি সৈনিক হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে আমাকে বলল, 'আমরা ঠিকমত একবার গুছিয়ে নিতে পারলে হয়, তা হ'লে আমরা একবার ম্যানারহাইম্‌কে দেখিয়ে দেব তাঁর হোয়াইট্‌ গার্ডদের চাইতে সত্যকার ফিন্‌বাসী কত ভাল যুদ্ধ করতে পারে।"

এই হ'ল ফিনিশ যুদ্ধের স্বরূপ।

বল্‌কান আঁতাৎ—

সম্প্রতি বেল্‌গ্রেডে বল্‌কান আঁতাৎ-এর এক বৈঠক হ'য়ে গেল। সারাজোগ্‌লু, গ্যাফেনকু, মার্কোভিচ্, মেটাক্সাস্—এঁরা সকলে বৈঠকে যোগদান করে' বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির একতার ভিত্তিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে' এলেন। কিন্তু একতাই বা কতটুকু সম্ভব এবং যুদ্ধে না লিপ্ত হবার যে প্রধান উদ্দেশ্য তাই বা কতখানি সফল হ'তে পারে? আমরা জানি ডাঃ বেনেস্ Little Entente-এর স্তুতি গেয়েছিলেন এবং বল্‌কান্ আঁতাৎ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে মধ্য য়ুরোপে Little Entente-এর যে উদ্দেশ্য, দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে Balkan Entente-এর সেই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রভাবমুক্ত হওয়া এবং নিজেদের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করা বল্‌কান্ আঁতাৎ-এর লক্ষ্য। লক্ষ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্ম্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আজ বেনেসের সেই আশা পূরণ করছে, এবং দুঃখের বিষয় হ'লেও বল্‌কান আঁতাৎ-ও যে ফুরহের বা ডুচের কবলে গিয়ে সেই পথই অনুসরণ করবে তা খানিকটা বোঝা যায়। বল্‌কানে সংখ্যালঘু সমস্যা জটিল সমস্যা। ইতিমধ্যে সারাজোগলু রুমানিয়াকে তাগিদ দিচ্ছেন দাব্রুজা ও ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়াকে local autonomy দিতে। রুমানিয়া তার পরিবর্ত্তে যা দাবী করেছে তাও মেটান সম্ভব নয়। তারপর এখন আলবেনিয়া ইতালীর আয়ত্তে, অতএব গ্রীসের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে এবং ইতালী মনে করলে যে যুগোশ্লাভিয়ার উপর চাপ দিতে পারে না তা নয়। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী সারাজোগ্‌লুর কল্পনামত হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া যদি তাদের সীমান্ত রদবদলের প্রস্তাব এখন মুলতুবী রাখে, তা হ'লেও সারাজোগ্‌লু যেন মনে না করেন যে বল্‌কানে তাঁদের কর্ত্তৃত্বে এই Bloc গঠন ইতালীর খুব সুনজরে আছে। কিছুদিন আগে ফ্যাশিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের পর কাউণ্ট্ সিয়ানো ও সিনর গেয়ড়া স্পষ্ট বলে' দিয়েছেন যে বল্‌কানের নিরাপত্তা তাঁদের কাম্য হ'লেও, সেখানে কারও নেতৃত্বে বা প্রভাবে ব্লক গঠন ইতালী বরদাস্ত করবেনা। সেইজন্যই বল্‌কান বৈঠক সম্বন্ধে ফ্রান্সের "লা পপুলের" পত্রিকা বিদ্রূপ করে লিখেছে যে বল্‌কানে যুদ্ধ হবে না যদি ইতালী যুদ্ধ না চায়। এ কথা সত্য। ইতালী যুদ্ধ চায় কি না চায় তা ভবিষ্যতেই বোঝা যাবে। তবে আল্‌বানিয়া ও স্পেনের দৃষ্টান্ত দেখলে মনে হয় যে জার্ম্মানি যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রবেশ করে তা হ'লে ইতালী তার বর্ত্তমানের বোল্‌শেভিজম্-বিরোধীতার আশাকে শেলফবন্দী করে' হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঐতিহাসিক দাবী পূরণ করবার চেষ্টা করবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০, কলিকাতা।

পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজ পদ্ধতির উত্থান ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

(জাতি-তত্ত্ব)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্ব্ব ইউরোপের বেশীর ভাগ লোক শ্লাভভাষী; ইহা আর্য্য ভাষার সাতেম বিভাগীয় অংশ। এই শ্লাভ ভাষা আবার বিভিন্ন উপভাষায় বিভক্ত; যথা:—বড় রুষ, ছোট রুষ, শ্বেত রুষ, পোল, চেক, সার্ভিয়, বুলগেরীয় প্রভৃতি। এতৎব্যতীত উত্তরে উগ্রো-ফিনিয়, এস্তোনীয় প্রভৃতি মঙ্গোলীয় মূল জাতীয় লোকদের ভাষা বিদ্যমান আছে; আবার, বস্কির, কাজান তাতার, ক্রিমতাতার, কালমুক প্রভৃতি তুর্ক-তাতার জাতীয় লোকদের ভাষাও প্রচলিত আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে শ্লাভভাষীয় কৌমগুলি এই ভূখণ্ডে ছিল না। সর্ব্বপ্রথম প্রাগৈতিহাসিক চিহ্ন "কুরগান" (Kurgan) নামক স্তূপে প্রকাশ পায়। এই স্তূপগুলি বর্ত্তমানের ইউরোপীয় রুষ ও সাইবিরিয়ার পশ্চিম দিকে পাওয়া যায়। পশ্চিম সাইবিরিয়ার কুরগান মধ্যে যে সব নরকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেগুলির করোটী গোলাকৃতি (Brachycephol) লক্ষণাক্রান্ত[১]। ইউরোপীয় রুষের কুরগানগুলি বিভিন্ন যুগের, ইহা ভিন্ন ভিন্ন মূল জাতীয় লোকদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন কুরগানগুলি প্রস্তর যুগে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়, তন্মধ্যে প্রাপ্ত করোটীগুলি লম্বাকৃতি (dolichocephal) বিশিষ্ট; বাকীগুলি গোলাকৃতিবিশিষ্ট[২]। এই করোটীগুলি কোন জাতীয় লোকদের ছিল তাহা নিয়া নানা তর্ক বিতর্ক আছে।

গ্রীক ইতিহাস হইতে এই তথ্য জানা যায় যে, বর্ত্তমান রুষের দক্ষিণ ভাগে শকেরা বাস করিত; ইহার পর কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গ্রীকেরা উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে সারমাতীয় জাতি এশিয়া হইতে আসিয়া এইস্থানে বসবাস করে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস কর্ত্তৃক গ্রীক ভাষায় রক্ষিত শক ভাষার নমুনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে শকেরা ইরাণীয় ভাষী ছিল। সিথীয়দের কুরগান হইতে আবিষ্কৃত করোটীগুলি বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত করোটী প্রাপ্ত হওয়া যায়; কতকগুলি মঙ্গোলীয়, কতকগুলি ইউরোপীয় লক্ষণাক্রান্ত[৩]।

১। Zaborowski-"Kourganes de la Siberia Occidentali—Bulletinsdela Soc D'anthropologie DeParis Tone Neuvie'ne (IVe Serio) 1898.

২। Zabrowski "D" cranes de Kurgans Bulletins et Mewoires dela Soc D'anthropologie s'evix V 1900.

৩। Minns—"Scythians and Greeks" Po 45-47; মধ্য এশিয়ার ইউচিরাও মঙ্গোলীয় ও ককেশীয় লক্ষণের মিশ্রণ ছিল।

খৃষ্টের জন্মের সমসাময়িক কালে এশিয়া হইতে সারমেটিয়, আলাম, রক্সানাস প্রভৃতি জাতি আসিয়া শকদের স্থানে বাস করে। অনুমান হয়, ইহারাও ইরাণীয় মূল জাতীয় লোক ছিল[৪]। এই স্থলের ইরাণীয়েরা ক্রমাগত বিভিন্ন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইলেও আজ পর্য্যন্ত বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই, ককেসস প্রদেশে তাহারা আজ "অসেট" (Ossets) নামে পরিচিত হইয়া বাস করিতেছে। ইহারা নিজেদের "ইরণ" বলে।

ইহার পর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে জার্ম্মান জাতীয় গথেরা উত্তর হইতে আসিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরে পুরাতন বাসিন্দাদের স্থানে বসবাস করে; কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে এশিয়া হইতে আগত হূনদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহারা পশ্চিম ইউরোপে অভিযান করে। হূনদের আক্রমণের সঙ্গে এশিয়া হইতে ক্রমাগত অভিযান আসিয়া রুষকে প্লাবিত করে এবং কৌম বিশেষের অভিযান পশ্চিম ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। হূনদের পর আভার, তাহাদের পর যথাক্রমে উগ্রীয় (বর্ত্তমানের হুঙ্গেরীয় "মজার"), খাজার, পেটচিনেক, মঙ্গোল, তুর্ক-তাতার প্রভৃতি এশীয় জাতিগুলি রুষে আধিপত্য বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে এটিলার অধীন হূনদের পর জঙ্গিস খাঁর মঙ্গোলদের আক্রমণ ইউরোপকে বিশেষভাবে কম্পিত করে। মঙ্গোলেরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অর্দ্ধ ইউরোপ জয় করে এবং রুষকে দুই শতাব্দী পদানত করিয়া রাখে।

ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকের কার্পাথীয় পর্ব্বতমালার উত্তর ভাগ হইতে শ্লাভ মূল জাতীয় কৌমগুলি পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানের পোলাণ্ড ও রুষ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। যে সব শ্লাভ-কৌম দক্ষিণে বল্কান উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদের সার্ভ বলে, যাহারা পশ্চিমে যায় তাহাদের চেক, মোরেভিয়, পোল বলে এবং পূর্ব্বে যাহারা যায় তাহারা বিভিন্ন রুষীয় কৌমে পরিণত হয়। এই রুষীয় শ্লাভেরা যখন নিপার (Dnieper) নদীর মুখাভিমুখে অগ্রসর হইয়া উত্তরে উপনীত হয়; তখন তাহারা মঙ্গোলীয়-মূল জাতি, উগ্রীয় ফিনজাতি, খাজার জাতি এবং আর্য্যভাষী লিথুনীয় জাতির সংস্পর্শে আসে।

ফিনেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্ত্তমান রুষ দেশের উত্তরভাগে বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা উগ্রীয় (Ugric) ভাষার অন্তর্গত—ইহা এশিয়ার মঙ্গোলীয়-মূল জাতীয় একটি ভাষা। এই ফিনেরাই রুষের উত্তর ও মধ্যস্থলের কুরগান নির্ম্মাতাদের বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়[৫]। কালে মস্কো প্রদেশের উত্তরের রুষস্থিত ফিনেরা বড় রুষ কৌম দ্বারা বিজিত হইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া যায়। মস্তকের গঠনের বিষয়ে তাহারা লম্বা ও গোল উভয় লক্ষণাকৃত। ফিনদের মধ্যে উজ্জ্বল শ্বেত (blond) বর্ণ, লাল চুল ও নীল চক্ষু তারা লক্ষণবিশিষ্ট লোকের বিশেষ সংখ্যাধিক্য আছে। ইহাদের দেখিলে উত্তর ইউরোপীয় Nordic লক্ষণাক্রান্ত মনে হয়। কিন্তু কেহ কেহ

৪। Platonov—History of Russia P. 5.
৫। Zabrawski—"Kourganes de la Sibini Occidentale" pp 104—105.

এই লক্ষণাক্রান্ত ফিনদের Nordic রক্ত-মিশ্রিত বলিয়া সন্দেহ করেন; আবার আজকাল কেহ কেহ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, গোল মাথা, বিশিষ্ট গণ্ড অস্থিযুক্ত (high cheek-bones) লোকদের East Baltic[১] জাতি বলিয়া অন্যান্য মূল জাতি হইতে পৃথক করিয়া গণ্য করিতেছেন। উত্তর রুষের মঙ্গোলীয় মূল জাতীয় লোকদের উত্তর ইউরোপের টিউটনিক অর্থাৎ নর্ডিক জাতির ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া অনেকে গবেষণা ও সন্দেহের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু উত্তর রুষের ও সাইবেরিয়ার কতকগুলি মঙ্গোলীয় মূল জাতীয় কৌমদের মধ্যে blond লক্ষণের অভাব নাই[২]।

৩। পূর্ব্ব ইউরোপের প্রধান অধিবাসী হইতেছে শ্লাভজাতি[৩]। ইহারা প্রধানতঃ গোল মাথা ও মধ্যমাকৃতি নাসিকা বিশিষ্ট।[৪]

শ্লাভজাতির বাহিরে থাকে মঙ্গোলীয় কৌম সকল। তাহারা শারীরিক গঠন বিষয়ে মঙ্গোলীয় মূলজাতীয় লক্ষণাক্রান্ত; তবে উত্তরের অষ্টিয়াক (Ostiak) ও ভোগোল (Vogul) জাতিদ্বয় লম্বা মাথা ও মধ্যমাকৃতি নাসিকা বিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে অষ্টিয়াকেরা মঙ্গোলীয় মূল-জাতীয় বলিয়া আজকাল গণ্য হয় না। তাহাদের উৎপত্তি গ্রীনলাণ্ডের এস্কিমোদের ন্যায় কুহেলিকাপূর্ণ হইয়া আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহারা প্রস্তরযুগের ইউরোপীয় জাতি যাহারা, Glacial period-এর অবসানের পর, বরফের স্রোত কমার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাদি অনুসন্ধান করিতে করিতে আর্টিক সমুদ্রের কূলে আসিয়াছে।

সর্ব্বশেষে থাকে লিথুনীয় ও লেটজাতিদ্বয়। ইহারা বিগত মহাযুদ্ধের পর পোলাণ্ড ও ফিনলাণ্ডের ন্যায় রুষ-সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করে। এই দুই জাতি বস্তুত একটি জাতিরই দুইটি কৌমমাত্র; একই ভাষাপ্রসূত দুইটি উপভাষা দ্বারা লিথুনীয় ও লেট কৌমদ্বয় পৃথকীকৃত হইয়াছে। লিথুনীয় ভাষায় অনেক শব্দের সহিত সংস্কৃতের মিল আছে[৫], এই ভাষাতে অনেক শব্দ আছে যাহা সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন আর্য্য-ভাষার রূপ রক্ষা করিয়াছে। এই জন্যই কেহ কেহ লিথুনীয়দের আর্য্যজাতির প্রাচীনতম কৌম বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন; আর এই জন্য কেহ বা

১। R. R. Gates—"Heredity in Man" pp 303—304.

২। Iocholson—"Peoples of Asiatic Russia" 1928; Sicksted—"Rassen Kunde und Rassen gechiesto" p 215—217.

৩ প্রাচীনকালে শ্লাভজাতি মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির মধ্যে বাস করিয়া নিরীহ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিল। টিউটন বা জার্ম্মানেরা তাহাদের ধরিয়া গোলামরূপে বিক্রয় করিত; সেই জন্য লাটিন Sclava হইতে জার্ম্মান Sclave ফরাসী Slave, ইংরাজী Slav নামটির উৎপত্তি হইয়াছে।

৪। L. Niederle—"La Race Slave" p 49-1916.

৫। আমার কোন জার্ম্মান মিশনারীবন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আসেন, তখন তিনি ইংরেজী আদৌ জানিতেন না; তজ্জন্য ইংরেজী ভাষার বিনা সহায়তায় হিন্দি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব প্রুসিয়ার লিথুনীয়-ভাষী বলিয়া, হিন্দি ভাষা শিক্ষা তাঁহার কাছে সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই শিক্ষায় লিথুনীয় ভাষা তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছিল।

বাল্টিক-সমুদ্রের কূলেই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া অনুমান করেন[১]। লিথুনীয় ও লেটদের ভাষা ইণ্ডোইউরোপীয় বা আর্য্য-ভাষার সাতেম শাখার অন্তর্গত কিন্তু শ্লাভ ভাষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। শারীরিক আকৃতি বিষয়ে লিথুনীয়েরা গোল মাথা এবং সরু ও মধ্যমাকৃতি উভয় প্রকারের নাসিকা বিশিষ্ট, আর লেটেরা সরু নাক বিশিষ্ট।

শ্লাভজাতি গঠন

শ্লাভজাতি পূর্ব্ব ইউরোপে অর্থাৎ আজ যাহাকে রুষ-সাম্রাজ্য বলে সেই স্থলে আসিবার পর, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহাদের আইনগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এইগুলি একত্রিত ভাবে শ্লাভদের জীবন গঠিত করে।

শ্লাভেরা যখন কারপেথীয় পর্ব্বতোপরি বাস করিত, তখন কুলগত (clan) সঙ্ঘবদ্ধতা তাহাদের সমাজের ভিত্তির একক (unit) ছিল।[২] এই পদ্ধতি দ্বারা তাহারা কৌমগত রাজা (tsarki) ও কুলের জ্যেষ্ঠদের (philarchi) দ্বারা শাসিত হইত; ইহারা জ্যেষ্ঠদের কাউন্সিলে ও কৌমের পার্লামেণ্টে (victcha) সাধারণীয় কর্ম্মের আলোচনা করিত। এই সময়ে মতের অমিলন অনৈক ও ব্যক্তিগত কলহ (feud) বা "বদলী"-প্রথা বিদ্যমান ছিল। অনুমান হয়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা কুল-প্রথা হইতে কৌম-প্রথায় বিবর্ত্তিত হইতেছিল। প্রবাদ আছে, এই সময়ে শ্লাভদের বিভিন্ন কুল ও কৌমের যোদ্ধা নিয়ে একটা সামরিক সংঘ স্থাপিত হয়। কখনও কোথাও অভিযান কালে এই সংঘের প্রয়োজন হইত। এই সংঘের উপরে "ড়ুলেব" নামক জাতিটি প্রভুত্ব করিত। আরব ঐতিহাসিক মাসুদি বলেন, এই সংঘ ভাঙ্গিয়া গেলে, পূর্ব্ব-বিভাগের শ্লাভেরা এক এক জন স্বাধীন রাজা বা সর্দ্দারের অধীনে কতকগুলি কৌমের মিশ্রিত সমষ্টিতে পরিণত হয়। এতদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে শ্লাভদের বর্ত্তমান রুষ খণ্ডে বাস করিবার কালে কুল-গত পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল। রুষ-প্রাচীন ইতিহাস Poviest-এ এই বিষয়ে ব্যক্ত হইয়াছে, "Each man lived with his own clan, in his own place and ruled there his clan." (প্রত্যেক লোক নিজের কুলের সহিত বাস করিত, নিজের স্থানে থাকিত এবং সেখানে তাহার কুলকে শাসন করিত)। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, একটি কুলের সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া বাস করিত এবং অন্য কুলের আস্তানায় যাইত না। এই কুলগুলি রক্ত-সম্পর্কীয় বংশ সমূহের সমষ্টি—যাহা একত্রে বাস করিত, সম্পত্তির সমান মালিক ছিল এবং কুলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি শাসন করিত—পরে, যখন ঔপনিবেশিকেরা বিস্তৃত সমতল ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারা নিপার ও ডন নদীদ্বয়ের কিনারা ধরিয়া জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে বাস করিতে থাকে। আর এই জঙ্গলা ভূমির সর্ব্বদক্ষিণেই কিয়েভ সহর স্থাপিত হয়। ইহা

১ Much—"Dio Heimat der Indo-Germanen im Lichte ders urgehclicht lich Fuschung 1901.

২ V. O. Kluchevsky—"A History of Russia." Vol. I. P. 39,

পূর্ব্ব-শ্লাভ সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্র হইয়াছিল। এই জলা ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে ঔপনিবেশিকেরা শুষ্ক জমি আবিষ্কার করিয়া তথায় এক একজন পৃথকভাবে বাসস্থল নির্ম্মাণ করিত; এই বাসস্থলের চারিদিকে তাহারা মাটির প্রাকার দ্বারা গড়বন্দি তৈয়ার করিত এবং তাহার চারিদিকের জমি পরিষ্কার করিয়া পশু পালন, কৃষিকর্ম্ম ও মৃগয়া স্থল করিত।

এই ঔপনিবেশিক প্রসারের গতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদিকের শ্লাভদের কুলগত সংঘবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়। কুলের সংঘবদ্ধতা দুইটী ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। (১) কুলের বয়োজ্যেষ্ঠের কর্ত্তৃত্ব, (২) কুলের সম্পত্তির অবিভাজ্যতা। এইগুলি আবার, কুলগত ধর্ম্ম বা পিতৃপুরুষের পূজা—(ancester worship) পদ্ধতি দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইত।[২] কিন্তু কুলের লোকেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, কুলবয়োজ্যেষ্ঠের প্রভাব নষ্ট হয়। সেই জন্য তাহার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর (family) বয়োজ্যেষ্ঠ সেই স্থলাভিষিক্ত হয়। এই সঙ্গে জঙ্গলের প্রকৃতি ও কৃষিগত শ্রমশিল্প নিপার নদীর প্রাকৃতিক লক্ষণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া অবিভাজ্য কুলগত সম্পত্তির ধারণা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার কারণ, পৃথক পৃথক গোলাবাড়ীগুলি দ্বারাই জঙ্গল পরিষ্কৃত ও চাষোপযোগী হয়। কাজেকাজেই, এই কৃষি-উপযোগী জমি সকল ক্রমে এক এক গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতে থাকে। রুষ পুরাবৃত্তে ইহার এরূপ নজীর পাওয়া যায়, যেখানে কুলগত অধিকারের কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। বরং সমাজের বিবর্ত্তনের পরের স্তরে আমরা প্রাচীন রুশীয় Dvor পদ্ধতি—যাহা একজন লোক, তাহার স্ত্রী, সন্তানাদি ও নিকট আত্মীয়দের নিয়া গঠিত, দেখিতে পাই। এই পদ্ধতিতে কুল ও আজকালকার কেবলমাত্র স্ত্রী পুরুষের সংসার নিয়ে গোষ্ঠির (simple family) মধ্যবর্ত্তী ধাপ যাহা রোমীয় familiaর সহিত মিলে, তাহারই বিবর্ত্তন হয়।

এই সময়কার পূর্ব্বদিকের শ্লাভেরা নিপারের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করায় ব্যবসায়ী জাতি হইয়া উঠে। দক্ষিণবাহিনী নদীসকল দিয়া তাহারা কৃষ্ণ সমুদ্রের কূলসমূহ, কনষ্টান্টিনোপল, এমন কি রোমেও বাণিজ্যাদি করিতে থাকে। এই সময়ে তুর্কি জাতীয় খাজার বা চোজার (Khazar or Chozar) কৌম এসিয়া হইতে অভিযান করিয়া রুষে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু তাহারা নূতন স্থানে শীঘ্রই যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণ জীবিকা গ্রহণ করে। তাহারা বহু সহর নির্ম্মাণ করে; অষ্টম শতাব্দীতে সেখানে অনেক ইহুদি ও আরব ব্যবসায়ী বাস করিতে

১ ইউরোপের ইহুদি জাতির একাংশ "তাতার" নরতাত্ত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করে। বিশেষতঃ রুষের ইহুদিদের মধ্যেকার একাংশ এই তুর্ক তাতার জাতীয় খাজারদের বংশধর। ইতিহাস বলে খাজারদের ইহুদি ধর্ম্ম গ্রহণ করায় খৃষ্টীয় সমাজ উদ্বিগ্ন হয়, কনষ্টান্টিনোপলের Patriarch তাহার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করে। কোন কোন ইংরেজ লেখকের মতে মধ্য-এশিয়ার এই খাজারেরা হূনদের সঙ্গে ভারতে আসিয়া হিন্দু "গুজার" বা "গুর্জ্জর" জাতিতে পরিণত হইয়াছে (Vincent Smith দ্রষ্টব্য); কিন্তু ভারতীয় গুজারেরা মধ্য-এসিয় তুর্কি জাতীয় নরতাত্ত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করে না (Risly দ্রষ্টব্য)।

২ V. O. Kluchevsky—"A History of Russia Vol. I. P, 43.

থাকে। ইহুদিরা এইস্থলে এত প্রভাবশালী হয় যে, খাজার খাঁ (রাজা) ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইহুদি ধর্ম্ম গ্রহণ করে।[১] এই খাজাদের করাধীন হইয়া রুষীয় শ্লাভেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি সাধন করে। বাণিজ্যের এই উন্নতির সঙ্গে রুষে প্রাচীন ব্যবসায়ী সহরগুলি গঠিত হয়।

এই সময়ের প্রাচীন রুষীয় পুরাবৃত্তে ধর্ম্ম বিষয়ে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে ইহা জানা যায় যে তাহাদের দুই প্রকারের ধর্ম্মপদ্ধতি ছিল।[২] প্রথমটি প্রকৃতি উপাসনা-প্রসূত; আকাশকে তাহারা "সরগ" (Svarogবা সংস্কৃত স্বর্গ!), বজ্র ও বিদ্যুৎকে পেরান বা পেরুন (Perun-বৈদি কপর্থম্য(!)) বলিয়া উপাসনা করিত। গ্রীক অলিম্পিয় দেবতাদের ন্যায়, রুষীয় দেবতাদের স্তর-ভেদ ছিল। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইতেছে পূর্ব্বপুরুষের উপাসনা; এইটিই লোকের মনে বেশী গ্রথিত হইয়াছিল। এই উপাসনার লক্ষ্য ছিল, পিতামহ ও তাহার পত্নীগণ। ইহারা তাহাদের কুলের রক্ষক বলিয়া গণ্য হইত। পরে, কুল-সংঘবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া গেলে, পিতামহ—যিনি চুর (Tchur) রূপে পূজিত হতেন তিনি ব্যক্তিগত গোষ্ঠির রক্ষকরূপে (Diediushka domovoi—dear grandfather of the home) পূজিত হইতে লাগিলেন।

যখন কুলপদ্ধতির আইনগত বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায় তখন বিবাহ বন্ধন দ্বারা কুলগুলি সম্পর্ক রাখিবার চেষ্টা হয়। পুরাবৃত্তে এই গতির বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে বলাৎকার দ্বারা বিবাহ (Marriage by Rape)। কুলের ঔপনিবেশিকদের বিবাহোপ-যোগী যুবকদের জন্য বধূ পাওয়া শক্ত ছিল; কারণ বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় ভাবী স্ত্রী পাওয়া মুস্কিল হইত এবং অন্য কুলের লোকেরা স্বেচ্ছায় বা বৃথায় কন্যাদান করিত না। এই জন্য কাড়িয়া লইবার প্রথা উদ্ভূত হয়। এই কাড়িয়া নিবার ফলে উভয় পক্ষে যে বিবাদ দেখা দিত তাহা মিটাইবার জন্য অপহৃত বালিকার আত্মীয়েরা একটা খেসারত পাইতেন। এই প্রথাকে ভিনো (Vieno) বলিত; কালে ইহা উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়া কনের আত্মীয়দের দ্বারা বরের কাছে সোজাসুজি বেচে-ফেলা হইত। এতদ্বারা, পূর্ব্বোক্ত বলপূর্ব্বক বিবাহ করার বদলে বর ক'নের বাড়ী গিয়া তাহাকে বাপের বাড়ী হইতে আনিবার জন্য খেসারত স্বরূপ টাকা দিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিত। আবার, "পোলিয়ানী" নামক কৌমের পুরাবৃত্ত বলে, সন্ধ্যাবেলায় কনেকে বরের বাড়ী পাঠান হইত, পরদিন সকালে তাহাকে যাহা দিবার তাহা দেওয়া হইত। এতদ্বারা আমরা বলাৎকার দ্বারা বিবাহের পরিবর্ত্তে "পণ্য" ও "যৌতুক" (Dowry)—এই উভয় প্রথার উদ্ভব হইতে দেখি। এই-সব উপায়ে কুলগুলির গণ্ডীবদ্ধ ভাব ও বহিষ্করণ নীতি (Exclusiveness) ভাঙ্গিয়া মিশ্রিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কুলগুলি গণ্ডীবদ্ধ থাকিত, বাহিরের লোকেরা তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিত না, কন্যার অন্যকুলে বিবাহ হইলে তাহার পিতৃকুলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইত এবং এই বিবাহদ্বারা দুই কুলে সম্বন্ধ স্থাপিত হইতনা; কুলগুলি সম্পূর্ণ endogamous ছিল।

১। *V.O. Kluchevsky—A History of Russia. Vol. 1 P. 50

† " P. 43—45.

এক্ষণে নূতন প্রথার বিবাহদ্বারা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া (আত্মীয়তা) Kinship স্থাপিত হইতে থাকে। এতদ্বারা যে সব কুল পূর্ব্বে পৃথক ছিল তাহারা বিবাহ দ্বারা আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়।

শেষে আমরা দেখি, কনেকে এই যৌতুক দেওয়ার প্রথা হইতে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত পৃথক সম্পত্তি থাকার পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

ইউরোপের প্রাচ্যে শ্লাভদের উত্থান হইতেছে, আর্য্যভাষী জাতির ইতিহাসে শেষ আবির্ভাব। এই প্রাচীয় শ্লাভদের ধর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির কুলগত সভ্যতার প্রতিচ্ছবি দেখি; ইহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিতে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদের রীতির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। ভারতীয় আর্য্যদের অনেক রীতি ও পদ্ধতির উৎপত্তির তথ্য শ্লাভদের প্রাচীনকালের রীতির উৎপত্তির মধ্যে পওয়া যাইবে। তুলনামূলক অনুসন্ধান দ্বারা অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে।

রুশ রাষ্ট্রগঠন

নবম শতাব্দীতে খাজার সাম্রাজ্য এসিয়া হইতে আগত পেচেনেগ ও পরে উজি নামক জাতিদের আক্রমণে টলটলায়মান হয়। ইহার ফলে দক্ষিণের বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়, খাজার সাম্রাজ্যের আর শ্লাভ বণিকদের ব্যবসা রক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল না। বাধ্য হইয়া শ্লাভ ব্যবসায়ীদের নিজেদের সামরিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই, তাহাদের পূর্ব্বের বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি এক্ষণে সুরক্ষিত দুর্গরূপে পরিণত হয়, ব্যবসায়ীরা যোদ্ধায় বিবর্ত্তিত হয়।

একটি বিশিষ্ট কারণ দ্বারা সহরের এই শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণটি হইল পূর্ব্বীয় শ্লাভদের দেশে নবম শতাব্দীর প্রাক্কালে উত্তরের সুইডেন হইতে সশস্ত্র ভাইকিং নামক ডাকাইতদের অভিযান। এই সময়ে যে সব স্কাণ্ডানেভীয় জলদস্যুরা পশ্চিম ইউরোপে লুটতরাজ করিত তাহারা ডেন, নর্থমেন বলিয়া পরিচিত হইত, আর যাহারা পূর্ব্বে লুটের জন্য যাইত তাহাদের Varangian (ভ্যারাঙ্গীয়) বলিত। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ের জন্য অথবা শ্লাভ প্রিন্সরাই যাহারা ভারাঙ্গীয়দের কাছ হইতে সৈন্য ভাড়া করিয়া নিজেদের অভিযান প্রেরণ করিত; তাহাদের দ্বারা আহূত হইয়া ইহারা ক্রমাগত শ্লাভদের দেশে আসিত। এমন কি পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে ইহারা নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেক শ্লাভ ব্যবসায়ী সহরে এত অধিক পরিমাণে বাস করিতে থাকে যে তাহারা স্থানীয় বাসিন্দাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হইয়া একটা উপরের স্তরে পরিণত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে কিয়েভ সহর কেবল তাহারা নির্ম্মাণ করে নাই বরং--কনস্টান্টি-নোপলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করয়াছিল। এই সময়ে সর্ব্বত্র এই ভারাঙ্গীয়েরা রুষ (Rus) নামে অভিহিত হত। বিজান্টিনিয় ও আরবেরা তাহাদের এই নামে

*Kluchevsky—A History of Russia. Vol. I. P. 46-48

জানিত। শ্লাভ পুরাবৃত্ত "পোভিয়েষ্ট" (Poviest) উত্তর-ইউরোপের সমস্ত জার্ম্মান জাতিদের "ভারাঙ্গীয়" বলিয়া অভিহিত করিত। বিশেষতঃ সুইড, নরওয়ের লোক, এঙ্গেলস্ ও গথল্যাণ্ডের লোকদেরও এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। ভারাঙ্গীয়দের সহিত তাহাদের ডেন জ্ঞাতিদের এই পার্থক্য ছিল যে, শেষোক্তেরা কেবল লুণ্ঠতরাজ করিত, আর ভারাঙ্গীয়েরা যুদ্ধ ও বণিক-বৃত্তি এক সঙ্গে করিত। তাহারা বণিকরূপে বিজান্টিয় সাম্রাজ্যে যাইত, তথায় হয় সম্রাটের কাছে চাকুরী পাইত, না হয় ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইত—না হয় সুবিধা পাইলে গ্রীকদের মাল লুট করিত। ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কার্য্যে কোথাও যাইতে হইলে তাহারা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করিত।

এই প্রকারে ভারাঙ্গীয়েরা যখন রুষের বড় বড় বাণিজ্যের সহরে বাস করিতে লাগিল, তখন তাহারা তাহাদের মতনই একটি শ্রেণীর সংস্পর্শে আসে[১]—ইহা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত সশস্ত্র শ্লাভ ব্যবসায়ী শ্রেণী। ইহাদের সঙ্গে প্রথমোক্তেরা শনৈঃ শনৈঃ মিশ্রিত হয়। ভারাঙ্গীয়েরা বিভিন্ন শ্লাভ ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের অস্ত্রধারী রক্ষীরূপে ভাড়াটিয়া খাঁটিত।

এই প্রকারে রুষীয় সহরগুলিতে যেমন দেশীয় এবং ভারাঙ্গীয়দের মিশ্রিত একটা সশস্ত্র শ্রেণী সৃষ্টি হইতে লাগিল, সহরগুলিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুর্গে পরিণত হইতে লাগিল এবং তাহাদের সহিত আশপাশের লোকদের সম্পর্কও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে, খাজারদের শাসন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যে সব নগর তাহাদের করদ ছিল, সেই সব নগর নিজেদের তাঁবে ব্যবসায়ী স্থানসমূহ নিয়া উক্ত সুরক্ষিত দুর্গাধীন হইেত লাগিল। পূর্ব্বে আমরা পশ্চিম-ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক যুগে কথঞ্চিৎ এই প্রকারের বিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখিয়াছি, যখন ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা আত্মরক্ষার জন্য একটি সুরক্ষিত কেল্লার স্বামীর শাসনাধীন হয়। এই প্রকারে রুষে রাজনীতির প্রথম স্থানীয় রূপ ধারণ করিতে থাকে। এই সহর-প্রদেশগুলি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে গঠিত হইতে থাকে। এই প্রদেশগুলি তাহাদের রাজধানীর নামে পরিচিত হইতে থাকে; এই সহরগুলি কেবল নিজেদের তাঁবে প্রদেশের ব্যবসায়ের কেন্দ্র হয় নাই, বিপদের সময় এইগুলি সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হয়। তবে, এই বিবর্ত্তন কেবল সেই সব কৌমের মধ্যে সংঘটিত হয় যেগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়।

[ক্রমশঃ

১। Kluchevsky—A History of Russia Vol I. P 60

গ্রন্থ-পরিচয়

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—

অনিলচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্।

ঢাকা বক্সীবাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—৷৷০ আনা

ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের মধ্যে খুবই দেখা যাইতেছে। এটি যদি honest swadeshi—খাঁটি স্বদেশী জিনিষ হয়, অর্থাৎ শুধু পরানুবাদ পরানুকরণ না হয়, বুদ্ধির দ্বারা সব কিছুর ভাল মন্দ পরীক্ষা করিয়া লইবার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে এই বিদ্রোহের ভাব উঠে তাহা হইলে ভাবিত হইবার কিছুই নাই। সত্যকে অস্বীকার করিতে যাইয়াই আমরা তাহার সত্য পরিচয় লাভ করি—যাহা মিথ্যা তাহাই বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোকে ধ্বংস হয়। সত্য আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই মানবজীবনের মূল সত্য রহিয়াছে—যাহারা honestly ঐকান্তিকতার সহিত চিন্তা করিবেন, সন্ধান করিবেন, তাহারা বেশীদিন নাস্তিকতা বজায় রাখিতে পারিবেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ, তরুণ সমাজ যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে ভয় পায় না, অন্ধ ভাবে কোন জিনিষ স্বীকার করিয়া লইতে চায় না—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার সুন্দর পরিচয়। এই গ্রন্থখানি রচিত ও পঠিত হয় বন্দী-শিবিরে—অতএব যাহারা আজ দেশের কাজে অগ্রণী তাহাদের চিন্তাধারা কোন পথে পরিচালিত হইতেছে তাহা দেখিয়া আশা করা অসঙ্গত হয় না যে, ভারতে যে নব-সমাজ, নব-জীবন গঠনের সূত্রপাত হইতেছে তাহাতে অন্ততঃ বাংলার যুবশক্তি পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

মানবসমাজ এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে দুঃখ ও কষ্টের অন্ত নাই—মানবাত্মার অপমান ও দুর্দ্দশা যেন চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। যাহারা প্রকৃত দরদী তাহারা বুঝিতেছেন যে, একটু আধটু সংস্কার বা পরিবর্ত্তনে আর কোন ফল হইবে না—চাই আমূল পরিবর্ত্তন, নব সৃষ্টির জন্য চাই নির্ম্মম ধ্বংস—তাই আজ তাঁহারা সকলেই মনে প্রাণে বিপ্লবী, revolutionary হইয়া উঠিয়াছেন। এই ভাবে বিপ্লবের জীবন্ত দৃষ্টান্ত জগৎবাসীর চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছে—সোভিয়েট রুশিয়া। তাই আজ বিপ্লবীরা সহজেই সেইদিকে আকৃষ্ট হন—আর সোভিয়েট রুশিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া অনেকে ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। ধর্ম্মের মূলে কোন সত্য আছে কি না তাহা তলাইয়া দেখিবার ধৈর্য্য তাহাদের নাই। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মের মূলে যদি সত্য থাকে—তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ায় আজ যে নব-সমাজ গঠনের পরীক্ষা হইতেছে তাহার

ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী, বিপ্লব সেখানে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। অতএব যাহারা বিপ্লবের সাফল্যবান—তাহাদিগকে এই প্রশ্নটা তলাইয়া দেখিতেই হইবে—অনিলচন্দ্র আলোচা গ্রন্থখানিতে সেই আহ্বানই করিয়াছেন।

মার্ক্সের মতবাদ যে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তাহা উড়িয়া গিয়াছে—একথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নব্য বিজ্ঞানের কোন্ আবিষ্কার, কোন্ চিন্তা-ধারার দ্বারা মার্কসবাদের ভিত্তি ধ্বসিয়া গেল, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ দূর হইয়া গেল—তাহার পরিচয় সকলে পান নাই। অনিলচন্দ্র যেরূপ সহজ ভাবে এবং সংক্ষেপে সেই পরিচয় দিয়াছেন—এমনটি আমরা আর ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই।

বইখানির প্রকাশ ভঙ্গী ও ভাষাতেও বৈশিষ্ট্য আছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে—যে-সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে—সে-সব প্রকাশ করিবার মত শক্তি এখনও বাংলা ভাষায় হয় নাই—সে জন্য অনেক পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হইবে, রচনা-প্রণালীর অনেক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সে-দিক দিয়া এই বইখানি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে এমন অনেক নূতন পারিভাষিক কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

অনিলবরণ রায়

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম—পণ্ডিচারী

ভারতের ও অন্যান্য

কলিকাতা, ঢাকা,
মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ,
দিল্লী, লাহোর,
বোম্বাই ইত্যাদি

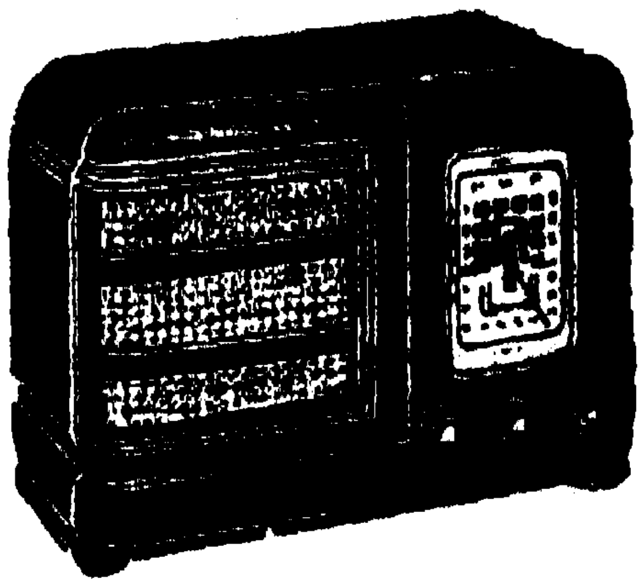

লণ্ডন, জার্ম্মাণী, ইতালী,
রাশিয়া, জাপান,
চীন, ফিলিপাইন,
অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

বেতার ষ্টেশন নিখুঁতভাবে শুনিতে

5-VALVES
AC/DC
ALL-WAVE
ALL-VOLTAGE

ফিল্কো-রেডিও

মডেল—৭১০ সি

দাম—মাত্র
২১৫৲
অথবা মাসিক কিস্তিতে
১২ মাসে দেয়

স্বরে, কার্য্যকারিতায়, গঠন নৈপুণ্যে, সরলতায়
ও স্থায়িত্বে অদ্বিতীয়
বিস্তারিত ক্যাটালগের জন্য আজই পত্র লিখুন।

সাব-এজেন্টস্
ফার ইষ্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন—ঢাকা
আইডিয়াল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্—চট্টগ্রাম।
রুক্তি ভট্টাচার্য্য—১৯ নং বাংলা, কাঁচড়াপাড়া

সোল এজেন্টস্—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স লিমিটেড।
৩নং ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা।

সম্পাদকীয়

শরৎ স্মৃতিতর্পন—

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় মৃত্যু-স্মৃতিবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার অবিস্মরণীয় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। চলমান কালপ্রবাহের বুকের উপরে তিনি যে অক্ষয় চিহ্ন এঁকে রেখে গেছেন তার বিনষ্টি নেই। সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মর্ম্মমূলে তাঁর প্রবল আহ্বান তিনি পৌছে দিয়ে গেছেন, সে আহ্বান শাশ্বত কাল ভ'রে বাঙ্গালীর কাণের কাছে বাজ্‌তে থাক্‌বে। শুধু বাংলা নয়: তাঁর সত্যিকার পরিচয় যখন বাংলাভাষার পরিধিকে পার হয়ে বাইরের পৃথিবীতে বিস্তারিত হবে, তখন তাঁর করুণ-গম্ভীর আহ্বান বিশ্বমানবের চিত্তকেও চঞ্চল করবে. এসম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মানুষের মর্ম্মের সঙ্গে মর্ম্মের যোগ না থাক্‌লে সাহিত্য সৃজন করা চলে না। মানব মনের বিচিত্র ও বহুল বেদনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় মর্ম্মসংযোগ বিস্ময়জনক রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রত্যেকটী বাণীতে ব্যঞ্জনায়। পরাধীনতার দুঃসহ বেদনা তাঁর রক্তে জ্বেলেছিল অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখা; সেই শিখায় দগ্ধ হ'য়ে যে কটী প্রজ্বলন্ত সত্য কথা তাঁর কলম দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার প্রত্যেকটী কথা এই হতমান জাতির অন্তরে আগুনের অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। অপূরনীয় দুর্ভাগ্য যে শরৎচন্দ্রের মত সত্যসন্ধ, মর্ম্মদর্শী কথাশিল্পী জাতির এই পরম দুর্য্যোগের সময়ে মহাপ্রয়াণ করলেন। এই প্রাচীন জাতির অভিযান বন্ধুর ও বিচিত্র পথে বাহিত হয়ে চলেছে, সমুখে কতো অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাতীত জীবন প্রতীক্ষা ক'রে আছে, কিন্তু সকল সংগ্রামে ও সঙ্গতিতে, সুখে ও দুর্গতিতে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি জীবনের সকল স্তরের সঙ্গে গঁথা হ'য়ে থাক্‌বে চিরদিন। শরৎচন্দ্রের সেই অবিনশ্বর স্মরণের প্রতি পুনরায় আমাদের প্রণতি জানাচ্ছি।

শরৎ-স্মৃতি-সমিতির আহুত সভায় গত ১৬ই জানুয়ারী (২রা মাঘ) কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্মৃতিসমিতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন যে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব হস্তে তিন হাজার টাকা ইতিমধ্যে দিয়েছেন এবং আরো ১৫ হাজার টাকার প্রয়োজন আছে। আমরা সানন্দে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং সমিতি ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে এই স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব কায়মনবাক্যে তারা বহন করুন।

গান্ধি-লিন্‌লিথগো সাক্ষাৎ

"কংগ্রেসের দাবী এবং বড়লাটের দাক্ষিণ্যের মধ্যে মূল পার্থক্য হইতেছে যে বড়লাটের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের ভাগ্য শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকার স্থির করিবে আর কংগ্রেসের

মত ঠিক ইহার উল্টা। কংগ্রেসের অভিমত যে বাহিরের হস্তক্ষেপ ছাড়া ভারতীয়রা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারন করিবে খাঁটি স্বাধীনতার ইহাই কষ্টিপাথর। যত দিন না এই মূল পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব শাসনতন্ত্র গঠন করিতে দেওয়া হইবে এই উচিত পন্থা ইংলণ্ড অবলম্বন করে ততদিন আমি ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোন শান্তিপুর্ণ ও সম্মানজনক আপোষ-রফার ভরসা দেখি না।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি ও ভারতের জাতীয়তার ভেতর যে মূলগত প্রভেদ-বহু স্তোকবাক্য, লৌকিকতা ও প্রীতিসম্ভাষণের মধ্যেও গান্ধিজী সেদিকে স্থির দৃষ্টি রেখেছেন এবং বিশ্বের দরবারে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। অতি সৌজন্যের সহিত তিনি দেখিয়েছেন শাসকের সদিচ্ছার স্বরূপটা কেমন। বিভিন্ন দল এবং স্বার্থের সম্মতি নিয়ে ইংরেজ যত শীঘ্র সম্ভব ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবে। বড়লাটের প্রস্তাবের সারতত্ত্ব এই। গান্ধিজী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে সংখ্যাল্পদের সঙ্গে কোন পার্থক্য হলে তা তিনি কোন চূড়ান্ত এবং পক্ষপাতহীন বিচার সভার সিদ্ধান্তে ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। দেশরক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীন ভারত নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। বর্তমান স্বার্থের মধ্যে যেগুলি ন্যায্য এবং জাতীয়তার পরিপন্থী নয় সেগুলি স্বরাজের ফলে অপসারিত হলে তাদের উচিত মত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ইউরোপীয় স্বার্থ এর বেশী কোন সুযোগ-সুবিধা পাবে না। সম্রাটের এবং সাম্রাজ্যের বাইরে দেশীয় রাজাদের কোন প্রতিষ্ঠা নেই। অতএব সম্রাট যদি তার ভারতব্যাপী কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয় তবে দেশীয় রাজাদেরও তাই করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা রাখবার জন্যে তাদের সম্রাটের উত্তরাধিকারী ভারতীয় জনসাধারণের দ্বারস্থ হতে হবে।

এই দাবীদাওয়ার সঙ্গে সাম্রাজ্যনীতি ও আনুষঙ্গিক স্থিতস্বার্থের কতখানি ব্যবধান তা বড়লাটের মধুর মোলায়েম কথার অন্তরাল থেকে গান্ধিজী আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু শাসকের হৃদয় বিগলিত হবে, বিনা সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতা আসবে—এ মায়াস্বপ্ন তাঁর চোখ থেকে অপসারিত হয় নি। তিনি চাইছেন সারা দেশ একবাক্যে তাঁকে সমর্থন করুক, তাঁর মত ইংরাজ এবং বড়লাটের সদিচ্ছায় মুখর হয়ে উঠুক তা' হলেই তাদের মন বিগলিত হবে, দেশের স্বাধীনতা আসবে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

জানুয়ারীর শেষের দিকটায় এলাহাবাদে নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেল। বেগম হামিদ আলী সভানেত্রী হন। অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।

সভা-সমিতির বন্যাবেগ প্রায় একটা যুগ-ধর্মের পর্যায়ে এসে পড়েছে। প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের গায়ে সভার সংবাদগুলো অনেক সময়ে মারীগুটিকার মত দৃষ্টিশূলও বলে মনে হয়

চমৎকৃত হয়ে এই কথাই ভাবা চলে,—এত সভা-সমিতি এত উন্মাদনা, এত আলোচিত ও গৃহীত প্রস্তাব, তবুও দেশ পাশ্চাত্য-পুরাণ বর্ণিত 'লেভিয়াথান্' হয়ে পড়ে' থাক্‌ছে কেন? উত্তেজনা কি আস্ফালনে পর্যবসিত হচ্ছে!

যুগ-বৈশিষ্ট্যের এই প্রবাহের সামনে দাঁড়িয়ে, নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলনের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদিকার মুখে আশ্বাসের বাণী শুনি,—"আলোচ্য বৎসরটী সম্মেলনের পক্ষে এক যুগ প্রবর্তনকারী বৎসর। কারণ, এই সময় সম্মেলন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশের এই সঙ্কটকালে সম্মেলনের পক্ষে সামাজিক ও শিক্ষাসমস্যা লইয়া কেবল আলোচনা করিলেই চলিবে না। দশ বৎসর পর সম্মেলন ঐ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে মনোযোগ দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে।" প্রায়ই দেখা যায়—যাঁরা সভা করে তারা কাজ করে না, যারা কাজ করে তাদের সভায় ব্যয় করবার মত উদ্বৃত্ত সময় থাকে না। সম্পাদিকার আশ্বাস বাক্যে যদি এ দুইয়ের বিরোধ মেটবার ইঙ্গিত থাকে তবে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কিছু নেই। সম্পাদিকার উক্তিতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য রয়েছে,—"আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। আমাদের চেষ্টার ফলে দেশের সর্বত্র পরিষদ সদস্যাদের মনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক দূর করার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে।" যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর নব্যতা ও স্বচ্ছতা আজ আর মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর একাধিপত্যে নেই। আজ তা ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের নারী-শক্তির প্রকৃত উদ্বোধন-লগ্নে সম্পাদিকার কথায় এটুকু বোঝা গেল যে সমস্যার মূল সম্বন্ধে তাঁদের অসতর্কতা নেই। অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে যে সমাজ-সৌধ দাঁড়িয়ে রয়েছে সে কথা না বুঝলে সৌধের সংস্কার সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বহির্ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় নারীর কর্তব্য কি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এ আলোচনার ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে কারও কারও সন্দেহবুদ্ধি থাক্‌লেও এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে নারীর দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারী হয়ে গেছে। সমাজের অধিপতিরা যাঁকে নারী তথা সমাজের পরমতম কল্যাণ বলে এতদিন অনুশাসন জারি করে আসছিলেন, নারীর সেই গৃহিণীরূপে "রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা, 'চিরজনম' এক চাকাতেই বাঁধা,"—সেই কর্মচক্রের বিড়ম্বনা আর তাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারছে না। আজকের সুর,—"আমি নারী, আমি মহীয়সী।"

সভানেত্রী বেগম হামিদ আলীও অতি সুন্দর ভাষায় এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন;—"আমরা ঘরে ঘরে বহুদিন যাবৎ বহু হিটলারের অত্যাচার ভোগ করিয়াছি। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি যে, যে কোন আকারের হিটলারী অত্যাচার জগৎ হইতে চিরতরে নির্বাসিত হউক।" হিটলারী আপদের উচ্ছেদ বিষয়ে বেগম সাহেবা আমাদের "Charity begins at home" প্রবচনটী মনে পড়িয়ে দিয়ে ভালো করেছেন। পুরুষাধীন নারীর মত পরাধীন ভারতও বৃটিশ সরকারকে সেই কথাই বলছে। কিন্তু ধর্মের কাহিনীতে কর্ণপাত করা শ্রেণীবিশেষের কাছে

চিরদিনই অসম্ভব হয়ে এসেছে। তাকে সম্ভব করানোর পথে করণীয় কি তাই নিয়েই গোরগোল। নারী সম্মেলনের উদ্যোক্তৃরা যে স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, সবল অন্তঃকরণ নিয়ে তাকে তাঁরা কমের স্রোতধারায় প্রক্ষিপ্ত করুন—তবেই সম্মেলন সার্থক হবে।

"গান্ধী পুনরায় নিরাশ করিলেন—"

Current History আমেরিকার একটী প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী মাসিক পত্র। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এ পত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় W. D. Allen উপরি উক্ত প্রবন্ধে (Gandhi Balks Again) নিম্নলিখিত প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যগুলি করেছেন,—"ভারত রাজনীতি গগনের আর একটি উদীয়মান জ্যোতিষ্ক, ৪২ বৎসর বয়স্ক সুভাষ বসু এ বৎসর গান্ধীর স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এবং গান্ধীর আপোষ নিষ্পত্তির মারফতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার পদ্ধতিকে খণ্ডিত করিয়া ভারতবর্ষে গভীরভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বঙ্গদেশের কলিকাতায় বসুর বাসস্থান। এই দেশ শিল্প-বাণিজ্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক মতামতের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার সমর্থকের সংখ্যা যে অল্প নহে তাহার কারণ তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রাদেশিক গৌরববোধ, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণী শক্তি ও তাঁহার বক্তৃতা-নৈপুণ্য। নির্বাসনের সময়ে বহুবর্ষ ধরিয়া ইউরোপীয় ঘটনাবলী অধ্যয়ন করায় বসু বিশ্বের পরিস্থিতি ও ভাবধারা সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতা নেহেরুর মতই ভূয়োদর্শন অর্জন করিয়াছেন। প্রধান প্রধান কংগ্রেস ধুরন্ধরদের অপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর পাশ্চাত্যধর্মী।

কংগ্রেসদলের মধ্যে সাম্প্রতিক অতি গুরুতর বিভেদ গত বৎসর বসু কর্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি অনুভব করেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দীর্ঘ দিনের কামনা গণ-পরিষদ বড়লাট কর্তৃক আহূত না হইলে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বৃটিশ সরকারের নিকট চরমপত্র প্রেরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে ১৯৩৯এর শীতকালেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইবে এবং তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় স্বাধীনতায় বৃটিশকে সম্মত করাইতে কংগ্রেস দলকে জীবন-মরণ পণ করিয়া কোন অভিযান চালাইতে হইবে না, কিন্তু গান্ধীও তাঁহার নিকট শিষ্যবৃন্দ, অর্থাৎ কংগ্রেসের রক্ষণশীল মহারথীগণ এ কথা বিশ্বাস করিয়াই চলিলেন যে চরম-পত্র দাখিলের আয়াস স্বীকার না করিয়াই বৃটিশকে স্বমতে আনা যাইবে, তাঁহারা আশঙ্কা করিলেন যে দেশব্যাপী আন্দোলন অহিংসার ভিত্তিতে চালানো সম্ভব হইবে না এবং বসুর ন্যায় অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃবৃন্দ বিশুদ্ধভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়েও সন্দিহান হইলেন।

গান্ধীর পাণ্ডারা যাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পারিলেন না তাহা হইতেছে তাঁহাদের এই আশঙ্কা যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এ সময়ে কোন ব্যাপক সাধারণ সংগ্রাম হইলেই অসংহত চাষী

এবং কারখানা-শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি প্রগতিশীল গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি এবং বামপন্থী নেতা তথা বে-আইনী অথচ সক্রিয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এমন কি প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে তরুণতম বেগবান, সমাজতন্ত্রবাদী নেহেরুও বৃটেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পূর্বে গান্ধীর আদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বসু শেষ পর্যন্ত দলের সভাপতিত্বে ইস্তফা দিয়া প্রগতিশীল এবং বামপন্থী খণ্ডদলগুলির সংহতির জন্য দলেরই মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক্ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বৃটিশ প্রেস ইহা হইতে এটুকু তাৎপর্য গ্রহণ করিলেন যে এই বিবাদের ফলে ভারতের জাতীয়তা আন্দোলন দুর্বল হইয়া যাইবে। কিন্তু ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে ইহা পারিবারিক কলহমাত্র। বসু এ কথা নিশ্চয়ই জানেন যে কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়িতেছে,—এই আশঙ্কাতেই বৃটেন গান্ধীবাদী অহিংসা-পন্থীদলের নিকট অচিরে আত্মসমর্পণ করিবে।"

ইস্লাম-নায়কত্বে জিন্নাসাহেব

বড়লাট সাহেবের সঙ্গে তাঁর যে পত্র বিনিময় হয়েছে বহু তাগাদা দিয়ে জিন্না সাহেব সেগুলো ছাপার সম্মতি নিয়েছেন। ছাপার জন্য তাঁর এই ব্যবস্থা অনাবশ্যক নয় চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অমানুষিক অত্যাচার থেকে তিনি ভারতীয় মুস্লিমদের রক্ষা করেছেন 'পরিত্রাণ দিবস' অনুষ্ঠান করে, এবার ইংরাজ-ইহুদী শাসন থেকে তিনি আরবদের উদ্ধার করেছেন বড়লাটকে এক চিঠি লিখে। তিনি দাবী জানিয়েছেন যে His Majesty's Government কে প্যালেষ্টাইনের আরবদের "যুক্তিসম্মত" জাতীয় দাবীগুলি মানতে হবে। বড়লাট জবাব দিয়েছেন—নিশ্চয়ই। 'যুক্তিসম্মত' জাতীয় দাবী His Majesty's Government শুধু ভবিষ্যতে মানবে না বরাবরই মেনে আসছে।

জিন্নাসাহেবের আর একটি দাবী যে ভারতীয় সৈন্য ভারতের বাইরে কখন কোন মুস্লিম শক্তির বা দেশের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হবে না। বড়লাট বলেছেন যে এরকম পরিস্থিতির যখন উদ্ভব হয় নি তখন এ কথাই ওঠে না। তবে মুস্লিম মনোভাবকে অবজ্ঞা করা হবে না।

চিঠিগুলি ছাপা না হলে আমরা জানতাম না আরবের স্বাধীনতা, মিশর, তুর্ক, পারস্যের নিরাপত্তা কার চেষ্টায় অর্জিত ও রক্ষিত হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গোল টেবিল

মাননীয় ফজলুল হক ও বি, সি চাটার্জ্জী বাঙ্গলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্যে এক গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে একটা বিবৃতি দিয়েছেন। দুই সম্প্রদায়ের দুজন প্রতিষ্ঠাবান নেতার কাছ থেকে এ রকম শুভবুদ্ধি সকলের মনেই আশার সঞ্চার করবে। এঁদের ধৈর্য্য ও সদিচ্ছা প্রশংসনীয়। কিন্তু আশঙ্কার কথা গোল টেবিল পাওয়া যাবে কোথায়। সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা ও পৃথক নির্বাচন এক চতুষ্কোণ টেবিল সৃষ্টি করে রেখেছে,—এর কোনগুলো শক্ত ধাতু দিয়ে বাঁধানো। মুস্লিম লীগ বাঁটোয়ারার সুবিধা ছাড়বে না—আর হিন্দু মহাসভার অভ্যুদয় এই মুস্লিম-সুবিধার প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এই বাস্তব সত্যের দিকে তাকালে আর আশায় উৎফুল্ল হবার কারণ থাকে না।

বিবৃতিতে আছে—"আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যে সব বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থ পৃথক তার চেয়ে যে সব বিষয়ে এক সেগুলি গুরুতর এবং মৌলিক। আমরা যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সন্তুষ্টিসাধন করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি তাহা হইলে এই পার্থক্যগুলি টিকিবে না।"

এ জাতীয় বাস্তব-বিরোধী উক্তিকে বলে স্তোকবাক্য বা platitudes। দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থে ঐক্যের অংশই মুখ্য এ বুদ্ধি হয়ে থাকলে মুস্লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার অস্তিত্বের যুক্তি আর মানা যায় না। স্বার্থের অভিন্নতা বুঝতে পেরেও পৃথক্ নির্বাচনের দাবী করা আরও বিস্ময়কর।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন করতে পারে লীগধ্বজী ফজলুল হক নয়, প্রজানেতা ফজলুল হক। তিনি এখন অভিজাত মুস্লিম স্বার্থের নেতা—পূর্বে তিনি ছিলেন অগণ্য নিরন্ন মুস্লিম প্রজার নেতা। নিরন্ন মুস্লিম প্রজার সঙ্গে নিরন্ন হিন্দু প্রজার মৌলিক স্বার্থে বিভেদ নেই, অভিজাত হিন্দু ও অভিজাত মুস্লিমে আছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের কাড়াকাড়ি, চাকুরি নিয়ে মারামারি। প্রজানেতা ফজলুল হক যদি চাষীর দুয়ারে ফিরে আসেন (সেখানে মুস্লিম, হিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী) তবেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা তাঁর মুঠোর মধ্যে আসবে—হিন্দু মহাসভার সঙ্গে গোল বা চতুষ্কোণ টেবিলে বসবার প্রয়োজন হবে না।

'শান্তিভঙ্গ'

চাঁদপুরের সাব-ডিভিস্যনল অফিসার মাননীয় এম্দাদ আলী সাহেব ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে দশজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কর্মীকে এক বৎসর শান্তিরক্ষার সর্ত্ত দিয়ে এক হুকুম জারি ক'রেছেন। দুজনের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ক'রে এবং বাকি আট জনের কাছ থেকে পাঁচ শ' টাকা ক'রে জামানৎ দাবী করা হয়। অন্যথায় যতদিন না জামানৎ আদায় হবে কিংবা এক বৎসর তাঁদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁরা গত বৎসর ১০ই, ১৫ই, ও ১৬ই জুলাই বন্দীমুক্তির জন্যে সভার আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা ক'রে এবং প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক তাঁর নির্বাচন প্রতিশ্রুতির খেলাপ ক'রেছেন এ প্রকার মন্তব্য ক'রে বক্তৃতা দিয়েছেন।

অপরাধ ১৭ এবং ১২৪-এ ধারা অনুযায়ী রাজদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে নি। হাইকোর্টের এক পূর্ববর্ত্তী বিচারে বিচারপতি রায় দিয়েছিলেন যে আইনের চক্ষে মন্ত্রীরা ছোট লাটের পরামর্শদাতা

মাত্র, তাঁরা স্বয়ং 'সরকার' নন বা সরকারের 'অধীনস্থ কর্মচারী' নন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে দিক দিয়ে যান নি। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, যে মন্ত্রীত্বকে দেশের শতকরা ৯৫ জন সমর্থন করে তার বিরুদ্ধে কোন তীব্র মন্তব্যে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হ'তে পারে (likely to disturb public peace and tranquility)।

বিচারের রায়ে আছে যে সমালোচনা করেছেন 'কোন কোন' আসামী, সবাই নয়। সভা আহ্বান তা হ'লে মূল অপরাধ, যদিও সভা সমিতি বন্ধ করবার কোন হুকুম জারি হয় নি। শতকরা ৯৫ জন বাংলার মন্ত্রীত্বকে সমর্থন করে এ কথা তাঁদের সবচেয়ে সেরা দালালের কাছে শুনলেও মন্ত্রীরা লজ্জা পেতেন! মাননীয় ফজলুল হক সেদিনও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে ব'লেছেন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনার জন্যে কোথাও দণ্ডবিধির আশ্রয় নেওয়া হয় নি। একজন দায়ীত্বশীল সরকারী কর্মচারীর 'শান্তিভঙ্গ' তাঁকে নিশ্চয় লজ্জা দেবে।

সংগ্রাম ও সংগঠন—

চীনদেশের বিখ্যাত কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন গত ২০শে নভেম্বর চুংকিঙে হয়ে গেল। তাঁরা একটা ঘোষণা পত্র সমস্ত দেশে প্রচারিত করেছেন, যাতে চীনা সংগ্রামের আদর্শ ও পন্থা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁদের কর্মপ্রয়াসের দুটো দিক আছে— সংগঠন এবং সংগ্রাম। একই সঙ্গে এই দুটো বিরুদ্ধ-ধর্মী প্রচেষ্টা তাঁদের চালাতে হবে। এদিকে সমস্ত জাতিকে শিক্ষায়, নীতিতে, ঐশ্বর্যে, আনন্দে সমৃদ্ধ ও শক্ত ক'রে তুল্‌তে হবে; অন্যদিকে প্রতিরোধ করতে হবে বহিঃশত্রুকে। সমস্ত চীনজাতির এই অপূর্ব প্রচেষ্টায় যে প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা বিস্ময়কর। দীর্ঘদিনের জড়তাকে ঝড়ে জলে দিয়ে এই জাতি সমস্ত শক্তিকে সংহত করে তুলেছে দুর্ধর্ষ সংগ্রামে; কিন্তু এই সংগ্রামের সংহতিকে গড়ে তুল্‌তে গিয়ে গঠনমূলক বিবিধ পদ্ধতিকে তারা বাদ দেয়নি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা একদিকে জাতীয় সংস্কৃতিকে গঠন করে তুলছে—অন্যদিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলায়ও জোগ দান করতে পশ্চাৎপদ হয়নি। এই সংগঠন ও সংগ্রামের দ্বৈতপদ্ধতিকে প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির ১৯৩৮ এর বিশেষ অধিবেশনে। অপরিমিত উৎসাহে ও শক্তিতে সমগ্র চীন দেশ এই কঠিন পন্থায় কাজ করে চলেছে, একবৎসরের অধিককাল যাবৎ। ভাঙ্গাগড়া দুটো দু'রকমের কাজ। একই সঙ্গে দুটো কাজকেই সমাধা করে চলা, খুব সহজ কাজ নয়।

আমাদের দেশের লোকের এতে অনুকরণ করবার বিষয় রয়েছে। আমাদের কংগ্রেসী নেতারা একদা মন্ত্রীত্ব কবুল করেছিলেন এই দ্বৈতপন্থার আদর্শ নিয়ে; অন্ততঃ দেশের সামনে তাঁরা এই দুমুখো প্রোগ্রামকেই জাহির করেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে তারা সংগঠনের জালেই আট্‌কে গেলেন, কিন্তু সংগ্রামের মনোবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। সংগ্রামের বুলি তাঁরা আবৃত্তি করেছেন বরাবর; কিন্তু তার জন্য যে শক্ত মেরুদণ্ড প্রয়োজন তার অভাব তাঁদের রয়েছে,

একথা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। সংগঠনের মধ্যে আছে আবর্তহীন শান্ত স্থৈর্য আর সংগ্রামের আনুষঙ্গিকই হলো ঝোড়ো সমুদ্রের দিক্‌চিহ্নহীন অনিশ্চয়তা। আমাদের নেতারা তাই সংগঠন প্রচেষ্টার (constructive programme) মন্ত্র আওড়াচ্ছেন এবং অনিশ্চয়তাকে এড়িয়ে চলেছেন। যৌবনশক্তির ধর্মই হলো দুর্গম পথে আশ্রয়হীন অভিযান; কিন্তু আমাদের প্রধান কর্ণধারদের হাড়ে হাড়ে বার্ধক্যের রাহু আক্রমণ করেছে। গান্ধীজী তাই বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছেন এবং বারম্বার কেবল সংগঠনের মারণ-মন্ত্র আমাদের কাণে দিচ্ছেন; কিন্তু সংগ্রাম ব্যতীত সংগঠনের কোন মানে পরাধীন দেশে অন্ততঃ নেই, একথাটা তিনি বিস্মৃত হচ্ছেন। মহাচীনের নেতাদের গ্রন্থ থেকে দু'এক ছত্র আমাদের প্রাচীন নেতারা শিখে নিলে ভারতের তেত্রিশ কোটী নর-নারীর কল্যাণ হোতো। কিন্তু তাঁদের কি শেখবার মনোবৃত্তি আছে?

দিল্লীতে লেবার কনফারেন্স

শ্রমিক সমস্যা আলোচনা করবার জন্য কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের সরকারী প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়েছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যর রামস্বামী মুদালিয়র সভার উদ্বোধনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক-অবস্থার ও শ্রমিক-আইনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে শ্রমিক-আইনের অসমতার দরুণ স্থায়ীভাবে ও নির্বিঘ্নে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না। অন্য দিকে যেখানে হয়ত' প্রাকৃতিক অবস্থা শিল্পপ্রগতির অনুকুল নয়, সেখানে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ আইন না থাকার সুবিধা নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শিল্প ও যন্ত্রের প্রসার হয়। ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের ফলে এই সমস্যা আরো তীব্র হয়েছে। এ অসম অবস্থা দেশের অর্থনীতিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়।

এর প্রতিকারস্বরূপ ১৯৩১ সালের রিপোর্টে শ্রমিক তদন্ত কমিশন একটী শিল্প সমিতি (Industrial Council) গঠন করবার পরামর্শ দিয়েছিল। বড়লাট সাহেব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মতে এ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সময়োচিত হবে না এবং এর চেয়ে সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা বেশী প্রয়োজন। অর্থাৎ এ প্রকার সম্মেলন ও বৈঠক আরো ঘন ঘন হ'লেই সহযোগিতা সহজ হবে।

বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছাড়া প্রীতি-সম্মিলনে শ্রমিক-সংস্কার ও শিল্প-সামঞ্জস্য যে সম্ভব হয় না আলোচ্য বিষয়গুলির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এর মধ্যে তিনটী গুরুতর বিষয় ছিল'—শ্রমিক-মালিক বিবাদ দূর করা ও মিটমাট করা; বেতন সহিত ছুটীর ব্যবস্থা; এবং শিল্প ও শ্রমিক-সংক্রান্ত সংখ্যা সংগ্রহ। সভায় মোটামুটী এই মত ব্যক্ত হয়েছে যে এই তিনটী বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে হাত দিতে হবে এবং এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী সর্ত গঠন করবে। শিল্প ও শ্রমিকদের সম্বন্ধে সংখ্যা সংগ্রহ করবার জন্যে

একটা সংখ্যা-আইন (Statistics Act) প্রবর্তন করবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার থেকে উত্থাপিত হ'য়েছে,—এই প্রস্তাব অনুসারে আইনের অন্তর্ভুক্ত মালিকরা তথ্য রাখতে এবং দিতে বাধ্য হবে। মালিক-সমাজ নিঃসন্দেহ এই বাধ্যতানীতির বিরোধিতা করবে। এই আশঙ্কা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তও হয়েছে। জনমতের বিরুদ্ধে সম্ভবত এ বিরোধিতা টিকবে না—কিন্তু ভয়ের কথা যে শ্রমিকদের কাছ থেকেও বাধা আসতে পারে। জন্মগত আশঙ্কা ও ধর্মান্ধতার ফলে অনেক সময়ে তারা অপরিচিতের কাছে ঘরোয়া খবর সঠিকভাবে দিতে চায় না। অনেক সময়ে মালিকদের কুনজরে পড়বার ভয়েও তারা কাজকর্মের অবস্থা সম্বন্ধে যথার্থ খবরাখবর দিতে পারে না। আইনের মধ্যে কড়া ব্যবস্থা না থাকলে মালিকস্বার্থ শ্রমিকদের ভয় ও কুসংস্কারের সঙ্গে এক অদ্ভুত মিতালী পাতিয়ে সংখ্যা আইন পণ্ড করতে পারে।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক—

এ দেশে সমস্যা কতো আকার যে ধারণ করতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। প্রদেশে প্রদেশে ঝগড়া, হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া, বর্ণহিন্দু ও তপশীলহিন্দুতে ঝগড়া, ভারতীয়বর্মীতে ঝগড়া—এসব তো আছেই, এর ওপরে আবার আছে ভারতে-সিংহলে ঝগড়া। বহুদিন যাবৎ এই সমস্যাটা প্রবল হয়ে উঠেছে এবং দেখতে দেখতে এর তীব্রতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষ চিরদিন সিংহলকে ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত বলে মনে করেছে। প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাসের জের টেনে ভারতীয়গণ সিংলহকে বরাবর আপন ব'লে দাবী করে আসছে। কিন্তু কিছু দিন থেকে ও দাবী স্বীকৃত হওয়া আরম্ভ হয়েছে। Ceylon for Ceylonese (সিংহল সিংহলবাসীর) নামক নূতন প্রচার অতি পুরানো আকারে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভারতীয় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী এবং মজুর সিংহলে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করছে বহুকাল ধরে। কিন্তু আইন করে তাঁদের ভারতে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা সেখানকার ব্যবস্থা-পরিষদে জোর ধরে উঠেছে।

এই প্রাদেশিক সংকীর্ণতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারলে সিংহলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সংস্থা অনুযায়ী সিংহল আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটী স্বতন্ত্র সত্তা হতে পারে। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জিত হ'লে সিংহলের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ওপরে একক দাঁড়িয়ে থাকবার কল্পনা অতিমাত্র বাস্তবতাহীন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ভারতের নাড়ীর সঙ্গে যোগস্থাপন না করলে সিংহলে সুস্থ ও সর্বাঙ্গীন পরিণতি অসম্ভব। আজকার জগতে ভৌগলিক সংকীর্ণতার ওপরে স্বদেশ-সেবার ভিত্তি গাঁথবার প্রয়াস অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তিসমবায়ের অনিবার্য আঘাতে অচিরে ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে যাবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নতুন শক্তিসংঘাত যে গড়ে উঠেছে তার প্রমাণ "লঙ্কা সম-সমাজ সঙ্ঘ। আধুনিক

জগতের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে এঁরা সচেতন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সিংহলীয় সমস্যাগুলোকে এঁরা সমাধান করবার দিকে সচেষ্ট। সিংহলে ভারতীয় সিংহলী সমস্যা যে কৃত্রিম উপায়ে হিত-স্বার্থের প্রতিনিধিগণ সৃষ্টি করছেন, একথা আজ অবিসংবাদিত সত্য। সর্বসাধারণের ভিতরে এই সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—এমন কি এখনো নেই। লঙ্কাসমসমাজসঙ্ঘের যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত রমানাথ কিছুদিন থেকে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতেই একথা প্রমাণিত হয়। "মূল আরা ষ্টেট্" এ গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে যে সব ধর্মঘট হয়েছিল তাতে সিংহলী মজুররাও দলে দলে ভারতীয় মজুরদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই সম্পর্কে যে সব মামলা মোকদ্দমা হয় তাতে ভারতীয় মজুরদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার কাহিনীকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এই লঙ্কা সমাজের কর্মীগণ। বাগানের মালিকগণ এই ধর্মঘটকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতে যেমন হিন্দু মুসলমান সমস্যা কৃত্রিম সৃষ্টি: তেমনি সিংহলী ভারতীয় সমস্যাও কৃত্রিম। ভারতেও যেমন গণসংযোগই হবে একমাত্র সত্যিকার সংহতি গড়বার পথ, তেমনি সিংহলেও গণসাধারণকে একই ভিত্তিভূমিতে এনে সংহত করবার উপায় সমাজতান্ত্রিক গণসংযোগ। লঙ্কাসমসমাজের প্রচেষ্টা সফল হবে, এ আশা আমাদের আছে। তাতে ভারতীয়-সিংহলী সমস্যাও অচিরে সমাধান হয়ে যাবে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার এক ইস্তাহারে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী আইন প্রবর্তনের সঙ্কল্প জানিয়েছেন। চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে পাটের দর ক'মে যায়, আড়ৎদার পুঁজির জোরে অল্প দামে চাষীর কাছে পাট কিনে সুবিধামত উচু মুনাফায় বিক্রী করে, ফলে পাটের দৌলত চাষীর ভোগে লাগে না—এ কারও অজানা নেই। কৃষকের সুবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে এবং সুপরামর্শ দিয়ে কোন লাভ হয়নি, তাই বঙ্গীয় সরকার স্থির করেছেন বছর বছর বাজারের হাল দেখে আবাদী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে,—এবং কি উপায়ে বিভিন্ন স্বার্থের ও পাট-প্রধান প্রদেশগুলির সহযোগিতা পাওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য আগামী বৎসর থেকে এক বিশেষজ্ঞ সভা দাঁড় করানো হবে। বর্তমান বৎসরে সম্ভাবিত চাহিদা এবং উৎপন্ন ও সঞ্চিত পাট দেখে স্থির হয়েছে যে গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসরে আবাদ বেশী হতে পারে না। গত বৎসরের আবাদী জমির যে খসড়া তৈরী হয়েছে তার একটী ক'রে নকল প্রত্যেক চাষীকে দেওয়া হয়েছে এবং খসড়ায় যেমন যেমন লেখা আছে তার বেশী জমিতে এবার কেউ পাট বুনতে পারবে না। অবশ্য আগের জমিতেই যে বুনতে হবে এমন কোন কথা নেই।

এ সঙ্কল্পকে ফলবান করবার জন্যে আসাম ও বিহার প্রদেশের সহযোগিতা প্রার্থনা করা হবে। পার্শ্ববর্তী পাট-প্রধান প্রদেশগুলি যদি অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ ও প্রয়োগ না করে তবে বঙ্গীয় সরকারের প্রয়াস ব্যর্থ হবে। এদের সহযোগিতা ছাড়াও আর একটী বিষয় চিন্তা

করা দরকার। শুধু আবাদী জমির আয়তন জানলেই আবাদের পরিমাণ জানা হয় না, বিঘা প্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও জানা চাই। এ সম্বন্ধে কোন তদন্ত না ক'রে প্রতি বৎসর ঠিক প্রয়োজন-মত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ কি করে সম্ভব হবে অনুমান করা কঠিন। তা ছাড়া সরকারী আইন মতেই সমান আয়তনের ভিন্ন জমিতে চাষ চলতে পারে। সকল জমির উৎপাদন শক্তি সমান নয় এবং একই জমির উৎপাদন শক্তি বাড়তে বা কমতে পারে। আশা করি বিশেষজ্ঞ-সভা এ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেবে।

লড়াই-মুনাফা কর

Excess Profits Bill নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে তুমুল বিক্ষোভ উঠেছে। ৮ই ফেব্রুয়ারী, কেন্দ্রীয় পরিষদে বিলটি আলোচনার দিন কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এশোসিয়েসন সেয়ার মার্কেট্ বন্ধ করে দিয়েছিল। আইন সভায় কংগ্রেস দল অনুপস্থিত থাকলেও সরকার পক্ষকে বহু কূট প্রশ্নে জর্জরিত হতে হয়েছে। বিলটী Select Committee তে দেবার প্রস্তাব হয়েছে।

লড়াইয়ের ফলে যে সব শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ফেঁপে উঠেছে তাদের অতিরিক্ত লাভের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'দেশরক্ষা'র জন্য সরকারী তহবিলে যাবে—এই হচ্ছে বিলের প্রধান অঙ্গ। অবশ্য ছোটখাট ব্যবসাগুলি এতে পড়বে না। রাজস্ব-সচিব স্যার জেরেমি রাইসম্যান প্রস্তাবনায় বলেছেন যে বিলটী সামাজিক ন্যায্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রাজস্বনীতির দিক দিয়ে তিনি একে সমর্থন করবেন। অর্থাৎ যুদ্ধরত দেশ দেশরক্ষার জন্যে অতিরিক্ত খরচের মধ্যে পড়ে যায়, এবং এই অতিরিক্ত খরচ মেটাবার জন্যে যে অতিরিক্ত রাজস্ব তোলার দরকার তা সেই অতিরিক্ত লাভের থেকেই তোলা ন্যায়সঙ্গত যা অতিরিক্ত খরচের মত লড়াইর ফলে এসেছে।

আত্মরক্ষার জন্যে কোন দেশ যখন লড়াই করে তখন তার অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সে অবস্থায় ধনিকের কোষাগারে হাত দেওয়া সমাজনীতি বা রাজস্বনীতি কোন দিক দিয়েই দোষ-নীয় নয়। ভারতবর্ষ লড়াইতে যোগ দিয়েছে স্বেচ্ছায় নয় বা আত্মরক্ষায় নয়। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বলতে গেলে ভারতবর্ষে কিছু নেই এবং হবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। গ্যাস-মুখোস, বালির বস্তা বিমানপোত-ধ্বংসী কামান, শেলপ্রুফ বাড়ি এসব কেমন বস্তু তা আমাদের নাগরিকরা দূরের কথা সৈনিকরাও জানে না। সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য অতিরিক্ত লাভের ওপর কর ধরা আমরা সমর্থন করি—কিন্তু অনীপ্সিত যুদ্ধকে পরিচালনার নামে দায়িত্বহীন খরচের জন্য কোন কর উদ্ধারণকেই সামাজিক ন্যায্যতা বা রাজস্ববৃদ্ধি বলে চালানো যায় না।

ইংলণ্ডের ওপরও এরকম কর ধার্য্য হয়েছে এই বলে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করে স্বপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা হয়েছে। লড়াই সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এক পর্য্যায় দাঁড়ায় না—এই একমাত্র যুক্তি। অন্য যুক্তি দিলে এই চূড়ান্ত যুক্তির শক্তিহরণ করা হয়। কোন

স্বশাসিত উপনিবেশ এ জাতীয় বিল পাশ করে নি। সিংহলে পর্যন্ত সরকারের প্রস্তাবিত অনুরূপ একটি বিল বাতিল হয়ে গেছে।

১৯২৯ সাল থেকে যখন পৃথিবীব্যাপী মন্দার বাজার সুরু হয় তখন অন্যান্য দেশের শাসক তাদের শিল্পকে রক্ষা করেছে বিদেশী আমদানীর ওপর কর বসিয়ে, বিনিময়ের হার নিয়ন্ত্রণ করে, এবং বাণিজ্যচুক্তি ক'রে। সেই দুর্দিনে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের জন্য কিছু করে নি—তারা শুধু লাভ থেকে নয়, মূলধন হ'তেও রাজস্ব জুগিয়েছে। এখন তাদের সুদিনে তাদের ওপর কর বাড়ানো হচ্ছে। এজন্যে ভুলাভাই দেশাই বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে যুদ্ধের সুবিধা নিয়ে তার শিল্পের প্রসার করতে না দেওয়া।

অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলি এই করের আওতায় পড়বে না। ব্রিটিশ ভারতের শিল্পবাণিজ্য দেশীয় রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবে। ব্রিটিশ ভারতে কিছু কিছু শ্রম সংস্কারক আইনের প্রবর্তনের ফলে দেশীয় রাজ্যের দিকে ভারতীয় শিল্পের গতি ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। অর্থনীতিক দিক দিয়ে এতে মঙ্গল হবে না।

ব্যবসায়ীরা যে লাভ করেছে তার বেশীর ভাগই ক্রেতার স্বার্থ-বিনিময়ে। তাদের মুনাফার অংশ শ্রমিকরা যেটুকু পেয়েছে তার বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহারা যুদ্ধের ফলে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে। ব্যবসায়ীর লাভ ছেঁটে সরকার ক্রেতাকে বাঁচাবেন না, শ্রমিককে খাওয়াবেন না। এরপর চতুর ব্যবসায়ী যখন লোকসান পোষাবার জন্যে কাঁচামালের দাম কমিয়ে দেবে তখন চাষীরও দুর্গতি হবে।

উদারনৈতিক ঔদার্য

ওয়েল্‌স, ব্রেল্‌সফোর্ড, কোল, হাক্সলী প্রমুখ কয়েকজন উদারনৈতিক ও শ্রমিকভাবাপন্ন প্রগতিবাদীর মাথায় যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন এবং উপনিবেশগুলি নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা খেলেছিল। উদারনৈতিক দলের সভাপতি রামসে মুইর এক বক্তৃতায় তাঁদের আকাশদুর্গ ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র কল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বলেন যে বিপুল জনসংখ্যার জোরে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যুক্তপার্লামেণ্টে রাজত্ব করবে এবং পশ্চিমের রাষ্ট্রনীতির ওপর আধিপত্য করবে। তা ছাড়া পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোকের মধ্যে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শান্তি স্থাপন করেছে—যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করতে হ'লে তাকে ভাঙ্গতে হবে।

স্বল্প জনসংখ্যার স্বল্পতর শ্রেণীবিশেষ ভিন্ন দেশের বিপুল জনসংখ্যার ওপর প্রভুত্ব করবে,—স্বদেশের বা কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে teeming millions এর ভাষা শোনা যাবে না—এই হচ্ছে ইংলণ্ডের উদারনীতি। এই উদারনীতি বশতই মুইর সাহেব রশ্‌ডেল এ আর একটা বক্তৃতায় বলেছেন যে ভারতীয়দের এমনই এক জটিল সমস্যা যে স্বায়ত্তশাসন দিতে গেলে যেটুকু তারা মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া সুরু হবে। কারণ তাদের মধ্যে আছে ভাষার তফাৎ,

মানব-প্রকৃতির তফাৎ সর্বোপরি ধর্মের তফাৎ। এ ছাড়া নিম্ন জাতিদের সাহস এবং চেতনা যতদিন না হচ্ছে ততদিন গণতন্ত্র সম্ভব হবে কী করে ?

কথা শুনে নিশ্চয়ই Seely ও Macaulay তাঁদের কবরের মধ্যে পাশ ফিরে শুয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদীর সংবাদ-শাসন

একটি দেশীয় কাগজের লণ্ডন অফিস থেকে একটা খবর এসেছে যে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের মধ্য-এসিয় গণতন্ত্রে মুস্লিম-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চলেছে—বিশেষ করে ঘোমটার উচ্ছেদ করতে সাম্যবাদীরা কোমর বেঁধে লেগেছে।' বড় বড় সভা করে ঘোমটা পোড়ানো হচ্ছে এবং 'বিশ্বাস-পরায়ণ' স্বামীদের ও ধর্মনিষ্ঠ মৌলবীদের ট্রটস্কাইট বলে গালি দেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই নাকি ঘোমটা বন্ধ করে আইন পাশ হবে।

আদর্শ-দ্বেষদুষ্ট বিকৃত খবরের একটি চমৎকার নমুনা। রুষ ও সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুস্লিম গোঁড়ামিকে উত্তেজিত করবার এই অপচেষ্টা অতি সাধারণ বুদ্ধির কাছেও ধরা পড়ে। যে কামালকে সারা মুস্লিম-জগৎ সেদিনও ইস্‌লামের ত্রাণকর্তা বলে সম্বর্ধনা করেছে—তাঁর দেশ থেকে তিনি একদিন ঘোমটাকে নির্বাসন করেছিলেন। বিস্ময় আমাদের লাগে এই ভেবে যে সোভিয়েট-রাষ্ট্রে এই সংস্কার এতদিন সাধন হয় নি কেন ?

সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত-বার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রায় শতাব্দী পূর্বে যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি শ্রমিকের মর্মভেদী হাহাকারে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন ও তাদের উদ্ধারের ব্রতকে নিজের জীবন দিয়ে উদ্‌যাপন করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন, কৃতজ্ঞ দেশবাসী যাকে 'সেবাব্রত' সম্বোধনে অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করেছিলো, তাঁকে আমরাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

শ্রমিক আন্দোলন আজ আপন ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার শক্তিতে দুর্দমনীয় বেগে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। শশীপদ-শতবার্ষিকীতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে,—আজ আন্দোলনের মধ্যাহ্ন-সূর্যের তলায় দাঁড়িয়ে প্রত্যূষের অনিশ্চিত আলো-আঁধারের বীর পথিককে আমরা স্মরণ করতে পারছি।

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী যান্ত্রিক সভ্যতার কৃপায় যখন পাশ্চাত্যে সর্বহারার সৃষ্টি হোলো, অমানুষিক অত্যাচারের পেষণে শ্রমিক কেঁদে উঠলো, তখন নতুন করে সমাজ গড়বার স্বপ্ন অনেকেই দেখতে লাগলেন। গত শতাব্দীতে ইংরেজের শিক্ষা-দীক্ষার জোয়ার এদেশের উপকূলে এসে আছড়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ-স্বপ্নও এলো। কুটির-শিল্প ধ্বংসের সাথে ভারতে অজস্র নরনারীকে জীবিকার সন্ধানে শ্রমিক বৃত্তির আশ্রয় নিতে হোলো। রাজধানীর উপকণ্ঠ বরাহনগরে থেকে শশীপদ শ্রমিকের গ্লানি স্বচক্ষে দেখলেন। এই গ্লানি দূর করার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ

করেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্যায়ে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরণীয় থাক্‌বে, তিনিই এদেশের প্রথম শ্রমিক নেতা।

বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস

১১ই ফেব্রুয়ারী বাংলা ও সুরমা উপত্যকার সর্বত্র "কংগ্রেস দিবস" পালিত হয়েছে। সুবিধাবাদী, সংরক্ষণশীল ও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' দলের কথা স্বতন্ত্র; কংগ্রেসকে যাঁরা প্রগতিশীল, সুস্থ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতীক দেখতে চান, তাঁরা সকলেই যোগ দিয়ে এ "দিবস"কে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা জানেন, আপাতদৃষ্টিতে এ দ্বন্দ্বের একটা প্রাদেশিক রূপ থাকলেও আসলে 'ওয়ার্কিং কমিটী' ও 'বি পি সি সি'র বিবাদ 'দুই বিভিন্নমুখী আদর্শের উপরেই' দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদ লাভ, গান্ধীজির ব্যক্তিগত পরাভবের ক্ষোভ ("my own defeat") পন্থ-প্রস্তাব, কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'নির্বাচন' কংগ্রেস নিয়ম-কানুনের রদ-বদল, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা করবার ক্ষমতা বিলোপ, সুভাষচন্দ্র, সহজানন্দ, নরীম্যান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, 'বি পি সি সি'র প্রস্তাব ও নির্বাচন-ট্রাইব্যুনাল নাকচ করা, বাট্‌লীবয়ের হিসাব পরিদর্শন, এ্যাড্ হক্ কমিটী নিয়োগ—সবই এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। "বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস" এই পদ্ধতিরই প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু বহু প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে বলেছেন—ওয়ার্কিং কমিটী ও 'বি পি সি সির' বিরোধের মূল কি। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষনিষ্পত্তিই যে দক্ষিণপন্থীদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সংগ্রামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই যে তাঁদের কর্মপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য—এ কথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। নৈরাশ্যের মাঝেও কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতো যদি দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কুটিল পথ না ধরতেন, যদি সত্য ও অহিংসার মুখোস পরে অসত্য ও হিংসা তাণ্ডব নৃত্য না করে বেড়াতো।

বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবসে প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীকে আসন্ন স্বাধীনতা সমরের জন্যে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে; এই আসন্ন সঙ্কটকালে নির্বাচন প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে: ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যায় হুমকী ও অনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এ্যাড্ হক্ কমিটী নিয়োগের প্রতিবাদ করতে বলা হয়েছে। ভারতের এই সঙ্কটকালে এ "দিবস"এর প্রকৃত অর্থ সকলের কাছেই প্রাঞ্জল হয়ে গেছে আমরা এই আশা করছি।

ঐক্যের বাঁধা বুলি আওড়ে কেউ কেউ এর নিন্দাবাদ করেছেন। অথচ ঐক্যটা কেবলমাত্র প্রগতিশক্তির আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই কেন হবে তার জবাব তাঁরা দিতে পারছেন না।

ঐক্যের নামে দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা বিশ্বাসভঙ্গেরই নামান্তর। প্রকৃত ঐক্য দাক্ষিণ-পন্থীর বিলোপের সাথে সাথেই আস্‌বে, অথবা যদি তাঁরা সংগ্রামের পথে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে পরিচালিত করেন, অর্থাৎ যদি তাঁরা বামধর্মী হন তবেও ঐক্য আস্‌বে। বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতিগত। সুভাষচন্দ্র আন্তরিকতা নিয়েই বলেছেন,—"Meanwhile may we not appeal to Mahatma Gandhi to give up these long and tiresome journeys to Viceroy's House and to come and stand at the head of his countrymen as he did in 1920 ?"

"বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস" জাতীয় কংগ্রেসকে বিবেকের পথে. বিচারের পথে, বুদ্ধির পথে ফিরিয়ে আনবার আমন্ত্রণ।

STATE LIB
COOCH BEH

জয়শ্রী

অষ্টম বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৬ | দশম সংখ্যা

নতুন রং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গান)

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি
মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রং দেয় গুঞ্জন গীতি ॥

ফাগুনের চম্পক পরাগে
সেই রং জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রং লাগে,
সেই রং পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমা তিথি ॥

এই ছবি ভৈরবী আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি ॥

গান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ

অনিল চন্দ্র রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অহিংসা মুষ্টিমেয়ের জন্য হতে পারে, সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়

প্রাচীন গ্রীক দর্শনও মানুষের বিভিন্ন রুচি ও বিচিত্র প্রকৃতির কথা স্বীকার করেছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তিও বিবিধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবন সংগ্রামকে বরণ করে *। পারিপার্শ্বিকের আঘাতে সব লোকেরই এক রকমের প্রতিক্রিয়া বা প্রচেষ্টা হয় না। আঘাত করলে কেউ প্রত্যাঘাত করে, কেউ করে পলায়ন। কেউ হয় ক্রোধান্ধ, কেহ বা হয় করুণাপ্লুত। নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলেও প্রশান্ত মনে তার সম্মুখীন হতে পারে ক'জন লোক? দুঃসহ অত্যাচার চোখের সাম্‌নে দেখে কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও হিংসার অতীত থাকবে কজন? মুষ্টিমেয় কজন লোকের পক্ষে এই চিত্তপ্রশান্তি সম্ভব। "অক্রোধেন জিনে ক্রোধং"—প্রীতির দ্বারা ক্রোধকে জয় করার লোকোত্তর সাধনা পৃথিবীতে অতি বিরল। এ সাধনা নিতান্তই ব্যক্তিগত। যুগযুগান্তের তপস্যায় মানুষের এই দুরূহ অহিংসাযোগ সিদ্ধ হতে পারে। সমস্ত আধ্যাত্মিক যোগের চরম সুফল হলো এই নির্ব্বিশেষে বিশ্ব-প্রেম। এই সাধনাকে আয়ত্ত করবার মতন সংস্কার, পুরুষকার ও ক্ষমতা যাদের আছে তারাই এতে সফল হবেন। যারা সাত্ত্বিক চিত্ত-বৃত্তির অধিকারী তাদেরই স্বধর্ম্ম হলো এই সাধনা। যারা রাজসিক বা তামসিক তাদের নয়। "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততে সিদ্ধয়ে" ইত্যাদি গীতাতেই রয়েছে; লক্ষ কোটী লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ এই পথে যান; যারা যান, তাঁদের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ এতে সিদ্ধ হতে পারেন। যাঁরা এতে সিদ্ধ হবেন তাঁদের বুদ্ধদেব বলেছেন 'ব্রাহ্মণ'; সকল সংযোগ, সকল বন্ধনের ওপরে তাঁর স্থিতি "অথহস্স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছতি জানতো"; এরা নিজেদের প্রেমের তেজে নিজেরা সততই প্রদীপ্ত থাকেন,—"অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা"। কজন বিশেষ ক্ষমতা ও রুচির অধিকারী যা' করতে পারেন, তাকেই গান্ধীজী ছোট-বড়ো সকলের একমাত্র সাধনা করে তুলতে চান। যা' নিতান্ত বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত, তাকে করে তুলতে চান সার্ব্বজনীন ও সকল কালের।† রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সাময়িক প্রয়োগের জন্য নয়; আধ্যাত্মিক তপস্যা হিসেবে

---

* "Man meets the battle of life in the manner most consonant with the essential quality most dominant in his nature." (Essays on the Gita, pp 74).

† "Gandhiji tried to make this individual ideal into a social group ideal." (Jawaharlal).

নিখিল মানবের নিত্যকার অবলম্বনের জন্য। গান্ধীজীর এই চেষ্টা মনস্তত্ব, জীবতত্ব, এক কথায় সমস্ত বিজ্ঞানের বিরোধী। সকল ধাতুকে গড়ে পিটে' একই ধাতুতে পরিণত করা চলে না। মানব জাতির স্বভাবের মৌলিক পরিবর্ত্তন হলেই এ আশা সফল হতে পারে। সমষ্টিগতভাবে সকল মানবকে বিকার-রহিত প্রেম ধর্ম্মে সিক্ষিত, বিগলিত করে তোলা সম্ভব হবে কি? হবে বলে আমরা বিশ্বাস করিনে। অন্ততঃ সুদূর ভবিষ্যতে নয়। গত পনর হাজার বছরে মানুষের চেষ্টায় যা' হয়নি গান্ধীজী ন'মাসে ছ'মাসে তাকে সমাধা করতে চান। যাদের হৃদয়াবেগ কল্পনার পাখায় ভর করে কেবলি আকাশে উড্ডীন হয়, তারা এই স্বপ্নালু ভাবপ্রবণতায় আবিষ্ট হতে পারেন। কিন্তু কঠোর দার্শনিক বিচারে যারা পথ নির্ণয় করবেন তারা একে আমল দেবেন না। অরবিন্দ তাঁর "গীতা-প্রবন্ধ-মালা" (Essays on the Gita) নামক বইখানার "কুরুক্ষেত্র" "মানব ও জীবন যুদ্ধ" ইত্যাদি পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার করেছেন। * 'বিবেকানন্দ স্বামীও এই অবাস্তব আদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এককালে তুলেছিলেন। সমস্ত দেশ যখন তামাসিকতায় আচ্ছন্ন তখন চাই তীব্র রাজসিক উন্মাদনার বিদ্যুৎসঞ্চার; প্রেম ও অহিংসার কোমল প্রভাব তামসিক স্তরের মানুষকে আরো জড়ধর্ম্মী করে তোলে; যারা দীর্ঘদিনের অবসাদে ম্রিয়মান তাদের কাণে প্রেমসাধনার মধুর মন্ত্র শোনালে তারা সত্যিকার প্রেমিক হতে পারবে না; তারা হবে জড়ত্বের মুগ্ধ পূজারি। মানবজাতির সবাইকে একসঙ্গে সাত্বিক অহিংসায় বিশেষজ্ঞ করে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গান্ধীজির পরম ভক্ত জহরলালজীও সংশয় জর্জ্জর চিত্তে প্রশ্ন করেছেন, এ কী করে সম্ভব হবে? যা' বিশিষ্ট কোনো কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে তা কী করে জনসাধারণ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে জীবনে পালন করবে?† বাস্তব পরিস্থিতির কোন বিচার না করে নির্ব্বিশেষে এই আধ্যাত্মিক অহিংসার আদর্শকে পালন করতে গেলে ফল হবে, হয় ভণ্ডামী নয় হিংসার স্বাভাবিক প্রকাশ। হয় কৃত্রিম মুখোসে আবৃত হিংসাবৃত্তি মিথ্যার আশ্রয় নেবে; নতুবা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানে হিংসাবৃত্তি প্রকাশ্যভাবে সমাজের ওপরে ভেঙ্গে পড়বে। অহিংস আন্দোলনের ইতিহাসই তার সাক্ষী। যতবার গান্ধীজী গণআন্দোলনকে অহিংস থাকতে বলেছেন, ততবারই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষ রক্তপাত করেছে, নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত করেছে। ১৯২০ সনের আন্দোলন দ্রুতবেগে চৌরিচৌরায় এসে শেষ হলো, কিন্তু জনসাধারণ হিংস্র উন্মাদনায় করে বসল রক্তপাত ও হত্যা। গান্ধীয় অহিংসার ওপরে প্রকৃতি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়লো। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারিতে সংগ্রাম বন্ধ করে' দেওয়া হলো।

* "The gospel of universal peace and good will among men.........has never succeeded for a moment in possessing itself of human life during the historic cycle of our progress, because morally, socially, spiritually the race was not prepared and the poise of Nature in its evolution would not admit of its being immediately prepared for any such transcendence." (Essays on the Gita. pp 68).

†"Can National and Social groups imbibe sufficiently this individual creed of nonviolence, for it involves a tremendous rise of mankind in the mass to a high level of love and goodness?" (Jawaharlal, autobiography, pp 339.)

১৯৩০ সনের আন্দোলনেরও সেই একই পরিণতি ঘটলো। ১৯৩৩ সনের মে মাসে গান্ধীজী ৬ সপ্তাহের জন্য সংগ্রাম স্থগিত রাখলেন এবং পরে দ্বিতীয়বার ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার পরে পুনায় একেবারে আন্দোলন বর্জ্জিত হলো। ১৯৩৪ সনের বোম্বে কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করলেন, অহিংসা এবং সত্যের খাতিরে সংগ্রাম বন্ধ করা হলো। সংগ্রাম ক্রমেই গোপনতার পথে প্রবেশ করেছে এবং সত্য ও অহিংসার অপলাপ হচ্চে। কাজেই সংগ্রাম করা চলবে না, কারণ হলো "peculiar moral and spiritual character of the struggle." বারবার মানুষের প্রাকৃতিক বৃত্তি গান্ধীজীর এই কৃত্রিম আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, বারবার গান্ধীজী সংগ্রামকে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি ও বাস্তব পারিপার্শ্বিককে বিবেচনা না করলে অপর ফল হয় ভণ্ডামী। আমরা এমন দেখেছি যে অহিংস সৈনিকরা গোপনে গোপনে লাঠিয়ালের সাহায্য নিয়ে বিরুদ্ধ দলকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা করেছেন। বড় বড় মহারথীরাও এইরূপে অহিংসার নামে প্রবঞ্চনা করে থাকেন। গান্ধীজীর এই অবাস্তব আধ্যাত্মিক আদর্শের বিরুদ্ধে এইরূপেই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে। বারবার জাতীয় আন্দোলন তাই ব্যর্থতায় নিঃশেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহ বন্ধ করবার পূর্ব্বে গান্ধীজী বুঝতে দিয়েছিলেন যে হিংসার ছোঁয়াচ লাগলেই আন্দোলন বন্ধ করা হবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ আন্দোলন তিনি বন্ধ করেছিলেন। গান্ধীবাদের প্রধান দৌর্ব্বল্য এই যে গান্ধীবাদ মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করেছে। গান্ধীজী কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের দোহাই দিয়েছেন। তার মতে ঋষিরাই ভারতকে অস্ত্রত্যাগ করে অহিংসার মন্ত্রজপ করতে বলেছেন।* আমরা একথা অস্বীকার করি। ভারতীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্বকে গান্ধীজী নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন নি। ভারতীয় প্রতিভার প্রথম কৃতিত্ব হলো মানবচরিত্রের এই বহুবিধ বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা। ভারতীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মূলকথা হলো বাস্তববাদ; প্রাচীন ঋষিরা প্রকৃতিভেদে স্বধর্ম্মের ভেদকে স্বীকার করেছেন। তাঁরা আধার ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। গান্ধীজীর মত তাঁরা সকল রোগের একই ঔষধের ব্যবস্থা দান করেননি। অরবিন্দ ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; তাঁর আলোচনাও আমাদের এই মতকে সমর্থন করেছে; ভারতীয় সভ্যতা মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেছে।† আমাদের মতে অহিংসা সকল লোকের সকল অবস্থায় স্বধর্ম্ম হতে পারে না। জহরলালও একথা সমর্থন করেছেন।‡

*Having themselves known the use of arms, they realised their uselessness and taught a weary world that its salvation lay not through violence but through non violence." ("The Doctrine of the Sword," Gandhi, 1920)

†The ancient Indian civilisation laid peculiar stress on the individual nature, tendency, temperament and sought to determine by it the ethical type, function and place in the society." (Essays on the Gita, p. 70.)

‡This consideration must take into account the nature and weaknesses of collective man. Any activity on a mass scale.....is affected......by what the human material they work with thinks about it." (Autobiography, p. 550.)

ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসা বিলুপ্ত হতে পারে না

প্রশ্ন উঠবে ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ কি? ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসাবৃত্তি কি একেবারে বিলুপ্ত হবে? ভবিষ্যতের মানুষের মনে কি হিংসাবৃত্তি বলে কিছু থাকবেই না? দার্শনিক বিচারে এই ধরণের একাকার, দ্বন্দ্বহীন সমাজ সম্ভব বলে প্রমাণ হয়নি। সমাজতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব থেকেও আমরা সেই একই জবাব পাই। হিংসা বলতে দুটো মানে হয়, (১) হিংসা নামক মানসিক বৃত্তি, অপরের অনিষ্ট কামনা (২) হিংসামূলক কাজ বা শারীরিক বলপ্রয়োগ (violence). গান্ধীজীর অহিংসা হলো কায়মনোবাক্যের নির্জলা অহিংসা। মন থেকে অপরের প্রতি অশুভ ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত মুছে যাবে; সমস্ত মনের হবে একটা আমূল রূপান্তর, যার ফলে মন পূর্ণ থাকবে কেবল জীবজগতের প্রতি অবিমিশ্র প্রেমে। গান্ধীজীর আদর্শ হলো আধ্যাত্মিক একটা মৌলিক রূপান্তর। এই ধরণের রূপান্তর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে; আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সমষ্টি বা মানবসমাজের পক্ষে একই কালে এ রূপান্তর সম্ভব নয়। অধিকাংশ লোকের মনে হিংসাবৃত্তি থেকেই যাবে। সকল মানুষের মন থেকে এই বৃত্তিকে নিঃশেষে মুছে ফেলা যাবে একথা জীবতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব বলে না। একদল মনস্তাত্বিক বলেন যে মানুষের সহজ বৃত্তি হলো এই হিংসাবৃত্তি। একে জন্মের সঙ্গে মানুষ পেয়েছে, মৃত্যুকালেও এ থাকবে। সহজবৃত্তি (Instinct) গুলোর পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের মতে বিনাশ-প্রবৃত্তি (Death Instinct) মানুষের চিরন্তন সহচর। আবার একদল আছেন যারা পারিপার্শ্বিকের ওপরই মানুষের বৃত্তিগুলো নির্ভর করছে বলে মনে করেন; পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবেই মানবমনের মানসিক বৃত্তিগুলো সব জাতও সংগঠিত হয়। কাজেই এঁদের মতে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জাত ও লালিত হলে মানুষের মনকে অহিংস করেও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পারিপার্শ্বিকবাদী (Environmentalist) যান্ত্রিকব্যবহারবাদী (Behavourist) ইত্যাদি মতবাদীরা মানুষের মনকে নতুন করে গড়া সম্ভব মনে করেন। কাজেই সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে এমন নূতন সমাজ গঠন করা চলে যাতে মানুষ পরস্পরকে হিংসা করবে না, ঘৃণা করবে না। কিন্তু কথা হলো এই যে সমস্ত সমাজের সকল লোককেই পরিবর্ত্তন করা চলে কিনা? আমাদের মতে পারিপার্শ্বিকবাদ এক দিকের খবর রাখে, অপর শক্তির সম্বন্ধে কিছু খবর রাখে না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অনেক সময়ে কার্য্যকর হতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত উন্মুখতা বা বৃত্তিগুলো কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক হতেও প্রবলতর হতে পারে। তখন হাজার বাহ্য পারিপার্শ্বিকও মানুষের মানসিক গঠনের পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারে না। কাজেই সমাজের কিছু লোক অসামাজিক বা সমাজবিরোধী থাকবেই চিরদিন। এদের মনকে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হবে না। সহায়ক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বহুসংখ্যক লোককে একদিন হয়ত হিংসারহিত করে তোলা যেতেও পারে। একথা মেনে নিলেও, কিছুসংখ্যক লোক অন্ততঃ হিংসার স্তরে থাকবেই। অর্থাৎ হিংসাবৃত্তির ঐকান্তিক বিলুপ্তি ঘটবে না কোনোদিনই।

গান্ধীজী যে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকের আধ্যাত্মিক রূপান্তর কল্পনা করে থাকেন, তা অসম্ভব আদর্শ বই কিছু নয়। তারপরে হিংসামূলক কাজ (violence) সম্বন্ধেও এই কথা প্রয়োজ্য। মনের মধ্যে হিংসার বীজ বা অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকলেও মানুষ হয়তো বাইরের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বা ব্যবহারকে কিছুটা সংযত করে চলতে পারে। কাজেই এ কর্ম্মটী অপেক্ষাকৃত সহজ; অর্থাৎ মন থেকে হিংসাবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে দেওয়া অনেক কঠিন কাজ; তবে ভেতরে যাই থাকুক, বাইরে যদি অহিংস ব্যবহার বজায় রেখে মানুষ চলতে পারে, তবেই সমাজকে 'অহিংস' বলতে পারা যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে বাইরে 'অহিংস' ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে যদি অন্তরে হিংসা বর্জ্জিত না হয়ে থাকে। বাইরের সঙ্গে ভিতরের একটা অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। কাজেই অহিংস ব্যবহারও সমাজে সবাই করতে পারবে না; কিছুসংখ্যক লোক অহিংসা নীতিদ্বারা পরিচালিত হবে না।

এ অবস্থায় আমাদের লক্ষ্য কি? কী রকম সমাজ আমরা চাই? যে সমাজ চাই আমরা তার কি হিংসার ওপরেই ভিত্তি হবে? তবে কি আমাদের লক্ষ্য হবে হিংসামূলক সমাজব্যবস্থা? যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে, হিংসা করে? তা নয়। আমাদের মতে হিংসা থেকে অহিংসা সত্যি সত্যি মানুষের অধিকতর কাম্য। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিককে কামনা করে থাকে, রক্তপাত ও ধ্বংসের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা রয়েছে; এমন কি আদিম মানব রক্তপিপাসু বর্ব্বর বলে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাও আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা খণ্ডন করেছেন। শান্তিময় আবহাওয়া সকলেই চায়। রক্তপাত কেহ কামনা করে না। খামোখা রক্তপাত করবার মত নিষ্ঠুর সৌখীনতা কারুরই আছে বলে জানি নে। বিনা রক্তপাতে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে এমন কেউ নেই যে, তবু রক্তপাতের মধ্য দিয়েই কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করবে। মানুষ চালিত হয় আত্মরক্ষা ও আত্মসমৃদ্ধির প্রবৃত্তি দ্বারা। কিন্তু এই আত্মসমৃদ্ধির পথে বৃথা রক্তপাতকে এড়িয়ে চলবার একটা সহজ প্রবণতা মানুষের আছে। এই কারণে সবাই স্বীকার করবে যে অহিংসা-অতি উত্তম বস্তু। হিংসা থেকে অহিংসা অনেক ভালো। তাই এমন সমাজের কথা ভাবতে ভালো লাগে, যেখানে হিংসা থাকবে না, রক্তপাত থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না, মানুষের লাঞ্ছনা থাকবে না। কিন্তু কল্পনাটী পছন্দসই হলেও সম্ভব হবে না, আগেই আমরা দেখেছি। তবু মানুষ চেষ্টা করে সেই কাল্পনিক আদর্শলোকের দিকে অভিসার করতে। আদর্শের দিকে এগোবার সাধনা মানুষ তবু করবে। কারণ আদর্শের মধ্যে অর্দ্ধেক হলো বাস্তব এবং অর্দ্ধেক আছে মানুষের কল্পনা; 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে মানুষ রচনা করে তার আদর্শকে। তাই আদর্শ চিরদিনই নাগালের বাইরে থাকে। আদর্শ হলো নিখুঁত—কিন্তু দেশকালের অধীন এই দুঃখের সংসারে নিখুঁত কোন বস্তুই নেই; সংসারে দ্বন্দ্ব চিরদিনই থাকবে; কেবল অবিমিশ্র অহিংসার প্রশান্ত ছায়াতলে বসে মানুষ তার সুখনীড় রচনা করবে একদিন, এ কল্পনা মানুষের স্বপ্নলোকেই থাকবে, বাস্তবলোকে তার স্থান নেই। তবু মানুষ প্রাণপণ সাধনা করবে সেই লক্ষ্য-

স্থলে উপনীত হবার জন্য। কিন্তু একসঙ্গে সমগ্র মানবজাতি সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাবে, এমন কখনো হতে পারে না। সমষ্টির আধ্যাত্মিক মোক্ষ (collective emancipation) দেশকালের পৃথিবীতে হবে না। বিভিন্নকালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মোক্ষ সম্ভব হতে পারে। ক্রমবিকাশতত্ত্বের গোঁড়ার কথাই তাই। তবে এমন দিন হয়তো আসবে যখন বেশী সংখ্যক লোক অহিংস হলেও হতে পারবেন। কিন্তু সেই পরিকল্পিত নবযুগেও সমাজের একটা অংশ হিংসানীতির পরিপোষক থাকবে।

কিন্তু কবে একদিন পৃথিবীতে বহুমানব অহিংস হবেন, এই আশায় মানুষ কি বর্ত্তমান কালে নিষ্ক্রিয় থাক্‌বে? কখনই নয়। ভবিষ্যতের সাধনা মানুষ অদ্য হইতেই সুরু করবে; কিন্তু তার কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে স্থূল বাস্তব ও রূঢ় বর্ত্তমানের গূঢ় যোগ থাকা চাই। এখনো সেই নবযুগ আগত হয় নি,; আজও মানবের মধ্যে হিংসাবৃত্তি প্রবলরূপে রয়েছে; এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। যতদিন মানবসমাজে নবযুগের আবির্ভাব না ঘটবে, ততদিন বর্ত্তমান যুগানুযায়ী কালধর্ম্মকে অনুসরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে একদিন আকাশে উড়তে পারবো, এই আশায় যদি আজই হাত ছড়িয়ে আকাশে উল্লম্ফন করি, তবে হাত পা ভেঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য্য। অরবিন্দও বলেছেন, মানুষের ব্যবহারিক দর্শন ও ধর্ম্ম অকেজো হলে চল্‌বে না; বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার সংযোগ থাকা চাই। মানুষের মধ্যে যুযুৎসা আছে। তাকে চক্ষু বুজে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না। তাকে স্বীকার করে যোগ্যস্থান দান করতে হবে। সুদূর ভবিষ্যতে নয়—বর্ত্তমান কালের মানুষ যা', তার ওপরে ভিত্তি করেই বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম নির্ণিত হবে। কবে মানুষ পরিবর্ত্তিত হবে, সেই কল্পনার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হ'য়ে এখন থেকেই বিশ্বশান্তির গদ্ আওড়ালে লাভ হবে না। * আর একটা কথা আছে এখানে। বিশ্ব প্রেমের বাণী ছড়ালেই মানুষ অহিংস হবে না। মানুষ হিংসাব্রতী হয় ভিতরের এবং বাইরের দুই রকমের কারণে। মানুষের অন্তরে যে হিংসার বীজ রয়েছে তাকেও দূর করবার ব্যবস্থা চাই; তেমনি বাইরের জগতে আছে অহিংসার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক। মানুষ অনেক সময় বাহ্য অবস্থাসঙ্ঘাতের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় হিংসামূলক ব্যবহারে। সেই সব অবস্থাসঙ্ঘাতের পরিবর্ত্তন করে এমন সমাজব্যবস্থা যদি করা যায় যাতে মানুষের ওপরে মানুষের বিদ্বেষ হবার কারণ দূর হয়ে যায়, তবে মানুষকে বিশ্বপ্রেমের দিকে আনুকূল্য করা হবে। এই কারণে আগে সমাজব্যবস্থায় অহিংসা প্রচলনের যে বাধা রয়েছে সেই সব বাধা দূর করা দরকার। তা না ক'রে কেবল অহিংস হবার উপদেশ দিলেই মানুষ অহিংস হয়ে যাবে না। আমরা মনে করি পারিপার্শ্বিকের দ্বারা মানুষের চরিত্র, প্রবণতা ও

* "A day may come, must surely come, we will say, when humanity will be ready spiritually, morally, socially for the reign of universal peace; meanwhile the aspect of battle & the nature of function of man as a fighter have to be accepted and accounted for by any practical philosophy and religion." (Aravinda, Ibid pp 69).

ব্যবহার অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হয়। কুৎসিৎ আবহাওয়ার প্রভাবে মানুষ কুৎসিৎ কাজ করে থাকে, এ তো দৈনন্দিন ঘটনা। মানুষকে সুন্দর কোরবো, উদার কোরবো, প্রেমপ্রবণ কোরবো, এতো খুব ভালো কথা! কিন্তু সুন্দর হবার, উদার হবার পথে বাধা রয়েছে পদে পদে, বাধা রয়েছে সমাজের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক সকল রকমের ব্যবস্থায়। কাজেই আগে সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়তে হবে। তবে প্রেম সাধনার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারবে। এই হেতু অন্ধকার জগতে প্রেমপ্রচারের মূল্য অতি নগণ্য।

উপায় এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর যুক্তি ভুল

নৈতিক আদর্শ হিসেবে গান্ধীজী অহিংসার স্বপক্ষে কয়েকটী নীতিশাস্ত্রের (ethics) যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলো নিতান্ত পুরাণো যুক্তি, তবু আমরা এগুলোর গলদ প্রদর্শন করবো। কারণ বহুলোক এসব যুক্তির আবেদনে বিমুগ্ধ হয়ে থাকেন। গান্ধীজী বলেন—যে উদ্দেশ্য মহৎ হলেই চল্‌বে না, উপায়ও মহৎ হওয়া চাই। উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে গূঢ় যোগ রয়েছে। বিষগাছ বুনলে তার থেকে আম্রফল ফল্‌তে পারে না, বিষগাছই গজাবে। কাঁটাগাছে কাঁটাই ফল্‌তে পারে, গোলাপ নয়। তেমনি হিংসা থেকে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে না। অহিংসা-মূলক সমাজ গঠন করতে হলে হিংসামূলক উপায়ে সফল হওয়া সম্ভব নয়। বীজ এবং গাছের মধ্যে যে রকম অমোঘ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে "উপায়" এবং "উদ্দেশ্যে"র মধ্যেও তেমনি সম্বন্ধ রয়েছে। *

(ক) এখানে প্রথমেই বলা দরকার যে গান্ধীজী উপমার আশ্রয় নিয়েছেন; কিন্তু উপমা যুক্তি নয়। মোটামুটী সাদৃশ্যের দ্বারা সহজ ভাবে বোঝাবার জন্যই উপমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্য রকমের উপমা সংগ্রহ করে' আবার বিরুদ্ধ মতকেও প্রতিপাদন করা চলে। খারাপ জিনিষ থেকে ভালো ফল উৎপন্ন হতে পারে, এর বহু দৃষ্টান্ত জগতে রয়েছে। কালকূট বিষ থেকেও প্রাণপ্রদ ঔষধ হয়, এ তো সবাই জানে। প্রাচীন জগতে এবং আধুনিক পৃথিবীতে, বিষের কল্যাণকর ব্যবহার মানুষ জেনেছে। সাপের বিষ থেকে কত রকম বেরকমের কল্যাণকর ঔষধ তৈরী হচ্ছে, তার খবর কে না রাখে। আসল কথা হলো বস্তুকে ব্যবহার করবার পদ্ধতি। উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারলে এবং উপযুক্ত অবস্থার যোগাযোগ ঘটাতে পারলে বিষকেও অমৃতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। তেমনি হিংসাবৃত্তিকে যথোচিত আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ব্যবহার করতে পারলে সংসারের মঙ্গল সাধন করা যায়। মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে হিংসাবৃত্তি বা পশুশক্তিও বহুতর মঙ্গলের আকর হতে পারে। [ক্রমশঃ

* "Your reasoning is the same as saying that we can get a rose through planting a noxious weed."

* * * * * *

...The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree. (Hind Swaraj, pp 60).

চতুর্দ্দশপদী

সুধীর কুমার গুপ্ত

বর্ষ শেষ হ'য়ে আসে, ম্রিয়মান বসন্তের গান
এসেছে যে পথ বাহি, তারে যেন করিছে সন্ধান
সবারে বিমুখ হেরি ; এবার নামিবে যবনিকা,—
অস্পষ্ট দিগন্ত বুঝি উদ্ভাসিবে নূতন ভূমিকা
চঞ্চল সম্পদ পাতে, বুভুক্ষিত রঙের বিলাস
নগরীর ক্লিন্ন ধূমে হয়তো করিবে পরিহাস ;
শত নির্য্যাতন তলে এবারের প্রদীপ্ত স্বপন
জানিনা কাহার মাঝে নিজেরে করিবে অন্বেষণ।

বেদনা পাণ্ডুর এই জনতার কোলাহল তলে
আমরা হারায়ে যাই, প্রতিক্ষণে প্রতি পলে পলে
নিঃশেষে শিখিতে হয় যা' পেয়েছি এই মোর সব,
স্নায়ুতে কাঁপেনা তাই সমুৎসুক অশান্ত বিপ্লব ;
দুর্ব্বল বিকারগ্রস্ত আত্মা সেই অবহেলিতের
কেমনে দেখিবে স্বপ্ন মুক্তির নিগূঢ় আলোকের !

বিজয়িনী

রাণী রায়

দিগন্তরালস্থিত ধূষরাভ পাহাড়ের পশ্চাতে সূর্য ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। আকাশের সর্বাঙ্গে একটা গোলাপী আভা ফুটে উঠল। পৃথিবীও সেই লালিমা আপনার অঙ্গে মেখে হাসতে লাগল। চারিদিকের সব কিছুকে হাসিখুসী দেখা যেতে লাগল। শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ ও পাহাড়, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর এবং স্রোতস্বতী, পিংগল বর্ণের মেঘ, শ্বেত বর্ণের কুটীর ইত্যাদি সব কিছু আজ ঐ স্পর্শ-কাতর, মনোমুগ্ধকর আলোর সংস্পর্শে এসে যেন আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। একটী তরুণী ঠিক এমনি সময়ে দাঁড়িয়েছিল কুটীরের ধারে। তাকিয়েছিল সে আকাশের পানে। এই মৌন-সন্ধ্যায় তরুণীর মুখখানি হয়ে উঠেছিল সৌন্দর্য-সুষমায় মণ্ডিত—তার মুখশ্রীতে ফুটে উঠেছিল স্বর্গীয় বিভা। ঠিক ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটী যুবক—চোখে তার অপরূপ সৌন্দর্য-মহিমার বিস্ময়! তরুণীর কেশগুচ্ছ এবং ভ্রূযুগল যেমন কালো, ঠিক তেমনি কালো তার চোখ দুইটী। এমনি চোখ যেন আর হয় না! কিন্তু তার মুখ-চন্দ্রমার মাধুর্য বর্ধিত করেছিল তার গাত্র-চর্মের বর্ণ-সুষমা! সর্বোৎকৃষ্ট পোর্সেলিনের মতো তা শুভ্র, স্বচ্ছ। অতুলনীয় ওর কপোলের রক্তিম-আভা। সদ্য ফোঁটা রক্ত গোলাপ এনে তার পাশে রাখলেও সে আভা হবে না এতটুকু ম্লান। প্রকৃতি ওকে করেছে মহিমাময়ী—সূর্যের এই রঙীন আলোতে ও হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যময়ী।

"রোজা, প্রিয়া আমার", তরুণ বলল। ওর বিমুগ্ধ চোখের দৃষ্টি তরুণীর আননে নিবদ্ধ। "আজকে, এই বিদায়ের দিনে তোমায় এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন? এমন সুন্দর তো আগে তোমায় কোনদিন দেখায়নি।"

"অস্তাচলগামী সূর্যের রশ্মি পড়েই এমনটী দেখাচ্ছে, জিম, এ আর কিছুই নয়।"

"আমি তোমায় ভালবাসি, প্রিয়া, আমি তোমায় ভালবাসি", তরুণীর কটিদেশ আপন বাহু দিয়ে বেষ্টন করে আবেগজড়িতকণ্ঠে তরুণ বলল। সতৃষ্ণ নয়নে সে তাকিয়েছিল তরুণীর মুখের দিকে। তরুণীর কপোলের রক্তিমাভা যেন আরও একটু গাঢ় হ'ল। দেখে মনে হচ্ছিল, তার গণ্ডদেশের ঐ আরক্তিম বর্ণ যেন আলবাষ্টারের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া লাল আলো! কেন যে আজ ওকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে তার কারণ তরুণও জানত না—কেবল জানত যে তার নয়ন দুইটী পেয়েছে আজ সৌন্দর্য-রসের আস্বাদন।

"আমি যাব না। আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না।"

একটা বেদনা-কাতর ধ্বনি তরুণীকে আঘাত করল।

"কিন্তু, তোমায় যেতেই হবে, প্রিয়তম। এখন আর নিজেদের কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তুমি যাও, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। আলস্যে দিন না কাটিয়ে তোমাদের যাতে সাহায্য হয় আমি তাই করব।"

যুবক ওকে তেমনি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে স্তব্ধ হয়ে রইল। উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল-সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত নিমজ্জমান মানবের মত যেন সে তরুণীকে আঁকড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। তরুণীই যেন তার শেষ আশা ভরসা। এ আশ্রয়চ্যুত হলেই সে তলিয়ে যাবে চির-অন্ধকারময় কোন অতলগর্ভ মহাসিন্ধুর মাঝে।

অকস্মাৎ ও তাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করল—আপনার বক্ষে তাকে নিবিড়ভাবে চেপে ধরল। একটা দুর্নিবার অশ্রুর উচ্ছ্বাস তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তরুণীর রেশম সদৃশ্য উজ্জ্বল অলকদামের মাঝে আপনার মুখ লুকিয়ে ফেলল।

"রোজ, প্রিয়তমা, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না।"

তরুণী আপনার বাহু দিয়ে যুবকের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে ওর কানের কাছে আপনার পাতলা ঠোঁট দুইটী সরিয়ে আনল।

"জিম, আমার বীর প্রেমিক! তোমাকে যেতেই হবে যে! স্বদেশ তোমায় আহ্বান করছে! ভেবে দেখ, জিম, ওঁর সঙ্গে তুলনায় আমি কি? ও যে তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে, তোমায় ডাকছে। দেশ আজ বিপন্ন! তুমি তাঁকে নিরাশ করতে পার না!"

"আরও অনেক লোক রয়েছে তো!"

তরুণীর চুলের ভিতর হতে মুখ না-তুলেই যুবক অস্ফুটে জবাব দিল।

"তাঁরাও যাচ্ছে", তরুণী বলল, "কেউ থাকবে না। সমর্থ যাঁরা তাঁরা সবাই যাবে। তুমি থেকে গিয়ে নিশ্চয় অসমর্থ বলে নিজেকে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করবে না।"

"সেখানে গিয়ে যদি আমি অন্ধ হয়ে যাই।" রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সে বলল।

"কোন ক্ষতি নাই তাতে! সে হবে যে স্বদেশের জন্য। তাছাড়া, আমি আমার সকল সত্ত্বা দিয়ে তোমায় আবৃত করে রাখব।"

"কিন্তু তোমায়...তোমায় যে আর দেখতে পাব না", তরুণীকে দৃষ্টি সম্মুখে এনে জিম বলল। তার সতৃষ্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তরুণীর মুখের উপর পদচারণা করে ফিরতে লাগল। সে যেন চায় ঐ আনন আপনার হৃদয় কন্দরে গ্রথিত করে রাখতে--যাতে ভবিষ্যতে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে, অথবা দৃষ্টি-হীনতার দরুণ অথবা মৃত্যুর মাঝেও ঐ রম্য আলেখ্য লুপ্ত হয়ে না যায়।

তরুণীর আননে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল। "বিদায়, প্রিয়তম", ধীরে ধীরে সে বলল, "আবার আমরা মিলিত হ'ব। যদি এ পৃথিবীতে তা সম্ভবপর না হয়, তবে হ'বে পরলোকে।"

আকাশের সেই লালিমা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। পৃথিবীর কোল থেকে সূর্য তার আলো এবং আভা তুলে নিলেন। সাঁঝের তিমির কুন্তল ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ধরণীর বুকের 'পরে। তরুণ তরুণীর মূর্তিও সেই আবছা অন্ধকারে গেল ঢেকে। ঠিক এমনি সময় তরুণী জানাল বিদায়-প্রার্থনা। তরুণের সমস্ত বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল তরুণীর মুখের উপর।

চারিদিকের আঁধার আরও গাঢ় হয়ে এল। যুবক বিদায় নিয়ে চলে গেল। তরুণী সেই

নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর যতদূর সম্ভব আপনার দৃষ্টি মেলে তরুণের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল। ঐ মূর্তি অন্তর্হিত হ'তেই তরুণী ফিরে গেল আপনার কুটীরে। নয়ন তার শুষ্ক—বেদনার তীব্রতা যেন ওর নয়নের সমস্ত অশ্রু নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

বাড়ী এসে দেখে তার পিতা, তাদের বাড়ীর মালী এবং আরও গুটিকয়েক ব্যক্তি যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সে ভাবল: দেশের ডাকে সাড়া দেবার এই যে আকুল-আগ্রহ এর জন্যই স্বদেশ তার রয়েছে আজও স্বাধীন। আহ্বান এলে ওদের থাকে না শত্রুমিত্রের বিভেদ, থাকে না পুরুষ-নারীর প্রভেদ, থাকে না নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করবার অবসর। এমন কি বয়সের পার্থক্যভুলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামে।

ওঁরা চলে গেল। রোজা বেল রইল ঘর-দুয়ার আগলাতে আর ছোট বোনের দেখাশোনা করতে। সে সানন্দে এ ভার মাথা পেতে নিল। শুধু তাই নয়: বাড়ী থেকেও এই যুদ্ধে সে কি সাহায্য করতে পারে তাই ভাবতে লাগল দিনরাত!

আগষ্ট মাসের এক সূর্যকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর!

বেলা তখন তিনটা।

রাজপথের শুভ্রতা পথিকের চোখে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। পথের দু'ধারের গুল্মলতাগুলি এক প্রকার অদ্ভুত হলদে ধূলিতে আবৃত। গন্ধকের তীব্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। হাতুরীর শব্দে আর কান পাতা যায় না। বড় বড় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিকের কোলাহলে শহর হতে বিচ্ছিন্ন এই উপত্যকা আজ মুখর। সুউচ্চ দুইটি চিমনি দিয়ে অজস্র পীতাভ ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বেরুবার পূর্বে ওগুলো চিমনির মুখে এসে তালগোল পাকিয়ে খানিক থেমে তারপর অন্তহীন আকাশে আপনাদের মিশিয়ে দিচ্ছে।

ক্লান্ত চরণে একটি তরুণী সেই জ্বলন্ত রাজপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। চলতে-চলতে সে পথি-পার্শ্বের একটি দরজার দিকে ফিরল। ওটাকে ধরে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল অতি কষ্টে যেন সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সম্মুখের প্রসারিত প্রান্তরের দিকে সে একবার তাকাল। সূর্যতাপে সেই মাঠের বর্ণ হয়েছে হরিতাভ, আকাশের চলন্ত ধোঁয়ার ছায়া এসে তাতে পড়ছে বারে বারে এবং এরই মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি সরু পায়ে চলা পথ। পথটি শেষ হয়েছে প্রান্তরের সীমানায় ঘন বনের মাঝে।

তরুণী তার রক্তিম আঁখি দুইটি তুলে সেই পথের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল। আঃ, একটু ছায়ার জন্য কতক্ষণ ধরে-ই না সে প্রতীক্ষা করে আছে! ঐ বনানীর শীতল হাওয়ার জন্য তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। চার বৎসর আগের কথা! এই পথ ধরেই একদিন দুপুরে সে জিমের হাতে হাত মিলিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তখন বাতাস ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, পাখীর

সুমিষ্ট কূজন শুধু ভাঙত প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, ছিল না এমনি সব কারখানা, বাতাসে ছিল না কালিমা, মনও তাদের তখন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েনি যুদ্ধের চিন্তায়। কিন্তু আজ তা দুঃস্বপ্ন! ব্যথা বেদনাময় দীর্ঘ চারিটি বৎসর। ধীরে ধীরে তা অদৃশ্য হয়ে গেছে—রেখে গেছে দুঃখের একটা স্বপ্ন-স্মৃতি! পিতা তার চলে গেছেন অজ্ঞাত জগতে—সেখান থেকে আর তিনি ফিরবেন না কোনদিন। কিন্তু জিম? সে-ও কি আর ফিরবে না? ও চলে যাবার পর আর তাদের সাক্ষাৎ হয়নি। সে শুধু শুনেছে: যুদ্ধে জিম গুরুতর আহত হয়েছে। ওর পত্রাদিও বড় একটা আসত না, যাও আসত তাও দীর্ঘ অবসর নিয়ে। কিন্তু তাতেও নিরাশ হয়নি, নিজের কর্তব্য ভোলে নি। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওকে পত্র দিয়েছে। বাকী সময়টাতে করে গেছে নিজের কায। সে জানত, ওর কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করা বা চোখের জল ফেলাই তার একমাত্র কর্তব্য নয়। তাকে পরিশ্রম করতে হবে। উপার্জন ক'রে অর্থ সঞ্চয় করতে হ'বে। কে জানে জিম পঙ্গু, অসমর্থ, খঞ্জ বা অন্ধ হয়েও ফিরতে পারে। তখন যে ওর হবে অর্থের প্রয়োজন। তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে সেই প্রয়োজনের চাহিদা সে মেটাবে। আঃ, কি আনন্দই না তার তখন হ'বে! নিজের হাতে সে ওর সেবা করতে পারবে, আপনার শ্রদ্ধা ঢেলে দিতে পারবে। শুধু তাই নয়—স্বোপার্জিত অর্থে এনে দেবে জিমের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

নিজের জন্য খরচ সে-খুব কমই খরচ করত। কিন্তু এলার যাতে কোন কষ্ট না-হয় সেদিকে ছিল তার প্রখর দৃষ্টি। ফলে, তার নিজের স্বাস্থ্য যেতে লাগল নষ্ট হয়ে আর এলা দিনে দিনে হয়ে উঠতে লাগল সুন্দরী। এলার কাপড় জামা জুতো যখন যা লাগত বলা মাত্রই তা সে এনে দিত। কিন্তু নিজের জুতো যে ছিঁড়ে গিয়েছিল, টুপির শোলা যে বেরিয়ে পড়েছিল, জামা কাপড় যে পরার অযোগ্য হ'য়ে গিয়েছিল সেদিকে তার নজর ছিল না। যা টাকা তার হাতে জমেছিল তাতে সে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তাই কারখানায় বেশী বেতনে কোন বিপদজনক কায করবার জন্য যখনই আহবান আসত তখনই সে তাতে যোগ দিত। হউক সে কায বিপদসঙ্কুল, তবু সে টাকা ত বেশী পাবে। সেই টাকা যে তার প্রিয়তমের পরিচর্যায় লাগবে।

কিন্তু এই যৎসামান্য অর্থ সঞ্চয় করতে তাকে কতখানি ত্যাগ-ই না করতে হয়েছে। তার সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। একথা মনে হতেই সে শঙ্কিত হ'ল। আচ্ছা, ও যদি পঙ্গু হয়েই ফেরে তবে এ অবস্থায় সে কি করে তার সেবা শুশ্রূষা করবে? নাঃ তাকে আরও সবল হ'তে হ'বে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হ'বে। এজন্য আজ দুপুরেই সে কারখানা ছেড়ে বেরিয়েছে। বাড়ী গিয়ে আজ-সে বিশ্রাম নেবে। কাজ করতে করতে একবার সে সংজ্ঞা-হারা হয়ে পড়েছিল। নাঃ কি বোকা সে! নিজের অবিবেচনাকে সে ধিক্কার দিল। এবার থেকে তাকে সাবধান হ'তে হবে। বাড়ী গিয়ে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে, তারপর ঘুমাবে। তাহ'লেই শরীরটা ঝরঝরে হ'য়ে যাবে। দরজা ছেড়ে দিয়ে সে হাঁটতে চেষ্টা করল। কিন্তু পা যেন তার ভেঙে আসছে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হ'ল। কি

করে যেন গন্ধকের বিষাক্ত বাষ্প তার লোমকূপের ভিতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করেছিল। ভয়ে ভয়ে সে তার হাতের দিকে তাকাল। ইস্, এ যে একেবারে হলদে হ'য়ে গেছে—অথচ তা ছিল শ্বেতশুভ্র !

কাঁপতে কাঁপতে সে এসে কোন প্রকারে আপনার বাড়ীর দোরে দাঁড়াল। ওর ভগ্নী বেরিয়ে এসে ওকে অভ্যর্থনা করল। "আঃ দিদি, তোমাকে আজ ভারী অসুস্থ দেখাচ্ছে !" তরুণী বলল, "তুমি বস এসে। আমি চা ক'রে আনছি।"

তরুণী তার দিদিকে ধরে নিয়ে জানলার ধারে একটি পুরোনো আরাম কেদারায় বসিয়ে দিল। তার মাথার পেছনে একটি বালিশ রেখে দিল। তারপর মৃদু হেসে ওর উপর ঝুঁকে পড়ল।

রোজের আননের সেই অপরূপ গোলাপী আভা ফুটে উঠেছিল এই তরুণীর কপোলে। তার দেহ-সৌষ্ঠব ছিল রোজের চেয়ে সুন্দর। তাই এই দু'য়ের সম্মিলনে তরুণীকে দেখাচ্ছিল লাবণ্যবতী।

"দিদি, সুসংবাদ আছে একটা। শুনবে ?......না......তুমিই বল দেখি সুসংবাদটি কি হতে পারে ?" কৌতুকোজ্জ্বল কণ্ঠে তরুণী বলল।

রোজা মুখ তুলে তাকাল। তার কপোলের সেই অতুলনীয় রক্তিমাভা, ওষ্ঠের লালিমা যেন সেই বিষাক্ত বাষ্প শুষে নিয়েছে। মৃতের মত তা দেখাচ্ছে রক্তহীন হলদে। রোজা একবার হাসতে চেষ্টা করল। "তুমি-ই বলনা দেখি," সে ভারী গলায় বলল।

"জিমের সংবাদ এসেছে," তরুণী সানন্দে চীৎকার ক'রে উঠল, "সে আসছে। আজ তার টেলিগ্রাম পেয়েছি, লণ্ডন থেকে করেছে; এবার বল আমায় কি দেবে ?" বলে টেলিগ্রামটি বের ক'রে নৃত্যচপল ভঙ্গীতে সে দূরে সরে গেল। চোখে তার দুষ্টমি মাখান। সমস্ত অবয়বে যৌবনের পূর্ণচ্ছটা, গতিভঙ্গিমায় উচ্ছলতা।

"দেব একটা চুমু," বলে রোজা হাত বাড়াল, "এবার দাও ওটা আমায়। দেখি কি লিখেছে ও।"

"শুধু একটা চুমু !" তরুণী হেসে উঠল, "কে চায় তোমার ঐ হলদে ঠোঁটের চুমু। কিন্তু তোমায় কি বিশ্রী দেখাচ্ছে ! আচ্ছা, দিচ্ছি তোমার টেলিগ্রাম। আর তোমায় কারখানায় যেতে হবে না ভেবেই আমি খুসী হচ্ছি।"

ভগ্নীর দিকে টেলিগ্রামটি ছুঁড়ে দিয়ে তরুণী চা বানাতে মন দিল।

রোজা কম্পিত হস্তে টেলিগ্রামটি তুলে নিল। জিম দেশে ফিরে আসছে। সমস্ত জগৎ যেন স্তব্ধ হ'য়ে তার টেলিগ্রাম পড়া শুনতে লাগল। আঃ কি আনন্দ ! লেখাগুলো যেন তার চোখের সম্মুখে নৃত্য করতে লাগল। "সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে ফিরে এসেছি। কালকেই তোমার কাছে পৌঁছব জিম।" আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে সে হাঁপাতে লাগল। সুস্থ, অক্ষত দেহে ও ফিরে আসছে তার কাছে ! এ যে তার মহাভাগ্য ! সে কৃতজ্ঞ থাকবে চিরকাল ! ঠিক সময়েই ফিরে এল ও ! পরিশ্রম করবার সামর্থ্য যে আর ওর নেই। এবার সে বিশ্রাম নিতে পারবে। ওর সব কাহিনী শুনলে জিম কত খুশিই না-হবে। ও এলেই ওরা দু'জনে যাবে

ডাকঘরে। এতদিন ও যা কিছু জমিয়েছে সব তুলে দেবে ওর হাতে। কারণ, সেই-তো এর মালিক।

"এই নাও চা। এক চুমুকে খেয়ে ফেল দেখি। শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠবেখন।"

"আপনার অজ্ঞাতেই কখন যেন ওর নয়ন দু'টি মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। আজকাল এমনটি ওর প্রায়ই হয়। ভগ্নীর আহ্বানে সে চোখ মেলে তাকাল। দেখে এক কাপ চা নিয়ে ওর বোন দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। চা-র কাপ তুলে নিয়ে ও নিঃশব্দে পান করতে লাগল।

"অশেষ ধন্যবাদ! এবার আমার অনেকটা ভাল লাগছে। এতদিন পরে ওকে ফিরে পাওয়া খুবই সুখের, না, এলা? বাড়ীঘর এবার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ওকে বাবার ঘরটাই দেওয়া যাবে, না? কয়েকদিন ও থাকবে নিশ্চয় ? খুব আমোদ হবে, কি বলিস্ ?"

ব্যাগ্রব্যাকুল কণ্ঠে সে বলল। লজ্জায় মুখ তার লাল হয়ে উঠল। চোখ দুইটি জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল।

"শিগ্‌গীরই তো তোমাদের বিয়ে হবে, না?" এলা ধীর কণ্ঠে বলল, "তারপরেই আমায় এখান থেকে সরতে হবে?"

"কি বলছিস তুই? আমাদের বিয়ে হ'লে তোকে চলে যেতে হবে কেন? এর পরেই যে তোর বিয়ে দেব, এলা। তুই আগের চেয়ে কত সুন্দরই না-হয়েছিস!"

"সত্যি?" জিজ্ঞাসা করে এলা উঠে আয়নার নিকট গেল। আরশীতে তার সুন্দরশ্রী লাবণ্যমণ্ডিত আনন ভেসে উঠল। নিজ কপোলের বর্ণ-সুষমা লক্ষ্য করে সে নিজেই মুগ্ধ হল।

"আমার গায়ের রঙ্ ঠিক তোমার মতই হয়েছে, না দিদি?" ক্ষণপরে সে বলল। "কারখানায় যাবার আগে তোমার রঙ্ ঠিক এমনি-ই ছিল। নাঃ, ওখানে গিয়ে কাজ না-করাই তোমার উচিত ছিল।

"আমার....আমার মনে হয় ঠিকই করেছি।" রোজা জবাব দিল। একটা অজ্ঞাত শঙ্কা এবং অব্যক্ত বেদনা যেন তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ফেললে। পিতা আর বেঁচে নেই...জীবন দিয়েছেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে...জিমও তো সেখানেই ছিল...সে অবশ্য ফিরে এসেছে, কিন্তু ভবিতব্য কে জানে?"

"এর জন্য এমন বিপদসঙ্কুল কাজ করা তোমার উচিত হয়নি।"

"জিম গিয়েছিল যুদ্ধে, কে জানে হয়ত সে ফিরত পঙ্গু হয়ে। কি করে তার সেবাশুশ্রূষা চলত অর্থ না-থাকলে? তাই ত আমায় ঐ কায করতে হয়েছে।"

"তার মানে, ও পঙ্গু হ'য়ে ফিরলেও ওকে তুমি বিয়ে করতে নাকি?"

"নিশ্চয় করতাম, এলা। তখন তাকে আরও বেশী ভালবাসতাম, আমার সঞ্চিত অর্থ তার সেবায় ঢেলে দিয়ে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করতাম।"

"আমি কিন্তু কোন কানা খোঁড়াকে বে করতে রাজী হতাম না। তাকে পাঠিয়ে দিতাম হয় হাঁসপাতালে নয় অন্য কোথাও।"

"ওকথা বলে আমায় আর ব্যথা দিস্না, এলা। জিমকে হাঁসপাতালে পাঠাবার কথা-যে আমি কল্পনাও করতে পারিনে!"

"যাক ওসব কথা। চল এবার ঘরগুলো গুছিয়ে ফেলি।"

দিনের আর বাকী সময়টা দুবোনেই ব্যস্ত রইল। ঘর দোর পরিষ্কার করে, জানালায় নূতন পর্দা ঝুলিয়ে, বাসনপত্র মেজেঘষে, টেবিলগুলি ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে, জিমের জন্য চমৎকার একটি শয্যা রচনা করে তারা কায শেষ করল।

শোবার আগে রোজা আবার এসে জিমের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করল। বাঃ কি সুন্দর ফুটফুটে হয়েছে ঘরটি। ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে ঘরের হাওয়া ভরে গেছে। নাঃ, বেশ হয়েছে। মুখে তার মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল। সে সরে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াল। আয়নার দিকে তাকাতেই তার ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। উঃ, এ যে দেখছি একেবারে হলদে হয়ে গেছে। সে আরও একটু এগিয়ে দাঁড়াল। সারা কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে সেই হলদের ছোপ্! চুলগুলোও হ'য়ে উঠেছে লালচে, অথচ চার বৎসর পূর্ব্বে এগুলো ছিল সিল্কের মত মসৃণ আর ঘন কালো। দৃষ্টিতে তার একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে ফেললে।

"আচ্ছা, আমি কি বোকা! সব কথা শুনলে জিম নিশ্চয়ই আমায় আরও অধিক ভাল-বাসবে। অথচ আমি শুধু শুধু কি সব ভাবছি।"

সে শুতে গেল পরম সন্তোষ নিয়ে। তার পরিশ্রান্ত মনের নিদ্রা স্বপ্ন-মুখর হয়ে উঠল আগামী দিনের সুখ-কল্পনায়।

পরের দিন অসম্ভব গরম পড়ল।

এর ভিতরই দু'বোনে প্রায় ছুটাছুটি করতে লাগল। দুই তিন মিনিট পর-পরই তারা ছুটে গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত বাইরের দিকে। এমন করে অনেকক্ষণ কাটল। পরে রোজা শ্রান্ত হয়ে কেদারায় বসে পড়ল। এলা তখন ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে, তার চক্ষেই পড়ল জিমের মূর্তি সর্বপ্রথম। রোজা বসে বসে শুনতে লাগল তার বহু আকাংখিত প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর। সে বলছে, "রোজ! প্রিয়া আমার! আবার আমাদের মিলন হল। তুমি কিন্তু ভারী সুন্দর হয়েছ।" প্রত্যুত্তরে শোনা গেল তার ভগ্নীর হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর।

"থামুন, বোকা ছেলে। দেখছেন না যে আমি আপনার রোজা নই। আমার কথা বুঝি মনে নেই আপনার? মনে পড়ে আপনি আমায় ডাকতেন "খুকী" বলে। চলুন, বাড়ীর ভিতরে।"

রোজা ছুটে বাইরে এল। ব্যগ্র বাহু দিয়ে সে জিমের গলা জড়িয়ে ধরল।

"জিম! প্রিয়তম আমার!"

আপনার ভুল বুঝে জিম হাসছিল। রোজাকে সে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চেপে ধরল। চুম্বনে চুম্বনে তার কপোল ভরে দিতে লাগল। ক্ষণপরে দুহাতে ওর মুখখানা তুলে ধরে তার দিকে তাকাল।

রোজাও সপ্রসংশ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আঃ, কত সুন্দরই না হয়েছে জিম!

"তোমার হয়েছে কি রোজ?" জিম জিজ্ঞাসা করল। তার বলার ভঙ্গী লক্ষ্য করে রোজ শঙ্কিত হ'ল।

"জানেন না বুঝি, আপনি যাবার পরেই দিদি গিয়ে ঐ অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় কাজ নিয়েছিল। তার ফলেই ওঁর শরীরের হয়েছে এই হাল।" এলা বলল, "দিদির গায়ের রঙ ছিল গোলাপের মত ফুটফুটে। এখন সেই গোলাপ গেছে শুকিয়ে,—রয়েছে শুকনো পাপড়ি।" বল্লে সে খিলখিল করে উঠল।

জিম সস্নেহে রোজকে নিজের বুকে টেনে নিল। তার কেশগুচ্ছে চুম্বন করতে লাগল। ওর এই সোহাগ-স্পর্শ তার ভালই লাগছিল কিন্তু তবু কেন জানি একটা অব্যক্ত তীব্র বেদনায় তার সারা অন্তঃকরণ বিষিয়ে যাচ্ছিল। জিম এসেই যেমন স্নিগ্ধ-মধুরকণ্ঠে কথা বলেছিল এখন তার কণ্ঠে সেই স্বর ছিল না। কি সুধা মাখান কণ্ঠেই না তখন বলেছিল, "তুমি ভারী সুন্দর হয়েছ।" কিন্তু কই এখন তো ও আর সে-কথা বলছে না।

জিমের বক্ষে মুখ লুকিয়ে রোজ স্তব্ধ হয়ে রইল। জিম আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু দৃষ্টি তার অদূরে দণ্ডায়মান এলার লাবণ্যমণ্ডিত মুখের উপর নিবদ্ধ।

"কেন তুমি এত পরিশ্রম করেছ, প্রিয়তম?"

"তোমার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা যে প্রয়োজন ছিল।"

অকস্মাৎ সে মুখ তুলে জিমের দিকে তাকাল। তাকিয়ে দেখে দৃষ্টি তার বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ভগ্নীর মুখের উপর নিবদ্ধ। দেখেই তার সারা দেহ যেন বরফের মত শীতল হয়ে গেল। আস্তে ওর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে সে তড়িৎগতিতে গিয়ে আপনার কম্পিত দেহ ঢেলে দিল আরাম কেদারায়।

"আমাদের একটু একা থাকতে দাও, এলা। আমাদের কিছু কথা আছে।" রোজা অতি কষ্টে বলল

"জিমের গল্প শোনার ইচ্ছা আমারও ছিল কিন্তু", অনিচ্ছুকভাবে দ্বারের দিকে যেতে যেতে এলা বলল।

"আচ্ছা, সে-গল্প পরে হবে। আমার নিজের সম্বন্ধে ওকে কিছু বলতে চাই, আর সে তো তুমি জানই।"

"ওঃ! সে কথা! বেশ, আমি বাগানে যাচ্ছি। দরকার হ'লে ডেকো।"

জিমের দিকে ফিরে একটু মুচ্‌কি হেসে এলা বেরিয়ে গেল।

রোজা ঘুরে বসল জিমের দিকে। তার কেমন যেন দুর্বল এবং অসোয়াস্তি লাগতে লাগল। জিমের মুখে অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে সে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। কিন্তু এখন দুর্বল হলে চলবে না, যে-কথা বলার জন্যে তার সমস্ত হৃদয় উতলা হয়ে উঠেছে, এবার তা বলতেই হবে। খানিক ইতস্তত করে সে বলতে লাগল দীর্ঘ চার বৎসরের ইতিহাস। কি করে ওর জন্য অর্থ সঞ্চয় করেছে ওকে পূজা করেছে, ওর জন্য প্রার্থনা করেছে, ওকে ভালবেসেছে এই গুলো সে একনিঃশ্বাসে বলে গেল। জিম নীরবে সব শুনে গেল কিন্তু চোখ তুলে একবারও তাকাল না। অথচ রোজা জানে পূর্বে যখনই তারা কথা বলত তখন জিম তার দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকত। আজ আবার তারা কথা বলছে কিন্তু তা যেন নেহাৎ প্রাণহীন। মনে হ'ল রোজা যেন তার জীবন ভিক্ষা চাইছে। কোন অশুভক্ষণে যেন তাদের ভিতর গড়ে উঠেছিল এক বিরাট প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেদ করে অগ্রসর হবার শক্তি ছিল না রোজার। মনে হ'ল, জিমের সমস্ত উৎসাহ, আগ্রহ, উল্লাস ইত্যাদি সব কিছু যেন তার সেই প্রথম সম্ভাষণের পরেই নিঃশেষে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তা ফিরিয়ে আনবার শক্তি রোজার নেই। সঞ্চিত অর্থের কথা বলতে গিয়ে রোজার কণ্ঠস্বর বিজয়-গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সঞ্চয় করবার কারণ, ভবিষ্যতের আশঙ্কা, প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ ইত্যাদি সব কিছু সে উল্লেখ করল। কিন্তু জিম এতে যেন একটুও বিস্মিত বা সন্তুষ্ট হলো বলে মনে হ'ল না।

"যা করেছ তা ভালই, কিন্তু ওসব না-করলেই পারতে। যদি আমি পঙ্গু হ'য়ে ফিরতামই তবে আমার জন্য যা করা প্রয়োজন গভর্ণমেণ্টই তা করতেন, সেজন্য তোমার মাথা না ঘামালেও হত। এমন ভাবে তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করায় আমি সত্যই দুঃখিত।"

"সত্যিই কি আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে?" বিহ্বল ভাবে রোজা প্রশ্ন করল।

"একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।" ক্ষণিকের জন্য একবার তাকে দেখে নিয়ে জিম জবাব দিল। "অথচ দেখ, তোমার বোনের স্বাস্থ্য কত ভাল হয়েছে। আমি যখন যাই—তখন তোমাকে দেখাত, ঠিক ওর মত।" বলে জিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

রোজা স্তব্ধ হ'য়ে রইল। সে মারাত্মক ভুল করেছে, এই উপলব্ধি ধীরে-ধীরে তার হৃদয়ে একটা মৃত্যু-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলল। একটি ভুলের জন্য আজ তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে অনেকটা সময় কেটে গেল।

একটা অব্যক্ত বেদনায় রোজার সমস্ত অন্তর আকুল হয়ে উঠল। সে নিঃস্পন্দভাবে কেদারায় পড়ে রইল। ক্ষণপরে জিম উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

"আমি বাগান থেকে একবার ঘুরে আসিগে," জিম বলল, "তুমি বসে একটু বিশ্রাম নেও।"

রোজা মৃদু হেসে সম্মতি দিল।

জিম চলে গেল। রোজা নিঃশ্চল নিঃসাড় দেহে দৃষ্টি তার ভূমিতলে নিবদ্ধ।

রোজা যেমন কোমল হৃদয়া, প্রেমিকা, ঠিক তেমনি আবার সে দুঃসাহসিকা। সিংহীর মত দুর্জয় সাহস ছিল তার। তাই যে সর্বনাশ সে আপনার জীবনে ডেকে এনেছিল তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে ভয় পেল না। সেই সর্বনাশের গুরুত্ব হ্রাস করবার চেষ্টা সে আদৌ করল না আজ সে হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, তার প্রিয়তম জিমকেও। যা সে ভেবেছিল তেমন কিছুই ওর হয়নি। জিম ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ সুস্থ সমর্থ দেহ নিয়ে কিন্তু তাকেও হারিয়ে ফেলল। এ যেন দুর্বোধ্য প্রহেলিকা সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবে কি জিম তার কপোলের ওই ক্ষণস্থায়ী রক্তিমার জন্যই তাকে ভালবাসত? তাইত মনে হয়। আর সে? সে যদি বিকলাঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরত তবে ত রোজা তাকে আঁরও বেশী ভালবাসত। সেবা দিয়ে তার সমস্ত ব্যথা বেদনার লাঘব করবার চেষ্টা করত। এই বুঝি পুরুষের সত্যিকার রূপ। কিন্তু এতো তারই দোষ। এ কথাটা তার আগেই জানা উচিত ছিল। কাদের যেন পদশব্দ শোনা গেল। বোধ হয় ওরা বাতায়নের ধার দিয়ে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওরা দুজনেই চলেছে। আঃ ওকে কত প্রফুল্ল কত সুন্দরই না দেখাচ্ছে; আর তার ভগ্নীর মুখশ্রীতে ফুটে উঠেছে অপরূপ মাধুর্য। কথা বলতে বলতে ওরা চলে গেল।

রোজা আবার উপবেশন করল। তার মনে হ'ল, একটা তপ্ত লৌহ শলাকা যেন তার বক্ষের হাড় মাংস ভেদ করে অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে বিঁধছে।

সান্ধ্য ভোজের সময় হয়ে এল। হাসতে হাসতে ওরা দু'জনে এসে টেবিলে বসল। হাসি গল্পের ভিতর দিয়ে খাওয়া দাওয়া চলতে লাগল। খেতে খেতে জিম তার নানা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল। রোজা যেন স্বপ্নের মধ্যে জিমের কথা শুনতে লাগল। কিন্তু সে-স্বর পূর্বের মত তেমন মধুর নয়—মনে হয় বড় নিষ্করুণ।

খাওয়া দাওয়া সেরে জিম তার পাইপে তামাক ভরে নিল। তারপর বলল, "আজকের সন্ধ্যেটা আমোদেই কাটবেই। চলনা একবার বাগান থেকে বেড়িয়ে আসি।" যদিও জিম রোজার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলল, তবু রোজের কেন জানি মনে হ'ল, যে জিম চায় না যে সে তাদের সঙ্গে যায়।

"শরীরটা আমার ভাল লাগছে না, আমি যাব না", ক্ষুব্ধ বিষণ্ণকণ্ঠে রোজা বলল। বলতেই জিমের চোখ দুইটী যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা রোজার দৃষ্টি এড়াল না।

"তুমি এবার শুয়ে পড়গে, রোজ। আমরা একটু ঘুরে শিগ্‌গিরই ফিরে আসছি", বলে সে এগিয়ে এসে রোজাকে চুম্বন করল। তাদের গতিশীল মূর্তির দিকে বাষ্পাচ্ছাদিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। বাসনগুলো পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর নিজ কক্ষে এসে শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর সে চোখ মেলে তাকাল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না এতটা সময় তার ঘুম না সংজ্ঞাহীনতার ভিতর দিয়ে কেটেছে। বেশ রাত হয়েছিল। আকাশে চাঁদ উঠেছিল এবং

তারই ক্ষীণ আলো এসে ঘরে ঢুকেছিল। বাতায়ন-পথে মৃদু-হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছিল। অকস্মাৎ তার এই জাগরণের কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করবার জন্যে সে শয্যার অপর পার্শ্বে হাত বাড়াল। কিন্তু সে অংশ শূন্য। এমন সময় বাইরে তাদের মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। জিম কি যেন বলছে না? নিশ্চয় তারা বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"ও কথা ছেড়ে দাও, এলা। অমনি পাংশুটে মুখ আমি দেখতে পারিনে। ওকে বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না। আমার কথা শোন। চল, আমরা দু'জনে এখান থেকে চলে যাই। ওর কোন কষ্টই হ'বে না। বাড়ীটা রয়েছে, আমার জন্য যে টাকা জমিয়েছিল তা রয়েছে, চলে যাবে। এবার বুঝলে ত, ডার্লিং, আমার কথা—" এর পরে আর শোনা গেল না। বোধ হয় ওরা চলে গেল।

রোজা এসে চন্দ্রালোকে দাঁড়াল। অপরিসীম ব্যথার ভারে তার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। হায়, এই তার জিম! তার প্রিয়তম! ওরই জন্য সে করতে চলেছিল আত্মবলি দান। মিথ্যা মায়ার যন্ত্রণা যে দুঃসহ! রোজার মনে হল আজ ওর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে, সে যে যাতনা অনুভব করছে তা পূর্বের বেদনার চেয়ে অধিকতর মর্মন্তুদ। এ যন্ত্রণা তার আদর্শের বিসর্জনের জন্য নয়, তার আদর্শের অবমাননার জন্য। জিম তাকে কোনদিনই ভালবাসেনি। বাসতে পারেনি; শুধু ভাল বেসেছিল তার কপোলের বর্ণ-সুষমাকে! অন্ধকারে অকস্মাৎ আলোর ঝলকানির মত একটা সত্য তার মনে পড়ল। যদি তাই হয়, তবে সে প্রেমের মূল্য কি? প্রেম সে পেয়েছিল কি পায়নি তা চিন্তা করারও কোন মূল্য নেই। তার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে বিজলী চমকের মত আবার তার মনে উদয় হ'ল অন্য ভাবনা। সে ত শুধু এর জন্য, এই অকৃতজ্ঞ প্রেমের জন্যই পরিশ্রম করেনি। সে পরিশ্রম করেছে দেশের জন্য—যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল তারা যাতে অস্ত্রশস্ত্র পায় তাদের জন্য। অবশ্য তাদের ভিতর জিমও একজন। যাক্, যা সে করেছে তার জন্য সে অনুতপ্ত নয়। এখন আবার যদি সে তার স্বাস্থ্য ফিরে পায়, তবে সে কি কোন পুরুষের প্রেম যাচ্ঞা করবে? নিশ্চয় না। প্রেমের মূল্য যে কি আজ তা সে উপলব্ধি করেছে। হৃদয় তার ব্যথায় ককিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সেই নিদারুণ ব্যথা যেন সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হ'ল, সব কিছু যেন তার সম্মুখ থেকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কোন শব্দ সে করল না, এমন কি একটী ক্ষীণ আর্তনাদও নয়। কোন প্রকারে উঠে গিয়ে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্‌সিল নিয়ে এল। কাগজে কি যেন লিখল, তারপর শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

* * * * *

ক্ষণপরে এলা চুপি-চুপি ঘরে এসে ঢুকল। হাতড়াতে হাতড়াতে শয্যায় গিয়ে রোজাকে স্পর্শ করেই চমকে উঠল।

"জিম! শিগগীর এস!" সে আর্তনাদ করে উঠল।

জিম এসে ঘরে ঢুকল।

"ব্যাপার কি ?" বলে সে বাতি জ্বালাল। আলো জ্বলতেই জিমের চোখে পড়ল এলার আতঙ্কগ্রস্থ মূর্তি।

"জিম! দিদি আর বেঁচে নেই।"

জিম এগিয়ে এসে ওর মুখের দিকে তাকাল। যে হল্‌দে মুখখানাকে সে করেছে ঘৃণা, সে মুখ এখন দেখাচ্ছে বরফের মত শাদা। তার পাতলা ঠোঁট দুইটীতে রয়েছে হাসিমাখা। সে বুঝল, সত্যি রোজ আর বেঁচে নেই।

"এটা কি ?" বলে সে একটু করা কাগজ রোজার মুঠো থেকে টেনে নিল। কাগজের ভাঁজ খুলতেই তাদের চোখে পড়ল মাত্র দুইটী শব্দ ঃ

"ক্ষমা করিলাম !" *

বিদেশী গল্পের অনুবাদ।

ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট

মহেন্দ্র নাথ

যুগান্তরকারী রুশ বিপ্লবের অবসানে রুশিয়ায় যখন শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালাভ করল, তখনই দুনিয়ার ধনতন্ত্রবাদের কাঠামোতে ধ্বংসের সূচনা দেখা দিলো। ধনতন্ত্রবাদের বনিয়াদ রক্ষা করবার জন্য ধনিকগোষ্ঠী মাতাল হ'য়ে উঠলো। আর আশ্রয় নিলো সন্ত্রাসবাদের। দুনিয়ার সর্বত্র সর্বহারা শোষিতদের মাঝে আত্মসচেতনা এবং আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের আভাষ পেয়ে বিশ্বের ক্যাপিটালিষ্টগণ প্রমাদ গুণলো। ইহার ফলে ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিজ্‌ম-এর অভ্যুদয় হ'লো এবং সেখানে ধনিকবাদ হ'লো সু-প্রতিষ্ঠিত। তারপর ১৯৩১ সালে জার্মাণীতে হিট্‌লারের নেতৃত্বে নাৎসী অভ্যুদয়ের ফলে ক্যাপিটালিজম্-এর জয়-বার্তা ঘোষিত হ'লো। ফ্যাসিষ্টবাদ অথবা ফ্যাসিষ্টবাদ বনাম নাৎসীবাদ গণতন্ত্রের একটা ধূয়া মাত্র। মাঝে মাঝে যখন এদের গণতন্ত্রের মুখোস খসে' পড়ে, তখনই তাদের সত্যিকার রূপ আত্ম প্রকাশ করে; দুনিয়ায় সৃষ্টি হয় ধ্বংশ লীলার আলোড়ন। এখানে জার্মাণীর ফ্যাসিষ্ট অর্থনীতির একটুখানি আভাষ দিলে আশা করি অন্যায় হ'বেনা।

"You industrialists, stand for the maintenance of private property, which is an aristrocratic principle; but you have not yet made up your minds whether or not you are to oppose democracy. Make no mistake about it; if you do not destroy democracy, it will do away with your rights and privileges; for the logical outcome of political equality in the economic sphere is communism, which has already conqured the one-sixth of the earth and is spreading. You must give me political power, for I am the only man, who with help of the Nazi movement can crush democracy..."*

এই হ'লো জার্মণ গণতন্ত্রের সত্যিকার রূপ—গণতন্ত্র বিদায় না হোলে আর্থিক সাম্য পুঁজিপতিদের অধিকার লোপ করবে।

জার্মাণী, ইতালী প্রভৃতি দেশে শ্রমিকগণ রুশিয়ার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করতে পারেনি বোলেই ধনতন্ত্রবাদের বনিয়াদ সেখানে নিরঙ্কুশ র'য়েছে। এবং ফ্যাসিষ্টবাদের স্বৈরাচারের প্রতিক্রিয়ারূপে জনসাধারণের অসন্তোষ নানা প্রকার আন্দোলনে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ক'এক বৎসর পূর্বেই ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার কর্মপ্রণালী সাম্যবাদীদের চোখে ধরা পড়েছিলো। সে হ'লো ১৯৩৪ সালের কথা। সেই সময় অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশানালের সপ্তম কংগ্রেস জার্মাণ ফ্যাসিজম্-এর দস্যুবৃত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো যে, হিট্‌লারের

---

*Adolph Hitler—Speech on 27th January, 1932.

একমাত্র উদ্দেশ্য—ফ্রান্সের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা—চেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়া গ্রাস করা, এবং বালটিক রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা অপহরণ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের পথ তৈরী করা। সাম্যবাদীরা আরও বলেছিলেন যে,—উপনিবেশ ও হৃতরাজ্য পুনরধিকারের কলরবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের সূত্রপাত করাও ফ্যাসিষ্টদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৩৪ সালে সাম্যবাদীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,—এই ক'এক বৎসরে তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। ১৯৩৫ সালে ইতালী-আবিসিনিয়া গ্রাস করল; এবং জার্মাণী লোর্কানো চুক্তি ছিন্ন করে রাইনল্যাণ্ড দখল করল। ১৯৩৬ সালে ইতালী-জার্মাণী স্পেনর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুললো এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অস্ত্র ও সৈন্যবল দ্বারা বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করল। আর গণতন্ত্রবাদী বৃটেন এবং ফ্রান্স এই ফ্যাসিষ্ট বর্বরতায় সায় দিলো—গোপনে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য কোরল। ইহার একমাত্র প্রমাণ বৃটিশ জাহাজ "ডেভনসায়ার"-এ আরোহণ করে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর মিনার্কা দখল। তারপর জার্মাণীর অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া দখল, ইতালীর আলবেনিয়া অধিকার, জাপানের চীন আক্রমণ এবং পরিশেষে জার্মাণীর পোলাণ্ড অধিকার গণতন্ত্রধ্বংশী ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার নির্মম আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তারপর জার্মাণ-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি, রাশিয়ার পোলাণ্ড আক্রমণ এবং কিয়দংশ অধিকার বর্তমান আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চের বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নেই—কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে ইহা কারও অজানা নেই যে, জার্মাণীর ডানসিক-পোলিশ-করিডার কলরবের আভাষ পেয়েই রুশিয়া বৃটেনের সাথে সহযোগীতা কোরে' "Anti-Facist-Block" গঠন করবার প্রস্তাব করেছিলো; কিন্তু বৃটেন তাতে মনোযোগ দেয়নি; কারণ, সে চেয়েছিলো—জার্মাণী আর রুশিয়ার মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হোক।

কিন্তু ফল হ'লো অন্যরূপ!

১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাসানালের সপ্তম অধিবেশনে এই স্থির হয় যে, বিশ্বের শান্তি, শ্রমিক-কৃষক তথা জনসাধারণের স্বার্থ ও গণতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির সমন্বয়ে 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট' গঠন করা, একান্ত প্রয়োজন। সেই অধিবেশনে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডিমিট্রফ্ বলেছেন:—

"The first thing that must be done, the thing with which to begin, is to form a united front, to establish unity of the workers, in every factory, in every district, in every region, in every country all over the world. Unity of the proletariat on a national and international scale is the mighty weapon, which renders the working class capable of not only of successful defence, but also of successful counter attack against Facism, against the class enemies."

তিনি আরও বলেছেন—"ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধের ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সমগ্র

জনগণকে নিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কর্তব্যভার সপ্তম কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর উপর অর্পণ করছে।" এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের সহযোগীতার কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন,—"আমরা সাম্যবাদীরা বিপ্লবী পার্টির সভ্য, তথাপি আমরা এই সম্মিলিত সংগ্রামে প্রস্তুত আছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস আছে, ইহার মধ্য দিয়েই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রবাদ এবং ফ্যাসিষ্টবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হ'ব। ইহাতে বিপ্লববাদী মজুর, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবিদের উপর ফ্যাসিষ্টবাদের পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হ'বে। আমরা যদি "ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট" গঠন করে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে লড়াতে পারি, তা' হলে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারসিপের পতন অনিবার্য এবং দুনিয়া হ'তে ফ্যাসিষ্ট বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদী সমর বিভীষিকা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হবে।" (অনুদিত)

জার্মাণ-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধের একটা রাজনৈতিক চাল ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে জার্মাণীর ফ্যাসিষ্ট অগ্রগতির পথে একটা সাংঘাতিক বাধা পড়েছে। জার্মাণ কর্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের প্ল্যানও ব্যর্থ হয়েছে। মার্কসবাদের নীতি হ'লো—পারিপার্শ্বিক চলমান পরিস্থিতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে, যে নীতি অনুসরণে সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী, মার্কসবাদীরা সেই নীতিকে গ্রহণ করবেন। কাজেই জার্মাণীর সঙ্গে রুশের আক্রমণ চুক্তি এবং রুশ সীমান্তবর্তী পোলাণ্ড দখল, সেই নীতিরই আত্ম প্রকাশ মাত্র।

ইতালী ফ্যাসিজম্-এর স্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ফ্যাসিজম্-এর পৈশাচিক বিজয়োল্লাস ঘোষিত হ'য়েছে জার্মাণী হ'তে। দুনিয়ার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য দায়ী একমাত্র জার্মাণী। জার্মাণ ফ্যাসিজম্-এর পটভূমির পূর্বাভাষে আমরা দেখতে পাই—বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটে জার্মাণীতে শ্রেণী চেতনা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো। শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হ'তে লাগলো। পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় এই আত্মসচেতন জাতিকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখা গেলনা। ফ্যাসিষ্টবাদীরা এই সুযোগ অবহেলা করলনা। নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ১৯৩৩ সালে জার্মাণীতে ফ্যাসিষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ১৯৩৩ সালের পর যে কটা বছর অতীত হ'য়ে গেছে—তা' খুব বেশী নয়। এই ক'বৎসর হিটলার যা করেছেন, তার তুলনা নেই। জার্মাণীর শান্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্ছেদের সাথে সাথে এই ফ্যাসিষ্টদস্যু বিশ্বের শান্তির প্রশ্নকেও জটিল হ'তে জটিলতর করে তুলেছে। হিটলারের বর্বরতা যে কেবল জার্মাণীর জনসাধারণকেই বিক্ষুব্ধ কোরে তুলেছে, তা নয়—সমগ্র বিশ্ব আজ হিটলারের পৈশাচিক কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত, ভীত। এই ফ্যাসিষ্ট-বাদের সাথে সাথে ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধনে দুনিয়ার প্রগতিশীল জনমত বদ্ধপরিকর।

সেই জন্য সপ্তম কংগ্রেসে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, এই ফ্যাসিষ্টবাদ প্রতিরোধের জন্য শ্রমিক এবং জনসাধারণের একটা সমন্বয় থাকা দরকার। ইহার ফলেই সমগ্র প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়রূপে এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর সৃষ্টি। ফ্রান্সের ১৯৩৪ সালের শ্রমিক বিদ্রোহ

ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতির গৌরবময় আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে বৎসরই অষ্ট্রীয়া আর স্পেনের মজুররা ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

অনেকদিন যাবৎ অর্থাৎ রুশিয়ায় কম্যিউনিজম্-এর প্রতিষ্ঠার পর হ'তেই ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের প্রতি সাম্যবাদী নেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'য়েছিলো। ১৯২১ সালে কম্যিউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিন 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' নীতির উপর কর্মীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে লেনিন "On the work of the United Front" শীর্ষক একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। ১৯২১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর Comintern-এর একজিকিউটিভ কমিটী কর্তৃক এই নীতি গৃহীত হয়। তারপর কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের একজিকিউটিভ কমিটী এবং চতুর্থ কংগ্রেসও এই নীতি সাদরে গ্রহণ করে। ১৯২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী হ'তে ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয়; তাতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,—"At the coming International Conference, only those questions should be dealt with which conerns the action of the working class." তা' ছাড়া—"Unity in action of the working masses, which can at once be achieved in spite of fundamental differences of political opinion." এই সিদ্ধান্তও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই অধিবেশন হয় বার্লিনে। ইহাতে রিফরমিষ্ট নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের সাথে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। "We have paid two much" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লেনিন শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন—"We adopted the United Front tactics in order to help these masses to fight against capital, to help them to understand the "cunning mechanism" of the two fronts in the whole of international politics; and we shall persue these tactics to the end.

শ্রমিক ঐক্য সাধনে লেনিন আজীবন সাধনা করে গেছেন। ১৯২১ সালে যে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতির প্রতি লেনিন সাম্যবাদী এবং শ্রমজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, ১৯৩৪ সালে সপ্তম কংগ্রেসে তা' কার্যে পরিণত করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জার্মাণীর ফ্যাসিষ্ট স্বৈরাচারের অত্যাচারিত কমরেড ডিমিট্রিফ ঘোষণা করেন :—

"The establishment of unity of action by all sections of the working class, irrespective of the party or organisation to which they belong, is necessary even before the majority of the working class is united in the struggle for the overthrow of capitalism and the victory of proletarian revolution."

"ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রস্তাব

গৃহীত হবার পূর্বেই ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টি "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর নীতি কার্যে পরিণত করে। এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মাঝে ঐক্য সংস্থাপনের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করে। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতেই ফ্রান্সে পরে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী "ইউনাইটেড পিপল্‌স্"-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ইহার ভিত্তিতেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী "ন্যাশনাল ফ্রন্ট"-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে প্রস্তাবিত এবং গৃহীত "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচারে উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহে কতদূর কার্যকরী হ'লো, অথবা কিভাবে তারা ফ্যাসিষ্ট ব্যবহার প্রতিরোধে যত্নবান হ'লো, সে আলোচনা করলেই এই নীতির সফলতা এবং সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারবো। এবং "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি শ্রমিক ঐক্য সাধনে কতদূর কার্যকরী হয়েছে, তাও দেখা যা'বে।

ফ্যাসিষ্টবাদের পূজারী বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর স্বৈরাচার হ'তে স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষা করবার জন্য সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টি সোশ্যালিষ্ট পার্টির সাথে মিলিত হ'য়ে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" এবং "পপুলার ফ্রন্ট" গঠন করেছে। শুধু যে পুরুষ কর্মীই এই "পপুলার ফ্রন্ট" গঠনে এবং ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধে অগ্রসর হ'য়েছেন, তা নয়; নারীরা তাঁদের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে পুরুষদের সহযোগীতা করেছেন। তাঁদের মাঝে শ্রমিক-দুহিতা, কমিউনিষ্ট পার্টির অক্লান্ত কর্মী "পাসিও-নারিয়া"র (ডোলোরেস্ ইবারুরি) নামই উল্লেখযোগ্য। "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতিতে প্রতিষ্ঠিত স্পেনের "পপুলার ফ্রন্ট" যে কি ভাবে ফ্রাঙ্কোর সামরিক শক্তিকে প্রতিরোধ এবং বিপর্যস্ত করেছে, তা' আমরা জানি; এবং গণতন্ত্রের ইতিহাসে তা' অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্পেনের প্রগতিশীল দেশগুলির সমন্বয়রূপে যদি এই "ফ্রন্ট" গঠিত না হতো, তা' হ'লে স্পেন, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ফ্রাঙ্কো এবং ইতালী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ আড়াই বৎসর সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম হ'তো না। তবু শেষ পর্যন্ত স্পেন তার গণতন্ত্র রক্ষায় সমর্থ হ'লো না! এর কারণ কি, তার জবাব কে দেবে!

ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট"এর কার্যাবলী আমাদের অজানা নেই। প্রতিক্রিয়াশীল দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের বিরোধীতার মাঝেও যে ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট" স্বীয় গৌরবময় মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে, তা' সত্যই প্রশংসনীয়। সেখানকার এই "ফ্রন্ট" ফ্যাসিজম্-এর সাংঘাতিক শত্রু। ফ্রান্সের এই "পপুলার ফ্রন্ট" সম্বন্ধে Mourice Thorez বলেছেন—"The Victory of the Popular Front in France has changed the balance of forces in favour of peace and democracy." "পপুলার ফ্রন্ট"-এর এই অগ্রগতিশীল অভ্যুন্নতি প্রতিহত করবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু তা' বোধ হয় সম্ভব হ'বে না। কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ জার্মাণ-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি এবং জার্মাণী রুশিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে বলেছেন—ফরাসী সরকার সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙে দেবেন। যদি তাই হয়, তবে "পপুলার ফ্রন্ট"এর মাঝেও হয়তো ভাঙন ধরবে; কিন্তু তা' কি সম্ভব

হ'বে ? কারণ—"it was not he, who made the People's Front, and it is not he, who can 'unmake' it." ফ্রান্সের প্রগতিশীল গণপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়রূপে এই "পপুলার ফ্রন্ট"-এর সৃষ্টি। বর্তমানে কমিয়ুনিষ্ট পার্টিকে ভেঙে দেবার অন্য অর্থই হ'লো—ফরাসীর গণ-মতের কণ্ঠরোধ করে জনসাধারণের একত্রীভূত প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন করা। ফরাসীর শ্রমিকদের এই প্রগতিশীল সমন্বয়ে কৃষকরাও যোগদান করেছে। ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট"এর সর্বপ্রথম সমবেত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিলো—১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে, যাঁরা ১৯৩৪ সালে ফ্যাসিজম্-এর কবল হ'তে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই, বিসমার্ক-এর সহযোগীতায় Tiers কর্তৃক নিহত ফ্রান্স কমিয়ুনের সহীদানদের স্মৃতি-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এই "পপুলার ফ্রন্ট"-এর পৌরহিত্যে। এই "পপুলার ফ্রন্ট" সম্বন্ধে দালাদিয়ে বলেছেন—The Popular Front is the alliance between the Third Estate and the working class; when they are united, they can repeat what happened in 1789, 1793, 1848 and the 4th of September (1870), when they are dis-united, they can be subject to another Thermidor, Brumaire or the 2nd of December (1851). তারপর দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের "Make the poor pay" নীতির প্রতিবাদে সমগ্র ফ্রান্সকে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ দেখতে পাই। বর্তমানে ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট" এতো শক্তিশালী যে র‍্যাডিকেল পন্থী দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তে, সেখানে যদি "পপুলার ফ্রন্ট" গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তা' হ'লেও আমরা বিস্মিত হবো না। বর্তমানে কেবল র‍্যাডিকেল দলের দো-টানা মনোভাবের ফলে দালাদিয়ে কোনো রকমে টিকে আছেন।

প্রাচ্যে জাপানের ফ্যাসিষ্ট বিধানের কবল হ'তে চীনের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য চীনেও বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো তাদের মতানৈক্য ভুলে চীন কমিয়ুনিষ্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাপ-বিরোধী "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" গঠন করেছে। চীনের "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর কার্যাবলী এতো ব্যাপক যে, এই প্রবন্ধে তা' আলোচনা করা সম্ভব হ'বে না। প্রবন্ধান্তরে তার বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

কিন্তু কেবলমাত্র বৃটেনে এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতিকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। পার্লামেণ্টারী ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বৃটেনে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" গঠনে একমাত্র বাধা সেখানকার লেবার পার্টি। বৃটেনে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" গঠনের জন্য আন্দোলন করবার অপরাধে লেবার পার্টির একজিকিউটিভ কমিটীর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে পার্টি হ'তে বিতাড়িত করা হ'য়েছে। তবুও ক্রীপস্ তাঁর প্রচেষ্টা হ'তে বিরত হননি, লেবার পার্টির এই পার্লামেণ্টারী মনোবৃত্তিতে বহু লেবার পন্থীই সায় দিতে পারেননি; তাঁদের মাঝে G. D. H. Cole অন্যতম; মিঃ কোল কিন্তু একজন খাঁটি লেবারাইট।

ফ্রান্স, স্পেন এবং চীন প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। কিন্তু আবার এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে এই আন্দোলন প্রবেশলাভ করেনি। এইজন্য প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই; কারণ, ইহা তাদের মজ্জাগত মনোবৃত্তি। কিন্তু ইহা অতি সত্যি কথা যে মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের এই বিরোধীতামূলক প্রতিক্রিয়া "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি ব্যর্থ করতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যাতে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতিতে প্রতিষ্ঠিত "পপুলার ফ্রন্ট" গঠন করা হয়, তার আবেদন জানিয়ে কমরেড ডিমিট্রফ বলেছেন—"কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেস প্রত্যেক ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রে ফ্যাসিজম্-এর বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক বাণী করেছে। যাঁরা ভাবেন, সে সমস্ত রাষ্ট্রে ফ্যাসিজম্-এর বিজয় অনিবার্য, তাঁরা সাংঘাতিক ভুল করবেন। যদি মজুরদের ঐক্যের আহ্বানে সকলে সংস্কারমুক্ত হ'য়ে সাড়া দেয় এবং বিশাল শ্রমিকবাহিনীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর হয়, তা' হলে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী ফ্যাসিজম্-এর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।"

ঐক্যই শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র অস্ত্র—যার প্রয়োগে সে ফ্যাসিজম্-এর গর্বোন্নত শির নত করতে সমর্থ হবে। লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্বোধন হতে আরম্ভ করে, তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন শ্রমিকদের ঐক্য সাধনে আপ্রাণ সাধনা করেছেন। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে লিখিত "On Unity of the Workers" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :—

"Unity is essesntial for the working class......And this unity is infinitely dear, infinitely more important to the working class. Divided the workers are nothing, united, they are everything."

তারপর ১৯১৪ সালের জুন মাসে "On Unity" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :—

"Unity must be fought for, and only the workers themselves, the class-conscious workers themselves are in a position to achieve this—by persistant stubborn work..."

আমাদের এ বিশ্বাস আছে, লেনিনের এই বাণী মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে কম্যিউনিষ্ট ইন্টার-ন্যাশনাল এবং ইউনাইটেড ফ্রন্ট-এর কর্মপ্রণালী নির্ধারিত হ'বে।

চীন অথবা স্পেনের "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি যে কেবলমাত্র চীন অথবা স্পেনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। চীনের এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি জাপানে এবং স্পেনের "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি জার্মাণী এবং ইতালীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যান্য ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রেও ইহার প্রভাব উপেক্ষার বস্তু নয়। শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রত্যেকটী প্রগতিশীল আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে, গত ক'এক বৎসরের ইতিহাস আলোচনা

করলে আমরা নির্বিবাদে তা' বলতে পারি। কারণ,—"Every courageous resistance to the fascist aggressors in any given capitalist country, in any given corner of the word, is, to-day, assuming international importance, as it inspires and strengthens the Anti-Fascist forces in the other countries."

যখন প্রত্যেক রাষ্ট্রে এবং প্রত্যেক উপনিবেশে এই "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট"-এর নীতি কার্যে পরিণত করে সম্পূর্ণরূপে সফল করে তোলা যাবে, তখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফ্রণ্টগুলোর সমন্বয় সংগঠন রূপে পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য, রোমা রোঁলার ভাষায় World Front গঠন সম্ভব হবে। সেদিন অর্থাৎ রোঁলার স্বপ্ন যেদিন প্রত্যক্ষ বাস্তবে রূপায়িত হবে, সেদিনই ফ্যাসিজম্ এবং ইম্পিরিয়েলিজম্-এর ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী; আর সেদিনই ক্যাপিটেলিজম্-এর ধ্বংসস্তূপের কালো যবনিকা ভেদ করে সোস্যলিজম্-এর বিজয় বার্তা ঘোষিত হবে। এই আন্তর্জাতিকগণ-ফ্রণ্ট গঠন ব্যতীত ফ্যসিজম্ এবং তার আনুষাঙ্গিক ইজম্গুলোর গতি প্রতিরোধ কোরতে পারলেও, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা যাবেনা। অথচ এই গণফ্রণ্টের কার্যক্রমের কষ্টি পাথরে যাচাই হ'য়ে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্বর্ণমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে; মানুষে মানুষকে চিনতে পারবে—সমস্ত বৈষম্য মূলক প্রতিযোগীতা অপসারিত হবে বিশ্বের ধূলিকণা হ'তে।

এখানে আর একটা কথা আলোচনা করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেকেই "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট"-এর নীতিকে সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক নীতিবিরোধী সুবিধাবাদী প্রভৃতিদ্বারা সমালোচনা করে থাকেন। এই সমস্ত সমালোচকদের মাঝে ট্রটস্কাইট্, স্পেনের সিণ্ডিক্যালিষ্ট এবং বৃটেনের লেবারাইটগণের নামই উল্লেখযোগ্য। কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানাল নির্ধারিত "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট"-এর এই নীতিকে কি করে যে তারা সাম্যবাদ বিরোধী নীতি বলে প্রচার করেন, তা' আমাদের ধারণার অতীত। ফ্যাসিষ্ট এজেণ্ট এবং বিশ্বাসঘাতক ট্রটস্কীপন্থীদের কথা না হয় বাদ দিলাম; কিন্তু সিণ্ডিক্যালিষ্ট এবং লেবারাইটগণ যে কেন ইহার বিরোধীতামূলক সমালোচনা করেন, তার কোনো যুক্তিপূর্ণ কারন কি তাঁরা নির্দ্দেশ করবেন?

আমারা যদি এই "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট"-এর পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা করি, তা' হ'লে আমরা কনো মতেই এ' কথা বলতে পারি না যে, "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট"-এর কর্মপ্রণালী সাম্যবাদ-এর মূলনীতি-বিরোধী।

বর্তমানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে যে সমস্যা মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছে, এই বহুমুখী সমস্যার সমাধান করতে হ'লে, অবিলম্বে ভারতবর্ষেও "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট" গঠন করা একান্ত কর্তব্য। ভারতের এই "ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট"-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে—ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হ'তে ভারতের জনগণের মুক্তিসাধন। এই ফ্রণ্ট গঠন করতে হ'লে ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধন করতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত না তা সম্ভব হবে, ততদির ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত

হবে। তা করতে হলে, সমগ্র বামপন্থী সমন্বয় কমিটির ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। এবং কংগ্রেসের সংগ্রামহীন মনোবৃত্তির মাঝে সংগ্রামশীল অনুপ্রেরণার উদ্বোধন করা অনিবার্যভাবেই স্বীকার্য। গত সভাপতি নির্বাচনের পর হ'তে কংগ্রেসের মাঝে যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হ'য়েছে, সেই রাজনৈতিক অমানিশা প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে বামপন্থীরা সম্মিলিত হলো,—"বামপন্থী সমন্বয় কমিটিতে (Left Consolidation Committee)। প্রথমেই কমিউনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট, রায়বাদী, "ফরোয়ার্ড ব্লক" দল ও কিষাণ সভার দল প্রভৃতি বামপন্থী, সংগ্রামশীল, সাম্রজ্যবাদ বিরোধী দলগুলি এই "বামপন্থী সমন্বয় কমিটি"তে সমবেত হলো। তবে দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় রায়বাদীরা গত ৯ই জুলাই-র প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় এই কমিটি পরিহার করেছেন। এই নীতিহীনতাকে আমরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারি না। এবং আমাদের বিশ্বাস ইহাই সমস্ত অনর্থের মূল।

ভারতের জাতীয় ঐক্যের শুভদিনের আগমনীর জন্য ভারতের জনমত সংঘবদ্ধ হোক, আমরা একান্তভাবে তাই প্রার্থনা করি।

C. P. S. U (B)-এর অষ্টাদশ কংগ্রেসে (১০-১৫ মে, ১৯৩৯ ইং) Comrade Mannilsky বলেছেন :—

"Working people want a United front of the capitalist countries with the Soviet working class, with the armed Soviet people, who have at their disposal a powerful state, material power of victorious socialism. This Front will be the real guarantee of peace. World re-action will shatter itself against the impregnable rock of such a Front,"

বিশ্বের উৎপীড়িত জনগণ দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতির সাথে সংগ্রাম করবার জন্য সংঘবদ্ধ হোক, আদর্শগত নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রগতিশীল অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে থাক, আমরা তাই চাই।

কবির ভাষায় আমরা সংগ্রামশীল সর্বহারাদের বলি—"Soar above the conspiring cloud, and say : we see the sun"—দীপ্ত কণ্ঠে তারা বলুক,—ধনতন্ত্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ অস্তাচলে, প্রাগুষার ক্ষীণ আঁধারের বুক চিরে যে আলোর রেখাটি দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এ' সেই আলো—যার জন্য, আমাদের তাদের এবং আরও অনেকের প্রাণ ব্যাকুল!

বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার

শান্তিসুধা ঘোষ

কিছুকাল হইতে আমাদের শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন রণিত হইতে শুনিতেছি। ব্যবস্থা পরিষদে এ বিষয়ে প্রস্তাব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে নামিয়া গেল, বিলটী পাশ হওয়া ঘটিল না এবং তর্কযুদ্ধে বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণের মতামত শুনিবার সৌভাগ্য হইতেও আপাততঃ বঞ্চিত হইয়াছি। তবে কেন্দ্রীয় পরিষদ এ বিষয়ে হিন্দু জনসাধারণের যে মতামত আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে কাহারও কাহারও আলোচনা সংবাদপত্রের মারফৎ চোখে পড়িয়াছে।

বিষয়টী আলোচনার যোগ্য। কেননা, এ কথা সত্য যে, আমাদের সমাজে বহু বিবাহিত জীবনে অশান্তির কাল ছায়া স্ত্রীর জীবনকে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং ইহার প্রতীকার প্রয়োজন।

দাম্পত্য জীবনের যে অশান্তির কথা বলিতেছি, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথমেই গোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়িবার কথা ; প্রথমেই প্রশ্ন মনে আসিবে—কিসের আশায় মানুষ বিবাহ করে ? এই আশা যখন অপূর্ণ হয়, তখনই দাম্পত্য জীবন বিষময় হইয়া উঠে এবং এই বিষভাণ্ড বহন করিবার ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়িয়া যায় নারীর স্কন্ধে।

আমরা দেখি, মানুষ বিবাহ করে. প্রথমতঃ—দৈহিক কামনা চরিতার্থ করিবার আগ্রহে।

দ্বিতীয়তঃ—সংসারে স্বচ্ছন্দে আরামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আশায়, অর্থাৎ পুরুষ নারীর সেবা যত্ন পাইবার আশায় ও নারী পুরুষের নিকট হইতে রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্রাসাচ্ছাদন লাভের জন্য।

তৃতীয়তঃ—প্রেমে জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার প্রেরণায়।

রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার বিভিন্ন কারণে মুখ্যতঃ বিবাহ করে। তবে আমাদের দেশে সমাজের অতি বিপুল অংশই প্রথম দুই কারণে বিবাহ করিয়া থাকে ; তাহাতে প্রেমের স্থান অতি অল্পই। এমন কি, পশ্চিম জগতেও—যেখানে প্রেমমূলক বিবাহরীতি প্রচলিত আছে বলিয়া আমাদের ধারণা—তৃতীয়োক্ত কারণে বিবাহ করিবার মত লোক বেশী নয়। কেহ ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। কারণ, যথার্থ প্রেমের দ্বারা জীবনকে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে পারিয়াছে অথবা করিতে চায়, এমন লোক এখনও পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় ; প্রেম নামে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঐ প্রথমোক্ত ব্যাপারেরই সামান্য রূপান্তর মাত্র। তৃতীয়োক্ত কারণ দ্বারা আমি সেরূপ প্রেম বুঝাইতে চাহি নাই। কিন্তু বিদেশের কথা যাক্, দেশের কথাই ভাবি।

বিবাহবিচ্ছেদের কথা তখনই উঠে, যখন যে কোনও ঘটনাচক্রে হউক, বিবাহের ঐ তিনটী উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসে। যিনি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্য লইয়া বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই উদ্দেশ্যটী ব্যর্থ হইলেই বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন। এবং যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, উপরোক্ত তিনটী কারণের মধ্যে প্রত্যেকটীই সভ্য জগতে বিবাহের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া ধরা যায়, কোনটীই অন্যায় বা অবৈধ নয়, তাহা হইলে উহার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপত্তিই বা টিকিবে কি করিয়া? এবং উদ্দেশ্য-গুলির বৈধতা সম্বন্ধে এ যাবৎ প্রগতি বা পুরাগতি কোনও সম্প্রদায়ের তরফ হইতেই কোনও প্রশ্ন শুনিতে পাই নাই।

প্রথম উদ্দেশ্যে যাঁহারা বিবাহিত হইয়াছেন, যদি বিবাহের পরে এরূপ ঘটে যে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দৈহিক মিলন অসম্ভব বা অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে, তবে সে ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ করাই স্বাভাবিক। এরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটিতে পারে। যদি দম্পতীর একজন উন্মাদ অথবা অন্য কোনরূপ উৎকট ব্যধিগ্রস্ত হন, যেখানে দৈহিক মিলন অপর জনের ও সন্তানের স্বাস্থ্যের হানিকারক হয়, তাহা হইলেই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। অথবা, স্বামী বা স্ত্রী একজন যদি সন্ন্যাসী ও মিলনবিমুখ হন, তাহা হইলেও বিবাহের প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং এই দ্বিবিধ পরিস্থিতিতেই দম্পতীর মধ্যে যিনি স্বাভাবিক, তাঁহার পক্ষে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা বিধেয়।

বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী অপেক্ষাকৃত লঘু এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত সহজেই সফল হইতে দেখা যায়। যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব না থাকে, সেখানে স্বামীও স্বভাবতঃই স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং স্ত্রীও সাধ্যমত স্বামীকে সেবাযত্ন হইতে বঞ্চিত করেন না। যদি প্রকৃত সদ্ভাব অর্থাৎ মনের মিল নাও থাকে, তথাপি নিজ নিজ স্বার্থবশে পরস্পর সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলেন। সেইজন্যই এ বিষয়ে সাধারণতঃ বিফলতা আসে না, এবং মাত্র এই বিফলতা অবলম্বন করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ পাশ্চাত্য দেশেও কম দেখা যায়। এই কারণ দর্শাইয়া যদি কচিৎ কখনও বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু হয়, তবে বুঝিতে হইবে, প্রকৃত কারণ ইহা নয়, ইহার পশ্চাতে প্রেমের অভাব এবং সম্ভবতঃ অন্য ব্যক্তিতে প্রেমাসক্তি। সুতরাং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ব্যর্থতাকে বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত অজুহাত বলিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করি না। তবে যেক্ষেত্রে অসদ্ভাব এত অধিক যে, একে অন্যের প্রতি দৈহিক নির্য্যাতন করিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে নির্দ্দোষ পক্ষের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকা আবশ্যক।

তৃতীয় উদ্দেশ্য লইয়া যিনি বিবাহ করেন, প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যর্থতার আবির্ভাবে তিনি তত বিচলিত হন না, সুতরাং ঐ কারণে বিবাহবিচ্ছেদের কল্পনা তিনি করেন না। প্রেমাস্পদ যদি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হন, কিন্তু সে ব্যাধি যদি তাঁহার চরিত্রের কলুষজনিত না হয়, তাঁহার জীবনের উপর অশ্রদ্ধা জন্মাইবার হেতু না হয়, তবে অপর পক্ষ তাঁহাকে ত্যাগ করিবার কথা মনে

আনিতে পারেন না। সন্ন্যাস সম্বন্ধেও ঐ কথা। যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উচ্চতর প্রেম আছে, সেখানে একজন ভোগবিমুখ হইলেও বঞ্চিত জনের প্রেমে বঞ্চিত হন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ঐ কারণে বিবাহবিচ্ছেদের কথা উঠে না। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদের কারণ একটী ঘটিতে পারে—তাহা বহু বিবাহ। এক স্বামী বর্ত্তমানে সভ্য সমাজে স্ত্রীর বহু বিবাহের নিয়ম নাই, সুতরাং স্বামীর পক্ষে এদিক্ দিয়া কোনও গোলযোগ নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সে রীতি আজকাল অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন বিরুদ্ধ হয় নাই; ফলে, এখনও কোথাও কোথাও এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সুতরাং এ বিষয়টী স্ত্রীর পক্ষ হইতেই শুধু বিচার করিতে হইবে। যে নারী প্রথমোক্ত কারণ দুইটীকেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, তিনি স্বামীর বহু বিবাহে তেমন আপত্তির কারণ না দেখিতে পারেন,—যতক্ষণ স্বামী তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন ও মিলনস্পৃহা পূর্ণ করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে বিবাহ ব্যর্থ হইতেছে না। কিন্তু যে নারী প্রেমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, প্রথম উদ্দেশ্যগুলি ত্যাগ করিয়াও যিনি চলিতে পারেন, কিন্তু অন্তরের প্রেমে বঞ্চিত হইতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে স্বামীর বহু বিবাহ অবশ্যই বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে স্বামী অন্য নারীতে অনুরাগ অর্পণ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে স্ত্রীর প্রাণের মিলন হয় নাই বুঝা গেল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে সামাজিক মিলনকেও ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা সঙ্গত—যাহাতে তিনি অন্য পতি বরণ করিয়া তাঁহার প্রেম দ্বারা নিজের প্রেম-জীবনকে সার্থক করিতে পারেন।

কোনও কোনও স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, স্বামী আইনতঃ দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু বিবাহ না করিয়াও অন্য নারীর প্রেমাসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়ও স্ত্রীর প্রেম জীবন নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং যদি স্বামীর অন্যানুরাগ আইনতঃ প্রমাণিত হয়, তবে স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ন্যায়সঙ্গত। এটী অবশ্য পুরুষের পক্ষ হইতেও খাটে, অর্থাৎ পত্নী অন্য পুরুষে অনুরক্ত বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তবে স্বামীও বিবাহবিচ্ছেদ করিবার অধিকারী।

ব্যক্তিজীবনে বিবাহের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সফলতা দিতে হইলে কোন্ কোন্ অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকা নিতান্ত সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিলাম। কিন্তু এই অধিকার প্রদান করা হইলে সামাজিক জীবনে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় কিনা, অথবা ব্যক্তিজীবনেই অন্য কোন দিকে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। মানুষের মন ও জীবন দুই-ই জটিল; একদিকে বন্ধন খুলিয়া দিতে গেলে অন্যদিকে হয়তো জট পাকাইতে পারে।

বিবাহবিচ্ছেদ প্রথার বিরোধীদল সাধারণতঃ একটী যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহারা বলেন যে, বিবাহবিচ্ছেদ যদি আইনসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সামান্য অজুহাত অবলম্বন করিয়াই বহু পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, সমাজে যে অশান্তি বর্ত্তমানে আছে, তাহা

অপেক্ষা অশান্তি বহুগুণ ব্যাপক হইবে। বর্ত্তমানের অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থায় স্বামীস্ত্রীকে আজীবন এক হইয়া থাকিতে হইবে জানা থাকাতে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে গরমিল থাকিলেও যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। যদি এই অবিচ্ছেদ্যতা আবশ্যক না হয়, তবে ব্যক্তিগত জীবনে সংযম প্রচেষ্টা শিথিল হইয়া আসিবে, তাহাতে ব্যক্তির বা সমাজের কল্যাণ কোথাও নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের নজির দেখান।

পাশ্চাত্যজগতের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই অশান্তি তাহাদের সমাজে অধিক কি আমাদের সমাজে অধিক তাহাও তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলিতে পারি না, কাজেই সে সম্বন্ধে অনুমানের উপরে ভরসা করিয়া কিছু বলা ঠিক নয়। তবে একথা সত্য যে, ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চ বিকাশের পক্ষে সংযমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে কোথাও লাগাম না লাগাইয়া চলিতে দেওয়ার রীতি সুরীতি নয়। এদিক দিয়া বিবাহবিচ্ছেদ রীতির বিপক্ষে যে আশঙ্কা, তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। বিবাহবন্ধনকে ইচ্ছা হইলে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়, এই বোধটি মনে মনে থাকিলে দম্পতীর মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য হইলেই ঐ সম্ভাবনা অগোচরেও উঁকি মারে; এবং বর্ত্তমানে যেমন মনোমালিন্যকে যথাসম্ভব দুর করিয়া সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা থাকে, তখন তাহার পরিবর্ত্তে মনোমালিন্যকে বাড়াইয়া তুলিবারই সম্ভাবনা অধিক হইবে। মানুষের মনে স্বার্থ ও অহঙ্কার স্বভাবতই এত প্রবল যে, নিতান্ত না ঠেকিলে ইহাকে অপরের কাছে খাটো করিতে মানুষ কখনও চায় না; ঠোকাঠুকি বাঁধিলে নিজেকে বড় রাখিবার জন্যই জিদ্ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহা হইলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও আত্মসংযমের শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অতিশয় গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য থাকার রীতিই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য "incompatibility of temper" মনের অমিল, অসদ্ভাব প্রভৃতি কারণগুলি বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বিবাহবন্ধনের যে অবিচ্ছেদ্যতা থাকিলে পতিপত্নীর পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বদ্ধমূল থাকা সম্ভব, তাহা আমাদের সমাজে নারীর পক্ষেই শুধু আছে, পুরুষের পক্ষে নাই। পুরুষ ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, অথবা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং পত্নীর সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ও তাহার প্রীতিসাধনার্থ যে ত্যাগ ও সংযম স্বীকার করা প্রয়োজন, তাহা করিবার জন্য পুরুষের দিকে কোনও তাগিদ নাই। সেই কারণেই আমাদের সমাজে পুরুষের জীবনে উহা সচারাচর দেখিতে পাই না। আত্মত্যাগের সমস্ত বোঝা আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে নারীর উপর। বিবাহবিচ্ছেদবিরোধীগণ সংযম-শৃঙ্খলার যে যুক্তি অবতারণা করিতেছেন, তাহা এরূপ ব্যবস্থায় কখনও কার্য্যকরী হইতে পারে না। সুতরাং "incompatibility of temper" জাতীয় লঘু কারণগুলিকে বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত কারণ

বলিয়া সমর্থন করিব না তখনই, যখন পুরুষের একাধিক পত্নীগ্রহণ ও ইচ্ছাগত পত্নীত্যাগ আমাদের সমাজে আইন দ্বারা বন্ধ করা হইবে। মাত্র সেইরূপ অবস্থাতেই বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা দম্পতীর মধ্যে উভয়পক্ষ হইতে সদ্ভাব সহযোগিতা স্থাপনের পক্ষে অনুকূল হইবে। এবং এই অবস্থাই আমরা কামনা করি।

বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে লঘু কারণগুলি বর্জ্জন করিলে আর যে কয়টি বাকী থাকিল তাহা—(১) দম্পতীর একজনের উৎকট, দুরারোগ্য, বংশানুক্রমিক ব্যাধি (২) দম্পতীর মধ্যে একজন সন্ন্যাসী অথবা সম্ভোগবিমুখ (৩) পত্নীবর্ত্তমানে স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ (৪) দম্পতীর একজন অপর স্ত্রীতে অথবা পুরুষে অনুরক্ত (৫) দৈহিক অত্যাচার। এই কয়টি কারণের প্রত্যেকটিই গুরুতর। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিকে বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত হেতু বলিয়া গ্রহণ কাহার করিতেও কোনও আপত্তি উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, এগুলি কেহ মিথ্যা অজুহাত স্বরূপ সৃষ্টি করিতে পারে না; ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও প্রমাণগোচর। ইহার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের কথা নাই। আত্মসংযমের অভাবহেতু যে ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়াশঙ্কা বিরোধিদল করিয়া থাকেন, তাহার ফাঁকও ইহাতে নাই। অধিকন্তু এরূপ বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে কোনও আইনের প্রশ্ন নাই। পিতার মৃত্যুতে পুত্র যেরূপ স্বাভাবিক নিয়মে সম্পত্তিলাভ করে, মৃত জীবনবীমাকারীর পরিবার সহজভাবে আইনতঃ অর্থ গ্রহণের অধিকারী হয়, প্রায় তেমনই নিরুপদ্রবে সহজভাবে এই বিবাহবিচ্ছেদগুলিও আইনতঃ সম্পন্ন হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে সচরাচর কোনও দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নাই।

এসম্বন্ধে এইটুকু বলা দরকার যে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার আইনানুমোদিত হইবে বটে, কিন্তু ইহা কোনও ক্ষেত্রেই আবশ্যক হওয়া উচিত নয়। উক্ত কারণগুলি বিদ্যমান থাকিলেও কোনও স্বামী অথবা স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ না করিয়াও পারিবেন। কিন্তু যিনি করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যাহাতে আদালতে দরখাস্ত করা মাত্রই অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী অনুসন্ধানের পরেই অনায়াসে ডিক্রী পাইতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ দুইটি অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ ও বিশদ প্রমাণ সাপেক্ষ। সুতরাং ইহা লইয়া বহু গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা আছে এবং এই দুইটি অধিকারের ছল করিয়া অনেক স্থলে অসদুদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা রুজু হওয়ার আশঙ্কাও কম নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যসমাজে অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই। অতএব এই দুইটিকে বিবাহবিচ্ছেদের কারণরূপে গ্রহণ করা উচিত হইবে কি না, অথবা কি ভাবে করা হইবে, তাহা গভীর চিন্তা সাপেক্ষ।

কেন্দ্রীয় পরিষদ হইতে যখন বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ে মতামত আহূত হইয়াছিল, তখন কোনও কোনও তরফ হইতে এরূপ পরামর্শ শুনিয়াছিলাম, যেন বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ও হেতুগুলি পুরুষ ও নারী উভয়পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজ্য হয়। নিছক নীতির দিক হইতে আমরাও এ প্রস্তাব সমর্থন করি এবং সেইভাবেই ইহার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যাক্ষেত্রে আমাদের

দেশে এমন কতকগুলি কুপ্রথা প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে, যাহার দরুণ বর্ত্তমানে স্বামীস্ত্রী উভয়কে বিবাহবিচ্ছেদের সমান অধিকার দিলে নারীসমাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা মনে করি পুরুষের পক্ষে যখন ইচ্ছামত পত্নীত্যাগ অথবা এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের প্রথা আমাদের সমাজে আছে, তখন তাহার পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদের কোনও অনিবার্য্য কারণ থাকিতে পারে না। নারীর সে অধিকার নাই কাজেই তাহারই নিমিত্ত মাত্র বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যতদিন ঐ কুপ্রথা দুইটি আইনত রহিত না হয় ততদিন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা তো নাই-ই পরন্তু একদিক দিয়া নারীর পক্ষে উহা অতিশয় বিপজ্জনক হইবে।

বিষয়টি হয়তো আরও বিশদভাবে বলা দরকার। আমাদের দেশে সম্পত্তিতে নারীর কোনও অধিকার নাই, উপার্জ্জনের প্রথা ও পথও অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে সেই পরিত্যক্তা নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কি হইবে? স্বামীকুলে কোথাও তাঁহার আইনত কোনও দাবী রহিল না। যদি পুরুষের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার না থাকে তাহা হইলে স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বা অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও পূর্ব্বতন স্ত্রী তাঁহারই নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহে অধিকারী থাকিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত না নারীকে সম্পত্তিতে পুরুষের সমান ব্যক্তিগত অধিকার দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

এই সম্পর্কে বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে আরও অনেক জটিলতা দেখা যায়। নারীকে যদি বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আইনতঃ কাগজপত্রে দেওয়াও যায়, তবুও তাহা কার্য্যতঃ সফল হইবে না—যতদিন পর্য্যন্ত নারীকে সম্পত্তি ও উপার্জ্জন ক্ষমতায় পুরুষের সমান সুযোগ না দেওয়া যায়। মনে করা যাউক যেন স্বামী আইনসঙ্গত কারণে বর্জ্জনীয় সাব্যস্ত হইলেন এবং পত্নী তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তথাপি পত্নী তাঁহার সহিত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইবে না, যদি না তিনি অন্যত্র নিজের জীবিকার উপায় দেখিতে পান। অন্নাভাবে মরিবার চেয়ে নাক মুখ গুঁজিয়া ঐ স্বামীরই সঙ্গে গ্রন্থি রাখিয়া অভিশপ্ত জীবনটাকে বাঁচাইয়া রাখা অনেক নারী বাধ্য হইয়া শ্রেয়ঃ মনে করিবেন। সুতরাং সহজে কোন নারী বিবাহবিচ্ছেদ আইনের স্মরণ লইবেন না। আইনতঃ সিদ্ধ হইলেও প্রথাটী কার্য্যতঃ অচল হইয়া থাকিবে। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া যাঁহারা নারী জাতির দুঃখ নিরসন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নারীর উত্তরাধিকার ও উপার্জ্জনের যথোচিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রতিও সচেতন হইতে হইবে।

আরও একটী কথা আছে। আমাদের সমাজে অনেক বিষয় আইনের খাতায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের অন্ধতা ও কুসংস্কারের দরুণ সমাজ-জীবনে কার্য্যকর হইতে পারিতেছে না। যথা, বিধবা বিবাহ। কোন্‌কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ আইন লিপিবদ্ধ

করাইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আজও চারিপাশে ঘরে ঘরেই দেখিতে পাইতেছি, তরুণী বিধবার ম্লান মুখচ্ছবি। বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বিবাহিত করাইবার কথা অভিভাবকদের তো মনেই আসে না, কন্যা যদি আপন ইচ্ছায় স্বয়ংবরা হয়, তাহাতেও অনেকদিন পর্য্যন্ত আত্মীয় ও প্রতিবেশী মহলে অস্বচ্ছ আলোচনা চলে। অর্থাৎ বিবাহেচ্ছু বিধবাকে সমাজ ভালো চক্ষে দেখিতে এখনও শেখে নাই। সমাজের মন হইতে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি যদি অপসারিত না করা যায়, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ-কারিণীদের সামাজিক অবস্থাও এইরূপ অথবা ইহা অপেক্ষাও করুণ হইবে। বিচ্ছেদকারিণী নিরপরাধ নারীকে যদি সমাজ কুমারী কন্যার মত সরলভাবে গ্রহণ করিতে না পারে, ও তাহাদের বিবাহ করিবার মত প্রবৃত্তি যদি যুবকদের মনে না হয়, তবে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়াও সে নারী সুখময় জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইবেন না; সমাজের শ্লেষবিদ্রূপ এবং নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যর্থতা সহিয়াই তাঁহাকে বাঁচিতে হইবে।

বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যা জটিল ও বহুব্যাপক। একদিক দিয়া টান দিলেই সমাজ শরীরের নানাদিকে টান পড়িবে। এ প্রবন্ধে সামান্যভাবে দুই চারিটী বিষয় উল্লেখ করা গেল। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। সমাজ শরীরে নাড়া দিতে যাঁহারা ভয় পান, তাঁহারা হয় বিবাহবিচ্ছেদকে ধামা চাপা দিয়া, নয়তো আনুষঙ্গিক দিক্‌গুলির প্রতি চক্ষু বুজিয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু কল্যাণকামীর সে উপায় নাই। নারীর দুঃখ দূর করিতে হইলে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নারীকে দিতেই হইবে, পক্ষান্তরে, যাহাতে দুঃখের পরিবর্ত্তে আবার অন্যতর দুঃখই আসিয়া আবির্ভূত না হয়, তাহারও প্রতিষেধ চাই। তাই তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মের দায়িত্ব গুরুতর।

মুক্তিস্নান

ভবানী প্রসাদ সেনগুপ্ত

(একাংশ)

যেদিন ওর প্রথম মনে হলো যে ও নারী, সেদিনকার কথা আজও রূণকি চুপ করে ব'সে ব'সে ভাবে। আকাশের উত্তর দিকে যে তারাটা জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলতে থাকে, তারই দিকে ও তাকিয়ে থাকে পলক-হারা চোখে। সব কিছুই কোথায় যেন মিলিয়ে যায়—ওর চার পাশের সব কিছু। তবু মনে বাজতে থাকে একটী কথা আমি নারী, আমি নারী...

একটা চাঁদনি রাতে চুপ করে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল আকাশের চাঁদের পানে তাকিয়ে—বারো বছরের মেয়ে রূণকি। সহরের যে দিকে ওদের তাঁবু তার চারদিকে বড় বড় নারিকেল গাছের উপর চাঁদের আলো রূপার জলের মত ঝকঝক করছিল—শান্ত, গভীর হাস্যময়ী রাত্রি, সুন্দর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো। গুলদা চুপ করে ওর পাশে এসে দাঁড়ালে। নিজের ঘাড়ে কারুর হাত লাগলো দেখে চমকে উঠে রূণকি বুঝতে পারলে পাশে দাঁড়িয়ে আছে গুলদা। গুলদার সঙ্গে ওর ছোটবেলার ভাব। এক সঙ্গে কত খেলাই না দেখিয়ে এসেচে সেই ছোট পাঁচ বছর বয়স থেকে। গুলদা এখন ষোল বা আঠার বছরের যুবক। দীর্ঘ মজবুত চেহারা, কোঁকড়ান ঝাকড়া ঝাকড়া চুল মাথায়—কালো রং, মুখে হাসি লেগেই আছে। ওর মনে যেন কোন বেদনার কালো ছায়া পড়েনি কোন দিন—জন্মের প্রথম দিনে লেগেছিল যে অরুণ আলোর আভাষ আজো তার দীপ্তি হ্রাস পায়নি যেন।

গুলদা তার হাতখানা ধরে বল্লে : কি চমৎকার খেলাই তুই আজ দেখালি, রূণকি! কেবল হাততালির উপয় হাততালি পড়ছিল। আমারই হিংসে হচ্ছিল যেন।

রূণকি হেসে বললে—তোর খেলাতেও তো কতো হাততালি পড়ছিল—তুই তো আমায় চেয়ে ভাল খেলা দেখাতে পারিস গুলদা।

গুলদা ওর ঘাড়ে হাত জড়িয়ে বললে—না রূণকি, আমি তোর চেয়ে কক্ষনো ভাল দেখাতে পারিনে—তোর খেলার সত্যি আর তুলনা হয় না। দেখছিস্ না ম্যানেজার তোকে কত ভালবাসেন। লোকগুলো তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় আর বলে—আঃ মেয়েটা যা খেললে!

রূণকির বুকখানা আনন্দে ভরে ওঠে। তার খেলা সবাই প্রশংসা করে, আনন্দের এটাই সবচেয়ে বড় কারণ নয়। গুলদা তার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েচে আজ, এটাই তাকে খুসী করে বেশী।

গুলদা...গুলদা...নামটা এককালে কত প্রিয়ই ছিল।

ঝণকি কি ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো মুখের ওপর চাঁদের আলো চিক চিক করে—ঝণকির মনে হয়, এমন সুন্দর মুখখানা যেন জগতে হয় না।

হঠাৎ গুলদা একটা কাণ্ড করে ব'সে—ঝণকিকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে একটী চুমু খেয়ে বলে, তুই কি চমৎকার দেখতে ঝণকি!

ঝণকির বুকের ভেতর রক্ত গরম হয়ে উঠে। এ তো নতুন নয়...কত দিন...কত দিন গলা ধরাধরি করে তারা একত্র বেড়িয়েছে, তাঁবুর বাইরে। কত দিন গুলদার কোলে মাথা রেখে ঝণকি শুয়ে রয়েছে ঘাসের ওপর—গুলদা তার চুলগুলি টেনে দিয়েছে ধীরে ধীরে—তার সুন্দর, কালো চকচকে চুলগুলি ঝণকি এলিয়ে দিয়েছে, তার শরীর—তার সোনার রঙের ক্ষীণ নরম শরীর—অলস আরামের অনাবিলতায়। আজ কেন এমন হলো? কোথাকার কোন উদ্দাম উত্তপ্ত গোপন রক্ত বয়ে গেল ওর ধমনীতে ধমনীতে। ঠোঁট দুটো জ্বলে উঠলো—আরো, আরো একবার অন্য ঠোঁটের সংস্পর্শের জন্যে। কোথা থেকে রাজ্য জোড়া সংকোচ ওর সকল দেহ অধিকার করে বসল। প্রবলভাবে নিজের মাথা সরিয়ে নিয়ে বললে—"ছাড়্, ছাড়্।"

গুলদা তবু ওর ঘাড় চেপে ধরলে—বললে, ঝণকি, তুই আমায় ভালবাসিস্ না?

ভালবাসা? আঠার বছরের গুলদা আর বার বছরের ঝণকি। ঝণকি কি ক'রে ভাল বাসতে পারে গুলদাকে—বার বছরের ঝণকি? ভালবেসেছিল পাঁচ বছরের ঝণকি, দশ বছরের ঝণকি। কিন্তু বার বছরের মেয়ের যেদিন নারীত্ববোধ প্রথম জেগে উঠলো সেদিন ভাল বাসলেই বা কি ক'রে সে মুখের ওপর বলতে পারে, 'হ্যাঁ, তোকে আমি ভালবাসি?'

সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা। সেই প্রথম সে পেলো তার জীবনের প্রকৃত পরিচয়—ঐ একটী বাহুবন্ধনের মধ্যে। উঠে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা দেখাল। রিং ধরে ঝুলে ঝুলে কত খেলার বাহাদুরী। দড়ির উপর বর্ম্মা ছাতি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে পা ফেলে উঠে যাওয়া। বল নিয়ে ছুড়ে ছুড়ে হাজার রকমের খেলা দেখাল। রোজ...রোজ...এখানে আজ... ওখানে কাল। সাইকেল নিয়ে কত ভাবে কত খেলায় কসরতী—চমক লাগিয়ে দেওয়া দর্শকের মনে। সাইকেলের সামনের দিকটা এক হাতে উঁচু করে ধরে এক পায়ে যখন সে দাঁড়ানো সাইকেল চালিয়ে যায় তখন দর্শক মণ্ডলীর ঘন ঘন করতালিতে তার বুক উন্নত হ'য়ে উঠে...এ সব রোজকার ঘটনা।

গুলদা...গুলদা...কোথায় সে?

ঐ যে নতুন নাচওয়ালী মেয়েটা এসেচে ম্যানেজারের নতুন নাচ বিভাগের জন্যে ওর সঙ্গে আজকাল বড় ভাব গুলদার। অথচ এই গুলদাই একদিন বলেছিল ঝণকিকে, দেখ ঝণকি, জীবনে তোকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না।

ঝণকি তখন জানত না কিছুই। আজ জানে পুরুষ মানুষের ভালবাসার কোন মানে হয় না। একটা জলবুদবুদের মত, কখন যে মিলিয়ে যাবে কোন স্থিরতা নেই তার!

গুলদা...গুলদা...নামটা এখনো মাঝে মাঝে আওড়ায় রূণকি, গভীর রাত্রে বিনিদ্র শিয়রে শুয়ে শুয়ে। তার মনে আনন্দ হয় না, ঘৃণা হয় না, দুঃখ হয় না। পাশের ঘরে মাতাল ম্যানেজারের হাত পা ছোড়ার শব্দ হয়—আর জড়িতকণ্ঠে 'কিচলু, কিচলু' ডাক আসে তাঁবুর কাপড় ভেদ ক'রে। কিচলু যার নাম সে আর হয়তো বেঁচে নেই এখন। হয়তো বা বেঁচেও আছে! ম্যানেজারের স্ত্রী সে। মাতাল লোকটা দলের মেয়েদের নিয়ে কাটালে সারা জীবন—কেবল এই সময়টা দেহের যন্ত্রণার বেলাতেই তার মনে পড়ে দেশের গৃহিণী নিজের স্ত্রীকে। আহা...ভাবতে রূণকির চোখে জল আসে...ওকে সেবা করবার কেউ নেই পর্য্যন্ত। তাঁবুটার ঘরে ঘরে কুৎসিৎ ভোগের দুর্গন্ধ ভরে আছে। রূণকির অসহ্য মনে হয় এই আবহাওয়া। ধীরে ধীরে সে উঠে আসে...তাঁবুর দুয়ার দিয়ে...হেঁটে হেঁটে চলে যায় মাঠের একধারে ঐ উঁচু টিপিটার কাছে। আকাশে চাঁদের আলো হাসচে...কেবল হাসচে। কি স্নিগ্ধ মধুর আলো। মৃদু মৃদু বাতাসে রেশমী সূতার মত নরম চুলগুলি বার বার ওর মুখে এসে পড়ে।

ওর মনে হয় দুই বছর আগেকার একটী কথা। জীবনটাকে কি করে বদল করে দিল ঐ একটীমাত্র দিনের স্মৃতি—রূণকি তন্ময় হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাবে। রূণকি সেদিন ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সহরের ধারে নদীর পারে একা একা। সেদিন তাদের খেলা দেখানো বন্ধ ছিল কোন কারণে, মনে নেই ওর আজ। হঠাৎ ও শুনতে পেলো পেছন থেকে কে বলচে—'ঐ সেই মেয়েটী, কী চমৎকার খেলাই না দেখায়।'

একটী মেয়ে আর একটী ছেলে। মেয়েটীর রূপের তুলনা নেই—রূণকি ভাবতে পারেনি এমন দিব্য কমনীয়তা কি ক'রে স্থান পেতে পারে মানুষের মুখে। ছেলেটী মেয়েটীর চেয়ে খানিকটা বড়—লম্বা, গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা। ও শুনতে পেলে ছেলেটী বলচে...'না, না, ওর সঙ্গে কি আলাপ করবে, সার্কাসের মেয়ে...ওদের কি স্বভাব বা চরিত্র ভাল থাকে?'

রূণকির রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল.. ওর কানে ভেসে এল কঠিন নিষ্ঠুর কথাগুলি: 'ওদের আর অভাব কি? দলের একটা পুরুষকে পেলেই হলো...আমি কিন্তু বুঝতেই পারিনে এই সব বড় বড় মেয়েরা কেন সার্কাসে থাকে...আর দোষই বা কি...বেশ্যাও...সমাজে।'

রূণকি...নিজের গৌরবে নিজেই অস্থির হয়ে উঠতো রূণকি! ভাবত—ওর প্রতি প্রশংসায় সবার মুখ ভরে উঠে! ওর খেলা দেখে হাততালির ঘটা যা পড়ে, গর্ব্বের গরিমায় ওর মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে তাতে। কিন্তু ও কি স্বপ্নেও জানত—এ ধারণা পোষণ ক'রে সবাই ওর সম্বন্ধে। চরিত্রহীন....দলের ছোকরা....ওর মনে ভেসে উঠল গুলদার মুখ...কালো কর্কশ দৈত্যের মত ভীষণ কুৎসিৎ মুখ। ওর ঠোঁটে বিষ আছে, ওর হাতে কাঁটা আছে ওর বুকে ভীষণ অস্ত্র লুকান আছে যা দিয়ে মেয়েদের সর্ব্বনাশ করতেই ওর জন্ম।

খানিক পরে ওর মনের তলদেশ থেকে কে যেন ধীরভাবে বলে উঠলো...না, না, ভুল ভাবার সময় এখনো আছে, সময় যায়নি তোর জীবনে।

ঐ ছেলেটি কে? জানতে বড়ো ইচ্ছে হোলো রূণকির। সে এগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটিকে, কোনপথে তাঁবুতে সোজা যেতে পারবো? ওকে এগুতে দেখেই ছেলেটি খানিক দূরে সরে গেল। মেয়েটি পথ দেখিয়ে দিয়ে বললে...তুমি এ-দলে কতো দিন আছ?

'অনেক দিন...আমি পাঁচবছর থেকেই তো এখানে।'

'তোমার বাবা-মা নেই?'

'আছে। তবে তাদের বড়ো হ'য়ে আমি মাত্র একবার দেখেছি।'

'তোমাকে মাইনে দেয় না।'

'হ্যা, আমাকে খুব কম দেয়—মাত্র কুড়ি টাকা আর বাবাকে পাঠিয়ে দেয় বাকী সব টাকা। মাইনে আমার আশি টাকা এখন।'

'তোমার ভালো লাগে?'

রূণকি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ভালোই তো লাগছিল এতদিন! কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনে হোলো ওর ভালো লাগে না...না...না...না। ইচ্ছে হলো ছুটে পালিয়ে যেতে—সাঁতরে পার হয়ে যেতে ঐ নদী। ও বললে...

'ভালো লাগে কি না বুঝতে পারিনে'—একটু পরে বললে...উনি আপনার কে হন? মেয়েটি ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর দিকে তাকালে...যেন একটা কালো সন্দেহের ছায়া তার চোখের ওপর। তারপরে গম্ভীর হ'য়ে বললে...আমার স্বামী। বলেই সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলেটির কাছে।

স্বামী...স্বামী...অনেকক্ষণ রূণকি ভাবে। কি যেন একটা অজানা মাধুর্য্য জড়িয়ে আছে ঐ নামটার সঙ্গে—বিশ্বজোড়া সুখ, শান্তি, সার্থকতা। কি জিনিষ কে জানে...ঐ স্বামী। সে ভাবে তার মা ও বাবার কথা। দক্ষিণ ভারতের একখানা গ্রামের কুটীর প্রান্ত তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একবার...একবার মাত্র জীবনে সে ওখানে যেতে পেরেছিল। তার মায়ের স্নেহমাখা মুখখানি...তার বাবা...তার মায়ের স্বামী কি আদর, কি ভালোবাসা!

সেদিন রাত্তিরে ঘুম এলো না ওর চোখে। শেষের 'শো' দেখানো শেষ হ'য়ে গেল। কলের মতো কাজ করে গেল রূণকি। চারধারের আবহাওয়া হাততালিতে মুখর হ'য়ে ওঠে... কিন্তু দীপ্তিতে ওর মুখ তো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না প্রশংসার আনন্দে। দড়ি ওপর দিয়ে হাটবার সময় ও শুনতে পায় তাবু থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যেন একজন বলচে...কি সুন্দরই দেখালে মেয়েটা...আর একজন বলে, রেখে দাও। সার্কাসের মেয়ে—ও তো বেশ্যা। দুদিকের ব্যালান্স ঠিক থাকে না.. পড়তে পড়তে রূণকি তাল সামলে নেয়.. ম্যানেজারের চোখ-কটমটানি ওর চোখে ঠিকরে এসে আঘাত করে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। গুলদা এসে বলে রূণকি, দোর খোল। রূণকি ধীরে ধীরে দোর খুলে নিজেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। গুলদা বলে, চল বিছানায় চল; কি চমৎকার খেলাই

তুই দেখাস বল দিকি? আজ দড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছিলি কেন? আসল কথা হচ্ছে ব্যালান্স ...বড়ো কঠিন একটু থমকে গেলেই বিপদ...চল্ বিছানায় চল...!

রূণকি উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে...হঠাৎ ওর চোখে আগুন জ্বলে ওঠে...গুলদার দিকে তাকিয়ে পাগলের মত বলে ওঠে—যা, যা, আমার ঘর থেকে...চলে যা। হতভাগা মেয়েদের ঘরে কিসের জন্যে আসা তোর? আর কোনদিন..." ওর গলা কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে আরম্ভ করে—সেই নোনা চোখের জলের উত্তাপে যেন গাল দুটো পুড়ে দাগ হয়ে যায় ওর।

পরদিন এই গুলদার হাতধরে আবার সাইকেল চালাতে হয়—আবার ওর সঙ্গে বল্ খেলতে হয় বুকের ও মুখের কথা ঢেকে রেখে। হাতটাকে গুলদা একটু চেপেই ধরতে চায়... একটু যেন করুণভাবে ওর দিকে তাকায়...দয়া হয় না ওর মনে...নিজের প্রতি ঘৃণায় ওর মন ভরে আসে।

খেলা দেখাতে এসে ওর চোখ পড়ে ঐ কোনের একটা লোকের দিকে...নীচ জাতির লোক হবে বোধ হয়। লোলুপ চোখে লোকটা তাকিয়ে থাকে রূণকির অপর্য্যাপ্ত আবরণে আবৃত অসংযত দেহের পানে। সহসা লজ্জায় রূণকির পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা কিসের ভাব খেলে যায়। ওর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যেতে এক্ষুনি ভিতরের দিকে। অসম্পূর্ণ খেলা দেখিয়েই ও সেদিন চলে যায় ম্যানেজার বলে কি হোলো কাপড়টাকে বুকে জড়িয়ে ও বলে 'শরীর ভালো নেই আমার।' ম্যানেজার 'হু' বলে চলে যায়।

আসরে রাত্রির নিস্তব্ধতায় রূণকি বসে বসে ভাবে। ঐ যে চেয়ারে ব'সে খেলা দেখছিল একটি মেয়ে আর একটি ছেলে ..ওরা নিশ্চয় স্ত্রী আর স্বামী। খানিকক্ষণ নিজেই বারবার শব্দটা উচ্চারণ করে...স্বামী....স্বামী...স্বামী। হয়তো বা সার্কাসের কথাই ওরা বলছে এখন কি বলবে তারা ওর সম্বন্ধে? ভালো খেলা দেখালো? ...এ তো সবাই বলে! রূণকি আর এ প্রশংসা চায় না...চায় না। এতে তার অরুচি ধরে গেছে। তার জীবনই সে কি দড়ি চড়ে কাটিয়ে দেবে?......

কেউ কি নেই যে বলে...না, ও খারাপ মেয়ে নয়...ও বেশ্যা নয়...ও ভালো...ও পবিত্র।

সহসা ওর চোখে কোন অজানা জলের ধারা অবিশ্রান্তরূপে ঝরে পড়তে আরম্ভ করে.. বাঁধা আর মানতে চায় না।

তুমি নারী, আমি কবি

সতীশ রায়

জনমে জনমে রচি তব স্তবগান তুমি নারী, আমি কবি।
স্নেহের নিঝর, মমতায় গড়া প্রাণ, তুমি করুণার ছবি।
শক্তিরূপিনী, তুমি দিলে বরাভয় সংসার-রণে আসি'
ধরার দুঃখ অবহেলে করি জয় নিরাশা তিমির নাশি'
তোমারে বরিতে মরণ যজ্ঞা'নলে ঢালি যে জীবন-হবি,
তব মন্দিরে মম হোমশিখা জ্বলে, গান জাগে ভৈরবী।
তব কোলে এনু অসহায়, ক্ষুধাতুর জননী! মিটালে ক্ষুধা!
নিকটে আসিলে তবু রয়ে গেলে দূর প্রিয়ালো! বিলা'লে সুধা।
সঁপি' দিলে যবে প্রসারিয়া মনপাশে হে রমণী! আপনারে,
ধরা দিনু আমি প্রণয়ের ফুলফাঁসে ক্ষমাহীন সংসারে;
যৌবন-রসে উদ্বেল বারিবাহ প্রেমতটিনীর নীরে
অবগাহি গেল কামনার দাব দাহ শান্তি আসিল ফিরে!
জীবন-কাব্য হে বাণী! তোমার দান, আমারে করিলে কবি
মম সঙ্গীতে তাই সুধা বহমান কঠিন পাষাণ দ্রবি'!

দুর্গা সে তুমি দুর্গতি কর নাশ সৃজন প্রভাতে, দেবী!
প্রলয়-প্রদোষে তব খল খল হাস, শোণিত-আসব সেবি'।
ভারত-সমরে তুমি সে যাজ্ঞসেনী যজ্ঞ-সমুদ্ভূতা,
দুঃশাসনের রক্তে রচিলে বেণী হর্ষ পরিপ্লুতা!
তুমি সে 'যোয়ান' দৈবী প্রেরণা লভি' ফরাসী পল্লীবালা
স্বদেশ-সেবায় সাজিলে যে ভৈরবী কণ্ঠে করোটি মালা!
দৃপ্ত কণ্ঠে, দীপ্ত নয়নে হেরে, তুমি সে লক্ষ্মীবাই
কামানের মুখে দাঁড়ায়ে কহিলে, 'মেরে ঝান্সি দেঙ্গেনাই!'
অশ্ব-আরূঢ়া তুমি চাঁদ সুলতানা হাতে খর তলোয়ার
ঝড়ের রাত্রে উড়ে গেছে সব মানা আবরণ বোরোখার!—
ভীষণ-মধুর নিরখি বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে প্রাণ-হবি
পাগলের মত রচি নব গীতলিখা তুমি নারী, আমি কবি।

ছাড়ায়ে আসিনু সব প্রয়োজন-সীমা দিগন্ত ঘেরা মাঠে
গেরুয়ায় যেথা মুছে গেছে শ্যামলিমা, সূর্য্য বসেছে পাটে।
দেখি নারী চলে সন্ধ্যা-ধূসর পথে দিবসের রণ-জয়ী,
কাব্যলোকের সব রূপবতী হ'তে এ নারী মহিমময়ী!
উচ্ছল হাসি, মুক্ত সকল বাধা, সঙ্কোচ, লাজ, ভয়
রক্তজবায় উদ্ধত খোপা বাঁধা, কালো আঁখি কথা কয়!
সঙ্গীত রবে মুখরিত করি দিক চলে নৃত্যের তালে
সখীগণ মিলি' সচকিত করি পিক মিলাল চক্রবালে!
প্রকৃতি দুলালী! অহেতুক তব দান!— অমর আখ্যা লভি'
দেশে দেশে ফিরি গাহি তব জয় গান, তুমি নারী, আমি কবি।

অর্থ-পরিকল্পনার নব রূপায়ন

অতীন্দ্রনাথ বসু

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধান থেকে সম্প্রতি "পরিকল্পনা" (Plan) এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned economy) এই শব্দদুটি আমদানী হোয়ে মন্ত্রীসভা থেকে চায়ের টেবিল পর্য্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বসাধারণের ব্যবহারের ফলে এরা এদের কৌলিন্য খুইয়েছে, এদের সংজ্ঞাও ক্রমশ হয়েছে অস্পষ্ট। আর্থিক বিলিব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচরণের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার রাষ্ট্রপ্রয়াস, ব্যবসায়িক আবর্তের (business cycle) বিরুদ্ধে যে কোনপ্রকার সংগ্রাম সবই অর্থনীতিক পরিকল্পনার নামে কেটে যাচ্ছে। বিশেষ করে গত মন্দা'র পর থেকে আর্থিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজবার নানান রকমের প্রস্তাব আলোচিত ও প্রযুক্ত হয়ে আসছে। কম্যুনিষ্ট অর্থনীতি, ফাসিস্ত অর্থনীতি ও নিউ ডীল, এই সব বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে চলেছে এই সংগঠনের পরীক্ষা। এদের সবই আর্থিক পরিকল্পনা। ফলে পরিকল্পনা বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট ভাবার্থ বা সমাজ-দর্শনের আভাস পাই না এবং অর্থনীতিক আলোচনায় বহু অস্পষ্ট চিন্তা ভীড় জমিয়েছে।* রাষ্ট্রীয় অধিকারের মাত্রাভেদে এই আর্থিক শাসন-প্রণালীগুলির মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করা যেতে পারে।

লরবিন প্রথম এই শ্রেণী-বিভাগ করেছিলেন।† অর্থনীতিক পরিকল্পনা তাঁর মতে চার রকমের ঃ—

১। পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক (absolute Socialist)
২। অর্ধ সমাজ-তান্ত্রিক (partial State Socialist)
৩। ব্যবসায়িক স্বেচ্ছাতন্ত্র (voluntary business)
৪। সমাজ প্রগতিশীল (social progressive)

পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক ও সামাজিক জীবন এমন ভাবে কেন্দ্রীভূত হয় যাতে উৎপাদন, জীবন-যাত্রার মান এবং আর্থিক প্রণালীগুলি এক কেন্দ্রস্থ একক শাসনের অধীন থাকে এবং ঐ শক্তিদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত হয়।

অর্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদাহরণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (New Economic Policy)। ১৯৩১ সালে—তখন বহু শিল্প রাষ্ট্রের পরিকল্পনাসমিতির শাসন

*Annual Report of the Director of International Labour Office, Geneva, 1936. P. 46.

† L. L. Lorwin; "The Problem of Economic Planning" in World Social Economic Planning, Pd. by International Industrial Relations Institute.

ও অধিকারের বাইরে পড়ে আছে। ভোক্তার উপার্জন অর্থের আকারে সিন্ধুকে উঠছে, সুতরাং ব্যয়পন্থা স্থির করতে সে অনেকটা স্বাধীন।

মন্দা'র সময়ে ব্যবসায়ীরা যে প্রস্তাব করেছিল ব্যবসায়িক স্বেচ্ছাতন্ত্রের তাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রস্তাবের মর্ম এই:—সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পসমিতিগুলি ব্যবসায়ীসমাজের সভ্যদের ওপর কিছুটা অধিকার খাটাতে পারবে এবং যে কোন বিশেষ শিল্পপতির সিদ্ধান্তের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে। "আর্থিক সমস্যা সমাধানে শাসনশক্তি আরো বেশী করে অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু নেতৃত্বের এবং পথ নির্দেশের আসল কাজ করবে ব্যবসায়"। এই "ব্যবসায়িক" পরিকল্পনায় এর উদ্যোক্তারা বিভিন্ন শিল্পসমিতির সহযোগীতা কতদূর আশা করেন তা ঠিক বোঝা যায় না।

সমাজ প্রগতিমূলক ব্যবস্থায় একটী কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থা খাড়া করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে উপার্জনের কিছুটা সমতা-সাধন। আর্থিক সংস্থা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবার কতকটা ক্ষমতা রাখবে, কিছুটা শাসন কর্তৃত্ব রাখবে এবং আর্থিক শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত সমিতিগুলির (board) কাজে সংযোগ রাখবে।

প'লক্ এই বিভিন্ন পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে দুটী প্রধান ভাগ করেছেন—ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা, যার ভিত্তি উৎপাদন-যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিস্বত্ব, আর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা যার ভিত্তি উৎপাদন যন্ত্রের ওপর যৌথ স্বত্ব।* পলক্ এর মতে যাবতীয় পরিকল্পনা প্রস্তাব এই দুই ভিন্নধর্মী সীমার মাঝে কোথাও না কোথাও পড়ে।

ম্যাণ্ডেলবম্ ও মেয়ার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আরো সূক্ষ্ম পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন†। তাঁদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা হচ্ছে উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তির স্বাধিকার নষ্ট না করে অবাধ প্রতিযোগীতা দূর করবার অন্তত কমাবার প্রচেষ্টা। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্র হবে উৎপাদন-যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী। বিভিন্ন ধরণের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যেও আবার এঁরা পার্থক্য দেখিয়েছেন। "শাসনাধীন" (administrative) সমাজতন্ত্রে কেন্দ্রিয় সরকার সরাসরি তার আধিপত্য চালিয়ে বাজারের হালচাল পালটে তার জায়গায় একটী আর্থিক পরিকল্পনা স্থাপন করে। "বাজার" (market) সমাজতন্ত্রে কেন্দ্রিয় শক্তি বাজারের হালচাল ঠিক রেখে তাকে পরোক্ষ উপায়ে প্রশমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

ষ্ট্যালি আর একরকম শ্রেণী-বিভাগ করেছেন—অর্থনীতিক দর্শনের দিক থেকে নয়—ব্যবহারিক

* F. Pollock, "Die Gegenwaertige Lage des Kapitalisms und die Aussichten einer Planwirtschaftlichen Neuordnung", Zeitschr. f. Sozialforschung, 1932.

† K. Mandelbaum and G. Meyer, Zur Theorie der Planwirtschaft, Zeitschr f. Sozialforschung, 1934.

জগতে বর্তমানে চলতি অর্থনীতিক ব্যবস্থাগুলির দিক থেকে।* তাঁর ব্যাখ্যানুসারে অর্থনীতিক দুনিয়া একটি বিশ্লিষ্ট রবিরশ্মির মত। এই স্পেকট্রাম-এর এক মাথায় আছে খাঁটি খোলা বাজার, মূল্যের যোগাযোগ (pole of pure free market, price co-ordination) অন্য মাথায় আছে পুরোপুরি কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা এবং অধিকার (pole of complete central planning and control)। এই দুই মাথার মাঝখানে পাঁচরকম অর্থনীতিক ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রীয় অধিকারের তারতম্য অনুসারে এগুলোকে এভাবে সাজানো যায়:—

১। শিল্পস্বাতন্ত্র্য (Laissez Faire) ; ছোট প্রতিযোগী শিল্প (small scale competitive industries) ; রাষ্ট্রের স্বল্পপরিমান হস্তক্ষেপ ; স্বল্পপরিমান একাধিপত্য (monoploy)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। রাষ্ট্রের যথেষ্ট পরিমাণ হস্তক্ষেপ; বৃহৎ শিল্প ; কেন্দ্রাভিগমন (monopolistic tendencies) ; কতক পরিমাণ যৌথ স্বত্ব (collective ownership) বর্তমান পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩। ব্যক্তিস্বত্ব ও মুনাফা স্বীকৃত হ'য়েও স্বত্বাধিকারীর ওপর রাষ্ট্রের অত্যধিক আধিপত্য। খাটানো বিত্তের (investments) শাসন ও সংযম। সামরিক অর্থনীতি (military economy)। বর্তমান জার্মানী, ইটালি ও জাপান।

৪। বিপুল ("of commanding heights") রাষ্ট্রীয় শাসন। ব্যক্তিস্বত্ব ও মুনাফা অস্বীকার —কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে অনেকটা স্বাধীন প্রয়াস স্বীকৃত। 'নিউ ইকনমিক পলিসির' সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র (১৯২১-২৮)।

৫। গোড়াগুড়ি আর্থিক পরিকল্পনা, রাষ্ট্রচালিত শিল্প। ক্ষেত্র বিশেষে মাত্র অসম্পূর্ণ যুক্ত-স্বত্ব। বণ্টনসাম্যের জন্য মূল্য শাসন (control of price)। বর্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

এই স্পেকট্রামের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কতকগুলো পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

ক। উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিস্বত্ব ক্ষয় হয়ে যৌথ-স্বত্বের দিকে যাচ্ছে।

খ। সরকারের কাজ ছিল শান্তিরক্ষা, বিচার এবং বাজার চলাচলের কাঠামোটা তৈরী রাখা,—ক্রমশ সরকার যাবতীয় শিল্পানুষ্ঠানের পরিচালনা হাতে নিচ্ছে।

গ। আর্থিক ও রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা ছিল বহু যোগসূত্র সত্বেও স্বতন্ত্র—ক্রমশ তারা এক হয়ে যাচ্ছে—বিশেষ করে উর্ধতন ক্ষেত্রে।

ঘ। অবাধ পণ্যচলাচলের ফলে অনিবার্যভাবে যে সব সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হত তাই সংযোগ করে গঠিত হত রাষ্ট্রনীতি। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি যেন ছিল কতকগুলি 'অন্ধ' শক্তির ব্যক্তি-ইচ্ছা-

* E. Staley, World Economy in Transition, 1939.

নিরপেক্ষ স্বতস্ফূর্ত পরিণতি। তার জায়গায় রাষ্ট্রনীতি হয়ে উঠেছে সুচিন্তিত, প্রত্যক্ষসন্ধী এবং ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প-প্রণোদিত।

এ ছাড়াও আরো অনেক রকম শ্রেণীবিভাগ হয়েছে। পারসন ভাগ করেছেন শাসনযন্ত্র শিল্পপরিকল্পনায় কতখানি এবং কি ভাবে অংশ নিচ্ছে তার ওপরে (directive planning, general administrative planning, operative planning)।* গোল্ডস্মিড্ এর বিভাগীকরণ গুণ ও ধর্মবাচক। সবরকম পরিকল্পনাই দুই ধরণের হ'তে পারে—স্থিতধর্মী ও গতিধর্মী (static or dynamic) রক্ষণশীল ও পরিবর্তনশীল (conservative or progressive), সংযমশীল ও বর্ধনশীল (restrictive or expansive)। ইউটোপিয়ান, ফ্যাসিস্ত ও সোভিয়েটতন্ত্রের থেকে তিনি এদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।***

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিসের ভূতপূর্ব পরিচালক হ্যারল্ড্ বাট্‌লার অন্যভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের আওতায় অর্থ নৈতিক জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি মুখ্যত এই :—†

১। শিল্প ও কৃষি পরিকল্পনা
২। বিদেশী বাণিজ্য শাসন
৩। ঋণ ও মুদ্রার পরিচালন
৪। শ্রম ও সমাজ সংস্কারক আইন

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিসের ১৯৩৬ সালের রিপোর্টে 'পরিকল্পনা' (planning) এবং পরিচালিত অর্থনীতি (directed economy) এ দু'এর মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে "পরিকল্পনা"য় কয়েকটী সাধারণ বাঁধাবাঁধির মধ্যে অবাধ প্রতিযোগীতাকে কাজ করতে হয়। উৎপাদকদেরই থাকে নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তাদের সাধারণ ইচ্ছাকেই অইনগত করবার জন্যে,—অবশ্য যদি এই ইচ্ছা সমষ্টির স্বার্থবিরোধী না হয়।" পক্ষান্তরে "পরিচালিত অর্থনীতি বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কার্যপরম্পরার গোটা ক্ষেত্রের, অন্তত এর বহুল অংশের মধ্যে রাষ্ট্রকর্তৃক সামঞ্জস্যসাধন ও পরিচালন।"

* * * * *

আর্থিক শাসনের গুণবাচক ও আদর্শবাচক শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল নয়, কারণ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে আর্থিক শাসনের প্রকারভেদ করতে গেলে মুস্কিল হয় এই যে অফুরন্ত আদর্শের মধ্যে অফুরন্ত শ্রেণীবিভাগ এসে পড়ে। মানুষে মানুষে আদর্শের

*H. S. Person : "Nature and Technique of Planning", Plan Age, 1934.

***A. Goldsschmid, "Theories and Types of Planning : Utopian, Fascist, Soviet" in M. Van Kleeck and M, L. Fledderus, On Economic Planning, New York, 1935.

†H. Butler, "Economic Planning and Labor Legislation" M. V. K. and M. L, F. op. cit.

পার্থক্য অনন্ত এবং অস্পষ্ট—কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে 'প্রগতিশীল', 'রক্ষণশীল', 'ধনতান্ত্রিক', 'সমাজ-তান্ত্রিক' এই গালভরা কথাগুলি অনেক সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী ও ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার ওপর প্রযুক্ত হ'য়ে আসছে। শিল্পসংগঠনে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাত্রাভেদে শ্রেণীবিভাগ অর্থ-বিজ্ঞানের দিক থেকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সহজবোধ্য।

এই হিসাবে স্তরভাগ করতে গেলে সুরু করতে হয় খোলা বাজার ব্যবস্থা (free market economy) থেকে—অর্থাৎ যাকে চলতি কথায় বলা হয় নির্জলা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। উৎপাদনে ব্যক্তির অধিকার—এ প্রথার ওপর এ ব্যবস্থা ভিত্তিস্থ। এই মূলগত ব্যক্তিস্বত্বেরই এক একটি দিক হচ্ছে প্রয়াস (enterprise), বিনিময় (exchange) ও চুক্তির (contract) স্বাধীনতা।

'এই আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার অথবা বাজার-দর। দৃশ্যত অন্য কোন নিয়ন্ত্রেতার প্রয়োজন হয় না কারণ নিখুঁৎ প্রতিযোগীতায় বাজার-যন্ত্র কাজ করে ভাল'ই। এর সমর্থকদের মতে চাহিদা ও উৎপাদনে বৈষম্য হলেই দর চড়বে কিংবা নামবে এবং তার সূচনা দেখে শিল্পপতিরা স্বার্থবশে কাজের ধারা এমনভাবে বদলাবে যাতে নতুন ক'রে একটা ভারসাম্য আসবে।

সুতরাং খোলা বাজারে রাষ্ট্রের কোন হাত দেবার কথা নয়। প্রজার অধিকার এবং সম্পত্তি রক্ষা ছাড়া আর কোন দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেই। কার্যত এ অবস্থা আজ সর্বত্র অচল। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে রাষ্ট্র ক্রমশ তার অধিকার বিস্তার করছে--বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ ও মুদ্রানীতি এবং সমাজ সংস্কারক আইন প্রণয়ণে। রক্ষণশুল্ক (protective tariffs), ডিস্কাউন্ট রেট বদল, মিলে কাজের সময় সংক্ষেপ, নারী ও বালক শ্রমিক সংযম এই সব আধুনিক শাসননীতির অঙ্গ। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কার খোলা বাজার বা মূলধনী ব্যবস্থাকে নষ্ট করেছে এ কথা অতি গোঁড়া প্রাচীনপন্থীরাও বলবে না।

১৯৩০ সাল থেকে যখন পৃথিবী ব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দিল', তখন রাষ্ট্র আর্থিক ব্যাপারে আরো বেশী ক'রে মনোনিবেশ করলে। গত দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে যে সব উপায় অবলম্বন করেছে তা মূলত খোলা বাজারের পরিপন্থী। আগে রাষ্ট্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্যে বাজারকেই যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। যেমন, আগে কোন আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ কমাতে হ'লে রাষ্ট্র তার ওপর শুল্ক বসাত'। ফলে তার দাম চড়ে যেত' এবং আমদানী ক'মে যেত। এ প্রকারে ব্যবসায়ীরাই আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ স্থির করত' অথচ রাষ্ট্র শুল্কের হার দিয়ে তাকে বাড়াতে বা কমাতে পারত। কিন্তু এখন ব্যবসায় ও শিল্প শাসনে রাষ্ট্র আর বাজার যন্ত্রের আশ্রয় নেয় না,—quota system এ নিজেই সরাসরি স্থির ক'রে দেয় বিদেশী পণ্য কতটা আমদানী হবে। এর বণ্টন যে ভাবেই সাধিত হোক না কেন * বাজারের

*এই quota কোথাও পাইকারী আমদানীওয়ালাদের ভেতর বণ্টিত হয় প্রাক্তন বৎসরের আমদানীর অনুপাত হিসাবে। কোথাও মোট আমদানীর একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যেকের ভাগে ফেলে দেওয়া হয়। quota নিলামেও বিক্রী হ'তে পারে।

আইনকানুন এখানে খাটে না। বৈদেশিক বিনিময় শাসন করেও আন্তর্জাতিক পণ্যবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে জার্মাণী বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের (barter) ব্যবস্থা করে—সস্তায় কেনা ও চড়ায় বিক্রী এই বাজার প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। এখানেও আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করছে বাজারের অবস্থা নয়, রাষ্ট্রের নীতি। এরূপে রাষ্ট্র বা উৎপাদন-সঙ্ঘ কর্তৃক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, কোন ব্যাবসায় প্রয়াস বন্ধ করতে বাধ্য করা, নির্দিষ্ট আয়তনের অধিক জমিতে চাষ হ'তে না দেওয়া, শিল্পের ওপর জাতীয় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা (nationalisation of industry) সবই বাজার প্রথার পরিপন্থী। সর্বত্র রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে উৎপাদন হবে কতটা এবং কেই বা করবে কতটা। *

বাজার-ব্যবস্থা (free market economy) আদৌ টিকছে কিনা এ লক্ষনের ওপর রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে একটা লাইন টানা যেতে পারে। বাজার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে শিল্পনিয়ন্ত্রণে যে যে রাষ্ট্রিয় বিধি প্রচলিত তাদের তালিকা—

১। আমদানী শুল্ক

২। মুদ্রা সংস্কার, যেমন ডিস্কাউন্ট রেট, রিজার্ভ রিকোয়ারমেণ্ট ইত্যাদি পরিবর্তন

৩। শ্রম ও সমাজ সংস্কারক আইন

৪। যৌথ দরকষাকষীর পৃষ্ঠপোষণ

৫। শ্রমিক আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইন (Imrigation Laws)

৬। রাজস্বনীতি

যে সব রাষ্ট্রবিধি বাজার ব্যবস্থার বিরোধী তাদের তালিকা—

১। আমদানী-রপ্তানির quota নির্ধারণ

২। বৈদেশিক বিনিময় শাসন

৩। ঋণনীতি (credit policy) যা দ্বারা মুদ্রাবিভাগের কর্তারা শুধু চল্‌তি মুদ্রার পরিমাণ স্থির করে দেন না, মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্যও নির্ধারণ ক'রে দেন।

৪। নিম্নলিখিত উপায়ে সরাসরি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ,—

(ক) রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত অথবা স্বাধীন কার্টেল ও অন্যান্য শিল্পীসংঘ কর্তৃক, (খ) কোন শিল্পপ্রয়াস বন্ধ করে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট জমির অতিরিক্ত চাষ হ'তে না দেওয়া, (গ) মূল্য নির্ধারণ, যাতে চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে বাধ্য হয়, (ঘ) কোন বিশিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রসারের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বিভাগে (Public works department) ব্যয়, (ঙ) অর্থপটের (economy) কোন কোন অংশে জতিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা (nationalisation)।

৫। শ্রমিক আমদানী রদ আইন।

* G. Haberler and S. Verosta, Liberale and Planwirtschaftliche Handelspolitik, Berlin, 1934.

এ তালিকা অবশ্য ব্যাপক নয়। উৎপাদন ব্যাপারে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এ ভাবে বাড়তে বাড়তে ক্রমশ রাষ্ট্রস্বামীত্বে পর্যবসিত হ'তে পারে যখন দেশের সমুদয় আর্থিক কার্যকলাপে আসবে রাষ্ট্র-শাসন ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ। শিল্পজীবিরা (entrepreneurs) ক্রমশ হ'য়ে দাঁড়াবে সরকারী কর্মচারী। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে বাজারের স্থান। এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে উৎপন্ন তথা ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণ অন্তত নির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থিরিকৃত হবে। অবশ্য এই আর্থিক পরিকল্পনাও কতকগুলো বাজারের ইঙ্গিতের ওপর নির্ভর করবে যদিও এই গণ্ডীবদ্ধ বাজারের সঙ্গে মূলধনী ব্যবস্থার খোলা বাজারের তুলনা চলে না।

শুধু কতগুলি বিশিষ্ট পণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করলে খোলা বাজার প্রথা লুপ্ত হয় না—বাজারের একটা অংশ মাত্র বন্ধ হয়। নিয়ন্ত্রণার পরিধি যত বাড়তে থাকে,বাজার প্রথা তত লোপ পেতে থাকে। ব্যক্তি অধিকারের স্থানে আসে রাষ্ট্র-অধিকার। কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলো যে এক সুসমঞ্জস পরিকল্পনায় সুসম্বদ্ধ হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং আজকাল অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে সরকার থেকে রাজনৈতিক কারণে কতকগুলি অসংলগ্ন অর্থনৈতিক পন্থা অনুসরণ করা হয়। বিশেষত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বামীত্ব রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্পপতিরা তাদের স্বার্থ ও সিদ্ধান্ত জাহির করতে চাইবেই এবং ততক্ষণ গোটা অর্থপটের জন্যে একটা কেন্দ্রীয় সুসমঞ্জস অর্থনীতিক পরিকল্পনা কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভব, অন্তত স্বত্ববানের মুখাপেক্ষী।

অতএব 'পারিমাণিক নিয়ন্ত্রণ' (quantative regulations) যত বিস্তৃতই হোক, তাকে পরিকল্পনা (plan) আখ্যা দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রপ্রয়াসকে তা হ'লে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

১। রাষ্ট্রশাসিত খোলা বাজার। রাষ্ট্র গৌণভাবে বাজারপদ্ধতির ভেতর দিয়ে উৎপাদন-বণ্টন, চাহিদা-যোগান শাসন করছে।

২। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (Regulated Economy)। উৎপাদন-বণ্টনে বাজারের শক্তি হ্রাস হচ্ছে শিল্প-বানিজ্যের আয়তন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলির মধ্যে সুচিন্তিত যোগাযোগ নেই—এবং অর্থনীতির পেছনে একটা সমগ্র পরিকল্পনা নেই।

৩। পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned Economy)। রাষ্ট্র উৎপাদন-যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী এবং অর্থনীতিক শাসনে চরম কর্তা। এক আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন-বণ্টন শাসিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

*　　*　　*　　*

এ সব আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনটী কতকখানি উৎকৃষ্ট সে আলোচনার স্থান এ নয়। অনেকের, বিশেষত ব'নেদী অর্থনীতির (classical economics) মতে আর্থিক সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হচ্ছে খোলা বাজারের ভারসাম্য (equilibrium)। কারণ ভারসাম্যের

অবস্থায় (equilibrium point) পরিমিত উপকরণকে এমন ভাবে কাজে লাগানো হয়, যাতে অন্য কোন যোগাযোগেই এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন মেটান সম্ভব হত' না। অর্থাৎ ভারসাম্যের অবস্থায় পরিমিত উপকরণ থেকে আমরা অধিকতম কাজ পাই।* কিন্তু খোলা বাজারের ভারসাম্য আজ আকাশকুসুম প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ ঃ—

১। কোন রকম সরকারী শাসন না থাকলেও প্রতিযোগীতা-বৈষম্যের (imperfect competition) থেকে এমন একটা ভারসাম্যের উদ্ভব হয় যাতে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয় না।

২। যে চাহিদার পেছনে ক্রয়শক্তি নেই খোলা বাজারে তার কোন ক্রিয়াও নেই। কাজেই 'শ্রেষ্ঠ সমাধান' (optimum) হচ্ছে শুধু ক্রয়ক্ষমদের নিয়ে। যদি সমাজ থেকে অন্যভাবে ধনবণ্টন হয়, তা হলে ভারসাম্যের অবস্থা এবং সমাধান সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

৩। খোলা বাজারে সমাজের লোকসান মাপা যায় না। এ ব্যবস্থায় যে ভাবেই উপকরণ ব্যবহৃত হোক না কেন, যদি তাতে ব্যবসায়ীর খরচ উঠে কিছু লাভ থাকে তবেই সে ব্যবহার অর্থনীতি-সঙ্গত। কিন্তু ব্যবসায়ীর দিক দিয়ে সঙ্গত হলেও সমাজের দিক দিয়ে তা' না হ'তেও পারে। জমির উর্ব্বরতাক্ষয়, অরণ্যলোপ, বন্যা, সহরে জনবাহুল্য, খারাপ শ্রম-অবস্থা, এই সব অর্থনীতিক সমস্যা দূর করবার জন্যে আজকাল বিভিন্ন দেশে সরকার থেকে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেটাকে পঁচিশ বৎসর আগেকার উৎপাদন-ব্যবস্থা-জনিত সামাজিক ক্ষতি বললে অন্যায় হবে না। অথচ সে কালের উৎপাদন-প্রণালী ব্যবসায়ীর স্বার্থ ও লাভের দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই অর্থনীতি-সঙ্গত ছিল।

৪। এই একই কারণে সামাজিক উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে খোলা বাজার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। হয়ত' কোন সময়ে সমাজের কল্যানের জন্যে উন্নত ধরণের খাদ্য ও ওষুধপত্র উৎপন্ন করা দরকার। কিন্তু তা উৎপন্ন হচ্ছে না—কারণ প্রাপ্য উপকরণ থেকে এর চেয়ে লাভজনক জিনিষ তৈরী হচ্ছে যা সমাজের কাজে লাগছে কম এবং মুষ্টিমেয়ের বিলাস বা সখ তৃপ্তি করছে বেশী।

কোন রকম আদর্শগত তর্কের ভেতর না গিয়েও দুটো সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমত খোলা বা অব্যবস্থিত বাজারে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, সমাজের কল্যাণসাধন হয় না, উপকরণের আদর্শ সদ্ব্যবহার হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিস্বত্ব ও মূলধনী প্রথা বজায় রেখে সমাজ গড়বার কোন অর্থনীতিক পরিকল্পনা সম্ভব নয়। অর্থনীতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করলেই তাকে পরিকল্পনা বলা ভুল।

*"A freely competitive organisation of society tends to place every productive resource in that position in the productive system where it can make the greatest possible addition to the total social dividend as measured in price terms". F. H. Knight, The Ethics of competition and other Essays, New York & London, 1935.

দ্বন্দ্ব

(নাটক)

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

প্রভাত দেব সরকার

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক :

কোন-একটী কক্ষাভ্যন্তর

[ঘরটী অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। দূর থেকে গবাক্ষ পথচারী মৃদু আলোর বিচ্ছুরণে তরল আঁধারের সঞ্চারণ অনুভূত হ'লেও ঘরের কোন কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। দর্শকের দৃষ্টি সরল রেখা পথে ঐ গবাক্ষ-পথগামী আলোর অনুগামী মাত্র, আশপাশের আবেষ্টনীতে প্রতিহত। সুতরাং এ দৃশ্য-উপভোগে দর্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ রাখতে হ'বে, মাঝে মাঝে চোখ তুলে আলোর বিচ্ছুরণ লক্ষ্য ক'রতে হ'বে—কে জানে ইতিমধ্যে কিছু যদি ঘটে যায়। কতকটা আমরা যেমন অন্ধকারে চোখ জ্বেলে অনেক সময় একটা অভাবিতের কল্পনা করি।

এটা বেশ বোঝা যাবে যে, ঘরের এক কোণে দু'জন লোক আলাপ ক'রচেন। স্বর বৈচিত্র থেকে জনের সংখ্যা আসবে, কেননা দৃষ্টি এখানে অক্ষম। একজনের স্বরে আছে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বল-কর্কশলতা, শ্লেষ্মা বিজড়িত বক্রতা, আর একজনের কণ্ঠস্বরে আছে যৌবনের সঞ্জীবতা, ঐক্য এবং ঋজুতা এঁদের কথার মাঝখানে মাঝ-মাঝে আলোটা নিভে যাবে, যেমন অনেক সময় আমাদের কথার খেই হারায় আর কি!

দৃশ্যটা অভিনীত হবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ সময় নিঃশব্দে যাবে, তারপর কয়েকবার পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে, আবার চুপচাপ সহসা আমরা দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে আর্ত্তনাদ শুনতে পাব। সচকিত হবার আগেই ওঁদের কথা সুরু হ'বে।]

১ম

এ—এ সময়-এ তোমায় ডেকেচি কেন জান?

২য়

আজ্ঞে না, আমায় আবার এতদিন পরে যে আপনার দরকার হ'বে তা কেমন করে জানবো?

১ম (উত্তেজিতভাবে)

নিজের মূল্যটা দেখ্‌চি চিরকালই বাড়িয়ে দেখ্‌লে? ডেকে পাঠিয়েচি বোলেই যে তোমায় আমার দরকার, এ কথা তোমায় কে বললে? তুমি নিষ্ঠুর, তাই আমায় বুঝ্‌তে চাও না আজ!

২য়

আপনার কণ্ঠস্বর সে-কথা বলবে। প্রয়োজন যেখানে সত্যি নয়, সেখানে কিন্তু প্রয়োজনের ইঙ্গিতমাত্রই উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। এই আমার ধারণা। সুতরাং—

১ম

যাক, ঢের হয়েচে। যদি তাই-ই হয়, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, আর সেইজন্তেই আমি ডেকেচি, তাতে বক্রোক্তির কী আছে?

২য়

আজ্ঞে বক্রোক্তি আমি করচি না। বরং উদ্দেশ্যটা উভয়ের কাছে স্পষ্ট হ'লে আলাপ-আলোচনার পথটা সোজা হ'য়ে যায়।

১ম

তা যায়। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে তুমি তোমার মূল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সজাগ?

২য়

আজ্ঞে, সেটা আমাদের কেন, ইতর-বিশেষ সবার পক্ষে খাটে। তবে কিছু তারতম্য আছে!

১ম

তা যাক। একই জিনিষে তোমাদের অনুরাগ বহুকাল স্থায়ী নয় কেন?

২য়

নবীনের কল্পনা আমাদের আছে বলে। বিশেষ করে আমি যে পথের পথিক সে-পথে নতুনের আসা, আর পুরাণর যাওয়া অবিরাম চলে!

১ম

এ জিনিষটা কি খুব ভাল মনে কর? একদিন যাকে খাতির করে' তুমি নিজ হাতে বরমাল্য দিলে, আর একদিন অন্য জনের প্রলোভনে তার সে বরমাল্য কেড়ে-ছিঁড়ে পথের মাঝে ছড়িয়ে দিলে।

একটুও বাজলো না তোমার? দানের মর্য্যাদা তোমার রৈল কোথায়? মিথ্যে প্রলোভনে ভোলাও কেন?

২য়

অভিমানের কথা। সুতরাং যুক্তি গ্রাহ্য নয়। তবে দানের পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি না হ'লে যোগ্যতার সাক্ষাৎ আমরা পাই না। আর সেই যোগ্যতার নিরিখে নিরূপিত হয় জয়-পরাজয়। এটা নিয়ম বলেই আমি জানি।

১ম

তার সঙ্গে তোমার এটাও জানা উচিত ছিল না কি, এক সময় যে যোগ্যতার সমাদর পায়, পরে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে তার সেই যোগ্যতার অনাদর করলে কতখানি বাজে? আজ যাকে সম্মান দিচ্ছ, কাল তাকে সম্মানের সেই আসন থেকে নামিয়ে আনলে, এটা সে নিশ্চয়ই ভাবে এতদিন সে দাঁড়িয়ে ছিল নিছক একটা ফাঁকির ওপর।

২য়

কিন্তু, ওটা তো একটা নিয়ম হ'তে পারে। যে সম্মান পায় তার পক্ষে কাঙালের মত চিরকাল ফলের আশা শোভন নয়। অবিচলিত নিস্পৃহতাই যোগ্য সম্মানীর ভূষণ।

১ম

তা ব'লবে বৈকি ! তুমি জানবে কি ক'রে' একবার প্রতিষ্ঠাবান হ'য়ে পুনরায় তা থেকে চ্যুত হওয়া কত বড় মনোবেদনার কারণ। প্রতিষ্ঠার মূল্য তুমি দাও স্বীকার করি, কিন্তু প্রতিষ্ঠাবানের হর্ষ-বেদনার তুমি কোন ধার ধার না, এ আমি বলবো।

২য়

মহাকালের ল্যাজের ঝাপটে আমার দেওয়া প্রতিষ্ঠার চিরকালীনত্ব লাভের আশা একটা হাসির ব্যাপার। তার ওপর প্রতিষ্ঠাবান একটি-ই হ'লে কোন পক্ষের সুবিধে নেই, না সংসারের না তার নিজের। প্রতিষ্ঠার মূল্য তখন মুড়িমিছরির মত হ'য়ে পড়ে।

১ম

কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু তাতে একদালব্ধ প্রতিষ্ঠাবানের মন মানে না। সে যে ভিত্তির আশ্রয়ে দাঁড়ায়, আমরণ পর্য্যন্ত সে-ভিত্তি পাকা রেখে যেতে চায়, তার বাঁচার অর্থ তখন সেই প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ী !

২য়

বলেইচি তো চিরকালীনত্ব প্রতিষ্ঠার আদর্শ নয়। নিস্পৃহতাই যথার্থ ভোগীর অগ্নি পরীক্ষা।

১ম

তোমার মত করে' তুমি তো বললে, কিন্তু আমার মত করে' এটা কি কোনদিন ভেবে দেখেচো, জিনিষটা কত বড় অসম্ভব ব্যাপার। চোখের ওপর আপন খ্যাতি-প্রতিপত্তি অতলে তলিয়ে যেতে কে দেয়, কে সহ্য করে? নিজের জীবদ্দশায় এটা কেমন করে' ভাববো, আমি অবিনাশ ঘোষাল বেঁচে নেই, আমায় লোকে আর খাতির করে না—আমায় কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না! পরাভবের জ্বালা কি তুমি কখনো বোঝনি, নিষ্ঠুর? কেন, কেন তবে তুমি আমায় প্রতিষ্ঠা দিলে, কেনই বা ছিনিয়ে নিচ্চ বালকের হাত দিয়ে?

২য়

নিজের প্রতিষ্ঠানাশের কথাটা অমন করে' না-ভাবলে দুঃখটা লাঘব হ'য়ে যাবে। যে আসচে তাকে আসতে দিন, সব সোজা হ'য়ে। চেষ্টা করে' দুঃখ্ পাওয়ার গুরুত্ব অনেকখানি।

১ম

কিন্তু চোখের ওপর সব স্পষ্ট দেখে কি করে' সে-কথা ভাবচো, বলতে পার? তা হ'লে তো নিজের অস্তিত্বই ভুলে যেতে হয়। আমি যে অবিনাশ ঘোষাল ছিলুম, সে অবিনাশ ঘোষাল থাক্‌বো না, এ ভাবি কী করে? আমার প্রতিষ্ঠা, আমার যশ, আমার খ্যাতি, সবই কি ফাঁকি?

২য়

ফাঁকি কেন হ'তে যাবে? ভাবুন অবিনাশ ঘোষাল ঠিকই আছেন, তাঁর মূল্য কানাকড়ি

কমেনি, দ্বিতীয় অবিনাশ ঘোষাল কেউ আসবে না, আসবে নতুন লোক, নতুন আশা নিয়ে। তাকে সফল হ'তে দিয়ে নিজের মর্য্যাদা বাড়িয়ে তুলুন। কেন বৃথা আশঙ্কা?

১ম

না, তোমায় বোঝান বৃথা। তুমি নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক, তুমি শুধু নিজেকেই জান, সামনে যাত্রা-পথের নিশানা তোমার হাতে, পিছনে ফিরে তাকাবার অবসর তোমার নেই। বৃথা মনোবেদনা জানান তোমায়।

২য়

আমায় ভুল বুঝবেন না, প্রতিষ্ঠাবানের ঠিক-ঠিক সংস্করণ হয় না, তাঁরা যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে দেখা দেয় নতুন পথে। প্রতিষ্ঠার কোন ছাঁচ নেই। কেন মিছে ভেবে কষ্ট পাচ্চেন!

১ম

কেন? যাক সে কথা। তারিণী সামন্তর মামলায় হারার পরও তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, অবিনাশ ঘোষাল বেঁচে আছে,—তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি, লোকে তাকে তেমনি শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌চে, তেমনি সমাদর করচে! (থেমে) বার লাইব্রেরীতে গেচো কোনদিন? শুনচো ওরা কি বলাবলি করে? কত শ্রদ্ধা অবিনাশ ঘোষাল পায় আজও? তবু বল কেন? তুমি নিষ্ঠুর!

২য়

সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাবানের সপক্ষে এবং বিপক্ষে অমন অনেক কথা হয়। তাতে বিচলিত হবার কি আছে?

১ম

কি আছে? (সরে' গিয়ে) Get out! তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না, I say, get out!

২য়

মিছে উত্তেজিত হ'চ্চেন। আমি আপনার কোনই ক্ষতি করিনি। ভুল বুঝ্‌বেন না, দয়া করে'!

১ম

তুমি যাবে কিনা! হাত জোড় করচি, যাও আমাকে একলা থাকতে দাও। (থেমে) সেই দাঁড়িয়ে রইলে, Get out! Get out! out—out—out...ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়!

[সহসা ঘরে আলো জলে উঠলো। দেখা গেল শূন্য ঘর, কয়েকটা কৌচ, চেয়ার ফেল-ফেল করে' চেয়ে আছে—যেন হঠাৎ গণ্ডগোলে তাদের ঘুম ভেঙে গেচে। দেওয়াল ঘড়িটাতে রাত দুটো বাজলো। ক্রমে ক্রমে আলোটার জোর হ'লে দেখা যাবে প্রশস্ত ঘরখানার দক্ষিণের জানালায় নীচে খাটখানায় অবিনাশবাবু চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, ডান হাতটা কপালের ওপর, বালিশ থেকে মাথাটা কিছু ঝুকে গেচে। সামনের টেবিলের ওপর কাগজগুলো হঠাৎ বাতাসের ঝাপটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অবিনাশবাবু পাশ ফিরলেন।]

[আগামীবারে সমাপ্য

পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজপদ্ধতির উত্থান ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রুষের সর্ব্বপ্রথম এই রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের রূপ ধারণের সঙ্গে আর একটী রূপের আবির্ভাব হয়—তাহা ভারাঙ্গীয় খণ্ড রাজত্ব ! যে সব ব্যবসায়ের স্থানে ভারঙ্গীয়েরা ব্যবসায়ী বা স্বার্থবাহদের রক্ষকরূপে বেশী সংখ্যায় বাস করিতেছিল, সেখানে এই ঔপনিবেশিকদের শাসকরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া সহজ ছিল। ভারঙ্গীয়েরা অস্ত্রধারীদলে সংগঠিত হইয়া তাহারা নিজেদের একজন করিয়া সর্দ্দার (Captain) মনোনীত করে; ইহারা ক্রমে একটী ব্যবসায়ী সহরের গভর্ণরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। স্কান্দানেভীয় পৌরাণিকীগাথা (Sagas) এই কাপ্তেনদের Koenings or Vikings বলিত; শ্লাভ ভাষায় এই শব্দ Knia (Prince) রূপ ধারণ করে। এই স্কান্দানেভীয় ভারাঙ্গীয়েরা শ্লাভদের উপর প্রভুত্ব করিবার সময় এই সঙ্গে যে শ্লাভরূপ ধারণ করে সেই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই প্রকারে অস্ত্রে সুসজ্জিত কতকগুলি সহর ও তাহার সংলগ্ন প্রদেশগুলি ভারাঙ্গীয় প্রিন্সদের ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে এই সব খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়, যথা: রুরিকের নভগোরড ও আসকল্ডের কিয়েভ রাজ্য। বাল্টিক সমুদ্রের দক্ষিণ কূলের শ্লাভদের দেশেও এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক দর্শকেরা বলেন, এই সব ব্যবস্থা জয় দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়; ইহুদী লেখক ইব্রাহিম বলিয়াছেন, "উত্তরের কৌমগুলি কতকগুলি শ্লাভদের জয় করিয়া শাসনাধীন করিয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছে। তাহারা বিজিতদের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহারা শেষোক্তদের ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে[১]।

বর্ত্তমান কালের রুষ ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই সব ঘটনা হইতেই স্কান্দানেভীয় রুরিক ও তাহার দলকে নভগোরডের শ্লাভদের দ্বারা তাহাদের ঘরোয়া ঝগড়া মিটাইয়া শাসন করিবার নিমন্ত্রণের জনশ্রুতির উদ্ভব হয়। এই ঐতিহাসিকেরা বলেন[২], আসল কথা এই, রুরিকের দল শ্লাভদের নিকট ভাড়া খাটিত; পরে হয়ত তাহারা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করিবার দাবী করে; তাহাতে শ্লাভ অধিবাসীরা আপত্তি করে, ইহার ফলে এই আপত্তি অস্ত্র দ্বারা রুরিকের দল খণ্ডন করে, এবং

১। Kluchevesky P 64 vol I

২। „ P 66 „ Vol I.

নিজেদের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া ভাড়াটিয়া চাকরেরা মনিবরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে, স্বাধীন নভগোরড একটা ভারাঙ্গীয় রাজত্বে পরিণত হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাটী বর্ত্তমানের রুষ স্বদেশপ্রেমিকদের ব্যাখ্যা; কিন্তু ইহা সত্য যে এই সময়ে স্কান্দানেভীয় সশস্ত্র যোদ্ধার দল পশ্চিম ইউরোপের অনেক স্থানে এই উপায়ে ভাড়াটিয়া হইতে শাসকে বিবর্ত্তিত হয়। ঐতিহাসিক অধ্যাপক ক্লুচেভস্কি বলেন[৩] ব্যাপারটী আসলে এই যে দেশীয়েরা বহিশত্রু হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য বৈদেশিকদের সহিত সর্ত্ত করিয়াছিল, এবং এই বৈদেশিকেরা জোর করিয়া রাজশক্তি দখল করে। কিন্তু প্রাচীন পুরাবৃত্তে দ্বিতীয় ঘটনাটী চাপিয়া রাখিয়া প্রথমটী উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত করিয়াছে, যেন দেশীয়েরা বৈদেশিকদের স্বেচ্ছায় রাজশক্তি প্রদান করিয়াছে। এতদ্বারা রুষ রাষ্ট্র গঠনের একটা সম্ভবপর ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সব সহর প্রদেশগুলি তখনও স্বাধীন ছিল তাহাদের সহিত এই সব ভারাঙ্গীয় খণ্ডরাজ্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া (federation) রুষে তৃতীয় রাজনৈতিক রূপ সৃষ্টি করে কিয়েভ রাজত্বের উত্থান। দক্ষিণের কিয়েভ পূর্ব্বের ষ্টেপস্ (steppes) নামক প্রান্তর হইতে আগত শত্রুর আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবারও রুষ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইবার উপযোগী স্থান ছিল। এই সব কারণেই কিয়েভ সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব ইউরোপে বড় একটা রাজত্বে পরিণত হয়। কিয়েভ রাজত্ব প্রথম বড় রুষ রাষ্ট্র। এইজন্য ক্লুচেভস্কি বলেন[৪], নভগোরডে রুরিকের আগমনে রুষ সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন হয় নাই, বরং ডাইকিং বা কিয়েভে যে ক্ষুদ্র ভারাঙ্গীয় রাজত্ব স্থাপন করিয়া সমস্ত শ্লাভ ও ফিন কৌমগুলির সম্মিলনের বীজ বপন করে, তাহাই বর্ত্তমানের রুষ সাম্রাজ্যের* সর্ব্ব প্রথম রূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

তুর্কি জাতীয় পেচেনেগদের দ্বারা রুষ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবসায়ী সহরগুলি একটা সশস্ত্র শক্তির প্রয়োজন অনুভব করে,—ভারাঙ্গীয় প্রিন্স সেই শক্তি। ব্যবসায়ী সহরগুলি তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সে একটা সাধারণ স্বার্থের প্রতিপোষক ও রক্ষক হয়, তখন সে একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এইপ্রকারে রুষ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই প্রকারে, পূর্ব্ব শ্লাভ জাতি বর্ত্তমান রুষ সমতল ভূমিতে আসিয়া আইন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতি দ্বারা অবশেষে রাষ্ট্র সংগঠিত করিতে থাকে।

একটা কথা উঠে—রুষ নামটার উৎপত্তি কোথা হইতে আসিল? ভারাঙ্গীয় প্রিন্সদের গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণ বাহুরূপে ও প্রধান ব্যবসায়ীরূপে যেমন সশস্ত্র দল কার্য্য করিত তাহাদিগকেই Rus (রুষ) বলিত। ক্লুচেভস্কি বলেন[৫], ইহার ঐতিহাসিক বা ব্যাকরণগত কোন অর্থ আবিষ্কৃত

৩। Kluchevesky—P 68

৪। Kluchevesky—P 91

* ইহা ১৯১১ খৃঃ লিখিত হয়।

৫। Kluchevsky—P 91

হয় নাই, কিন্তু আমেরিকান নরতাত্ত্বিক রিপলে[৬] বলেন, উত্তর ইউরোপের স্কান্দানভীয় ভারাঙ্গীয়দের গাত্র বর্ণ হইতে শ্লাভেরা তাহাদের Rus লাল রঙ্গের মানুষ বলিয়া অভিহিত করিত। পোভিয়েষ্ট পুরাবৃত্তের লেখক বলেন, ইহা একটা জাতীয় নামবাচক, এই নাম সাধারণভাবে ভারাঙ্গীয় জাতির প্রতি প্রয়োগ করা হইত। পরে ইহার একটা সামাজিক মানে হয়; গ্রীক ও আরব লেখকেরা এই নাম দ্বারা রুষীয় সমাজের উপরের স্তরের লোকদের বিশেষতঃ প্রিন্সের সশস্ত্র যোদ্ধাদের বুঝিত। পরে ইহার একটা ভৌগলিক মানে হয়, এতদ্বারা রুষীয় জমি Russian land বুঝাইত। ইহার পর এগার ও বার শতকে যখন রুষ ভারঙ্গীয় ও দেশীয় শ্লাভদের সংমিশ্রণ হয় তখন (রুষীয় জমি বা দেশ Russkaia Zemlia) একটা রাজনীতিক অর্থ প্রাপ্ত হয়; সেই সময়ে কিয়েভের প্রিন্সের অধীনে সমস্ত রাজ্যখণ্ডকে এবং সেই সঙ্গে তন্মধ্যস্থিত সমস্ত রুষ শ্লাভনীয় লোকদের বুঝাইত[৭]। কিন্তু তখনও (দশম শতকে) উপরের স্তরের সামরিক-বণিক শ্রেণীটী বিশিষ্টভাবে ভারাঙ্গীয় বংশীয় দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এবং দেশীয় শ্লাভজাতীয় নিম্ন শ্রেণী হইতে বিভিন্ন ছিল। এই শেষোক্তেরা তখনও বৈদেশিক ভারাঙ্গীয়দের "দান" ("Dan" tribute) কর প্রদান করিত। পরবর্ত্তী ইতিহাসে, এই দেশীয় লোকের স্তর বা শ্লাভীয় লোকদের কেবল বিজাতীয় শাসকদের "দান" কর দিতে দেখা যায় না, সেই সঙ্গে তাহারা সমগ্র রুষীয় সমাজের নিম্ন স্তরের লোক বলিয়া গণ্য হইল; উচ্চ শ্রেণী হইতে ইহাদের কম অধিকার ও বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই যুগে "রুষ" জাতীয় লোকেরা ও শ্লাভেরা আকস্মিক ঘটনা দ্বারা এক শাসনাধীনে এক সামাজিক জীবনে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহার একটা জাতি অন্য একটা জাতির উপর প্রভুত্ব করা সত্ত্বেও তাহারা ক্রমশঃ মিশ্রিত হইতেছিল। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিবর্ত্তনের এই গতি পশ্চিম ইউরোপের বিবর্ত্তন হইতে ভিন্ন প্রকারের কারণ রুষে উভয় জাতি মিলিয়া এক হইবার পূর্ব্বেই বিদেশীয়েরা দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল; এইজন্য রুষের নূতন সমাজ পদ্ধতিতে পশ্চিম ইউরোপের ন্যায় অত স্পষ্ট বিভাগ ও তজ্জনিত সামাজিক কুফল প্রসূত হয় নাই।

কিয়েভের সমাজ—

নানাপ্রকারের লোক নিয়া কিয়েভের রাজত্ব বা "রুষ" রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু তখনও রুষ "নেশনের" রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নাই, কারণ রুষ নেশন তখনও উদ্ভূত হয় নাই। এই সময়ে সমস্ত শ্লাভ জাতি খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। একত্বের এক ভিত্তি তখনও সৃষ্ট হয় নাই; কতকগুলি যন্ত্র বলে বিভিন্ন মূল জাতীয় লোক সমাজকে একত্রিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি, ও তাহার (পোসাডনিক) গভর্ণর দান ও ট্যাক্স প্রথা একটী যন্ত্ররূপে যাহা বিভিন্ন লোকদের এক করিতেছিল।

৬। Ripley—"European Races.',

৭। Kluchevesky—P 92

খৃষ্টান ধর্ম্মের আগমনের সঙ্গে নূতন রাজনৈতিক ভাব ও সম্বন্ধের উদয় হয়, এবং নূতন সৃষ্ট খৃষ্টীয় পুরোহিত শ্রেণী শীঘ্রই কনস্টান্টিনোপল হইতে এই ভাবধারা আমদানী করে, যে ভগবান একজন স্বাধীন রাজাকে তাহার রাষ্ট্রের বহির্ভাগে শান্তি স্থাপনের সহিত আভ্যন্তরীণ নিয়ম রক্ষা করিবার ভার দিয়াছে। ইহার ফলে, প্রিন্স ভ্লাডিমির কিয়েভের বিশফদের সহিত পরামর্শ করে যে জাতি অনেকদিন যাবত ভগবানকে জানে নাই, কিরূপে তাহাদের মধ্যে আইন ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়।

এক্ষণে কিয়েভের প্রিন্সের শাসিত সমাজের উপাদানের অনুসন্ধান করা যাক। উপরের স্তর, যদ্দ্বারা প্রিন্স শাসনকর্ম্ম পরিচালিত করিত—তাহা তাহার পরিষদ বা অনুচরবর্গ দ্বারা গঠিত হইত, ইহা আবার উচ্চ ও নিম্নস্তরে বিভক্ত ছিল। প্রথম ধাপ রাজার "লোক" (Boyars) দ্বারা গঠিত হইত ; আর দ্বিতীয় ধাপ তাহার দরবারী "ভৃত্য" দ্বারা সংগঠিত হইত। এই সময়ে প্রিন্সের অনুচরবর্গ (Retinue) প্রধানতঃ যোদ্ধৃ শ্রেণীয় হইলেও বড় বড় সহরগুলি "টীসিয়াচ" (এক সহস্র) নামে সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়া রাখিত। এই টিসিয়াচের প্রত্যেক দল "টিসিয়াচকি" নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইত, ইহারা আবার তাহাদের নিজেদের পুরবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত এবং কিয়েভের প্রিন্স দ্বারা কর্ম্মে বহাল হইত। এই নির্ব্বাচিত অফিসারবর্গ সহর ও তাহার সংলগ্ন প্রদেশের সামরিক শাসক সভা গঠন করিত। ইহারা প্রাচীন ইতিবৃত্তে সহর রক্ষক (Startsi gradskie—Town warden) নামে উল্লিখিত হয়। কোন অভিযানের সময়ে তাহারা সদলবলে প্রিন্সের অনুচরবর্গের সহিত সমানভাবে প্রিন্সের অনুগমন করিত ; ইহারা প্রিন্সের Duma বা রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিল। এতদ্ব্যতীত দরবারের সমস্ত অনুষ্ঠানে তাহারা নিমন্ত্রিত হইত। এতদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বোয়ারদের সঙ্গে তাহারাও দেশের অভিজাত শ্রেণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদিও প্রিন্সের পারিষদ বা অনুচরবর্গ, শাসক ও সামরিক শ্রেণী গঠন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিশিষ্টাংশ ছিল। এইজন্যই দশম শতকের মধ্যভাগে রুষের বণিক শ্রেণী ভারাঙ্গীয়দের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এই সময়ে উপরের স্তরের মধ্যে জমির উপর মালিকানা সত্বের বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যে আদিম ভিত্তির উপর রুষের সামাজিক বিভেদ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ছিল—গোলামের উপর মালিকানা সত্ত্বা। Russkaia Pravda নামক আইনে 'Ognistchane' নামক অধিকার-ভোগকারী শ্রেণীর উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভব যে প্রিন্সদের যুগের পূর্ব্বে ইহারা একটী ব্যবসায়ী শ্রেণী ছিল—ইহারা দাসদের কারবারে ব্যাপৃত ছিল! এই জন্য ইহারা দেশের অভিজাত শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইত। যদিও একাদশ শতাব্দীতে প্রিন্সের অনুচরবর্গ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইয়া দাঁড়ায় তত্রাচ ঐতিহাসিকদের মতে উভয়ের মধ্যে একটা মূল জাতিগত (racial) পার্থক্য পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। একাদশ শতক পর্য্যন্ত একদল "বোয়ার" ভারাঙ্গীয় বলিয়াই গণ্য হইত।

এই জাতিগত শ্রেণী বিভাগের তীব্রতার একটা ইঙ্গিত রুষের খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রথমকালের ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে উপদেষ্টা বলিতেছেন "তুমি অভিজাত" বলিয়া তোমার জন্মের জন্য অহঙ্কার করিও না; বলিও না যে তোমার পিতা একজন বোয়ার ছিলেন, আর বলিও না যে খৃষ্টের জন্য যে দুইজন প্রাণদান করিয়াছে তাহারা তোমার ভাই ছিল।" শেষের উক্তির মধ্যে ৯৮৩ খৃঃ কিয়েভের অখৃষ্টানদের দ্বারা দুইজন খৃষ্টীয় ভারাঙ্গীয়দের নিহত হওয়ার ইঙ্গিত আছে[৮]।

খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণের ফল—

৯৪৯ খৃঃ কিয়েভের ভারাঙ্গীয় রাজা কন্‌স্টান্টিনোপলের গ্রীক চার্চ্চ অনুযায়ী খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই ধর্ম্ম তাহার প্রজাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রচারিত হয়, তবে কোন কোন স্থানে নভগোরডের ন্যায় শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। দেশের অভ্যন্তরে পূর্ব্বেকার ধর্ম্ম কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল, এবং নূতন ধর্ম্মের সহিত তাহার কিছু কিছু ভাব সংমিশ্রণও ঘটে। খৃষ্টান ধর্ম্ম রুষে প্রধান ধর্ম্মরূপে সংস্থাপিত হওয়ার পর, উহার আইন ও প্রতিষ্ঠানাদি নূতনভাবে গঠিত হয়। গ্রীস হইতে রুষে ধর্ম্মমণ্ডলীর স্তরভেদ (hierarchy) আসে। গ্রীক খৃষ্টীয় চার্চ্চের শীর্ষে ছিল কন্‌স্টান্টিনোপলের "পাট্রিয়ার্ক" (মহান্ত)। তাহার নীচে ছিল কিয়েভের মেট্রোপোলিটান (বিশফদের প্রধান), তাহার অধীনে ছিল বিশফগণ; ইহারা আবার ক্ষুদ্র ধর্ম্ম যাজকদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিল। এই প্রকারে ধর্ম্মযাজকগণ একসূত্রে গ্রথিত হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সাহিত্য রুষে প্রচার লাভ করে। এইগুলি শ্লাভ ভাষায় অনুদিত হয়। সেণ্ট সাইরিল এই সাহিত্য প্রচারকল্পে গ্রীক ভাষার অক্ষর হইতে শ্লাভ ভাষার উপযোগী একটা নূতন বর্ণমালা পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পূর্ব্ব ইউরোপের যে সব শ্লাভ জাতি গ্রীক চার্চ্চের খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহারা এই বর্ণমালা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপ হইতে রোমের খৃষ্টীয় মণ্ডলী পশ্চিমের শ্লাভদের খৃষ্টান করিবার জন্য প্রচারক পাঠাইয়া তাহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইতেছিল। পশ্চিমের শ্লাভেরা রোমান ক্যাথলিক হওয়ার সঙ্গে লাটিন বর্ণমালায় তাহাদের ভাষার সাহিত্য লিখিতে থাকে। ইহাতে পোল, চেক প্রভৃতি পশ্চিমের শ্লাভদের সহিত পূর্ব্বের শ্লাভদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টিগত বৈষম্য সৃষ্ট হয়, তাহাদের জাতীয় বিবর্ত্তন বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। ফলে শ্লাভ জাতি চিরতরে দ্বিখণ্ডীকৃত হইয়া যায়। সেণ্ট সাইরিলের গ্রীক বর্ণমালা প্রচার দ্বারা নিখিল শ্লাভ জাতির একতার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে প্যান শ্লাভিষ্টেরা তাহার জন্য বিশেষ অনুতাপ করে।

ভারাঙ্গীয়দের গ্রীকখৃষ্টানধর্ম্ম ও তৎপ্রসূত কৃষ্টি গ্রহণের সঙ্গে আমরা দেখি কিয়েভের রাজার অধীনে পূর্ব্বের শ্লাভদের দ্বারা রুষের বিভিন্ন ধারায় রাষ্ট্র বিবর্ত্তনের ইতিহাস; অন্যদিকে আমরা দেখি, পশ্চিমের পোল ও চেকদের (বোহেমিয়ান) রাষ্ট্রসমূহের বিবর্ত্তন পৃথকভাবে হইতেছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রুষে মেট্রোপোলিটান ও বিশফগণ গ্রীক পাদরীদের ন্যায় লোকদের

৮। Kluchevesky—P 91.

Nowocanon* নামে একটা বিশিষ্ট আইন দ্বারা শাসন ও বিচার করিতে থাকে। বিজাণ্টিন-রীতি ও আইনানুযায়ী রুষচার্চ্চ জমির মালিক হইতে লাগিল এবং এই জমি ধর্ম্মযাজক ও মঠদেরকর্ত্তৃক উপরোক্ত আইনানুযায়ী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই প্রকারে নূতন ধর্ম্মের সহিত জমির নূতন মালিকও নূতন প্রকারের মালিকানা স্বত্বের উদ্ভব হইতে লাগিল। "রাজা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দ্বারা শাসন করে" এই মত চার্চ্চ প্রচার করিতে লাগিল, এবং নিজের ধর্ম্মযাজক ও অধীনস্থ লোকদের লইয়া চার্চ্চ একটা স্বতন্ত্র সমাজ (community) গঠন করিল। চার্চ্চ গোলামীত্বের বিপক্ষতাচরণ করিতে থাকে ; ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে অপরাধ চার্চ্চের আইনের অধীন হয়[৯]।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে কিয়েভের রাষ্ট্রস্থাপন পর্য্যন্ত বিবর্ত্তনের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা দেখি যে, প্রথমে শ্লাভেরা কতকগুলি কুলে বিভক্ত ছিল ; পরবর্ত্তীকালে তাহারা অভিযান উপলক্ষে একটী সামরিক সংঘ স্থাপিত করিত ; ইহার উপর একটী জাতি বা কুল প্রভুত্ব করিত। এতদূর পর্য্যন্ত বৈদিক আর্য্যদের বিবর্ত্তনের সহিত তাহাদের বিবর্ত্তন মিলে। তারপর দেখা যায় যে তাহারাও কুলগত পিতৃপুরুষের পূজা (ancestor worship) করিত। এই পূজা-পদ্ধতি কেবল হিন্দু ও চীনা বা জাপানীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ইউরোপের আর্যাদের মধ্যেও তাহার বিস্তৃতি ছিল। হয়ত অতি প্রাচীন (Totemism) হইতে ইহার উৎপত্তি হয়[১০]। এই সময়ে তাহারা তাহাদর কুলের সর্দ্দার ও জ্যেষ্ঠদের দ্বারা শাসিত হইত। এই বিষয়ে অন্যান্য আর্য্য জাতিদের সহিত শ্লাভদের মিল আছে। তবে সভ্যতার ক্রৌমগত পর্য্যায় ইহাদের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই সময়ে আমরা শ্লাভদের মধ্যে স্বাধীন (Muzhi) এবং গোলাম (cheliad) নামে কেবল দুই প্রকারের লোক সমাজে দেখিতে পাই*। গ্রীস ও রোমেও আমরা এই অবস্থা দেখি, আর ভারতের "আর্য্য" ও "দাস" কি এই ব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল ?

তৎপর বিজাতীয় রুষ ভারাঙ্গীয়েরা আসিয়া একটা সামরিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর সৃষ্টি করে ; আবার শ্লাভেরা ও "টিচিয়াক" নামক যোদ্ধৃবৃন্দের সৃষ্টি করে। অনুমান হয় যে ভারতীয় আর্য্যদের ক্ষত্রিয় নামক যোদ্ধৃ শ্রেণীর উদ্ভবের সহিত রুষের সাদৃশ্য আছে। ভারতেও বৈশ্যশ্রেণী (বিশ্) হইতেই ক্ষত্রিয়দের উদ্ভব হয় : ভারতের ইতিহাসের আলোচনাকালে আমরা ইহা দেখিয়াছি। রুষেও, ভারাঙ্গীয় ও শ্লাভ, উভয় জাতির মধ্যেই ব্যবসায়ী শ্রেণীই যোদ্ধৃবৃন্দ উদ্ভব করে। কিন্তু অন্যান্য আর্য্য জাতিদের মধ্যে যেমন অভিজাত বা শাসক শ্রেণী হইতে পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়,

* এই আইনকে "Administrative Code" বলে। ইহাতে ধর্ম্মমণ্ডলীর নিয়মসমূহ বিজাণ্টিন সম্রাটদের civil laws লিখিত আছে।

৯। Platonov PP 36—43.

১০। Durkheim—"The Elementary forms of Religious Life"—দ্রষ্টব্য।

* Platonov—P 39.

রুষের শ্লাভদের মধ্যে তদ্রূপ হয় নাই। কারণ শ্লাভদের ধর্ম্মে মন্দির ছিল না ও পুরোহিত বলিয়া একটা শ্রেণীর বিবর্ত্তন হয় নাই[১১]। তাহাদের ধর্ম্ম সভ্যতার সে স্তরে উঠে নাই।

পরে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কিয়েভ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে ধন ও পেশা লইয়া সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি নিজের গোলাবাড়ীতে থাকিয়া নিজের জমির চাষ করিত, সে Smerd বা স্বাধীন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু সে যদি অন্য লোকের জমিতে চাষ করিত এবং তাহার সহিত কতকগুলা বাধ্যতামূলক সর্ত্তে আবদ্ধ থাকিত, তখন সে Zakup বা দাসখত দেওয়া লোক হইত। যতদিন না সে তাহার বাধ্যতামূলক সর্ত্ত হইতে খালাস হইয়া নিজের জমির মালিক হইয়া "স্মার্ড" হইতে পারিত, ততদিন সে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত। 'স্মার্ডেরা' একত্রভাবে (commune) থাকিত ও প্রিন্সকে "দান" প্রদান করিত। এই সময়ে গোলামী প্রচলিত ছিল, কয়েদী কিংবা দেউলিয়া অধমর্ণ দল হইতে গোলাম সংগ্রহ হইত। গোলামদের পুত্রেরা গোলাম হইত। খৃষ্টান ধর্ম্ম গোলামীর নিষ্ঠুরতা অনেক লাঘব করিলেও এই প্রথাকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। গোলামের দলের আধিক্যের নমুনা অনেক বোয়ারের গ্রামে দেখা যাইত; সেখানে সমস্ত পরিশ্রমকারী লোকেরা গোলাম (চেলিয়াড) ছিল[১২]।

দাসখত দিয়া গোলামীত্বে আবদ্ধ হওয়া ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের এবম্প্রকারের সর্ত্তে দাসত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধানে কোন আর্য্যের পুত্র দাস (গোলাম) হইতে পারিত না; কিন্তু দাসের পুত্র আর্য্য হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কৌটিল্যের বিধান অন্যান্য দেশের সমসাময়িক বিধান হইলে অগ্রগামী ছিল। তবে ভারতীয় কোন ধর্ম্মকে দাসের গোলামীত্ব ঘুচাইবার জন্য চেষ্টা করিবার নিদর্শন নাই। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফলের দোহাই দিয়া এই বিষয়ে ধর্ম্মযাজকগণ নিশ্চেষ্ট থাকিত। রোমান ক্যাথলিক সেন্ট অগষ্টাইনও এই প্রকারের যুক্তি অবলম্বন করিয়া গোলামীত্বের সমর্থন করিত। এই বিষয়ে গ্রীক চার্চ্চ অগ্রগামী ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

১১। Platonov—P 32.

১২। Platonov—PP 55—56.

চিঠি

"চন্দ্রচূড়"

বান্ধবী,

শুনেছি উচ্ছ্বসিত নেশাভরা মহুয়া মধু
তাই—
উদ্‌ভ্রান্ত বসন্ত সমীরে
মনে করেছিলাম
তোমার হাতে দিয়ে যাব
একটি মহুয়া ফুল
শাখাচ্যুত ঝরা শালের পাতায়।

অনেক খুঁজেছি
সে ফুল পাইনি
তবু পেয়েছি এক সংবাদ
তাই জানিয়ে যাই তোমাকে
আলো ঝল্‌মল্‌ মহুয়া বনে
তোমার রাখাল বাঁশি বাজায়
আর
রক্তবিলাসী শিমুল পলাশে
রঙীন হয়ে ওঠে তোমার বনভূমি।

আরো আছে গোপন সংবাদ
সে সন্দেশ এখনো তুমি পাওনি
তাও আজ জানিয়ে যেতে চাই।

তোমার বনে ফুল ফুটেছে
হাজার রঙের ফুল
আকুল করা যুঁথির গন্ধ
ভাবমুগ্ধ মনে সাড়া দিয়ে যায়
আলোয় রাঙা গোধূলিতে ;
মুগ্ধমনের অবশ ভাষা
কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায়
পেতেছে তার বাসর [illegible]ন।
তাই —
খেয়ালী প্রাণের ভাবমত্ততা
হিল্লোলিত বসন প্রান্তে
নাচন জুড়ে দেয় ;
ভ্রমর-কাজল আঁখির পাতায়
স্বর্ণবিহারী বিহ্বলতা
পথভ্রান্ত উদাসীকে
আশ্রয় জানিয়ে যায় ;
পল্লবিনী বাহুলতা
অনাগত পথিকের তোরণ দ্বারে
মিনতি জানায়
প্রান্তিক মিলনের বাঁশরী সঙ্গীতে
বকুল গন্ধে আকুল-করা
বন্ধনহীন কৃষ্ণকুন্তল
অজানা পথিকের পথ ভুলায়।

তোমার সংবাদ দাতা
দেউলে হয়ে গেছে,
যবনিকা পতনের সময় এল।

কথার ফুলে মালা গেঁথে
যে সংবাদ জানিয়ে দিলে
তার উপযুক্ত মূল্য থেকে
তাকে বঞ্চিত করো না।
জানাবার কিছু নেই
জান্‌বারও কিছু নেই
তবু জানতে চায়—
তৃষিত নয়নের চাতকি
কোন্‌ সরোবরে
গভীর পিপাসার বারি খুঁজে বেড়ায় ;
কোন্‌ সাগরের
পরাণ উদাসী বাতাস
ঘরের কাজে ভুল লাগিয়ে দেয়,
গগন বিহারী
কোন তারাটির সাথে
জান্‌লায় বসে প্রহর গণ।

বিনয় ঘোষ

যুদ্ধ সম্বন্ধে সকলেই একরকম প্রায় হাঁফিয়ে উঠেছেন এবং প্রায়ই এমন অভিযোগ শোনা যায় যে যুদ্ধের কোন নামগন্ধ নেই, অথচ হাঁকডাক আছে খুব। বিশেষ করে' সোভিয়েট-ফিনিশ যুদ্ধের এখনও কোন মীমাংসা না হওয়াতে অনেকেই ধৈর্য্য হারাতে বসেছেন। আজই ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার 'Notes'-এর মধ্যে দেখলাম যে তিন মাস যাবৎ যুদ্ধ করেও সোভিয়েট রাশিয়া ৫০ মাইলের বেশী অগ্রসর হ'তে পারে নি, তাও খইমুড়কির মতো চারদিকে ছড়ানো লাল ফৌজের মৃতদেহের উপর দিয়ে বহু কষ্টে। এ নিয়ে অবশ্য মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে' কোন লাভ নেই, তবে রয়েটারের সংবাদকে নিজের সাধারণ বুদ্ধিতে পরখ করে' যতটুকু বোঝা যায় তাতে এই মনে হয় যে ক্যারেলিয়ান্ যোজকে লাল ফৌজ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, ম্যানারহাইম্ লাইনও ভেদ করা হয়েছে এবং বর্ত্তমানে ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী সোভিয়েটের দাবী মেনে নিয়ে কোন রকমে শান্তিচুক্তি করবার চেষ্টা করছেন। এই হ'ল ফিন্‌ল্যাণ্ডের সংবাদ। দ্বিতীয় খবর হ'চ্ছে মিঃ সাম্‌নার ওয়েলেস্ য়ুরোপ যাত্রা করেছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশানুযায়ী শান্তিস্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং ইতিমধ্যে রোম, বের্লিন ঘুরে লণ্ডনে গেছেন। মাঝে মিঃ চেম্বারলেন ও হিটলার দু'টি বক্তৃতায় নিজেদের অভিযোগ ও দাবী ব্যক্ত করেছেন। নরওয়ে, সুইডেন প্রমুখ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির রীতিমত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, এবং শোনা যাচ্ছে যে বল্‌কানে নাকি ইতালীর নেতৃত্বে ক্রমে একটি বেশ শক্তিশালী সোভিয়েট-বিরোধী ব্লক্ গড়ে' উঠছে। এই সংবাদগুলির আলোচনা করব একে একে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড

ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের খবরাখবরের আগে, যুদ্ধ কেমনভাবে চলছে সে-সম্বন্ধে কিছু বলব, কারণ তা হ'লে যুদ্ধের স্বরূপটা অনেকখানি পরিষ্কার হবে। এমনি কথায় বলে যে "General Winter is an ill-tempered commander"—সেনাপতি শীত বদমেজাজী সেনাপতি। কথাটা সত্য। শীতকালে যুদ্ধ আরম্ভ সেই জন্য বড় একটা করা হয় না, তবু সোভিয়েট রাশিয়া

করেছিল, কারণ তখন দেরী করবার কোন উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, সামরিক দিক থেকেও এর বিশেষ যুক্তি ছিল। ফিন্ল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ দেশগুলির আবহাওয়া সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে, প্রচণ্ড শীত, তার সঙ্গে তুষারঝঞ্ঝা, গভীর জঙ্গল, পার্ব্বত্য ভূমি—এই সব হ'চ্ছে ফিনল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য। শীতকালে জলা, হ্রদ প্রভৃতিতে সব বরফ জমে' থাকে, সুতরাং পথচলার একটু সুবিধা থাকে, যা গ্রীষ্মে সম্ভব নয়, কারণ তখন বরফ গলে' পথ দুর্গম হয়ে যায়। শীতকালে যুদ্ধ আরম্ভ করে' গ্রীষ্মে বরফ গলবার পূর্ব্বে যুদ্ধ শেষ করবার ইচ্ছা ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে "Finnish Ski troops" বলে' হেডলাইন দেখা যায়, কিন্তু এ-নামে, যেমন "French Alpins" বা "Canadian Ski battalions" আছে, তেমনি কোন ফিনিশ শি-সেনাবাহিনী (Ski Troops) নেই। 'শি' হ'চ্ছে বরফের উপর দ্রুত চলবার জন্য একরকম কাঠের জুতাবিশেষ এবং এই ski-ing স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলের সৈন্যদের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে পড়ে। সকলকেই শিখতে হয়, কারণ ski-ing স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সৈন্যের সামরিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক বিষয়। পৃথক কোন সেনাদলকে এ জন্য শিক্ষা দেওয়া হয় না। বরফ বা তুষারের মধ্য দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র, পোষাকপরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য নিয়ে স্থানান্তরে যাওয়া সেনাবাহিনীর পক্ষে কষ্টকর বলে' সাধারণতঃ এ-সবের জন্য স্লেজ্-এর ব্যবস্থা আছে। "Pulka" বলা হয় এক-মানুষের স্লেজ্‌কে, একজন শি-সৈন্য কোমরে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বেঁধে এই স্লেজ্ টেনে নিয়ে যায়। আর একরকম আছে শি-স্লেজ্ (ski-sledge), একদল সৈন্য শি পরে' টেনে নিয়ে যায়, আবার মাঝে মাঝে কুকুরে ও ঘোড়াতেও টানে। যেমন অন্যত্র অশ্বারোহী সৈন্যের সুবিধা, তেমনি বরফ-প্রধান দেশে শি-সৈন্যের সুবিধা আছে। "Motorised unit"-এর পক্ষে জঙ্গল বা পার্ব্বত্য স্থান দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এবং ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আছে, উত্তর দিক পর্ব্বতপ্রধান। সুতরাং শি-সৈন্য ভিন্ন যুদ্ধ সম্ভব নয়। শি-সৈন্যের আর একটা সুবিধা হ'চ্ছে যে তারা সাদা ওভারঅল্ বা সিল্কের একরকম পোষাক পরে যার জন্য তুষারের মধ্যে শুয়ে থাকলে বা বসে' থাকলে তাদের চেনা যায় না, এবং সেই জন্য তারা হঠাৎ একত্র হয়ে যেমন শত্রুকে আক্রমণ করতে পারে, তেমনি হঠাৎ আবার অন্তর্ধানও করতে পারে। শি-সৈন্যেরা জমাট বরফের চাঁই দিয়ে একরকম তুষার-কুটীর (snow-hut) তৈরী করে' বিশ্রাম করে, নাম 'ইগ্‌লু' (igloo)। ফিনিশ-শি-সৈন্যের এই সব নানারকম সুবিধা আছে, এবং ski-ing ভিন্ন যেমন এ-অঞ্চলে যুদ্ধ করবার উপায় নেই, তেমনি তারা এ-বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও পটু। এ-শিক্ষা বা এ-অভিজ্ঞতা লালফৌজের নেই এবং সেইজন্য তারা অন্য দিক থেকে হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী হ'লেও সে-শক্তি এখানে প্রয়োগ করতে পারছে না, করা সম্ভবও নয়, লাভও নেই। তাই এতদিন যাবৎ যুদ্ধ চলতে বাধ্য হয়েছে।

সম্প্রতি যে শান্তি আলোচনা চলছে তার মধ্যে কতখানি সত্য ও মিথ্যা আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভিপুরী উপসাগরের পশ্চিম তীরে বরফের মধ্যে লাল ফৌজ অনেকখানি অগ্রসর

হ'য়েছে। ফিনল্যাণ্ড থেকে দলে দলে আশ্রয় প্রার্থীরা সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ঠিক এই সময় শান্তির গুজবের মূলে কি রয়েছে বলা যায় না। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার এই যে আলোচনা কোথায় চলেছে তাই ঠিক কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলছে বের্লিনে, কেউ বলছে মস্কোতে, কেউ বলছে তালিন বা রিগায়। শোনা গেছে মিঃ রাইটি ও প্যাসিকিভি মস্কো গেছেন, আবার রোম রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে যে ফিনিশ পররাষ্ট্রসচিব ট্যানার বর্ত্তমানে বার্লিনে আছেন। এর থেকে এই পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে ফিনিশ শাসনকর্ত্তারা বর্ত্তমানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। আবার এর মধ্যে তর্জ্জনগর্জ্জন আছে, যেমন যথাযথ চুক্তি না হ'লে আবার ঘোরতর যুদ্ধ হবে, চেম্বারলেন সাহেব পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন যে বৃটেন ও ফ্রান্স রীতিমতভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে যদি নরওয়ে ও সুইডেনের কোন আপত্তি না থাকে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করবার। সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে হীন প্রচার কার্য্য চলেছে। ইতিমধ্যে রয়েটার কাজ হাসিল করে' দিয়েছে। রয়েটারের সংবাদে প্রকাশ যে কুসিনেন্ গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েটকে নিন্দা করেছে এই শান্তিচুক্তির জন্য। এই সব সংবাদ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করবার এখনও সময় হয় নি, তবে এইটুকু বলা যায় নরওয়ে ও সুইডেন এখন তাদের নিরপেক্ষ নীতি ছাড়তে রাজী নয়। নরওয়ে ও সুইডেনের প্রধান মন্ত্রীরা তা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

ফিন্‌ল্যাণ্ড কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে তা আশা করা যাচ্ছে দু' একদিনের মধ্যে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তবে আমাদের মনে হয় যে যা রটেছে তার অধিকাংশই মিথ্যা গুজব এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডের আস্ফালনও ভীত্তিহীন। সোভিয়েটের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে ফিনদের চুক্তি করাই ভাল।

ইতালী ও বল্‌কান রাষ্ট্র সম্বন্ধে গুজব

কিছুদিন আগে হাঙ্গেরীর বৈদেশিক মন্ত্রী কাউণ্ট সাকি ও কাউণ্ট সিয়ানোর সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হ'য়ে গেছে, তাতে গুজব রটেছে যে ইতালীর সঙ্গে হাঙ্গেরীর সামরিক চুক্তির পাকা কথা তো হ'য়েছেই, উপরন্তু ইতালীর নেতৃত্বে সোভিয়েট-বিরোধী ব্লক্ গঠনের ভিত্তি গঠন করা হ'য়েছে। এ-সব সংবাদ মিথ্যা। *Pester Llyod* নামক হাঙ্গেরীয় বৈদেশিক অফিসের একটি মুখপত্রে "Attempts to poison wells" নামক প্রবন্ধে এই সব গুজবের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মস্কোর হাঙ্গেরীয় রাজদূত সোভিয়েট বৈদেশিক বিভাগে এই মর্ম্মে একটি নোট দাখিল করেছেন যে: "The problem of the formation of any Bloc was not discussed at all at the meeting in Venice."

রুমানিয়ার উপর হাঙ্গেরী ও ইতালী একত্রে চাপ দিচ্ছে হাঙ্গেরীর "territorial concessions"-এর জন্য। এ-সংবাদও মিথ্যা। রুমানিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রীর মুখপত্র *Timpul* এ লেখা হয়েছে: "With regard to our relations with the Soviet Union, Rumania has repeatedly stated that it desires at all costs to maintain and strengthen good-neighbourly and friendly relations with the U. S. S. R. There is

nothing whatever that would render necessary a conflict or worsening of relations between the two states."

যুগোশ্লাভিয়ার Zvetkovitch-Maczek গবর্ণমেণ্ট ভীষণভাবে দমননীতি প্রয়োগ করে' সোভিয়েট্-সমর্থনকারীদের উপর অত্যাচার করছেন। বিলিচ জেলাতে concentration camp-এ এই সব সমর্থকদের বন্দী করে' রাখা হ'চ্ছে, সোভিয়েট-এর পক্ষে কোন রকম প্রচারকার্য্য বরদাস্ত করা হ'চ্ছে না। এ-সংবাদও কতটা খাঁটি বলা যায় না, কারণ বেলগ্রেডের *Poltika* পত্রিকা লিখছে: "We have no demands to make on other countries. Our vital interests are not endangered by any country, and, therefore, we are not the enemies of any other State. We wish to maintain our neutrality in the present international conflict."

বুলগেরিয়ার সম্বন্ধেও অনেক কিছু গুজব রটেছিল, তবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বুলগেরিয়ার বাণিজ্যচুক্তি হওয়াতে প্রচার একটু কমেছে।

এই সব ব্যাপার থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হ'য়ে যায়, যে ইতালী তার সাম্রাজ্যলিপ্সা পূরণের পথ পরিষ্কার করছে বল্কানে সোভিয়েট্-বিরোধী ব্লক্ গঠনের ধোঁয়া তুলে—"Italian imperialism is endeavouring to make use of the Balkans as a spring-board for the realisation of its latest expansionist plans. For this purpose, it seeks to use the "Soviet danger" as a smoke screen to represent Italian Fascism as a "guarantee of status quo in the Balkans." বর্ত্তমানে হের ফন্ রিবেনট্রপের রোমযাত্রার সঙ্গে যদি কোন কিছুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে তা হ'লে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যে জার্ম্মানির দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে পরবর্ত্তী সমরাভিযান, সেইসঙ্গে ইতালীর স্বার্থ এবং সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা, এই সবের সঙ্গেই রিবেনট্রপের রোমযাত্রার উদ্দেশ্য জড়িত। ইতালীর কয়লার জাহাজ আটকানো নিয়ে যে কলরব উঠেছিলো, চেম্বারলেন সেই সব জাহাজের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন বলে' New York Times খুব উল্লাসের সঙ্গে লিখেছে: "Rarely has there been a diplomatic visit that started with such dramatic possibilities and collapsed so thoroughly before it hardly got under way. The Allies have obviously won an important diplomatic victory in Italy." মিত্ররাষ্ট্রদ্বয়ের কূটনীতিক বুদ্ধিকে তারিফ করেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মুসোলিনীকে কয়লা দিয়ে তাঁর মনের ময়লা ধুয়ে ফেলা যাবে না, এবং রিবেনট্রপ রোমযাত্রা করেছেন, জার্ম্মানি ও ইতালীর 'Pact of Steel', যদি কোথাও কারও ভুল বোঝার জন্য চিড়্ খেয়ে থাকে, তাকে মেরামত করবার জন্য। অতএব উল্লাসী তালঠোকা মূর্খতা।

আমেরিকা—

আমেরিকা মিত্ররাষ্ট্রদের সাহায্য করবার জন্য খুব বেশী উদ্‌গ্রীব হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়, এবং সাম্‌নার ওয়েলেস্-এর য়ুরোপ যাত্রাকে এমনও অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন যে রুজভেল্ট শান্তির কোন পথ আছে কি না শেষ পর্য্যন্ত দেখে তারপর বৃটেন ও ফ্রান্সকে সাহায্য করবেন। এ-ভাবে মার্কিন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা আমরা ঠিক সমর্থন করি না। সাম্‌নার ওয়েলেস্-এর য়ুরোপ যাত্রার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্টের তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট্ পদে নির্ব্বাচিত হবার যোগাযোগ আছে। নির্ব্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে; তার আগে মার্কিনবাসীদের কাছে নিজের রাষ্ট্রীয় নীতির ভালভাবে পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এ-বিষয় আরও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে বৃটেনের মার্কিন রাজদূত মিঃ জোসেফ কেনেডির প্রেস সাক্ষাৎকারের মতামতে। মিঃ কেনেডি বলেছেন যে "If isolation means a desire to keep out of the war, I should say that it is definitely stronger now in America...such things as the sinking of neutral ships make an impression on American minds, but does not make America want to go to war." মিঃ কেনেডির এই উক্তিতে বৃটেন একটু হতাশ হ'য়েছে। গত ভের্সাই চুক্তির ইতিহাস আমেরিকা আজও ভোলেনি এবং এবার তার ক্ষতিপূরণ সে করবে। আমেরিকা চেষ্টা করবে যদি শান্তি চুক্তি হয় কখন তা হ'লে তার যেন সেই চুক্তিতে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি থাকে। এই শক্তি সঞ্চয় করতে হ'লে, অর্থাৎ আগামী শান্তি-বৈঠকে নেতৃত্ব করতে হ'লে, আমেরিকার স্বার্থ যুদ্ধে না জড়িত হওয়া এবং নিরপেক্ষ থেকে নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের মুনাফা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া।

চীন ও জাপান

জাপান-ওয়াং চুক্তির যে সোরগোল উঠেছে সে-সম্বন্ধে বুঝতে হ'লে অতীত ইতিহাস কিছু জানা দরকার। প্রিন্স কোনোয়ে যখন জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন চীন-জাপানের শান্তির জন্য তিনি একটা খস্‌ড়া করেন। ওয়াং চিং-ওয়াই সেই খস্‌ড়া চিয়াং-কাই-সেকের কাছে দাখিল করেন, কিন্তু জেনারালিসিমো সম্মতি দেন না এবং সেন্ট্রাল পোলিটিকাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ওয়াংকে বিতাড়িত করা হয়। কোনোয়ের খস্‌ড়ার মধ্যে মোটামুটি এই ক'টী সর্ত্ত ছিল: (১) চীন মাঞ্চুকুও সাম্রাজ্যকে স্বীকার ক'রে নেবে, (২) কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে চীনকে যোগদান করতে হবে, (৩) বিশেষ স্থানে জাপ সৈন্য মোতায়েন থাকবে, বিশেষ করে' কম্যুনিষ্ট-বিরোধী এলাকায় ও 'ইনার মঙ্গোলিয়াতে', (৪) ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। এর মধ্যে জাপানে তিনটী মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন হ'য়েছে—কোনোয়ে, হিরানুমা ও আবে—কিন্তু চীন সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। উত্তর চীনের যে 'puppet regime' বর্ত্তমানে গড়বার সঙ্কল্প করা হ'য়েছে তার নাম হবে কোন 'Political Council', এবং এই কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ যোগ থাকবে জাপান ও মাঞ্চুকুওর সঙ্গে। এই কাউন্সিল 'central puppet'-এর অধীনে থাকবে

এবং "will serve as a buffer between Japan and third powers." Inner Mongolia-র মধ্যে চাহার ও সুইয়ান্ প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উত্তর চীনের মধ্যে আসবে উত্তর হোনান ও লুংহাই রেলপথের অংশ। এময় ও হাইনান্ দ্বীপে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবে তা 'central puppet'-এর অধীনে থাকবে। দক্ষিণ চীনের ছোট দ্বীপগুলিতে জাপ নৌবাহিনীকে ঘাঁটি করবার অধিকার দিতে হবে। চীনের সৈন্য ও পুলিশ বিভাগে জাপানী advisers থাকবে। এই সব সর্ত্ত মেনে নেওয়ার অর্থ হ'ল চীনকে জাপানের কাছে বিক্রী করা, কিন্তু চীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এক ইঞ্চি জমিও সে ঘাড় হেঁট করে' সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে বিলিয়ে দিতে রাজী নয়। ওয়াং-চিং-ওয়াই-ও বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না, তাঁর দলে ভাঙন ধরেছে। জাপানের বিপদ ক্রমেই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতার সঙ্গে ঘনীভূত হ'য়ে আসছে। জাপ বৈদেশিক মন্ত্রী আরিতা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা যদি চীনের এই 'puppet regime' না স্বীকার করে তা হ'লে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও জাপান পশ্চাৎপদ হবে না। কথাটা সিংহের কাছে শৃগালের আস্ফালনের মতো শোনায় না কি? আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বরখাস্ত হওয়াতে জাপানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়েছে। নিদারুণ সঙ্কটের দিনে জাপ শাসন কর্ত্তাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং এতদিনের পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হয় দেখে তাঁদের বক্তৃতাদির মধ্যেও কোন সংযমের চিহ্ন নেই। যাই হোক্, চীনের কিন্তু এতে আশান্বিত হবার অনেক কিছু আছে।

ভারতবর্ষ

কয়েকদিন পরে রামগড় কংগ্রেস আরম্ভ হবে। সমস্ত ভারতবাসী অপেক্ষা করছে সংগ্রামের আহ্বান কবে আসবে সেইজন্য? কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির মতিগতির কোন পরিবর্ত্তন হবে কি? এখনও গান্ধীজীর নেতৃত্বে সকলের বিশ্বাস, আইন অমান্য আন্দোলনের তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি। পাটনায় গৃহীত প্রস্তাবে ক্ষীণ আলো দেখা গেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে এখনও ফ্যাকড়া আছে অনেক। বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমেই বাড়ছে। Left Nationalist-দের অভিমান ও গোঁসা এখনও পুরামাত্রায় রয়েছে, ফলে শুধু কালাপাহাড়ী তালঠোকা হ'চ্ছে মঞ্চ থেকে, আর প্রেসের মারফৎ হ'চ্ছে বাক্যনবাবি। সম্প্রতি বাংলাতে যে Congress Workers' Conference হ'য়ে গেল তাতে আমরা এইজন্যই খুসী হ'য়েছি যে সত্যই সংগ্রামকামী নেতারা কল্পরাজ্য ছেড়ে বাস্তবে নেমে এসে তাঁদের চাহিদাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়েছেন এবং কাজের জন্য তৈরী হ'য়েছেন। রামগড়ের ফল কি হবে জানি না, তবে রামগড় ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হবে এটাই আমরা আশা করছি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের মাহেন্দ্রক্ষণ আজও যদি না এসে থাকে, তা হ'লে আর কবে আসবে, আর কতদিন জন্ বুলের মুখের দিকে চেয়ে কাটবে? 'Liberty's, a glorious feast'—বন্দীশালায় তার সমারোহে আয়োজন যদি হয় তো হোক্ না কেন!

কলিকাতা, ১১ই মার্চ্চ, ১৯৪০

গ্রন্থ-পরিচয়

সাহিত্যে বিপ্লব।

বীরেন দাশ। মাসপয়লা প্রেস। দাম--বারো আনা।

'সাহিত্যে বিপ্লব', 'কবি ও বিপ্লবী,' 'লেখক ও নীতি'—এই তিন প্রবন্ধের সমবায়ে পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। বিষয় নির্বাচন হইতেই অনুমান করা চলে যে লেখক বর্তমান সাহিত্যের প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন। লেখকের চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহার চিন্তাক্ষেত্রে Cecil Day Lewis এর প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও তিনি শুধু অধমর্ণ রূপেই নিজেকে পরিচিত করেন নাই। তাঁহার স্বকীয়তাটুকুও অস্বীকার করিবার নহে।

রাজনীতি, বিজ্ঞান, ও মনস্তত্ত্ব—এই তিন বনিয়াদের উপর বিপ্লবী সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লেখক এই ত্রিধারার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে সাহিত্যিকমাত্রেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী হইলেও, সে সমাজের মুখ-পাত্র হিসাবে এই তিনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। "আসল কথা নিরপেক্ষ সাহিত্য গড়ে উঠ্‌তে পারে না।" "শ্রেণী সংগ্রাম যত প্রবল আকার ধারণ করে, লেখকেরা কোন-না-কোন পক্ষ নিতে বাধ্য হয়। তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। সেই সাহিত্যই প্রকৃত গণ-সাহিত্য। গণ-সাহিত্য সমালোচক নয়, গণ-সাহিত্য সত্যিকার কাজের পথনির্দ্দেশক।"

বিপ্লবোত্তর কিংবা প্রাক্-বিপ্লব যুগে কবির প্রয়োজনীয়তা যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে লেখকের সন্দেহ নাই। কৃষক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক কিংবা কবি—ইহারা সকলেই পেশাদার লোক। সমাজের একটি বিশেষ প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্য কবিও কাব্যরচনাকে নিজের পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বিলাস হিসাবে নহে। বিজ্ঞান যেমন বুদ্ধির খেলা, কবিতা ভাবের খেলা। কবিতা অনুভূতির ক্ষেত্র প্রসারিত করে। "যে ভাব হাজার কথায় ধরা পড়েনা, একটি ছোট কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিপ্লবীও এ কথা স্বীকার করবে।" কবি যদি সমাজ-জীবনে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন তবে তাহা নিজের দোষেই। সমাজে পরস্পরকে পরিচিত করাইবার গুরু দায়িত্ব কবির। সে দায়িত্ব অস্বীকার না করিলেই তাঁহার প্রয়োজন অনিবার্য হইবে। ভবিষ্যতের নৈরাশ্য হইতে লেখক কবিকে মুক্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন: "কিন্তু বুর্জোয়া কবিকে নতুন ভাষা শিখতে হবে। নতুন ভাষা, মানে শ্রমিকের ভাষা।"

নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনী সাহিত্যিকের বিপ্লবী বিবেককে নিদ্রিত করিয়া রাখে। এই পরিবেষ্টনীর প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলেও সাহিত্যিকের জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা অল্প।

কেননা, প্রত্যেক বড় সাহিত্যের পিছনে আছে দর্শন। তাহা জনসাধারণের নিকট দুর্বোধ্য থাকিয়া যায়। তবে ইহাও ঠিক যে, "আধুনিক সাহিত্যিক ড্রইংরুমের গল্পলেখক নয়। সে 'নিউরটিক'ও নয় কিংবা আত্মপ্রতারকও নয়।"

লেখক তাঁহার মতামত যতদূর সম্ভব পক্ষপাতদুষ্ট না করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিপ্লবী সাহিত্যের গোঁড়ামীকে তিনি বর্জন করিতে চান: ..."কেউ কেউ আরো এগিয়ে যায়। সব কিছুতেই সে 'লাল' শব্দ ব্যবহার ক'রবে। এ ধরণের ভাবপ্রবণতার হাত থেকে সমালোচককে মুক্ত থাকতে হবে।" পুনশ্চ;—"বস্তুতঃ কম্যুনিষ্টরা কোন বিশিষ্ট বস্তু কিম্বা ঘটনাকে যখন 'বাস্তব' বলে অভিহিত করে, তখন লেখকের উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক—যেন 'বাস্তব' শব্দটার উপর তার জন্মগত অধিকার। যেমন ধার্ম্মিকভক্ত 'ঈশ্বর' শব্দটার উপর জন্মগত অধিকার বলে দাবী করে।"

লেখকের চিন্তার স্বাধীনতা বা সাহসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গী ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোথাও কোথাও আমাদের অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। "আধুনিক লেখক তাকেই বলা যায়, ফ্রয়েডের বাণী যার কাছে একমাত্র সত্য নয়, কিন্তু সাইকো-এনালিসিস তার লেখায় আছে।" এই সংজ্ঞার ইতিমূলক তাৎপর্য কি তাহা লেখক আমাদের জানান নাই। Hardyর নৈরাশ্যবাদ বা অদৃষ্টবাদের সহিত বিপ্লববাদীর বিপুল জিজ্ঞাসার কি সম্পর্ক তাহা জানিনা। উভয়েই necessitarian বা determinist—ইহাই কি বলিবার অভিপ্রায়? যৌন-প্রেম ও প্রেম লেখকের দৃষ্টিতে সম-পর্যায়ভুক্ত। তিনি যৌন-প্রেমকে আর্থিক পরিস্থিতির উপর ছাড়িয়া দিতে রাজী হন নাই। "...একটি প্রেমের কবিতাও বাস্তব হতে পারে। অথচ এই প্রেমের কবিতার সঙ্গে ধনিক ও শ্রমিক সমাজের কোন সম্বন্ধ নেই।" এইরূপ নিরালম্ব প্রেমের কবিতার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। "কশ্চিৎ কান্তা-বিরহগুরুণা শাপেনাস্তং গমিতমহিমা..." কে ডক্-কুলির ভাষায় অনুবাদ করিলেও তাহা মোমিনপুরের বস্তীতে চাঞ্চল্য আনিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া যায়। প্রেমের কবিতাও শ্রেণী-সংগ্রামের অনুবর্তী হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে। 'ছাপার হরফ'কেই সাহিত্য সংজ্ঞা দিয়া লেখক এই বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: "টেলিভিসন যখন পূর্ণতা লাভ করবে, বই-পড়ার কোন প্রয়োজন থাকবে না। মোট-কথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাহিত্যকে কোন-ঠাসা করছে।" William Falkner হইতে সান্ত্বনা বা 'Earth' ও 'Turksib' ছবি হইতে আশঙ্কা, আমরা বুদ্ধি দিয়া যাচাই করিয়া লইতে পারি নাই। সাহিত্য মনের চেতনা-রাজ্যের বস্তু। পুস্তক বা ছাপার হরফে তাহাকে কালের উপর কতকটা আধিপত্য দেওয়া হয় মাত্র। D. H. Lawrenceএর সমাজ-বিমুখ আত্মকেন্দ্রীক প্রচেষ্টার পরিণতি আমরা শুনিলাম, কিন্তু "The Man who Died" এর স্রষ্টা সম্বন্ধে বিপ্লবী সাহিত্যের সমালোচক কি আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন না? ভবিষ্যধর্মের ভিত্তি প্রেমের উপর, সেই প্রেম Freud-অনুবর্তী, ফ্রয়েড্ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের পূজারী, সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

গণ-আন্দোলনের বিরোধী। এদিকে, "ফ্রয়েডের উদারনীতি, না গণ-আন্দোলন,—সাহিত্য কার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, এখনও ঠিক করতে পারেনি।" তাহাই যদি না পারিয়া থাকে তবে শ্রেণী-সংগ্রাম, বুর্জোয়া কবির শ্রমিকের ভাষা শিক্ষা, সমাজ-বিপ্লবের সহিত সাহিত্য-বিপ্লবের ঘনিষ্ঠতা, সাহিত্যের পথপ্রদর্শনবৃত্তি—এ গুলির সম্বন্ধে এত সচেতন হইয়া লাভ কি? ভাবের সক্রিয়তাকে সমাজ-চেতনায় প্রক্ষিপ্ত করাই শিল্পীর কাজ। Siegfried Sasson কেন, পুরাকালের psalmist ও কি প্রকাশের মাঝেই আপন মুক্তি খোঁজেন নাই? বুর্জোয়ার বৈপ্লবিক 'role' কোন বিপ্লব-দার্শনিক অস্বীকার করেন নাই। Ralph Foxএর হাতে সুন্দর কবিতা বাহির হয়, এবং তাহা বিপ্লবীর গ্রহণযোগ্য হইলে তাহাতে Ralph Foxএর মুকুটে নূতন পালক সংযোগ হয় না। Stephen Spender এর 'The Destructive Element' আমাদের একটি নূতন বিষয়ে চোখ খুলিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহার উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, কিন্তু Rilke, Kafka, Proust, Joyce এবং Eliot এর 'অন্তর্মুখী' সাহিত্যের যথেষ্ট বিচার না থাকায় তাঁহাদের অ-বৈপ্লবিক বা বৈপ্লবিক অভিসন্ধি পরিস্ফুট হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। এ যুগের সাহিত্য ও তাহার সম্মুখ-প্রসারী দৃষ্টি সম্বন্ধে যাঁহাদের শিরঃপীড়া আছে তাঁহাদের এই পুস্তিকাখানি আমরা পাঠ করিতে বলি। সাহিত্য-সমালোচনায় লেখক আত্মকেন্দ্রিক ভাবালুতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিচার্য-বিষয়গুলি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে অধিকতর বিস্তৃতভাবে সেগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন। এ যুগের সাহিত্যিকের সুনিদ্রার অবসর নাই। হ্যাম্‌লেটের মতো বা অমিতের মতো তাহাকেও বলিতে হয়—Time is out of joint. O cursed time! that ever I was born to set it right!

ন. স.

আমার জীবন কথা—টমাস বাটা

অনুবাদক—শ্রীআশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক—বাটানগর নিউজ।

এই পুস্তিকাটী বাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটার 'How I began' নামক পুস্তকের অনুবাদ।

প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া টমাস বাটা ব্যবসা ক্ষেত্রে যে বিশ্বযোড়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন বাটার আত্মজীবনীতে তারই পরিচয় আছে। বাটানগর নিউজ-এর উদ্যোগে এই কর্মবীরের অধ্যবসায় ও প্রতিভার কথা বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। বাঙালী যুবক কর্মবিমুখতার অপবাদ কিছুকাল যাবৎ তাহাদের ব্যবসা ও শিল্প প্রচেষ্টা দিয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার এই অনন্যসাধারণ ব্যবসায়ীর আত্মচরিত বাংলা দেশের পাঠকদের নিকট সমাদর পাইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

সম্পাদকীয়

পাটনা প্রস্তাব এবং আসন্ন সংগ্রাম

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ্চ পাটনায় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক হয়ে গেছে। চারিদিককার পারিপার্শ্বিকে যে জটীলতা দেখা দিয়েছে তাতে এই বৈঠকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী বলেই সবাই পাটনার দিকে তাকিয়ে আছে। য়ুরোপে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে উঠছে, আমাদের দেশেও কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রবল হয়ে উঠেছে ; রামগড়ে একদিকে হবে কংগ্রেস, অন্যদিকে হবে আপোষ-বিরোধী সম্মেলন। এই আবহাওয়ার মধ্যে পাটনায় কার্য্যকরী সমিতি সাতশ' বাক্যসম্বলিত এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা ক'রে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রস্তাবটীর মধ্যে চারটী অংশই মুখ্য, যথা : (১) পূর্ণ স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব নয় (২) য়ুরোপীয় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপ্রেরিত এবং ভারতবর্ষ এ যুদ্ধে কোন রকমের সাহায্য করতে পারে না (৩) ব্রিটিশ শাসন যতদিন থাক্‌বে ততদিন ভারতের দেশীয় রাজ্য সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা কোনটীরই সমাধান হতে পারে না (৪) স্বাধীনতা-সংগ্রামের আসন্ন অধ্যায় 'আইন-অমান্য আন্দোলন' অনিবার্য্য কিন্তু গান্ধীজী যতদিন কংগ্রেসকে শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সত্যাগ্রহের উপযুক্ত না মনে করবেন ততদিন সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে না।

পাটনা প্রস্তাবের ফলে আমাদের দেশের চারদিকেই একটা কলরব উঠেছে। গান্ধীজী এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের ঘনঘন আপোষের কথাবার্ত্তার ফলে সকলেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, হয়তোবা সুভাষবাবুর অভিযোগই সত্য ! হয়তো বা দক্ষিণপন্থীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে কোন মতি নেই। কিন্তু পাটনা প্রস্তাব আইন অমান্যের কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করায়, সন্দিগ্ধ গান্ধী-ভক্তদের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। এদিকে নূতন রাষ্ট্রপতি আবুলকালাম আজাদ ঘোষণা করেছেন যে সংগ্রামের আর বাকী নেই ; জবাহরলালও সংগ্রাম আসন্ন হয়ে এসেছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন। জয়প্রকাশনারায়ণ ও নরেন্দ্রদেব দুজনেই পাটনা প্রস্তাবের স্তুতিতে শতমুখ হয়ে উঠেছেন ; তাঁদেরও মতে কংগ্রেস যে অচিরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই সুরু করবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। পাটনা প্রস্তাবের পরে দেশে সর্ব্বত্রই যখন আসন্ন সংগ্রামের কথায় আবহাওয়া ভরপূর হয়ে উঠেছে, এমন সময় গান্ধীজী গত ৯ই মার্চ্চের "হরিজনে" "কখন ?" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে অবস্থাকে চমৎকারী করে তুলেছেন। ইতিমধ্যে ৭ই মার্চ্চ জয়প্রকাশনারায়ণকে ও পরে অন্যান্য বহু কর্ম্মী ও নেতাকে সরকার গ্রেপ্তার ক'রেছেন। জবাহর, আবুলকালাম ইত্যাদি নেতারা মর্ম্মাহত হয়ে বলেছেন যে

এই সব গ্রেপ্তার সরকারের যুদ্ধঘোষণার সূচনা এবং রামগড় কংগ্রেস এর যথোচিত জবাব দেবে। গান্ধীজী কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে চূড়ান্তভাবে বলেছেন যে সংগ্রাম আরম্ভ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই; যতদিন কংগ্রেসী সৈন্যদের অস্থিমজ্জায় অহিংসা ও শৃঙ্খলা দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট না হবে, ততদিন গান্ধীজী সংগ্রামের দায়িত্ব নেবেন না। অথচ গান্ধীজী দায়িত্ব না নিলে সংগ্রামও কেউ সম্ভব বলে মনে করেন না। সুতরাং একদিকে জবাহরলাল প্রমুখদের সংগ্রামমূলক ঘোষণা, অন্যদিকে গান্ধীজীর সংগ্রামে আপত্তি। নেতাদের মধ্যে এই দ্বিবিধ ইঙ্গিত ও মতঘোষণা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। পাটনা প্রস্তাবের আসল মানে বুঝতে হলে কার ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হবে?

আমাদের মতে বিভ্রান্ত হবার গুরুতর কারণ কিছু নেই; অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় গান্ধীজীর এবং গান্ধী-চালিত কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা ও সংগ্রাম-পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলেই পাটনা প্রস্তাবের অর্থ পরিষ্কার হবে। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের পদ্ধতি জাতীয় সংগ্রামকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই সীমায় উপস্থিত হলেই সত্যাগ্রহের নীতি অনিবার্য্যভাবে ভেঙ্গে পড়ে; ১৯২০ সনের সত্যাগ্রহ ১৯২২ সনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; ১৯৩০ সনের সত্যাগ্রহও ১৯৩৩ সনে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবারও সংগ্রাম আরম্ভ হবার আগেই গান্ধীজী সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন; তাঁর নীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা না হলে আন্দোলন আরম্ভ করা চলবে না; আরম্ভ হলেও, অগ্রসর হওয়া চলবে না। পাটনা প্রস্তাবেও গান্ধীজীর প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রথম তিনটী দফায় চরমপন্থী আদর্শ বিঘোষিত হয়েছে, কিন্তু চতুর্থ দফায় কর্ম্মপন্থা ঘোষণা করতে গিয়ে সে আদর্শের স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বীকার করা হয়েছে। শৃঙ্খলা ও গঠনমূলক কার্য্যের অজুহাতে আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পর্য্যবসিত করা হয়েছে। দেশের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে শক্তিসঙ্ঘাত এতদিন সূক্ষ্মভাবে জমে উঠেছে, তার প্রকাশ আজ গান্ধীনীতির সকল গণ্ডীকে ভেঙ্গে অগ্রসর হবার উপক্রম করেছে। ভারতের স্বাধীনতা থেকেও গান্ধীজীর কাছে তাঁর নীতি অনেক বড়ো; তাই গান্ধীজী আজ নীতিকে রক্ষা করতে গিয়ে সংগ্রামকে খর্ব্ব করতে দ্বিধা করেন না। তাই রামগড়ে জবাহরলাল প্রমুখের সংশয় ও দ্বিধা সত্ত্বেও গান্ধীজীর দাবী ও নীতিকেই সবাই স্বীকার করে নেবে; সংগ্রামের জন্য বাস্তবভাবে শক্তি-সংগঠনও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। পাটনা প্রস্তাবের চরমপন্থী বাক্য-বিস্তারের আড়ালে এই সম্ভাবনাই উহ্য রয়েছে; যারা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন তাদের উচ্ছ্বাসের কারণ নেই। গান্ধীজীর উপরোক্ত প্রবন্ধেই সকল সন্দেহের নিরসন হয়েছে। জবাহরলাল, আবুলকালাম, জয়প্রকাশ এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে আর কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি করেননি। কিন্তু রামগড়ে কী হবে, তা সবারই জানা আছে। পাটনা প্রস্তাব পাশ হবে, গরম গরম কথার উক্তি ও পুনরুক্তি হবে, কিন্তু সংগ্রামের আশু সম্ভাবনাকে দুহাত দিয়ে ঠেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নির্ব্বাসিত করা হবে।

আপোষ-বিরোধী সম্মেলন

আগামী ১৮ই, ১৯শে, ও ২০শে মার্চ্চ রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের প্রথম বৈঠক হবে। সভাপতিত্ব করবেন সুভাষ বাবু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী সহজানন্দ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন সম্মেলনের সফলতার জন্য। আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে একটা সাড়া পড়েছে। সম্মেলনের প্রয়োজন আছে কিনা, এবং সম্মেলনের ভবিষ্যৎ কী হবে, এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক চলেছে। দক্ষিণপন্থী নেতারা সকলেই এই সম্মেলনকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছেন; রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন, কংগ্রেস নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল আছেন, আপোষ-বিরোধমূলক গলাবাজী ও চোখরাঙানীর দ্বারা কংগ্রেসকে সুপথে রাখ্‌বার কোনই দরকার নেই। জয়প্রকাশের মতে, কংগ্রেসই হলো ভারতের একমাত্র বনিয়াদী আপোষ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান, কাজেই সম্মেলনের কর্ত্তারা দেশের শত্রুতা সাধন করছেন। আসল কথা, এঁরা ভয় পেয়েছেন। সুভাষ বাবুর যে প্রকার জনপ্রিয়তা বেড়েছে, তাতে ভয়ের কারণ ঘটেছে। তা'ছাড়া কৃষক-নেতা সহজানন্দ ও রাহুল সংকৃতায়নও যেরকম উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে ভারতের কৃষক গণসাধারণের যোগাযোগ ঘট্‌লে, কংগ্রেসের ঐশ্বর্য্য ম্লান হয়ে পড়তে পারে। বল্লভভাই তো খোলাখুলি বক্তৃতা করে সবাইকে এতে যোগ দিতে বারণ করেছেন। এই আব-হাওয়ার মধ্যে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের প্রথম বৈঠক বসবে।

সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সবন্ধে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী 'হাই কমাণ্ড' বারবার আপোষের জন্য বড়লাটের কাছে দরবার করেছেন; গান্ধীজী পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন, তিনি আপোষ চান এবং আপোষের জন্য চেষ্টা করবেন। বুলাভাই দেশাই, রাজাজী ইত্যাদির ইংরেজ এবং ইংরেজী শাসনের প্রতি ঘন ঘন আস্থা-জ্ঞাপন দেখ্‌লেও আপোষের জন্য একটা ব্যাকুলতা অনুমান করা যায়। তাছাড়া গান্ধীবাদ আপনার অনিবার্য্য নিয়মে আপোষের চক্রেই শেষ পর্য্যন্ত ঘুরতে বাধ্য হবে; গান্ধীবাদের মধ্যেই এর কারণ অনুস্যূত রয়েছে। আজকে পাটনায় সংগ্রামমুখী প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে; আজ আবুল কালাম আজাদ, জবাহরলাল ইত্যাদি সবাই সংগ্রামের কথা বলছেন; এ সবের মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের গত এক বছরের আপোষ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব অতি স্পষ্ট। তাছাড়া রামগড় কংগ্রেসে হয়তো পাটনা প্রস্তাবকেও আরো একটু চড়া সুরে বাঁধা হবে; কিছুদিন যাবৎ ভারতসরকারের যে যুযুৎসু মনোভাব দেখা দিয়েছে এবং দেশে নতুন করে যে ধরপাকড়ের হিড়িক সুরু হয়েছে, তাতে রামগড়কে পাটনা থেকে এক ডিগ্রী বেশী চরমপন্থী হতে হবে। যদি তাই হয়, তবে কংগ্রেসের এই চরমপন্থী রূপায়নের কারণও হবে আপোষবিরোধী সম্মেলনের প্রবল প্রভাব। এদিক দিয়ে এই সম্মেলনের সার্থকতা খুব বেশী।

সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্নটী কিন্তু জটীল। কেবলমাত্র আপোষ-বিরোধী মনো-

ভাবকে ব্যক্ত করেই এই সম্মেলন এক বছরেয় জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, না, এর থেকে স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবে, তা' আজো বলা শক্ত। যে প্রয়োজন থেকে এই সম্মেলনের উদ্ভব হয়েছে, সেই প্রয়োজনকে কার্য্যকরীভাবে মেটাবার ব্যবস্থা করাই হলো এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক সার্থকতা। ভবিষ্যৎ সংগ্রামকে একটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দেবার জন্য একটা স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। যদি তা' না হয়ে কেবল কয়েকটী প্রস্তাব পাশ করেই সম্মেলনের কাজ নিঃশেষিত হয়, তবে সম্মেলনের ব্যাপক সম্ভাবনাটী ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন' নাম দিয়ে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্য থেকে একটী অংশ কলকাতায় একটা সম্মেলন করেছেন। এঁরা বি পি সি সি থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা একটা সংহতি বা পীঠভূমি (platform) গঠন করলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এঁরা একটা মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা করেছেন। প্রস্তাব যেটী পাস করা হয়েছে সেটী দুমুখো। একদিকে দক্ষিণপন্থীদের এঁরা তীব্র বিরোধিতা করবেন; অপর পক্ষে সুভাষবাবুর নীতিকেও এঁরা তীব্র সমালোচনা করবেন। দুপক্ষের ভুলকে সংশোধন করবার জন্য এঁরা তৃতীয় পক্ষ সৃষ্টি করলেন। এঁদের প্রথম কথা হল এই যে, যে-সংগ্রাম বামপন্থীরা চান, দক্ষিণপন্থীদেরকে বাধ্য ক'রে সেই সংগ্রাম করাতে হবে, কারণ কংগ্রেসের নামে না ডাক্‌লে গণশ্রেণী সাড়া দেবে না; সুভাষবাবুর সঙ্গে থাক্‌লে কংগ্রেসের বাইরে থাকতে হবে, তাতে প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাঁদের দ্বিতীয় মত, কংগ্রেসের পাশাপাশি সুভাষবাবু যদি আলাদা মতের ও পথের কথা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে বল্‌তে থাকেন, তাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে মাত্র। অধিকন্তু সুভাষবাবুর কর্ম্মপন্থায় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়বে।

আমাদের মতে দক্ষিণপন্থীদেরকে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বাধ্য করা এঁদের সামর্থ্যের বাইরে। এঁরা কংগ্রেসের মধ্যে অতি নগণ্য অংশ মাত্র। এঁদের পক্ষে গান্ধীপন্থীদের বাধ্য করবার আশা নিতান্ত কাল্পনিক ও অবাস্তব। গান্ধীপন্থীরা "বাধ্য হয়ে" কিছু করবেন না; যখন তাঁরা নিজেদের সুবিধায় ও গরজে সংগ্রাম সুরু করবেন, তখনই কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত সংগ্রাম হতে পারবে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মুষ্টিমেয় বামপন্থীর পরামর্শে ও তাগিদে গান্ধীপন্থীরা এক পা'-ও নড়বেন, এমন কল্পনার কোন ভিত্তি নেই। যদি গান্ধীপন্থীদের অবিলম্বে সংগ্রামে নামান যেত, তবে সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের বাইরে যেতে হত না। সুভাষবাবুর প্রভাবে ও চেষ্টায় যা' হয় নি, তা' যদি কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনের শক্তি ও প্রভাবে সফল হবে বলে এঁরা বিশ্বাস করে থাকেন, তবে অবশ্য আলাদা কথা।

দ্বিতীয়তঃ সুভাষবাবুর মত ও প্রতিষ্ঠান যদি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবে, তবে এঁদের নূতন প্রচেষ্টার ফলেও বিভ্রান্তি বাড়বে বই কমবে না। যেখানে দুটা দলের মত-সংঘর্ষ রয়েছে, সেখানে তৃতীয় মত ও দল সৃষ্টি করলে জনসাধারণ আরো বেশী গণ্ডগোলে পড়বে। এঁরা তাই করেছেন।

এঁদের নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হলো "ঐক্য ও সংগ্রাম সমিতি।" ঐক্যের নামে পৃথক একটী দল সৃষ্টি করবার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। পৃথক দল করবার যে সব থিওরী এঁরা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরে আরো বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছে আমাদের রইলো।

২। বাঙ্গলায় শ্রমিক আন্দোলন দমন

অবশ্য এ কাজে বোম্বাইএর বিদেশী সরকারকে পথ দেখিয়েছেন বাঙ্গলার নির্বাচিত স্বদেশী মন্ত্রীমণ্ডলী। ভারত-রক্ষা আইনের নামে কলকাতার এগার জন শ্রমিক-কর্মীকে এঁরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ পরগণা ত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছেন। আদেশ অমান্য করায় দু'জন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। এঁদের (তথা বোম্বাইএর স[illegible]দী নেতাদের) শ্রমিক আন্দোলনে, ভারত রক্ষা কি করে কঠিন হয়ে উঠল, কেমন করে ইউরো[illegible]ায় যুদ্ধে ইংরাজ-ফরাসীর সাফল্যের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হল' তা সাধারণের বুদ্ধির অতীত। স্বরাষ্ট্র-সচিব নাজিমুদ্দীনের অভিযোগ, 'এঁরা গোপনে যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার বিলি করতেন। যদি করেই থাকেন তার ফলে ইংরাজের বা ভারতের অনিষ্ট কোথায় হয়েছে তা বুঝিয়ে দিলে আমাদের উপকার হ'ত।

সাধারণের বিশ্বাস মাননীয় শ্রমিক-মন্ত্রী বাংলার কোন একটী সাম্প্রদায়িক শ্রমিকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। যাঁদের ওপর জিলা ত্যাগের আদেশ হ'য়েছে তাঁরা সব বিরোধী শ্রমিক দলের কর্মী। রাষ্ট্রবিশ্বাসে তাঁরা সমাজবাদী বা সাম্যবাদী, বোম্বাইএর শ্রমিকদের মতই তাঁরা যুদ্ধ-বোনাসের জন্য আন্দোলন সুরু করেছিলেন। শ্রমিক-মন্ত্রীর তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর শান্তিরক্ষা-প্রণালী আরো বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, নচেৎ জনসাধারণ তাঁদের ওপর ব্যক্তিগত বা দলগত উদ্দেশ্য আরোপ করতে পারে।

যন্ত্র ও মানুষ

"It is my conviction that man, the machine created by God, is the best machine. The man-made machine has got no life. I do not understand why people should pride in such machine. Ten fingers and two hands of man with the brain he possesses can do wonders. I want every man and woman of Hindusthan to realise what strength and skill lie in the hands of man."

মালিকান্দায় গ্রাম্য-শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে গান্ধীজী কথা কয়টা বলেছেন। "আমি বুঝি না মানুষ কেন তার যন্ত্রের বড়াই করে। তার যে দশটী আঙ্গুল, দুটী হাত এবং একটী মাথা আছে তা দিয়ে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে।" কথা কয়টার মধ্যে মহাত্মার স্বাভাবিক বিচক্ষণতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাপার কল, বারুদ, অস্ত্র, বাষ্পযন্ত্র, বিদ্যুৎ এবং যাবতীয় power মানুষের দশটী আঙ্গুল, দুটী হাত এবং একটী মাথাই সৃষ্টি করেছে। মাথার পর মাথা জুড়ে, হাতে হাত, আঙ্গুলে আঙ্গুল লাগিয়ে যন্ত্রের সৃজন। যন্ত্র (Machine) সংহত মানব শক্তির

বুদ্ধি ও বাহুর পরিচয়। অবশ্য মাথার এখানে প্রাধান্য। গ্রাম্য শিল্প মানুষের একক শক্তির পরিচয় এবং এখানে বাহুর প্রাধান্য। মানুষের মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই তার বাহুর কাছে গৌণ নয় এবং গান্ধীজী নিশ্চয় সংহত মানব শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করতে চান না।

গ্রাম্য শিল্পকে ধ্বংস করতে সমাজতন্ত্রীরা চায় না,—গ্রাম্য শিল্পের স্থান এখনও এদেশে আছে বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যন্ত্রশিল্পের অনিবার্য প্রগতির ফলে গ্রাম্য-শিল্প গৌণস্থান অধিকার করবে। যন্ত্রশিল্প যে অসাম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে তার প্রতিকার যন্ত্রশিল্পের উচ্ছেদে নয়—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, যন্ত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রে গণকর্তৃত্বে।

"শব্দের অত্যাচার" এবং "অবাস্তবের অরণ্য"

গান্ধী-লিনলিথগো শান্তি আলোচনা [illegible] হওয়ায় ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেছেন—"সভায় ও কাগজে বড় বড় লোকের লম্বা লম্বা কথার তোপে কোন কাজ হবে না"—কংগ্রেস নেতাদের বাস্তব রাজ্যে নেমে আসতে হবে। সে হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা এবং আপোষ। গান্ধীজী প্রতিবাদে বলেছেন যে এই উক্তি ভারতের জাতীয় দাবীর প্রতি ইংরাজের মনোভাব সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দেয়। "ইহাকেই আমি বলি জাতীয় দাবীর উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেওয়া।" জেটল্যাণ্ড সাহেবই এক "অবাস্তবের অরণ্যে" বাস করছেন।

জেটল্যাণ্ড সাহেব গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছেন "কথার অত্যাচার" (tyranny of phrases) থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে, গান্ধীজী জেটল্যাণ্ড সাহেবকে বলেছেন যে তিনি "অবাস্তবের অরণ্যে" (forest of unrealities) বাস করছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, যে বিভেদ ভারতবর্ষে বিদেশী সাম্রাজ্য রচনা করেছে—সেই বিভেদ দূর করবার দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে জাতীয়তাবাদীদের ওপর। তিনি বাস্তববাদী ভারতসচিবকে আশ্বাস দিয়েছেন যে জাতীয় ভারতবর্ষ সাংঘাতিকভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প (dreadfully in earnest)।

রামগড়ে এই উক্তির দৃঢ়তা ও সারবত্তা যাচাই হবে। কোথায় কেমন করে রূঢ় বাস্তব লুক্কায়িত,—ভারত সরকারের চেতনা উদ্রেকের জন্যে শাণিত হচ্ছে তার পরিচয় যদি গান্ধীজীর অজ্ঞাত না থাকে তবে যথার্থ বাস্তববাদীর মত তাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবার সাহস যেন রামগড়ের পরীক্ষামঞ্চে দেখান হয় এই আমাদের প্রার্থনা।

বোম্বাইএ শ্রমিক ধর্মঘট

যুদ্ধের বাজারে ভক্ষ্য ও ভোগ্য বস্তুর দর চ'ড়ে যাবার জন্যে বোম্বাইএর সূতাকলের শ্রমিকরা চড়া ভাতা'র (dearness allowance) দাবী করেছিল—মালিকরা তা মঞ্জুর করেনি। ফলে ৩রা মার্চ থেকে সেখানে সূতাকলের মজুরেরা প্রাদেশিক ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং গিরণি কামগর ইউনিয়নএর নেতৃত্বে সাধারণ ধর্মঘট সুরু করেছে। অনুমান শতকরা ৯৫ জন মজুর (প্রায় দেড় লক্ষ) ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। বোম্বাইএর সূতাকল একদিন বন্ধ থাকার অর্থ সাড়ে চল্লিশ লক্ষ

গজ কাপড়ের উৎপাদন হ্রাস এবং শ্রমিকবেতনে দুই লক্ষ টাকার ক্ষতি। বস্ত্রশিল্প ও জাতীয় অর্থের লোকসান এ থেকে অনুমান করা যাবে।

লড়াই'র ফলে কাপড়ের মালিকরা লাভে লাভে ফেঁপে উঠেছেন—কিন্তু যে লাভ তাঁদের নিজেদের চেষ্টায় বা পরিশ্রমে আসে নি, তার তিলমাত্র অংশ তাঁরা আর কাউকে দেবেন না। তাঁরা সরকারকে অতিরিক্ত খাজনা দেবেন না, ক্রেতার সুবিধার জন্য কাপড়ের দর কমাবেন না, মজুরের উদরপূর্তির জন্য বেতন বাড়াবেন না। দারিদ্র্যের সীমারেখায় নিত্য যাদের বাস, মূল্য বাড়ায় তাদের অনাহার চলেছে। বহু দিন তারা মালিকের কৃপার ওপর নির্ভর করেছে, তারপর তাদের আর্জি জানিয়েছে, শেষে নিরুপায় হয়ে কাজ [illegible] করেছে। তাদের দাবীর ন্যায্যতা বা যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার সাহস পর্যন্ত কারো হয় [illegible]

কেন্দ্রীয় ও বোম্বাইএর প্রাদেশিক সরকারী আইন খাতায় Trades Disputes Act বলে একটা আইন আছে যার জোরে সরকার মিটমাটের জন্যে সালিশ নিযুক্ত করতে পারেন। অবশ্য সালিশীর সর্ত মানবার কোন বাধ্যবাধকতা কোন পক্ষের নেই। কিছুদিন পূর্বে আমেদাবাদে যখন মালিকের আবদারে এমনি সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছিল তখন বোম্বাই সরকার সালিশ নিযুক্ত করেছিলেন। সালিশের রায় মালিকপক্ষ মানেন নি। অনুমান হয় বোম্বাই সরকার এই অভিজ্ঞতার ফলে বোম্বাইএর গোলমালে সালিশ নিযুক্ত করছেন না। কিন্তু সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। কারণ ধর্মঘটীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হচ্ছে। এর মধ্যে আবার নারী পিকেটদের সংখ্যাই বেশী। সর্বশেষে গ্রেপ্তার হয়েছেন শ্রমিক নেতা কমরেড মিরাজকর, রানাদিভে এবং ডাঙ্গে। সংবাদে প্রকাশ যে এঁদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে ধর্মঘটের কোন সংস্রব নেই। ভারতরক্ষা আইনে এঁদের ধরা হয়েছে।

স্বার্থপর স্বদেশী মিলওয়ালাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মিতালী বোম্বাইসরকার অতি সরল ও নির্লজ্জভাবে প্রমাণ করেছেন।

যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস নির্বাচন

যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন ও কার্যকরী সমিতি গঠনের ভেতর দিয়ে বামপন্থীদের দলাদলি অতি শোচনীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সভাপতির পদপ্রার্থী ছিলেন একজন সমাজতান্ত্রিক এবং একজন দক্ষিণপন্থী নেতা। রায়বাদী এবং সাম্যবাদী সভ্যরা সমাজতান্ত্রিক প্রার্থীকে ভোট দেননি। রায়বাদীদের বিরাগের কারণ নাকি এই যে সমাজতন্ত্রীরা গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের নেতার বিপক্ষে মৌলানা আজাদকে ভোট দিয়েছিল। ডানপন্থীরা এ সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে নি। তারা নিজদলের সভাপতির ওপর কার্যকরী সমিতি গঠনের ক্ষমতা দিয়ে এক প্রস্তাব আনলেন। রায়বাদী ভূপেন্দ্র সান্যাল প্রতিবাদ করলেন যে এ কাজ কংগ্রেসের নিয়মবিরুদ্ধ। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে মজা দেখতে লাগলেন—সান্যাল

কারও সমর্থন না পেয়ে সভা ত্যাগ করলেন। দক্ষিণপন্থীদের অখণ্ড কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। অথচ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বামদলগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যা তাদের চেয়ে কম ছিল না।

বামপন্থীরা এই মর্মান্তিক প্রহসনের অভিনয় আর কত দিন করবে?

ফিনিশ-সোভিয়েট সন্ধি

বহু অর্থ ও জীবন নষ্ট করে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। যুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েটের যে সর্ত ফিনল্যাণ্ড প্রত্যাখ্যান করেছে তার চেয়ে কড়া সর্ত সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। মার্শেল ম্যানারহাইম ঘোষণায় বলেছেন পাশ্চাত্য শক্তিগুলির কাছে যে সাহায্য আশা করা গিয়েছিল তা পাওয়া যায় নি ... নরওয়ে ও সুইডেন সাহায্যের চেয়ে নিজেদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতেই বেশী ব্যস্ত ছিল। বোঝা যাচ্ছে ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি এবং স্কেনডিনেভিয় রাষ্ট্রগুলি। কার্যক্ষেত্রে তারা আত্মপ্রাণ বাঁচাতে তৎপর হয়েছেন ফিনল্যাণ্ডকে সর্বনাশের মুখে ফেলে। ফিনল্যাণ্ডের সৌভাগ্য বলতে হবে যে এবিসিনিয়া বা পোল্যাণ্ডের মত দুর্গতি তার হয় নি।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মহাত্মা গান্ধী

এতদিন মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে—কংগ্রেসের তরফ থেকে "না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতি" অনুসরণ করে আসছেন। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর "হরিজন" পত্রিকায় এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামতে এই প্রথম সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। তিনি বলছেন, "বন্দীর পক্ষে শাস্তি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের যেমন অর্থ হয় না তেমনি উপর থেকে চাপানো কোন কিছু সম্পর্কে গ্রহণ বা বর্জ্জনের প্রশ্ন উঠে না"। ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর করবার জন্যই যে এর ব্যবস্থা এ কথাও স্পষ্ট কোরে বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলছেন—'বাংলাদেশের উপরই সব চেয়ে বেশী অন্যায় হোয়েছে এখানে, প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্য, এত প্রচুর ইউরোপীয়ান ভোটের কোন সঙ্গত কারণই আমি দেখি না—কারণ সংখ্যার দিক দিয়ে তারা নগণ্য, বৃটিশের বেয়নেট রয়েছে তাদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য—তাদের তরফকার কথা জানাবার জন্য আইন সভাগুলিতে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণই যথেষ্ট হোত—ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজন ছিল না ......ইউরোপীয়ান সভ্যেরা হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষকেই শাস্তি দিতে দিচ্ছে না—মুসলমান মন্ত্রীরা মনে করতে পারেন—ইউরোপীয়ান ভোটের জোরে তাঁরা নিরাপদ আছেন—ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা নিরাপদ হোলে হোতেও বা পারেন—কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য সম্প্রদায় যদি ভোটের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে গণতান্ত্রিক কোন প্রতিষ্ঠানের হর্ত্তাকর্ত্তা হোয়ে বসেন তবে জাতির স্বার্থ কিছুতেই তাদের হাতে নিরাপদ থাকে না"।

তিনি বলছেন, "এই ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি—কিন্তু কি ভাবে যে একে বদলানো যায় তার পথ জানি না......। "বৃটিশ সরকার একে পরিবর্ত্তন কোরে এ অন্যায় দূর করতে পারেন, আর না হয় ঐক্য স্থাপিত হোলে এ দূর করা যায়। পরস্পর

চুক্তির দ্বারাও এ সম্ভব হোত, কিন্তু তা অসম্ভব বলেই মনে হয়—কারণ হিন্দু-মুসলমানে চুক্তি হোলেই সমস্যার মীমাংসা হবে না—বৃটিশের সঙ্গেও চুক্তি করতে হবে—আর রাজনৈতিকক্ষেত্রে আত্মত্যাগের কথা কখনো শোনা যায় নাই"। কাজেই মহাত্মাজী সিদ্ধান্তে এসেছেন স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন মীমাংসা হবে না—। মৌলানা আজাদও এবার বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতার প্রশ্ন অপেক্ষা কোরে থাকতে পারে না।"

আনন্দ ও আশার বিষয় মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এতদিন পর স্বীকার কোরেছেন—স্বাধীনতা না এলে গৃহদ্বন্দ্ব দূর হবে না। এ কথা আরো আগে যদি তাঁরা বুঝতেন তবে জিন্না সাহেবের সঙ্গে এতবার "কথাবার্ত্তার" জন্য শক্তি ও সময় ব্যয় তাঁরা করতেন না। আমাদের সামনে একটী মাত্র প্রশ্ন রয়েছে—স্বাধীনতালাভ ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো—সমস্ত শক্তি তার জন্যই ব্যয় করা দরকার—স্বাধীনতা এলে অন্যান্য প্রশ্ন ও সমস্যা অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতই সহজ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মীমাংসা সম্ভব হবে।

নোয়াখালী ও মহাত্মা গান্ধী

নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে মন্তব্য কোরেছেন সে নিয়ে বহু আলোচনা হোয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের মনেও নানা প্রশ্ন জেগেছে—প্রথমতঃ মহাত্মাজী বলছেন, "গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও গুণ্ডামি বন্ধ করা সম্ভব নয়"—এ বিষয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হোতে পারলাম না—জনসাধারণকে গুণ্ডামি থেকে বা অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যে কোন গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক কাজ—এই প্রাথমিক কর্ত্তব্য পালন করতে না পারলে শাসনভারের দায়িত্ব নেবার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। দ্বিতীয়তঃ আত্মরক্ষার জন্য হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে মহাত্মাজীর মতামত চিরকালের মতই এবারও চমৎকার অস্পষ্ট। তিনি বল্ছেন, "আত্মরক্ষা হিংসা বা অহিংসা দুই পথেই হোতে পারে। আমি চিরকালই অহিংস আত্মরক্ষার উপর জোর দিয়েছি।......কিন্তু স-হিংস আত্মরক্ষার মত অহিংস আত্মরক্ষা ও শিক্ষাসাপেক্ষ—কাজেই যদি অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে—স-হিংস আত্মরক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ ইতঃস্ততা থাকা উচিত নয়।" এ-সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর ১৯২০ সনে লিখিত The Doctrine of the Sword এও তিনি এ-ধরণের উক্তি করেছেন, "যখন ভীরুতা ও হিংসার মধ্যে একটা বেছে নেবার প্রশ্ন হয়—তখন আমি হিংসার পথ গ্রহণ করতেই পরামর্শ দেবো।......ভীরুর মত নিজের অসম্মান সহ্য না কোরে বরং ভারতবর্ষ আত্মসম্মান রক্ষার জন্য হিংসার পথ গ্রহণ করুক এই আমি চাই।" অহিংসার সপক্ষে মহাত্মাজীর যুক্তিটা চিরকালই আমাদের ঘোরালো মনে হোয়েছে—অহিংসা দ্বারা যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে হিংসা অপেক্ষা সে পথ ভাল এ স্বীকার কোরতে কোন অসুবিধার কারণ নেই—কিন্তু অহিংস উপায়ে যেক্ষেত্রে আত্মরক্ষা সম্ভব নয় সেক্ষেত্র নিয়েই হোচ্ছে প্রশ্ন। তিনি বলছেন, "অহিংস

আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করা শিক্ষাসাপেক্ষ।" কিন্তু সে শিক্ষা কি ভাবে পেতে হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আত্মবলিদানই সম্ভব—ব্যক্তির পক্ষে যদিও কখনো কখনো এ করা সম্ভব, যদিও উচিত কিনা তা বিচার্য্য—কিন্তু সমগ্র জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে এ কখনোই সম্ভব বলে আমাদের মনে হয় নি—মহাত্মাজী আমাদের এ সন্দেহ কোনদিনই দূর কোরতে পারেন নি।

গান্ধী সেবাসঙ্ঘের তিরোধান—

মালিকান্দায় পদ্মাতীরে সেবাসঙ্ঘ সমাপ্ত হয়েছে। গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য, আধুনিক হিংসক সভ্যতার বুকে অহিংসার দেউল গড়বার জন্য, নূতন সমাজ সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে দাঁড় করবার জন্য। খদ্দর ও চরকা, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ও অস্পৃশ্যতা দূর, এই ত্রিবিধ গান্ধীয় নীতির মর্মকোষ ছিল গান্ধী-সেবাসঙ্ঘ। সেবাসঙ্ঘের সেবাব্রতীরা এই ত্রয়ীকে আশ্রয় করে কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। মালিকান্দার সিদ্ধান্তে আছে সেবাসঙ্ঘের পরাজয়, সেবাব্রতীদের পরাজয়।

মালিকান্দায় সত্য ও অহিংসার যে পরাজয় স্বীকৃত হয়েছে এই পরাজয় ঘটিয়েছে গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য সেবাব্রতীরা, গান্ধীবাদের যারা ধারক ও বাহক। পরাজয়ের গ্লানি বহন করার সামর্থ গান্ধীজীর আছে, কিন্তু পরাজয়ের শিক্ষা গ্রহণ করার মত খোলা মন গান্ধীজীর নেই, অন্তত মালিকান্দায় তার পরিচয় আমরা পাই নি। সত্য ও অহিংসার পরাজয় সম্বন্ধে আলোচনায় এ কথা বারবারই মালিকান্দায় উচ্চারিত হয়েছে যে, কংগ্রেসের রাজনীতি, পার্লিয়ামেণ্টারী রাজনীতি, অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ, যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করা ইত্যাদি নীতির মধ্যে যে অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ ও অসত্যের বীজ গুপ্ত আছে তা' সেবাব্রতী জীবনের পরিপন্থী। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রজীবনের নৈতিকতার সংঘাত আমরা পূর্বাপর দেখে আসছি, কিন্তু, গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার বুকে,—ব্যক্তিগত জীবন ও গোষ্ঠীজীবনের—সে সামাজিক বা রাষ্ট্রীক গোষ্ঠী যাই হোক না কেন—স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সত্য ও অহিংসার কক্ষে রাষ্ট্রচক্রের আবর্তন চলবেই, বারবার কক্ষচ্যুতি ঘটলেও কক্ষ পরিবর্তিত হয় নি। মালিকান্দায় রাজনীতি বনাম সঙ্ঘনীতি তথা সত্য ও অহিংসার দ্বন্দ্বে সত্য ও অহিংসার দুর্গে বন্দী রাজনীতির মুক্তি ঘটেছে এবং এটা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে যে রাজনীতির কক্ষ এবং সত্য ও অহিংসার কক্ষ এক নয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিংবা সর্দার প্যাটেলকে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মতও সেই আভাষ দেয়। সঙ্ঘ বিলুপ্ত-প্রায় করেও এই সংশয় দৃঢ়তর করা হয়েছে। কারণ, গত এক বছর যাবৎ সুভাষবাবু, জওহরলাল প্রমুখ দক্ষিণ-বিমুখ নেতাদের গান্ধী-সেবাসঙ্ঘকে দক্ষিণী-সংহতি ব'লে আখ্যায়িত করার পর, রাজনীতি ও সঙ্ঘনীতির দ্বন্দ্বে রাজনীতির বেদীতে সঙ্ঘ উৎসর্গ করে সঙ্ঘনীতির উপরে রাজনীতির স্থান নির্ধারিত হয়েছে। সংঘের মরুপথে একমসক জল ও তাদের ভাগ্যে জুটবে না—সেখানে শুধু সত্য আর অহিংসার তপশ্চর্যা।

সজ্ঘ ক্ষুদ্রকায় গবেষণার কেন্দ্র (post-graduate research) হলে সজ্ঘের অন্যান্য কর্মবীরদের রাজনীতির রসগ্রহণে বিঘ্ন ঘটবে না, সুতরাং, ব্যবস্থাও তাই হয়েছে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন অহিংসা ও সত্য অক্ষত থাক, রাজনীতিও বিপন্ন না হয়। সর্দার স্পষ্টই বলেছেন রাজনীতি তিনি বিপন্ন করতে নারাজ; অহিংসার সঙ্গে রাজনীতির সজ্ঘাতেও তিনি অবিচলিত। মালিকান্দায় রাজনীতি ও অহিংসার সমন্বয় ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে, সত্য ও অহিংসার শালগ্রাম মুষ্টিমেয় পুরোহিতের হাতে অর্পণ করে অধিকাংশ পূজারী ছুটি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট

নূতন রাজস্বসচিব স্যার জেরেমি রেইস্ম্যান ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট পেশ করেছেন এবারকার বাজেটের বিশেষত্ব এই যে পূর্ববর্তী প্রথামত এ শান্তি কালের বাজেট নয়, বাজেটের প্রেক্ষাক্ষেত্র যেমন নূতন তেমনি যে প্রণয়ন ও উপস্থাপন করেছে তা ভারতীয় ক্ষেত্রে এই প্রথম। বৃটিশ রক্ষণশীল দলের অনমনীয়তা নিয়ে দীর্ঘকাল স্যার জেম্স্ গ্রিগ্ বাজেট রচনা করে গিয়েছেন। পরোক্ষভাবে পূর্ববর্তী সচিবের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার এবং প্রত্যক্ষভাবে জগদ্ব্যাপী আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নয়নের ফল হিসাবে লব্ধ উদ্বৃত বাজেট প্রদর্শন করবার সৌভাগ্যলাভ করেও তিনি যে জনমঙ্গলের খাতে বিশেষ কিছুই করে যেতে পারেন নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিজয়ী জাতির স্বার্থের ধারক ও পোষকরূপে বাজেট প্রনয়নের রীতি শুধু সেইদিনই বদ্লাতে পারে যেদিন জনসাধারণের প্রতিনিধি জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের জন্য বাজেট প্রণয়ন করবে। সুতরাং মূলনীতির সাথে যেখানে পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গীই যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে বাৎসরিক বাজেট পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটে ফোঁটা ভালমন্দের বিচার করতে যাওয়া ব্যবহারিক রাজনীতি বা অর্থনীতি বিরুদ্ধ।

গুজব উঠেছিল আলোচ্য বাজেটে লোহালক্কড়, চিনি, রূপা, লবণ ও আয়করের উপর বর্দ্ধিত হারে ট্যাক্স বসবে, কারণ যুদ্ধের জন্য বাজেটের ঘাটতি মিটান আবশ্যক। অর্থ সচিব চিনি ও পেট্রল ছাড়া আর সবাইকে রেহাই দিয়েছেন। ঘাট্তি মিটাবার জন্য অতিরিক্ত মুনাফা-কর প্রবর্ত্তিত হোচ্ছে, ইহার পরেও যে ঘাট্তি থাকবে রাজস্বের খাতে মজুদ তহবিল হতে তা পূরণ করা হবে। এর পরে যদি খরচ আরও বেড়ে যায় তা হলে নূতন ট্যাক্স বসান হবে। পেট্রলের উপর ট্যাক্স বসুক, বড়লোকের বিলাসোপকরণ হিসাবে তাতে আপত্তি নেই কিন্তু যেখানে দেশীয় পণ্যের চলাচলের উপর ট্যাক্স হিসেবে বস্‌বে সেখানে আপত্তি করবার কারণ রয়েছে; দরিদ্র দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের হানিকর কোন প্রস্তাবই সমর্থনযোগ্য নয়, বিশ্বব্যবস্থার অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে যেসব নূতন শিল্প জন্মলাভ করে উঠ্ছিল তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে সন্দেহ নেই। চিনির উপর উৎপাদন ও আমদানী শুল্ক বর্ধিত হওয়ায় দেশী মিলগুলির অবস্থার পরিবর্তন হল না বটে কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তের কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য ঘটল। অনাহার অর্ধাহারের দেশে যারা চিনি খাবার বিলাসিতা অর্জন করেছে সেরকরা এক পয়সা

বৃদ্ধিতে তারা কিছু মনে করবে না, কিন্তু আমরা ভাবি তাদের কথা যারা কালেভদ্রে গুড়টুকু জোটাতে পারে। চিনির দামে বাড়্তির সঙ্গে গুড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তার দামের উপর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

পরিশেষে এই শুধু বলতে চাই যে, কোথায় কিসের জন্য কি যুদ্ধ বেঁধেছে তাতে আমাদের লাভ ক্ষতির পরিমাণই বা কি তা না জেনেও ৮॥ কোটি টাকার মত সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির বরাদ্দ আমরা করেছি এবং দরকার হলে আরও ট্যাক্স বহন করতে প্রস্তুত থাকবার জন্য সতর্কীকৃত হয়েছি। কোন কিছুতে না ...র সামর্থ্য নেই, বড়লাটের ভিটো রয়েছে।

বাংলার বাজেট

বাংলার রাজস্বের দীর্ঘকালব্যাপী যে অধোগতি চলে আসছে আজও কিছুমাত্র যে তার ব্যত্যয় হয়নি আলোচ্য বাজেটে তারই নিদর্শন রয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রথম দুই বৎসর বহিরাগত কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য লাভ ক'রে অভাবের তাড়না এবং ঘাটতির পরিমাণ কমেছিল কিন্তু আভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অভাবে যুদ্ধ লাগবার এই বৎসরেই যে ভয়াবহ মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সবশুদ্ধ তেরো থেকে চৌদ্দ কোটি টাকার বাজেট বাংলার। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথমে অর্থাৎ ১৯৩৮ এর পয়লা এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেণ্টের হাতে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মজুত টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে ক'মে ৯১ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হয়। চল্তি বৎসরের শেষের দিকে ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু রাজস্বের অবস্থা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ মজুদ তহবিলের পরিমাণ ট্রেজারি বিল প্রবর্ত্তন করে (৬০ লক্ষ টাকার) বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশা করা যায় ৩১শে মার্চ তারিখে মজুদ তহবিলের পরিমাণ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা হ'বে। এ থেকে রাজস্বের খাতে ৫৭ লক্ষ টাকা (আয় ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ব্যয় ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ) এবং ঋণ আমানত ইত্যাদির খাতে ২৬ লক্ষ টাকা (আয় ১৩ কোটি ১২ লক্ষ ব্যয় ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ) একুনে ৮৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি মিটিয়ে বছরের শেষে মজুত তহবিলে মাত্র ৭২ লক্ষ টাকা থাকবে। এমন করে মজুত তহবিল ভেঙ্গে খেলে একটা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ইজ্জত নষ্ট হয় এবং ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা কমে যায়। নতুন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতসরকার বাংলাসরকারের নিকট হতে প্রাপ্য টাকা মকুব করে দেওয়ায় ১০-১২ লাখ টাকার একটা দায় বেঁচেছে; ১৯৩৭-৩৮ থেকে আয়করের দফায় কেন্দ্রীয় হ'তে ২৫-৩০ লাখ পাওয়া যাচ্ছে; সে সময় হতে পাট রপ্তানী শুল্কের খাতেও ৫০-৬০ লাখ টাকা করে বেশী পাওয়া যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী দমনের জন্য যে ব্যয়াধিক্য ঘটেছিল তারও প্রয়োজন হচ্ছে না। এ সব আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা লাভ করেও গবর্ণমেণ্ট যে ঘর সামাল দিতে পারছেন না তাতে তাদের অযোগ্যতাই সূচিত হয়। জাতিগঠন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনকল্যাণকর বিভাগে সুপরিকল্পিত কার্যপ্রণালীর দিকে নজর দিতে গেলে দলরক্ষা করা চলে না। কাজেই দলগত স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে

ইটসুড়কির মোটা ব্যয়বরাদ্দ এবং এদিক-সেদিক ছিঁটেফোঁটা অর্থসাহায্য ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন কিছু বাজেট হতে আশা করতে যাওয়া বাতুলতা।

রেলওয়ে বাজেট

রেলওয়ে বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়, গত ১লা মার্চ্চ তারিখ হতে সরকারী রেলে মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা এবং যাত্রী ভাড়া টাকায় এক আনা বেড়েছে। মালের মধ্যে খাদ্য শস্য, পশুর খাদ্য, সার ও যুদ্ধের সরঞ্জাম আপাততঃ এই বর্ধিত হার হতে রেহাই পেয়েছে এবং কয়লার উপর সার চার্জ ১২।৷০ টাকার স্থলে ১৫ টাকা ধার্য্য হয়েছে। রেলপথের আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নি। ১৯৩৮—৩৯ সালের বাজেটে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। এ বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ৩ কোটী ৬১ লক্ষ উদ্বৃত হবে বলে দেখান হয়েছে এবং আগামী বাজেটেও মাশুলের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করলেও তিন কোটী টাকার উপর উদ্বৃত আশা করা যেত। রেলের আয় হতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে একটা অংশ দেবার ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৪—২৫ হতে ১৯৩০—৩১ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ৫।৷০ কোটী করে টাকা রেল বাজেটে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এর পর হতে কয়েক বৎসর বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার জন্য রেলবাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৩৬—৩৭ সাল হতে পুনরায় কিছু কিছু করে দেওয়া হচ্ছে। হিসাবমত এই মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকারের ৩৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা পাওনা হবে। এই মাশুল বৃদ্ধি করে ভারত সরকারের পাওনা টাকা মিটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপাততঃ রেলওয়ে মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা এই শুনেছি। গত বৎসরের বাকী ৯০ লক্ষ টাকা আলোচ্য বৎসরে দেয় ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মেটাতে মাত্র ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার মত আয় বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু কেন যে ৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা আদায় করবার ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে। যদি ভারত সরকারের সমস্ত বাকী টাকা পরিশোধ করতেই হয় তবে কেন মজুদ তহবিলে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ রক্ষিত হ'ল? আসল কথা যা মনে হয় তা এই, একেতো নূতন ব্যবস্থায় রেলের আয় আরও বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই, হিসাবে তা অনেক কম করে দেখান হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মজুদ তহবিল রাখা হয়েছে এই জন্য যে যুদ্ধকালীন বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের চহিদা মেটাবার জন্য ওর প্রয়োজন রয়েছে। টাকাটা জমা থাকলে supplementary demand সময় মত পেস করলেই চলবে। যাত্রীর চিরন্তন অসন্তোষের সঙ্গে শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয়বাহুল্য রেল মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যুক্তি কিন্তু এই ব্যাপারেও অন্যান্য বিষয়ের মতই প্রতিবাদ জানানো মাত্রেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ।

কালভৈরব

জয়শ্রী

অষ্টম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৭ | একাদশ সংখ্যা

গান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ

অনিল চন্দ্র রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর যুক্তি ভুল

(খ) উপায়কে গান্ধীজী বলেছেন "বীজ" এবং "উদ্দেশ্য"কে বলছেন "গাছ" বা "ফল"। আমরা বলছি, এ তুলনা অসঙ্গত। বীজের এবং ফলের মধ্যে যে সম্পর্ক, উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সেই সম্পর্ক হতে যাবে কেন ? আমাদের মতে "পথ" এবং "গন্তব্যস্থানের" মধ্যে যে সম্পর্ক, উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সেই সম্পর্ক। পথ দিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছাই ; তেমনি উপায়কে অবলম্বন করে' আমরা উদ্দেশ্যে পৌঁছাই। এখানে এটা অতি সহজ কথা যে পথ যদি খারাপ হয়, কর্দ্দমাক্ত, দুর্গন্ধময় হয়, দুর্গম হয়, তবু এই খারাপ পথেই আমরা মনোরম গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারি। পথ খারাপ বলে গন্তব্য স্থানটীও খারাপ বা কদর্য্য হয়ে যাবে, এমন কথা মান্‌লে চলে না। গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত অপকৃষ্ট বলতেই হবে।

(গ) উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলে, গান্ধীজী বলেছেন, এবং বীজ ও গাছের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। কার্য্যকারণ তত্ত্বটী (causality) অতি জটিল। দার্শনিক বিচারে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কার্য্যকারণতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্য ধরা পড়েছে। বিশেষ করে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধটী অতো সহজ বা

স্পষ্ট মোটেও নয়। একটী ঘটনা ঘট্‌লে, তার কারণ যে কোনো একটীমাত্র শক্তি তা নয়। বহু বিচিত্র শক্তি ও অবস্থার সমবায়ের সংহত ফল হলো "কার্য্য" বা "ঘটনা"টী। অগণিত সূক্ষ্ম কারণ কাজ করছে প্রত্যেকটী কার্য্যের পশ্চাতে। অসংখ্য অস্তিবাচক (positive) ও নাস্তিবাচক (negative) অবস্থার সমবায়ে,—অগণিত উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সজ্ঘাতে—একটী ঘটনা ঘটে থাকে। এদের কোনো একটীমাত্র অবস্থা বা শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে "কারণ" বলে আখ্যাত করলে ভুল হয়। গান্ধীজীও তাই করেছেন। গাছের কারণ ঠিক "বীজ" নয়, একমাত্র বীজ হ'লেই গাছ বেরুবে না। কারণ বীজের সঙ্গে সঙ্গে আছে আলো, বাতাস, মাটী ইত্যাদি বহু বস্তুর সমাবেশ। তাছাড়া ঝড়, বজ্রপাত, শি... পঙ্গপাল, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি বাধা-বিঘ্নের অভাবও থাকা চাই। কারণ এসব বাধার ... তি ঘট্‌লে, গাছের আবির্ভাব কস্মিনকালেও ঘট্‌বে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে গাছের "কারণ" কেবল "বীজ", একথা ঠিক নয়। বহু অবস্থার সজ্ঘাতই হলো "কারণ"। অবস্থা-সজ্ঘাতের নড়চড় বা পরিবর্ত্তন করে নিলেই অন্যরকম "কার্য্য" বা "ঘটনা" (result, effect) ঘট্‌তে পারে। তেমনি একটা অনিষ্টজনক অমঙ্গল ঘট্‌লেই যে হিংসামূলক বা পশুশক্তিমূলক কারণ থেকেই ঘটেছে তা' বলা অসঙ্গত। হিংসার সঙ্গে সঙ্গে আরো নানারকমের অবস্থার সমাবেশেই উক্ত ঘটনা ঘ'টেছে। সেই সব অবস্থাগুলোর কোন একটা যদি বাদ দেওয়া সম্ভব হতো, তবে হয়তো অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলজনক ঘটনাই ঘটতো। রক্তপাত বা পশুবলের সঙ্গে যদি স্বার্থবুদ্ধি বা জিঘাংসাবৃত্তি জড়িত না থেকে পরোপকারবৃত্তি জড়িত থাকৃতো, তবে রক্তপাতের বা পশুশক্তির দ্বারা কল্যাণকর ফলই হতো। বোটানীর পরীক্ষাগারে দেখা গেছে, তীব্র রঞ্জন লাইট ফেল্‌লে তার প্রভাবে গাছপালা ইত্যাদি অন্যরকম হয়ে যায়। যে বীজের থেকে যেমন ফল হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে অন্যবিধ ফলের আবির্ভাব ঘটেছে। নতুন একটী শক্তির সংযোগে নতুন আবির্ভাব ঘটেছে। তেমনি পশুশক্তি, হিংসাবৃত্তি, যুদ্ধ ইত্যাদির ওপরে মহৎ আদর্শের আলো পড়লে, এদের মহৎ রূপান্তর ঘটে থাকে এবং সংসারে কুফল না হয়ে সুমহৎ কল্যাণের জন্ম হয়। কাজেই কার্য্যকারণের দোহাই দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা এক্ষেত্রে নেই। বহু পথে যেমন একই গন্তব্যে পৌঁছান যায়, তেমনি বহু উপায়ে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তেমনি একই উপায়ে বহুবিধ উদ্দেশ্য বা ফলপ্রাপ্তি সিদ্ধ হতে পারে। অকল্যাণ যেমন কেবল হিংসা কেন, বহু কারণে ঘট্‌তে পারে, তেমনি এক হিংসার পথেও যেমন অকল্যাণ হতে পারে তেমন কল্যাণও হতে পারে। হিংসা সর্ব্বত্রই কেবল একটীমাত্র ফলই প্রসব করতে পারে—অর্থাৎ মানুষের অমঙ্গলই কেবল সাধন করতে পারে—এই একপেশে উক্তি যে কত বড় মিথ্যা তা' কার্য্যকারণতত্ত্বের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। কাঁটা গাছে কেবল কাঁটাই হবে, সকল অবস্থায় ও কালে,—এবং এর ব্যতিক্রম হতে পারে না কোনো কালে—এমন কথা আধুনিক বিজ্ঞান বলে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণের সংযোগে ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা সততই রয়েছে। গোলাপ গাছে অবিকল গোলাপ না হয়ে অন্য ধরণের ফুলও হওয়া অসম্ভব নয়; রক্তজবার গাছে শাদা জবা ফুটতে

অনেকেই দেখেছে। আধুনিক জননবিজ্ঞান (genetics) জীবজন্তুর ভবিষ্যৎ নিয়েও পরীক্ষা করছে—অবস্থা-সঙ্ঘাতের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এক কারণ বা বীজ থেকে অন্য জাতীয় কার্য্য বা পরিণতিকে ঘটিয়ে তুলছে। সূক্ষ্ম অবস্থা-বিপর্য্যয়ের দরুণ পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হচ্চে এবং নারী পুরুষে পরিণত হচ্চে এমন ঘটবে অবিরতই ঘটছে সংসারে। কাজেই কার্য্যকারণের অমোঘত্বের অজুহাতে পশুশক্তি বা দেহশক্তিকে অনাদিকাল ধরে কেবলি অকল্যাণপ্রসূ বলে ধরে নেওয়া গোঁড়ামী বা অজ্ঞতার পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এর সমর্থন করে না।

হিংসাত্মক কার্য্যেরও রকমফের আছে; সকল রকমের হিংসাত্মক কার্য্যই অন্যায় (immoral) নয়। জবাহরলালও বলছেন, "Violence itself, though bad, cannot be considered intrinsically immoral." হিংসাত্মক কার্য্যের চেয়েও সমাজের ও ব্যক্তির বেশী হানিকর অনেক কিছু আছে; যেমন কাপুরুষতা, ভীরুতা, দাসত্ব ইত্যাদি। এরা মানুষকে হিংসাত্মক কার্য্য থেকেও অধিক অবনত ও অধোগত করে দেয়। এগুলো হিংসা থেকেও খারাপ। হিংসাত্মক কার্য্য যখন সদিচ্ছা ও শুভকামনার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় তখন নৈতিক দৃষ্টিতে কিছুতেই অন্যায় হতে পারেনা। * গান্ধীজী তাঁর এক বিখ্যাত প্রবন্ধে নিজেও একথা স্বীকার করেছিলেন। ডাক্তার যখন শিশুর গায়ে অস্ত্র চালিয়ে রক্তপাত করে, সে রক্তপাতকে কেউই পাপ বলবেনা। গান্ধীজীও না। ✝ আর নীচতা, ভীরুতা যে হিংসাত্মক কার্য্য থেকে মানুষকে আরো অনেক বেশী অধঃপতিত করে তা' সবাই স্বীকার করবেন। পশুবলের প্রয়োগে একটা রাজসিকতা আছে, যার দ্বারা একটা শক্তির ব্যঞ্জনা ঘটে। সদিচ্ছাপ্রণোদিত হলে এই শক্তি থেকে কিছু নতুন সৃষ্টিও আবির্ভূত হয়। কিন্তু তামসিকতা কোনদিনই সৃজনমুখী হয়না—সে সততই নিস্ফল ও বন্ধ্যা। অরবিন্দও বলেছেন: "...... inertia, 'tamas', indeed, injures much more than the rajasic principle of life which at least creates more than it destroys." (Essays on the Gita, pp 61)

হিংসা-অহিংসার মধ্যে ছেদ রেখা নাই

গান্ধীজী ধ্বংস চান না। তিনি পশুশক্তিকেও সমাজে স্থান দেবেন না। কারণ পশুশক্তি ধ্বংস-মুখী এবং প্রেমশক্তি সৃজনমূলক। তিনি চান কেবল সৃজন, কেবল মিলন; বিনাশ ও বিধ্বংসকে তিনি এড়াতে চান। কিন্তু বিশ্ববিবর্ত্তনের ব্যবস্থায় কোথাও তাঁর আদর্শের সমর্থন নেই। আমাদের

* "There are shades and grades of it and often it may be preferable to something that is worse. Gandhiji himself has said that it is better than cowardice, fear & slavery, and a host of other evils might be added to this list. It is true that usually violence is associated with ill-will, but in theory atleast this need not always be so. It is conceivable that violence may be based on good-will (that of a surgeon. for example) and anything that has this for a basis can never be fundamentally immoral After all, the final tests of ethics & morality are good-will and ill-will"

(Jawaharlal : autobiography : pp 539)

✝ "I do believe than when there is only a choice between cowardice & violence I would advise violence .....I would rather have India resort to arms in order to defend her honour than that she should in a cowardly manner become or remain a helpless victim to her own dishonour." ("The Doctrine of the sword"—Gandhiji 1920)

মতে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে কোন ছেদরেখা টেনে দেওয়া চলেনা। কাকে হিংসা বোল্‌বো এবং কোন্‌টুকুকে অহিংসা বোল্‌বো, তার কোন মানদণ্ড নেই। অহিংসার সঙ্গেও অনিবার্য্যরূপে হিংসা জড়িত রয়েছে; সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিনাশ; একের থেকে অপরকে ছেদন করে দেখা বাতুলতা। গান্ধীজী কেবল ব্যবহার করবেন আত্মিকশক্তি (soulforce); কিন্তু আত্মিক শক্তিও ধ্বংসকে ডেকে আনে। আত্মিক শক্তি অমঙ্গলকে (evil) ধ্বংস করে, একথা ঠিক। কিন্তু অমঙ্গলকে উপজীব্য করে যারা বেঁচে থাকে, অমঙ্গল যাদের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে, অমঙ্গলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও একান্ত ধ্বংস ঘটে যাবে। কাজেই ধ্বংসকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই; অমঙ্গলকে বিনষ্ট করতে গেলেও সমাজে অনেক [illegible]র একান্ত ধ্বংস সাধন করতে হয়। * আমরা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো নিজহাতে ধ্বংস না-ও [illegible] পারি; কিন্তু প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধ্বংসকে এড়ান চলে না। কোথাও না কোথাও ধ্বংস বা প্রলয় ঘটবেই। কোন দেয়াল তুলে দিয়ে ধ্বংসকে আলাদা করে দেয়া চলে না। প্রেমশক্তিকে ব্যবহার করবো অমঙ্গলকে ধ্বংস করবার জন্য; কিন্তু ছেদ রেখা টেনে দিয়ে বল্‌বো, এখানেই শেষ, ধ্বংসকে চাহিনে: এ চাঁদকে চাওয়ার মতনই অসম্ভব কল্পনা। আত্মশক্তি একটা দুর্দ্ধর্ষ তেজকে প্রকট করে তোলে; সেই প্রবল তেজে পৃথিবীর বুকে কোথাও না কোথাও প্রলয় ঘটবেই। আগুন ঘরকে আলোকিত করে কিন্তু সলিতাকে পুড়ে ছাই করে দেয়। আলোকই কেবল চাইবো, সলিতার একান্ত বিনষ্টিকে কামনা কোরবো না, তা' চল্‌বে না। কাজেই ধ্বংসকে সৃজন থেকে আলাদা করা চলে না। এরা জড়াজড়ি করে আছে, মাঝখানে ছেদরেখা টানবার কল্পনা অবাস্তব।

এ ছাড়াও কথা আছে। যখন হিংসা থেকে বিরত হলে অধিকতর ধ্বংস ঘটে, তখন কী করা? এমন সময় আসে যখন অহিংসাই প্রাণহানি ঘটায় বেশী। পশুশক্তিকে এমন স্থলে প্রয়োগ করলে প্রাণহানি কম হয়, তবুও কি পশুশক্তিকে আশ্রয় নেওয়া অন্যায়? কখনই নয়। যেখানে হিংসা থেকে বিরত হওয়ার ফল হলো বহুপ্রাণের ধ্বংস, সেখানে বিরত হওয়াই পাপ। হিংসা করলে যে প্রাণহানি ঘটে, হিংসা থেকে বিরতির দ্বারা যদি তার চাইতে বেশী প্রাণহানি ঘটে, তবে হিংসা শ্রেয়তর। গান্ধীজী হিংসা বা ধ্বংসকে চান না। কিন্তু কখনো হিংসা-বিরতিই (abstinence) বেশী ধ্বংসকে ডেকে আনে। অরবিন্দও তাই বলেছেন। †

জীববিজ্ঞানও তাই বলে

মানুষ ইচ্ছে করলেই ধ্বংসকে এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণে রয়েছে ধ্বংসের ইঙ্গিত। প্রাণীজগতের দিকে তাকিয়ে দেখলেও এ সত্য ধরা পড়ে। প্রত্যেকটী প্রাণীর

* "But even soulforce when it is effective, destroys.…evil cannot perish without the destruction of much that lives by the evil and it is no less destruction even if we personally are saved the pain of a sensational act of violence."

(Arabinda, ibid, pp 60)

† "…you have perhaps caused as much destruction of life by your abstinence as others by resort to violence.…(Ibid p 60.)

বাঁচবার প্রয়াসে রয়েছে অপরের বিনাশ লুকিয়ে। প্রত্যেক জীব বেঁচে থাকে অন্য জীবকে ধ্বংস করে। জীববিজ্ঞানেই (Biology) অহিংসার প্রবলতম প্রতিবাদ। মাংসভুক প্রাণীরা আহার পাবে কোথায়, যদি অপর প্রাণীকে ধ্বংস না করে? মানুষের জীবনেও আহারে বিহারে প্রাণীহত্যা ঘট্‌ছে প্রাকৃতিক নিয়মে। আমরা মাছ মাংস খাবো, অথচ অহিংসানীতির গুণ গাইবো, এ কেমন করে হবে? গান্ধীজীর নির্দ্দেশ পালন করতে গেলে স্বাধীনতার সৈনিক সবাইকেই নিরামিষ খেতে হবে। কিন্তু তাতো কেউ করছেন না, করবেন বলেও আশা দেখচিনে। কিন্তু তাতেও সমাধান হয়না। কারণ বিশ্বজগতে জীবন্ত (living) ও মৃত (dead) বলে কোন ছেদরেখা কোথাও টানা চলেনা। অবিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তি প্রকৃতির সকল স্তরে-স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মানুষ এবং প্রাণীর সঙ্গে তরুলতাও একই প্রাণপ্রবাহে [illegible] লালিত ও বিবর্ত্তিত হচ্চে। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেছিলেন, তরুলতাও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত; কেবল তাই নয়, এরা "সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" আজকার জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানও তাই বলছে। প্রকৃতির রাজ্যের স্তরভেদকে ডিঙিয়ে গিয়ে তারাও পৌচেছে একাকার প্রাণশক্তির লোকে, যে প্রাণ জীবজন্তু ও তরুলতায় সমপ্রসারী। কাজেই যারা নিরামিষ শাকশবজী খেয়ে ভাবেন অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছি, তারা ভ্রান্ত। মানুষকে বাঁচতে হলে শাকশবজী ছাড়া চলে না। কাজেই তরুলতাকে হত্যা করেই মানুষের জীবনযাত্রা সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া মানুষের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে অগণিত প্রাণীহত্যা ঘটে যাচ্ছে। এর প্রতিকার নেই। বাতাসে অসংখ্য বীজাণু-প্রাণী বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তাদের চোখে দেখা যায়না। কিন্তু মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে তাদের মৃত্যু ঘট্‌চে। তেমনি আমরা পরিষ্কার এক গ্লাস জল খেয়ে ভাবি পৃথিবীর কোথাও কোন অনিষ্ট হলো না। কিন্তু জলের মধ্যে কতো অগণন প্রাণী রয়েছে—তা অনুবীক্ষণই বল্‌তে পারে। জল না খেয়ে মানুষ বাঁচেনা, জল খেলে প্রাণীহত্যা হবে, একটী দুটী নয়, অসংখ্য, অগণিত। মানুষের প্রাণীহত্যা ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত বাঁচবার উপায় নেই। গান্ধীজী কি বল্‌বেন! কোথায় ছেদরেখা টেনে বোল্‌বো যে এই পর্য্যন্ত অহিংসা হচ্চে, এর পরেই হিংসা? মানুষের বেলায় অহিংস থাক্‌বো, কিন্তু জীবজন্তুর বেলায়ই হবোনা কেন? আর জীবজন্তুর প্রতি অহিংস হবো, তরুলতার প্রতি কেন নয়? কিন্তু বাতাসে আকাশে জলে স্থলে যে সব বীজাণু-প্রাণী রয়েছে তাদের তো হত্যা না কোরে বাঁচবারই উপায় নেই। কাজেই হিংসা অহিংসার সীমারেখা কোথায়? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গান্ধীজীর দার্শনিক অহিংসানীতি অলৌকিক ও অবাস্তব। জীবনে এই দিকের প্রতি অরবিন্দও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হত্যা ও ধ্বংস ছাড়া জীবন অচল ও সমাজ অচল। *

* "...this is certain that there is not only no construction here without destruction, no harmony except by a poise of contending forces but also no continued existence of life except by a constant self-feeding & devouring of other life. Our very daily life is a constant dying & being reborn, the body itself is a beleaguered city attacked by assailing, protected by defending forces, whose business is to devour each other; and this is only a type of all our existence." (Aravinda, ibid, pp 57)

ইতিহাস বলে, হিংসাবৃত্তি বেড়েছে, কমে নাই

ইতিহাসও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকে। সাধারণতঃ আমরা মনে করে থাকি মানুষ যতই সভ্য হয়েছে, ততই মানুষের হিংসাবৃত্তিও কমেছে। নভিকো (J. Novicow) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, যুদ্ধ ও রক্তপাত ক্রমশঃই সমাজে লোপ পাচ্ছে এবং সংঘর্ষটা কেবলি বুদ্ধির ক্ষেত্রে এসে সীমাবদ্ধ হচ্ছে। সমাজ যতই অগ্রসর হবে, ততই পশুশক্তির প্রয়োগ বিরলতর হয়ে দাঁড়াবে। অহিংসা ও প্রেমশক্তির স্তুতিগান সভ্যতার শৈশব থেকে মানুষ করে এসেছে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণ সেই তিমিরেই রয়েছে। কতো বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মানুষকে অহিংসা শেখালো, কিন্তু মানবপ্রকৃতি পুরানো খাতেই চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। আদিম মানুষ যত সভ্য হয়েছে তত বেড়েছে তার হিংস্রতা, বৃদ্ধি পেয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ। ২৯৮টী আদিম অসভ্য জাতির জীবনযাত্রা আলোচনা ক'রে তিনজন বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে "শিল্পোন্নতি এবং সমাজপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ যুদ্ধও ক্রমশঃ বেড়ে গেছে।" * একজন পণ্ডিত হিসেব করেছেন যে খৃঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খৃষ্টাব্দ ১৮৬০ পর্য্যন্ত ৩৩৬০ বছরের মধ্যে ৮০০০ সন্ধিপত্রে সাক্ষর দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে একটাও দুবছরের বেশী টেঁকেনি। জর্জ্জ পীল একখানা পুস্তকে লিখেছেন যে য়ুরোপ পুরাপুরি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবার পর থেকে ১৫০০ বছর ধরে কেবল শান্তির বাণী প্রচারিত হয়েছে; কিন্তু এই ১৫০০ বছর য়ুরোপের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে একটানা 'হত্যা এবং রক্তপাতের কাহিনী' ("a tale of blood and slaughter"). † হার্বার্ট স্পেন্সারও তাই বলেছেন। ‡ জবাহরলালও স্বীকার করেন যে সমাজ খুব বেশী উন্নত হয়নি। § কাজেই দেখা যাচ্ছে যুগযুগান্তরের প্রচার এবং প্রথম শ্রেণীর মহাপুরুষদের প্রভাব মিলেও পৃথিবীর মানুষকে এতটুকু পরিবর্ত্তন করতে পারেনি। গান্ধীজী আর একবার সেই নিষ্ফল প্রয়াস করতে চাচ্ছেন। প্রচারের দ্বারা মনুষ্যসমাজকে অহিংস করবার আশা বিফল হতে বাধ্য। এর বিরুদ্ধে ইতিহাস ও বিজ্ঞান দুইই সাক্ষ্য দিচ্ছে। দার্শনিক বিচারে আমরা আগেই দেখেছি যে, মানুষের মন থেকে এককালে হিংসাবৃত্তির উচ্ছেদ করা অসম্ভব।

সমাজবিবর্ত্তনের সঙ্গে পশুশক্তির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে

সমাজবিবর্ত্তনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে সমাজগতির প্রত্যেক অবস্থায় পশুবল প্রকট হয়ে পড়ে। সমাজজীবনের অন্তরালে নানা শক্তিসজ্ঞাত জমে উঠতে থাকে। পুরাণো সমাজব্যবস্থার

* "...organised war rather develops with the advance of industry and of social organisation in general." (Hobhouse, Wheeler and Ginsberg P 228).

† The Future of England by Hon'ble George Peel ; P 169).

‡ "After nearly 2000 years' preaching of the religion of amity ; the religion of enmity remain predominant..." (a letter, Spencer).

§ "But on the whole groups and communities have not improved greatly', (Ibid, p 542).

খোলসের মধ্যে এই সব শক্তিপুঞ্জ দিনে দিনে সংহত হয়। কিন্তু এমন একটা সময় এসে উপস্থিত হয় যখন পুরোণো খোলসের মধ্যে নবজাত বিপুল শক্তি আর ধরে না। তখন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে পুরোণো খোলসকে ভেঙ্গে চৌচির করে বেরিয়ে আসে নতুন জীবন। সমাজ জীবনের ইতিহাসে আছে একটি অশ্রান্ত গতির ইতিহাস। এই সম্মুখবাহী গতির মুখে মুখে প্রবল শক্তিতে প্রকাশিত হয়ে ওঠে নব নব জীবনব্যবস্থা। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নিষ্ঠুর ধ্বংস অনিবার্য্য ; শান্ত মধুর ভঙ্গীতে, অতি মোলায়েম রীতিতে এই বিপ্লব ঘটে না ; নির্ম্মম প্রলয় ও স্থূল শক্তির তীক্ষ্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এই নব সৃষ্টির জন্ম হয়। সমাজ-বিবর্ত্তনের ঐতিহ্যই হলো এই। একে অস্বীকার করলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়। [illegible] মতো বিপ্লবী সবাই এই রীতিকে স্বীকার করেছেন। নতুন শক্তিসংহতির জন্য বাধা যতো শক্ত হবে, বিস্ফোরণও ততখানিই প্রবল হবে এবং আনুসঙ্গিক ধ্বংসও (violence) তত বিপুল হবে।

রাষ্ট্রে ও সমাজে স্থূলশক্তির প্রয়োজন আছে—

মানুষকে গান্ধীজী পরিবর্ত্তিত করতে চান। কিন্তু কেবল প্রেমধর্ম্মের প্রচার করলে হবেনা ; সমাজব্যবস্থাকে বদ্‌লে দিতে হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সমষ্টিকে একই কালে একসঙ্গে বদ্‌লে দেওয়া যায় না। কারণ তাতে ক্রমবিকাশের ধারাকে অস্বীকার করতে হয়। সব মানুষ একই দিনে অহিংস হয়ে যেতে পারেনা। আধারভেদে ও স্তরভেদে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ হিংসাবৃত্তিকে আয়ত্তে আনতে পারেন ; কিন্তু সমাজে এমন একটা অংশ চিরদিনই থাকবে যারা সকল শিক্ষা ও প্রচারকে ব্যর্থ করে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকবে। পারিপার্শ্বিক-বাদীদের (environmentalist) মতকে আমরা মানিনে। বহু জন একটা নব মনোবৃত্তিকে সাধন দ্বারা আয়ত্ব করতে পারলেও, কতগুলো লোক বাকী থেকেই যাবে। এদের সমাজ-বিরুদ্ধ মনোভাব কিছুতেই যাবে না। এই শ্রেণীর জন্য সমাজে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শাসনও (coercion) দরকার হবে। সভ্যতার ব্যাখ্যা করতে গান্ধীজী বলেন একদিন শাসনের প্রয়োজন লুপ্ত হবে ; মানুষের সহজ প্রবৃত্তি সেদিন নবালোকে রঞ্জিত হয়ে রূপান্তরের দিকে যাবে। এমন আমূল রূপান্তর যে একসঙ্গে হতে পারে না, তাতো পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। মানুষের মনে হিংসাবৃত্তি উকি দিতেই থাকবে এবং তাকে আয়ত্তে রাখবার জন্য শাসনের ও শাস্তির ব্যবস্থাও প্রয়োজন হবে। গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ সমাজে পুলিশের দরকার হবেনা, সৈন্যের দরকার হবে না। কারণ এরা স্থূলশক্তি বা পশুশক্তির প্রতীক। কিন্তু বহুলোক অহিংস হয়ে রূপান্তরিত হলেও, কিছু লোকের জন্য অন্ততঃ স্থূল শক্তির প্রয়োগ করতেই হবে। সমাজ থেকে পশুবলের প্রয়োজন একেবারে লুপ্ত কোনদিন হবেনা, একথা সমাজবিকাশের বিশ্লেষণ থেকেই প্রমাণিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। ক্ষমতা হাতে পেলে মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় তাকে হাতছাড়া করে না। স্বার্থবুদ্ধিই মানুষের মধ্যে প্রবলতম, সেবাবুদ্ধি নয়। ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা কোন শ্রেণীর হাতে থাকলে, তারা ইচ্ছাসুখে তাকে অপরের হাতে উঠিয়ে দেয় না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ

ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য জড় হয়েছে; এই ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যকে তারা স্বেচ্ছায় সর্ব্বহারা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে, এ একেবারে অসম্ভব। স্বার্থবুদ্ধিকে শাসনে রাখতে হলে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হবেই।

রাজনৈতিক সংগ্রামে গান্ধীবাদীয় অহিংসার স্থান নাই—

ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসা লুপ্ত হবে না; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে অহিংসার স্থান আছে। গান্ধীজীর প্রতিভার সব চাইতে বড়ো প্রমাণ হয়েছে রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতিতে। অহিংসাকে সঙ্ঘবদ্ধ[illegible] জনসাধারণের রাষ্ট্রীক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার কৌশল তিনিই প্রথম শিখিয়েছেন জগতে। ভারত অস্ত্রহীন; [illegible] সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার সামর্থ্য ভারতের নেই; বৈজ্ঞানিক অস্ত্রসম্ভারের যুগে নি[illegible] অচেতন জনতাকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করবার কল্পনা আজ ধারণারও অতীত। তাই রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা হিসেবে অহিংসা-নীতির স্থান ভারতে রয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ হলো রাজনীতির বিচারের ফল এবং ব্যবহারিক ও সাংসারিক জ্ঞানের নির্দ্দেশ। এর সঙ্গে গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক অহিংসার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আমরা দেখিয়েছি যে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গান্ধীজীর অহিংসা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়! গান্ধী-মার্কা তাত্ত্বিক অহিংসা বরং আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে যুক্ত করলে, সংগ্রামের ক্ষতি হবে। কী ক্ষতি হবে, অসহযোগ আন্দোলনকে বারম্বার ক্ষান্ত করে দেওয়া থেকেই তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গণ-আন্দোলনে কোথাও কোন হিংসাবৃত্তির স্পর্শ লাগলেই গান্ধীজী সে আন্দোলনকে বন্ধ করে দেবেন। গান্ধীবাদীয় অহিংসার স্বাভাবিক পরিণতি হলো গণ-আন্দোলনের বাধক; গণ-সংগ্রাম তার সহজ বিকাশের পথে এগুতেই পারবে না, যদি গান্ধীজীর অহিংসা দ্বারা সংগ্রাম নিয়ন্ত্রিত হয়। গান্ধীজীর ইদানীন্তন বিবৃতিগুলোতেই একথা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গান্ধীজীর অহিংসা-দর্শনের কতকগুলো দিক আমরা দেখিয়েছি। বারান্তরে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক-মতবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা কোরবো।

জীবন

সত্যনারায়ণ সেন

বারেক থামিতে মোরে দাও
শ্রান্তিহীন হে বন্ধু আমার ! একবার ফিরিয়া তাকাও
তরঙ্গিত দুঃখ-সুখ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লয়ে [illegible] পলে
ফেনিল কল্লোল-ভরা গাঢ় [illegible] তলে
অশান্ত এ কলরোল জাগিবে কি চিররাত্রিদিন
কোনো কালে হবেনাকি এতটুকু নিস্তব্ধ বিলীন ?
নিখিল মর্ম্মের তলে একী অনুভূতি
অনন্ত আকৃতি !
উন্মুখ কালের স্রোতে অশান্ত চঞ্চল
কখনো উন্মাদ, কভু ব্যথায় অতল
নাচায়ে চলিবে মোরে অবিরাম অজস্র সজ্জাতে
শেষহীন সন্ধ্যায় প্রভাতে !

বারেক থামিতে দাও মোরে
এ গভীর আকর্ষণে কেন বন্ধু একটানা টানিছ সুদূরে ?
পারিনা পারিনা আমি আর
তোমার কর্ম্মের ওই বিপুল বিস্তার
উত্তরীতে চিরপ্রশ্নহীন—
ক্ষণেকে ভুলিয়া যাওয়া এ দৈনন্দিন
ক্ষণিক প্রাণের স্পর্শ, ক্ষণিকের প্রীতি,
দুঃখ, দ্বন্দ্ব, কলরব, আনন্দের গীতি,
তারপরে চিরনীরবতা—নিঃশব্দ মরণবেলাভূমি
অর্থশূন্য কর্ম্ম অবসানে ফেনসিক্ত মুখে রবো চুমি ?

তারচেয়ে এইখানে থামি
আস্থক হেথায় শেষ রজনীর অন্ধকার নামি :
এই ওঠানামা আর অবিশ্রাম চলিবার পালা
এই ক্ষুদ্র দুঃখসুখ, গ্লানি আর জ্বালা
হোক অবসান :
সুদূর দিগন্তে চাহি কোথাও তো মেলেনা সন্ধান
বিমুখ [illegible] জীবনের [illegible] অন্তরালে
আর কোনো আনন্দের [illegible]
গড়িয়া উঠেছে কালে কালে ?
অনন্ত যাত্রার পথে অতন্দ্র নয়ন
তারি পিপাসায় শুধু মানবের মন
লুটায়ে লুটায়ে বারে বারে
ছুটিয়া চলিবে এক অনির্দ্দেশ দিগন্তের পারে ?

STATE LIBRARY
COOCH BEHAR.

নব্য তুরস্কের নারী জাগরণ

(প্রথম পর্য্যায়)

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

(১)

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কী নারীর জীবনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সুলতান আবদুল হামিদের শাসনকালে পুরুষ ও নারী উভয়েরই ভাগ্য সমভাবেই নিষ্পেষিত হইয়াছে। কথায় কথায় প্রাণদণ্ড, কথায় কথায় নির্ব্বাসন সে-দিন তুর্কী জীবনের দৈনন্দিন বিধান ছিল। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে অতি অকিঞ্চিৎকর কোন মতামত প্রকাশ করিলেও কাহারো নিস্তার পাইবার উপায় ছিল না। সমগ্র দেশ গুপ্তচরের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেতনভুক ক্রীতদাসের সামান্য একটু ইঙ্গিতের উপর তুর্কী জীবনের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। সেদিন,—নির্ব্বাসন দণ্ড,—দেশপ্রীতি, উদারতা ও অগ্রগতির পরিচায়ক ছিল। তুরস্কে এমন উদারপন্থী ব্যক্তি খুবই কমই ছিলেন, যাঁহার ভাগ্যে সেদিন নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ হয় নাই।

কি পুরুষ, কি নারী কেহই তুরস্কের বাহিরে গতায়াতের অনুমতি সহজে পাইত না; পাছে বাহিরের কোন ভাব সংক্রামিত হইয়া যায় এই ভয়ে। তুরস্কের রাজদূতগণ বিভিন্ন দেশে যাইবার সময় সঙ্গে পত্নীকে লইতে পারিতেন না। বাধ্য হইয়া অনেকেই বিদেশেই বিবাহ করিতেন।

তুরস্কে বহু সংখ্যক বিদেশী-পরিচালিত স্কুল ও কলেজ ছিল। অধিকাংশই মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই সব স্কুলে ও কলেজে যে সব ছাত্র-ছাত্রী অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিত, তাঁহাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ হইত। স্বেচ্ছাচারী সুলতান প্রতিভাকে ভয় করিত, পাছে ইহাদের বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের প্রভাব ভবিষ্যতের প্রতি জাতিকে সজাগ করিয়া তোলে। কাজেই দেশে এ আপদ না রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য!

সম্ভ্রান্ত ঘরের অধিকাংশ মেয়েকেই, জার্ম্মাণ অথবা ফরাসী অভিভাবিকার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বাইরের জীবনের সহিত সকল প্রকার সম্পর্কশূন্য এই সব নারী উপায়ন্তর না দেখিয়া এই অভিভাবকদের নিকট হইতে যাহা পাইত পরম আগ্রহে তাহাই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিত। তাহাদের ক্ষুধাতুর মন কিন্তু বিচার করিতে পারিত না। বিনা বিচারে এই সব অশিক্ষিতা বিদেশী মহিলাদের অন্ধের মতই অনুকরণ করিতে যাইত। উহাদের মুখে ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী সভ্যতার কথা শুনিয়া মনে মনে তুর্কী নারী কণ্টকিত অস্বস্তি অনুভব করিত। মনে-বুকে তাহার অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত; কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। একটা প্রবল অতৃপ্তি, হতাশা ও মর্ম্মান্তিক জ্বালা তাহাদের বুকের মধ্যে তুষের আগুনের মত জ্বলিতে থাকিত।

এই সব অসন্তুষ্ট তুর্কী মেয়ে বুঝিতে পারিয়াছিল, ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের হাতেই আবদুল হামিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, কোনক্রমে যদি ইউরোপের চোখের উপর তুর্কীর নিপীড়িত নারী-জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার হইবেই। ইহার বেশী আর কিছু তাহাদের উত্তেজিত কল্পনায় স্থান পাইল না।

এই পথ বাছিয়া লইল সর্ব্বপ্রথম দুইটী তরুণী; জাইনেব ও মালেক, আবদুল হামিদের অন্যতম মন্ত্রী নূরীবে'র দুই কন্যা। জাইনেব ও মালেকের মাতামহ ছিলেন একজন ফরাসী। (Marquis de C[illegible]nenf)।

বাল্যকাল হইতেই জাইনেব ও মালেক [illegible] পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত মন তাহাদের ইউরোপের মুক্ত নারীজীবনের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা পাশ্চাত্য নারীর আনন্দঘন জীবনের স্বপ্ন দেখিত, মুক্তির নেশা তাহাদিগকে পাইয়া বসিল। ভগ্নী মালেকের সহিত একযোগে জাইনেব নির্য্যাতিত তুর্কী নারীর জীবন-কথা জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিবার জন্য ফন্দী আঁটিতে লাগিল।

জাইনেব তাহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছে:

"সেদিন তুরস্কে, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীক, কোন কিছুই করা সহজ ছিল না তার পর আমাদের কথা শুনিবেই বা কে? এ বিষয়ে কোন লেখা ছাপাইবার উপায় ছিল না। সর্ব্বোপরি সুলতানের সজাগ চক্ষু। স্বর্ণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ পাইলে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইত।...আমার বিবাহের পর হইতে কিছু একটা করিবার জন্য মন আমার উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বক্ষণের জন্য মন ঐ একই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত।..মধ্যে মধ্যে আমরা উৎসবের আয়োজন করিতাম; অনেক মেয়ে নিমন্ত্রিত হইত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল সামাজিক সমস্যার আলোচনা। কেমন করিয়া তুর্কী নারীর জীবন-সমস্যার সমাধান হইবে, অন্যান্য দেশের নারীর অবস্থা, কেমন করিয়া তুর্কী নারীর মুক্তি সম্ভবপর করিয়া তোলা যায়—এই সব ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এই সমন্ধে জ্ঞাতব্য পুস্তক আমাদের খুব বেশী ছিল না। সম্মুখে ভাল মন্দ যাহা পাইতাম নির্ব্বিবাদে তাহাই আমরা পড়িতাম। কিন্তু আমাদের কাজ একটুও আগাইল না। মধ্যে মধ্যে অতর্কিতভাবে সুলতানের আদেশে আমাদের উৎসব বন্ধ রাখিতে হইত। এমন কি সঙ্গীত বা অন্য কোন আমোদপ্রমোদও নিষিদ্ধ হইত।

আমরা তবু হাল ছাড়িলাম না। সভ্য জগত যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থা না জানে, কেমন করিয়া ইহার প্রতিকার হইবে। ইহাই ছিল আমাদের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। ঠিক এই কারণেই ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতই আমরা "লোতীকে" পাইলাম।

"পেয়ারে লোতী" ছিলেন নৌ বিভাগের কর্ম্মচারী। জাতিতে ফরাসী। এই সময়েই তিনি লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তুরস্কের প্রতি তাঁহার সহজ অনুরাগ আমাদের সমস্যার দিকে বিনা আয়াসেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিল। 'লোতীর' সহিত আমরা পত্র

ব্যবহার করিতে লাগিলাম। একজন ফরাসী মহিলা আমাদের দূতীর কাজ চালাইতেন। লোডীর জগতবিখ্যাত উপন্যাসের (Les Disenchantess) জন্ম হইল।...

...লোডীর উপন্যাস তিনটী অতৃপ্ত তুর্কী নারীর জীবন-আলেখ্য। 'যেনান', 'মালেক' ও 'জাইনেব'। শৈশব হইতে ইউরোপীয় ভাবধারায় এবং ইউরোপীয় অভিভাবিকার তত্ত্বাবধানে ইহারা মানুষ। একজনের প্রাচ্য প্রথায় বিবাহ হয় কিন্তু বিবাহে সে সুখী হইতে পারে নাই। এই তিনটী নারী তুর্কীর অভিশপ্ত সামাজিক জীবনের অবস্থা জগৎকে জানাইবার আশায় একজন ফরাসী লেখকের শরণাপন্ন হয়। ফরাসী লেখক কনষ্টান্টিনোপলসে আসেন। হারেমে মেয়ে তিনটী বাস করিত, পুরুষের সহিত দেখা করিবার উপায় ছিল না। গোপনে পত্র ব্যবহার চলিতে লাগিল।

'লোডীর' উপন্যাস আমাদেরই জীবনী। লোডী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, আজ আর বলিতে কোন বাধা নাই। আমার ও মালেকের জীবনী সত্য কিন্তু যেনান বলিয়া কেহ ছিল না। লোডী আমাদের খোলা মুখে প্যারিসে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন দিনই দেখিতে পান নাই। কদাচিৎ বোর্খায় আপাদ মস্তক ঢাকিয়া আমরা কথা বলিয়াছি।'

'লোডী উপন্যাসের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে আখ্যান ভাগের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক; কিন্তু উহা সত্ত্বেও উপন্যাসের ভিতর হইতে আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে কাহারো কষ্ট হইল না। তুরস্কের বাস আমাদের উঠাইতে হইল। প্যারিসে আমরা আশ্রয় লইলাম। কবে সুলতান হামিদের দানবীয় শাসনের অবসান হইবে জানি না। অনাগত সেই বিপ্লবের দিকে আমরা তাকাইয়া আছি।'

ইহার পর জাইনেব ও মালেক প্যারিসেই কিছুকাল কাটায়। মালেকের বিবাহ হয় পোলাণ্ডের এক ধনবান যুবকের সহিত। রাশিয়ায় তাহার বিস্তৃত সম্পত্তি ছিল। রুশ-বিপ্লবের পর সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট সে-সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। মালেক প্যারিসে দর্জীর কাজ করিয়া আজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

জাইনেব ১৯০৮ সালের বিপ্লবের পর দেশে ফিরিয়া যায়। সে যাহা চাহিয়াছিল, বিপ্লব তুরস্ককে তাহা দিতে পারিল না। অসহিষ্ণু অতৃপ্ত মনে জাইনেব স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে সে স্বেচ্ছায় ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়।

(২)

১৯০৮ সালের বিপ্লবের পর তুরস্কে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। নব-প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের অধীনে দেশ কতখানি আগাইয়া গেল, স্পষ্ট ইহা বোঝা না গেলেও লোকের মানসিক অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আসিল। ঘরের কোনে লুকাইয়া 'স্বাধীনতা' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইত। সেই পরম বাঞ্ছিত শব্দ প্রাণ ভরিয়া আজ উচ্চ-

কণ্ঠে বলা চলিবে; হোটেলে, চাএর মজলিসে বন্ধু-বান্ধব লইয়া আড্ডা জমাইয়া তুলিবে, সেখানে তাহারা আনোয়ার পাশার কথা কহিবে, সুলতানের সমালোচনা করিবে,—অথচ ইহার জন্য ষড়-যন্ত্রের অপরাধে তহোদের না হইবে ফাঁসি, না যাই[illegible] হইবে নির্ব্বাসনে। দুই পয়সা দামের চা ছাড়া বেশী কিছু আজো তাহারা খরচ করি[illegible] পারে না, বেশ ভূষাও আজো তেমনি জীর্ণ ও অপরিচ্ছন্নই, দারিদ্র তাহাদের বিন্দুমাত্রও ঘোচে নাই[illegible] কিন্তু অন্তরে যেন পুলকের বান ডাকিয়াছে। দারিদ্র্য আছে কিন্তু তাহার দাহ নাই।

এই সময়ে দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অন্তরে [illegible]ারীর দুঃখের কথা জাগিয়া উঠে; আহম্মদ রেজা বে এবং রেজা তিউফিক বে[illegible] আহম্মদ রে[illegible] [illegible]কালের রাজনীতি ক্ষেত্রের একজন নামজাদা লোক ছিলেন। চরিত্র তাঁহার অমায়িক ছিল [illegible] [illegible]ভাব প্রবণ ও আদর্শবাদী ছিলেন।

আহম্মদ রেজার সহোদরা ভগ্নী সালেমা হানু[illegible]ূর্ব্ব হইতেই নারী আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু সুলতানের স্বেচ্ছাচার তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এইবার তিনি অভিষ্ট সিদ্ধির সুযোগ পাইলেন।

সারা দেশ জুড়িয়া যে অজ্ঞানতা জমাট বাঁধিয়া ছিল, শিক্ষা ছাড়া তাহা অপসারিত করা যাইবে না, একথা আহম্মদ রেজা বুঝিয়াছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম শিক্ষক তৈয়ারী করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। আদর্শ শিক্ষক না পাইলে শিক্ষা বিস্তার কার্য্য অগ্রসর হইবে না মনে করিয়া শিক্ষক তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে ভগ্নীর সাহায্য লইয়া একটী 'নরম্যাল' কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জমি কেনা হইল, গৃহের কিছু কিছু কাজও চলিতে লাগিল কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহ সম্পূর্ণ করা গেল না। এই অনাবশ্যক বাহুল্য ব্যয়ের জন্য তখনো তুরস্কের মন প্রস্তুত হয় নাই।

কলেজের কাজ এই খানেই শেষ হইয়া গেল। কিন্তু নারী শিক্ষার কাজ বন্ধ হইল না। নেকী হানুম ও হালিদা হানুম, নব-তুর্কীর দুইটি প্রধান বৈপ্লাবিক শক্তি, তুরস্কের স্থানে স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র গঠন করিয়া চলিলেন।

রেজা তিউফিক বেকে লোকে সচরাচর 'দার্শনিক' বলিয়া ডাকিত। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। কবি হিসাবে তাঁহার যশ যেমন দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমানেই তিনি অপযশের ভাগী হইয়াছিলেন। সাহিত্য ছাড়িয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে আগমন করা তাঁহার বন্ধুরা কেহই সমর্থন করেন নাই। ব্যক্তিগত হিসাবে তো বটেই, জাতীয় প্রশ্ন হিসাবেও রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করা তাঁহার আদৌ সমীচীন হয় নাই।

কবির হৃদয়ঃ নারীর দুঃখ সহজেই তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু করিবার মত না ছিল তাঁহার ক্ষমতা না ছিল তাঁহার এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্ব ছিলেন হালিদা হানুম। হালিদা ছিলেন তাঁহার হাতে গড়া ছাত্রী, তাঁহার স্নেহ-সিক্ত শিষ্যা। তখন হালিদা অপরিণীত বয়স্কা তরুণী। পরবর্ত্তী সময়ে এই হালিদাই রক্তাক্ত বিপ্লবের মাঝে কামাল প্রভৃতি

বৈপ্লবিক নেতার ছিলেন সহযাত্রী, সঙ্গিনী এবং বিপ্লবান্দোলনের অন্যতমা প্রধানা অধিনেত্রী। *

তুরস্কের জীবনেও যাজকের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ছিল। শিক্ষাহীন অজ্ঞান সমাজ শুধু নির্ব্বিচারে ইহাদের অনুশাসন অন্ধের মত মানিয়া চলিত তাহা নহে, এই মানিয়া চলাকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিত এবং কেহ না মানিতে চাহিলে তাহার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিত।

পর্ব্বত প্রমান এই সব বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নব্য তুরস্ক আগাইয়াই চলিল। বিদেশে যাইবার অধিকার এই সময়ের এক[illegible] উল্লেখ যোগ[illegible]-সংস্কার। বন্দিনী নারীর শ্বাস-রুদ্ধ মন এই অকিঞ্চিৎকর অধিকারেই উৎফুল্ল [illegible] উঠিল।

দলে দলে নারী বিদেশ যাত্রা করিল। জাহাজে উঠিয়াই বন্দীজীবনের প্রধান সাক্ষী বোরখা তাহারা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল।

(৩)

নূতন শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই বলকান যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের বহু প্রদেশ হস্তচ্যুত হয়। ইউরোপের ক্ষুধিত লালসা এতদিন ধরিয়া ঐ ছুতাই খুঁজিতে ছিল। সে মনস্কামনা তাহার পূর্ণ হইল।

এই দুর্দ্দিনের মধ্যেই তুরস্ক তিনজন শক্তিধর নেতাকে পাইল: আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা ও কামাল পাশা। তুরস্কের এই ত্রয়ী ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন, নব্য-তুরস্কের গতি-পথের কণ্টক বিদূরিত করিয়াছেন, মৃত জাতিকে জীবনের সন্ধান দিয়াছেন।

এই তিনজনই বুঝিয়াছিলেন, তুরস্ককে বাঁচাইতে হইলে তুরস্কের অন্তপুরের রুদ্ধ অর্গল মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। যুদ্ধের সময়েই তাঁহারা তুর্কী নারীর নিকট আবেদন করেন।

নেতৃত্রয়ের এ আহ্বান ব্যর্থ হইল না। তুরস্কের অন্তঃপুরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে তুর্কী নারী যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল। কোথায় পড়িয়া রহিল তাহাদের আজন্ম সংস্কার, কোথায় পলাইয়া গেল তাহাদের শাস্ত্রও শাসনের কঠোরতা-কিষ্ট অন্তরের সঙ্কীর্ণতা। আহতের পার্শ্বে, মুমূর্ষুর পার্শ্বে তাহারা কল্যান-হস্তের মমতা স্পর্শ বিছাইয়া দিল।

তালাত ও কেমাল পাশার পত্নী নারী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু

*হালিদা হানম সাহিত্যিক হিসাবে অপর্য্যাপ্ত যশের অধিকারিণী হইয়াছিল। ইনি কিছুদিনের জন্য প্রথমে তুর্কী গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার 'ডটার অব স্মার্ণা (Daughter of Smyrna),' 'টারকি ফেসেস্ ওয়েষ্ট' (Turkey faces west), অরডিয়াল অব টারকি (ordeal of Turkey) ও 'জীবন স্মৃতি', সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। কিছুদিন পূর্ব্বে হালিদা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রনে কয়েকটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও হালিদা একখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

পারিলেন না আনোয়ারের পত্নী। আনোয়ারের পত্নী ছিলেন রাজপরিবারের মেয়ে, তাঁহার অভিজাত-মন ইহাতে সাড়া দিল না। গতানুগতিকে বিলাসিতা, উৎসব ও আমোদ প্রমোদ লইয়াই তিনি ব্যাপৃত থাকিলেন।

দেশ-যে কত পিছনে পড়িয়াছিল, নেতৃত্রয়ের তাহা অজানা ছিল না। স্বাস্থ্য, শিক্ষাও শিশু পালনের কাজ নারী-শক্তির সাহায্য ভিন্ন সুপরিচালিত হইতে পারে না, একথা তাঁহারা জানিতেন। নেতৃত্রয় সর্ব্বপ্রথম তুর্কী নারীর চলার-পথ উন্মুক্ত করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

কি সামাজিক, কি সম্বন্ধীয়, কি রাষ্ট্রিক, সর্ব্বপ্রকার অনাচারের কবল হইতে নারী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আ[illegible] করিলে[illegible] নানাবিধ দেশ হিতৈষী কর্মে তুর্কী-নারীকে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহারা উৎসাহিত কা[illegible]লেন।

তমসাবৃত হারেমের প্রকোষ্ঠ হইতে রাজপথে প্রকাশ্যে ভ্রমণ করিবার অধিকার নারীকে দেওয়া হইল! সমগ্র যাজক সমাজের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও তালাত পাশা সাধারণ পার্কে পুরুষের ন্যায় নারীর ভ্রমন করিবার অধিকার আইনত স্বীকার করিলেন। সর্ব্বশেষে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুক্তির দুর্ণিবার আকাঙ্খা তুর্কী-নারীর প্রাণে দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোন পথ এবং কোনরূপে তাহারা মুক্তিকে আবাহন করিবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

হালিদা ও নেকী হানুম এই অপূর্ব্ব সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, দীর্ঘদিনের অত্যাচারে তুর্কী-নারী এই অপ্রত্যাশিত মুক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; সহজভাবে ইহাকে গ্রহণ করিবার সামর্থ্যও তাই তাহাদের নাই। মুক্তি ঘোষণা করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না, মুক্তিকে গ্রহণ করিবার উপযোগী করিয়া তুর্কী-নারীর মন আজ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। হালিদা স্বয়ং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রচার কার্য্য দ্বারা তুর্কী-নারীর প্রাণে জাগিবার ও বাঁচিবার চাহিদা মূর্ত করিয়া তুলিলেন।

নেতৃত্রয়ের সদিচ্ছা ছিল, নারীর দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু একটা জাতির স্মরণাতীত কালের জমাট কুসংস্কারের পাষাণ-বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার বুকে মুক্তির সহজ, সরল, ও সাবলীল রূপ ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে শুধু সদিচ্ছা ও সহানুভূতিই যথেষ্ট নয়। তাঁহারা ছিলেন সংস্কারক। বিপ্লবের রক্ত-মাখা আগমনকে তাই তাঁহারা পরিহার করিতেই চাহিয়াছিলেন। মোল্লা, মৌলবী, সুলতান ও তাঁহার পরিবার, দেশের আইন ও শিক্ষা, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের প্রচলিত ইস্লামীয় সংস্কারভীতি বেশিদূর অগ্রসর হইবার পথে নেতৃত্রয়কে ভরসা দিতে পারিল না। যাহা হইয়াছে, তাহাতেই আপাততঃ তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু আসন্ন-ভবিষ্যৎ তাহার অন্তরের মনি-কোঠায় যে বিপুল, বিরাট ও ব্যাপক বিপ্লবায়োজনে ব্যাপৃত ছিল, সেদিনো তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। তুরস্কের বিধিলিপি সেই পথেই তুরস্ককে পরিচালিত করিতে লাগিল।

প্রত্যাবর্তন

নমিতা মজুমদার

শীতের সকাল। রাজলক্ষ্মী স্নান সারিয়া ঠাকুর ঘরে পূজার আয়োজন করিতেছেন; এম্‌নি সময় হারুর মা আসিয়া ডাকিল—মা।

রাজলক্ষ্মী বাহিরে আসিলেন। চন্দনের সুগন্ধ ললাটে। কণ্ঠ বেড়িয়া ভিজা চুলের উপরে মটকার আঁচল, কোণে বাঁধা চাবির গো

হারুর মা কহিল—দাদাবাবু এসেচেন?

—না।

—চিঠিপত্র দেননি?

—না।

হারুর মা অবাক্ হইয়া কহিল—ও মা! ঐ বুকের দুধ যে খেয়েচেন, সে কী ভুলে গেলেন। তুমি যে ভাবনা করে মরচ মা।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিলেন—তুই কী চাস্?

হারুর মা চমকিয়া উঠিল, মুখে হাসিয়া বলিল,—হ্যা মা, চাই বৈ কি? মা হও তাই মনের কথা চাপা থাকে না। কাল সারাদিন খাওয়া হয়নি।

ভাঁড়ারের চাবিটা খুলিয়া সৌদামিনীকে ডাকিলেন। খানিক পরে গামছায় ছোট বড়ো নানা পুঁটুলি বাঁধিয়া হারুর মা কহিল,—আর ভাবতে হবে না। এ আমাদের ছয়-সাত দিনের মতো।

দূর হইতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—তবে আসি। রাজ্যিশুদ্ধ লোকে বলে দয়ার সীমা নেই তোমার। অথচ—

অল্প হাসিয়া বলে—কী জানো মা, বলে 'পর হয় না আপন'। এই যদি হোতো তোমার গর্ভে ধরা—তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। রাগে কঠিন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—

—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা বল্‌চি।

হারুর মা বাহিরে আসিয়া রাগারাগি করিল। বামনীর দেমাক কত। ভালো কথা বলিতে গেলে ফোঁস করিয়া ওঠেন, যেন কোথায় কোণ মণিতে হাত পড়িয়াছে। ছেলে কি আর সাধ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। এখনি হইয়াছে কি! অনেক কান্না কাঁদিতে হইবে। অনেক দুঃখ আছে কপালে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাহির হইতে যখন সান্ত্বনা আসে ঘরে, সে যে কতোবড়ো লজ্জা, কতোবড়ো অপমান সেই কথা ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

ব্যাপারটা এই। সেদিন হঠাৎ নীরেন কহি[illegible];—বৌ বাপের বাড়ী যাবে পিসিমা।

পিসিমা বলিলেন—বেশী দিন তো আসেনি।

—নাই বা হোল। শ্বাশুড়ী লিখেচেন, দেখতে ইচ্ছে গেছে। আজ কালের মধ্যেই চলে এসো।

জমিদারের খেয়াল, [illegible] ঘরে মেয়ে দিয়া[illegible] বটে, সম্মান দেন নাই। মেয়েকে দেখিবার ইচ্ছাটা কেবল মাত্র মেয়ের কাছেই প্রকা[illegible]তাহাকে এমনি করিয়া অবজ্ঞা করাটা বাজিল। এতোবড়ো অপমান নীরেন সহিল কী বলিয়া?

নীরেনের মুখের দিকে গম্ভীর হইয়া চাহিলেন, বলিলেন—আমার শরীরটা ভালো নেই।

এইখানেই গোলমালটা যদি চুকিত, তবে ব্যাপারটা সহজেই মিটিত; কিন্তু যাহা খুবই সহজ কার্যকালে তাহাই ঘটিয়া ওঠে না। ঘরে লীলা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাঁধাইয়া তুলিল—এই পোড়া গ্রামে মুখ বুঁজিয়া থাকার চেয়ে মরণ ভালো। নিজের উপর যার নিজের ক্ষমতা নাই মায়ের আঁচলধরা সেই শিশুর বিবাহ না করাই উচিত ইত্যাদি। নীরেন স্বীকার করিল যুক্তিশাস্ত্রের ধারা অনুসারে ইহা অতর্কণীয়।

সুন্দরী ষোড়শী স্ত্রীর চোখের জলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন সংসারে এমন বীরপুরুষের সংখ্যা কম বলিয়াই সুন্দরীদের রক্ষা।

কাজেই নীরেনকে ফের পিসিমার কাছে আসিতে হইল,—সে বল্‌চে যাবেই।

—কে নিয়ে যাচ্ছে?

—কেন আমি।

রাজলক্ষ্মীকে যেন ধ্বক্ করিয়া কী বাজিল। নীরেন যদি মুখ ভার করিয়া বধূকে সম্মতি দিত হয়তো এত লাগিত না। দেখিতে দেখিতে তাঁর দীপ্ত দুই চোখ জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল,

দূর হয়ে যা—আর আসিস্‌নে তবে।

নীরেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল—কী বল্‌লে?

তাহার পরে বাক্স পেঁটরা গোছাইয়া হাসি মুখে লীলা, আর লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নীরেন প্রমাণ করিয়া গেল—আর ফিরিবেনা। এই তিন ছটাক জমির কচু কাঁচকলা না হইলেও তাহার চলিবে।

রাজলক্ষ্মী নীরবে চুপ করিয়া সবি দেখিলেন, কোনো কথা কহিলেন না।

এই ঘটনার অন্তরালে আরো একটি কাহিনী আছে। ষোলো বৎসর বয়সে রাজলক্ষ্মী যখন স্বামী এবং সদ্যোজাত শিশু দুই হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন তখন সকলে বলিল, পাগল হইয়া যাইবে, কাঁদে না যে।

ভ্রাতৃজায়া চোখ মুছিয়া আপনার মাসকয়েকের শিশু পুত্রটিকে কোলে দিয়া চলিয়া গেলেন। যেন বলিয়া গেলেন—এই তোর রইল।

সেই শিশুটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাজলক্ষ্মী ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামীপুত্রহীনার সেই বুকের দুধে নীরেন মানুষ।

নীরেন যখন গ্রামের ইস্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িবে কিনা ভাবিতেছে তখন দূর গ্রামের কলিকাতাপ্রবাসী জমিদার গ্রামে বেড়াইতে আসিলেন। ছেলেটির সুন্দর চেহারা আর নম্র স্বভাবে ভারি ভালো লাগিয়া গেল। কি ঘরে মেয়ে আছে। খোঁজ লইয়া জানিলেন কুলমর্যাদায় তাঁহাদের চেয়ে ইঁহারা ঢের বড়ো।

কাজে কাজেই কথাটা পাড়িবার সময়ে রৌপ্যমর্যাদার ফর্দটা ভালো করিয়া পেশ করিতে হইল। কলিকাতায় দ্বিতল বাটী, গ্রামে বৃহৎ বাড়ী, জমীজমা। ব্যাঙ্কে নগদ টাকা। উপরন্তু মেয়েটি একটি মাত্র সন্তান।

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ভালোই হইল। নীরেনের পড়াশুনার সাধটা ইচ্ছামতো পূর্ণ হইবে।

তাঁহারাও ভাবিলেন, ভালোই হইল। রৌপ্যের বদলে যে বংশমর্যাদা পাওয়া গেল তাহাতে সাধারণ মহলে বাহবা এবং হিন্দুয়ানী মহলে সম্মান পাওয়া যাইবে। আর রৌপ্যহীন রূপের সব চাইতে সুবিধা এই, যে নানা কারণেও শঙ্কিত হইবার কারণ সহজে ঘটে না। খুশীমত যখন তখন মেয়েকে ঘরে আনা চলিবে। ঘর জামাইয়ের মতো সমস্ত মন্ত্রণা দেওয়াও চলিবে; অথচ ঘরে কিছু সম্বল আছে বলিয়া তার কলঙ্ক ঘুচিবে।

আদরিণী একমাত্র কন্যার পক্ষে এমন পাত্র দুর্লভ।

কেবলমাত্র এই বিবাহে একটু আপত্তি জানাইয়াছিল সাবেককালের গোমস্তা হরিচরণ। একটু মাথা চুলকাইয়া একটু খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলিয়াছিল,—মা কাজটা কি ঠিক হোল?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়াছিলেন—বাছা কোনো ভয় কোরোনা। আমার নীরেন সে ছেলেই নয়।

রাজলক্ষ্মীর মনে মনে নিজের ভালোবাসার সম্বন্ধে একটা অহঙ্কার ছিল। বিশ্বসংসারের সমস্ত সম্পদ সমস্ত ভালোবাসার চেয়ে নীরেনের কাছে সেইটি বড়ো বলিয়া জানিতেন।

তাই হরিচরণের শঙ্কার কারণটা ধরিতে পারিয়া তাঁর ভারি হাসি পাইয়াছিল।

* * * *

অন্তরে অন্তরে একটা প্রবল আগ্রহ রাজলক্ষ্মীকে বেদনাসমুদ্রের মধ্যে কাঁপাইয়া তুলিত। তাই তাঁহাকে আপনা আপনি বলিতে হইত, আমি কঠিন হইব। কিন্তু কঠিন হইতে পারিতেন না বলিয়াই সময়ে অসময়ে সৌদামিনীকে ডাকিয়া ডাকিয়া কহিতেন—

আমি তাকে ডাক্‌চিনে, কখনই ডাক্‌চিনে এ তুই দেখিস্ সদু।

রাজলক্ষ্মীর বেদনাটা কোথায় সৌদামিনী তাহা জানিত, বলিত—

তোমার একটি ডাকের জন্য তিনি অপেক্ষা করে আছেন, ঠাকুমা।

—না কখনোই না—এ হ'তে পারে না।

অকস্মাৎ তাঁর দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিত, কণ্ঠ বেদনার ভারে কাঁপিয়া বুঁজিয়া আসিত।

সেদিন মধ্যরাতে হঠাৎ কান্নার একটা করুণ শব্দে রাজলক্ষ্মীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি করুণ। অন্ধকার রাত্রির অ[illegible]ণ্ড নিঃস্তব্ধতাকে সে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া তুলিল।

অকারণে তিনি বিছানার [illegible] উঠিয়া ব[illegible]লেন। সেই করুণ শব্দ তীব্রতর হইয়া কয়েক মুহূর্ত পরে একেবারে থামিয়া গেল। উঠিয়া [illegible] হাতে ঘরের আগলটা খুলিলেন। থমথমে অন্ধকার রাত্রি, প্রদীপের আলোতে ভালো ক[illegible]য়া কিছু চোখে পড়ে না। খানিক কাটিয়া গেল খোঁজাখুঁজি করিতে। ডোবার ধারের বাঁশঝাড়টার আড়ালে যেন কী দাঁড়াইয়া আছে। সেই চতুষ্পদ জন্তুটা তাঁহার উপস্থিতি জানিতে পারিয়া তাঁহারই সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া পালাইল। জন্তুটা শৃগাল জাতীয়। আলোটা তুলিয়া দেখিলেন—অন্ধকার রাতে বাঁশঝোপের আড়ালে একটা বিড়ালছানা ঘাড় গুঁজিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে। রক্তের দাগ ঘাড়ে। মাটিতে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

রাজলক্ষ্মীর মনে হইল সমস্ত জগৎ তাহার একান্ত নির্ভর মায়ের কোলখানি হারাইয়াছে, তাই একদিক দিয়া তার করুণ কান্না আর একদিক দিয়া মায়ের নীরব বেদনায় সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

ভালো করিয়া এক্‌লা চলিবার ফিরিবার মতো শক্তি ছিলনা, হয়তো কেমন করিয়া মায়ের কোলছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল, তাই পৃথিবীর আলো হাওয়া গ্রহণের আনন্দ দুদিনেই চুকিয়া গেল। কিন্তু এই চুকিয়া যাওয়াটাকে তিনি কিছুতেই মনের মধ্যে সহজে লইতে পারিলেন না।

ফিরিয়া আসিয়া সৌদামিনীকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ডাকিলেন—সদু ওঠ্‌।

এমনি করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া সদু অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল, কহিল—কী হয়েছে ঠাকুমা ?

—কিছু না, ভোরে কল্‌কাতা যাব।

একটা ভাড়াগাড়ী করিয়া রাজলক্ষ্মী যখন কলিকাতার কোনো গলির একটা বাড়ীর সম্মুখে নামিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। পাশেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আকাশের কোণে এক টুকরা মেঘ তাহারি উপর সূর্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। ক্লান্ত রাজলক্ষ্মীর মুখের উপর সেই মেঘে-মেশা অস্তমিত শেষ আলোর রেখাটুকু পড়িয়া তাঁহাকে আরও ক্লান্ত করিয়া তুলিল।

রোয়াকে যে বৃদ্ধ বসিয়াছিল সে বাড়ীর গোমস্তা। আশ্চর্য হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—

আপনি। কিন্তু তেনারা যে হাওয়া খেতে গেছেন। সে আজ সাতদিনের কথা। জামাইবাবুও গেছেন তেনাদের সঙ্গে।

রাজলক্ষ্মী ফিরিলেন দেশে। সমস্ত আছে অথচ কী নাই। সেই একটা কী না থাকায় সব নিঃস্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সে দিনটা চৈত্রের শেষ সন্ধ্যা। দেখিতে দেখিতে কালো হইয়া গেল আকাশটা। হু হু করিয়া ফুঁসিয়া ফুলিয়া গর্জিয়া উঠিল যেন ক্ষ্যাপা। তারপরে এলো ঝড়। সে কী ভয়ঙ্কর। রাস্তার ধারের জীর্ণ অশথ গাছটা হুড়মুড় শব্দে শিকড়াইশুদ্ধ পড়িয়া ঘুচাইল আপনার জীর্ণত্বের লজ্জা। রান্নাঘরের চালটা উড়িয়া পড়িল গোয়াল ঘরের পাশে।

অন্ধকার ঘরে পিসিমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে নীরেন। আপনার সমস্ত দেহখানাকে পিসিমার মধ্যে মিলাইয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে। রাজলক্ষ্মী স্পষ্ট দেখিলেন; সেই ষোল বৎসর পূর্বেকার ঝড়ে ছয় বৎসরের বালকের দিগন্তপ্রসারী বিপুল শঙ্কা আর ব্যাকুল নির্ভরতা। তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরেনের সেই থরথর কাঁপিয়া ওঠা।

আর একদিনের কথা। বর্ষাকালের রাত্রি। ঝম্‌ঝম্‌ ঝিম্‌ঝিম্‌ বর্ষণের বিরাম নাই। নীরেন ভিজিয়া ভিজিয়া ফিরিল বাড়ী। পরদিন—বেদনায় ভাঙিয়া পড়িতেছে সব, জবাফুলের আভা ভরিয়া উঠিয়াছে দুই চোখে, সমস্ত দেহ জ্বলিতেছে উত্তাপে। সেই নিদ্রাহীন বিপুল শঙ্কার রাত্রি, পীড়িতের মুখের' পরে ফেলিয়া রাখা নিমেষহীন দুই চক্ষু, অকারণ মৃত্যু-শঙ্কার ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ভিড় করিয়া বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিল।

আশঙ্কা, উৎকণ্ঠায় ভরা জীবনের উষ্ণদিনগুলি।

—মানুষের জীবনলীলা ব্যাপারটা এত বড় নিস্তরঙ্গ হইয়া যে এমন ভয়াবহ হইতে পারে রাজলক্ষ্মী তাহা কোনোদিনো কল্পনা করেন নাই। মৃত্যুর শীতল কঠিন স্পর্শটা এমনি নিবিড়তর করিয়াই স্পর্শ করিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরে ফের মোটঘাট বাঁধা হইল। বিশেষ কিছু নয়—দু'টো বিছানা, গোটা দুই ছোট পেঁটরা আর একটা থলি মাত্র।

সৌদামিনী বলিয়াছিল,

—কাজ করতে এসেছিলুম তোমার ঘরে সেকথা কবে ভুলে গেছি। এখন জানি তোমার কাছে না থাকলে আমার চলবে না।

তাই সৌদামিনীও চলিতেছে সঙ্গে। ছড়ান জিনিষপত্র বাসনকোসনের স্তূপের প্রতি চাহিয়া সদু কহিল,

—ঠাকুমা, কিছু নিয়ে যাই।

তিনি কেবল বলিলেন—না থাক্।

রাজলক্ষ্মী যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে কাশীবাস করিতে চলিলেন এ বিষয়ে কাহারো লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। পাড়া ভাঙিয়া একেবারে তাঁর উঠানে আসিয়া জড়ো হইল। এমন কি ছোট্ট হ্যাড়াটাও।

—সে বলিল—দিদিমা কাশীর পেয়ারা খুব বড়ো, নয়?

দিদিমা বলিলেন—হাঁ।

পুঁটির মা কহিলেন—যাই বলো দিদি, ঠাকুর তোমার ভালো করেচেন। সব মায়া কাটিয়ে তোমাকে কাছে টেনে নিলেন।

তিনি চুপ করিয়া নীরবে অল্প একটু হাসিলেন।

তারপরে আসিল বিদায়ের পালা। সকলেরই চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

সুখে দুঃখে, বিপদ আপদে, ভালো মন্দ, নিন্দা-স্তুতিতে এই যে ত্রিংশ বছর কাটাইয়াছেন ইহাদের সঙ্গে সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। কত আনন্দের, কত দুঃখের কাহিনীর সঙ্গে ইহারা জড়িত।

সেই যে আট বৎসর বয়সে বধূ সাজে পৌছিয়াছিলেন সলজ্জ চরণে, সেই রঙীন্ দিনগুলি; ষোল বৎসর বয়সের অকাল দুর্যোগের দিন, তাঁর বধূসজ্জা খুলিবার। নীরেনের কল্যাণকামনায় উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল শুভ্র দিনগুলি; তাহার বিবাহের আনন্দ, বিদায়ের বেদনার সঙ্গী এই প্রতিবেশী, এই বহু পুরাতন ভিটা সমস্ত আজ বিদায়কালে যেন কী এক মায়ায় মোহময় হইয়া উঠিল।

হারুর মাকে ডাকিয়া কহিলেন,—

—সেদিন গাল দিয়েচি হারুর মা, রাগ করিস্‌নে যেন।

হারুর মা কাঁদিয়া উঠিল,

সে কবে দিয়েচো মা, কবে ভুলে গেছি।

* * * *

ইহার পরে কিছু সময় কাটিয়া গেছে, বছর তিনেকের মতো। রাজলক্ষ্মী এখনো কাশীবাস সারিয়া ফেরেন নাই।

হয়তো দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে গিয়া বহুকাল পূর্বের ভুলিয়াযাওয়া যৌবনকালের একটি দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়। সেই যে, সখীদের সঙ্গে জল ভরিতে গিয়া পুষ্করিণীর জলে পা ডুবাইয়া আলাপ করা, জল ছিটাইয়া অকারণে খিল্ খিল্ হাসিয়া ওঠা, সেই পুষ্করিণীর মুখরতীর বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে অস্তমিত সূর্যের রাঙা আলোর ঝিকিমিকি, সেই ঘোম্‌টা টানিয়া বাঁকা পথে ঘরে ফেরা; চকিতের মতো ছবি আঁকিয়া চলিয়া যায়।

সব চাইতে বড়ো কথা এই যে বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালিতে গিয়া মনে হয়—যেন একটি চিরপরিচিত পদশব্দ সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁর কোলের কাছে আসিয়া পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে। তার অস্পষ্ট ধ্বনিটি দূরান্তের সঙ্গীতের গুঞ্জনের মতো, যেন অহর্নিশি কান পাতিয়া আছেন।

নীরেন পরম সমাদরে আছে শ্বশ্র গৃহে শ্বাশুড়ীর কাছে সে এম্‌নি কোমল এম্‌নি নম্র হইয়া ধরা দিয়াছে যে ভারি ভালো লাগিয়া গেছে। নীরেন যখন তাঁর কাছে কোনো আব্‌দার করে, তখন দাসীদের ডাকিয়া হাসিয়া বলেন,

—দেখেছ বাছারা—আমার নীরেনে[illegible]কারখানা। আহা—এতকাল তো মায়ের স্নেহ পায় নাই।

ভাবখানা এম্‌নি যেন এখনি পাইয়াছে।

যখন নীরেন অহেতুক অকারণ দাসদাসীদের বখশীশ্‌ করিয়া বসে তখন তাহারা খুসী হইয়া গৃহিণীর কাছে জামাইবাবুর বদান্যতার উল্লেখ করিলে তিনি হাসিয়া বলেন—হবেনা, কতোবড়ো বংশের ছেলে।

তাহার পরে যে গল্পটা ফাঁদিয়া বসেন তাহা এই যে, নীরেনের ঠাকুর্দার পিতামহের আমলে যখন ঘরে ঐশ্বর্যের পূর্ণ জোয়ার, মস্ত রাজপ্রাসাদের মতো চক্‌মিলান প্রসাদে দাসদাসী, আশ্রিত আত্মীয়ে গম্‌গম্‌, তখন তাহারা বখ্‌শীশ্‌ করিত তাল তাল সোনার দলা। তখন তাহাদের পাথরে বাঁধানো ঘাটের দীঘিতে থই থই করিত জল, সোনারূপোর কাজকরা নৌকায় চড়িয়া যখন বাবুরা জলবিহার করিতেন, তখন দাঁড়ের রূপার নূপুর বাজিতে থাকিত রিণ্‌ঝিন্‌।

দাসীরা আশ্চর্য হইয়া এতোবড়ো চোখ করিয়া কল্পনা করিতে চেষ্টা করিত, হয়তো জন্মান্তরে সেই বংশের দাসী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

—আবার যখন কোনো কাজে নীরেনের কিছুমাত্র কৃপণতা ধরা পড়িত তখনো খুসী হইয়া ওঠেন,—

এই তো চাই। জমীদারের জামায়ের কড়া না হইলে চলে কি? আমার নীরেনের হাতে এই সম্পত্তি বাড়িবে বই কমিবে না।

তবু মধ্যে মধ্যে নীরেনকে যেন উন্মনা করিয়া তোলে। মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া লীলা দেখে, জানালার গরাদে ধরিয়া নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের পানে দুই চোখ মেলিয়া দিয়া নীরেন স্তব্ধ হইয়া আছে।

ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরীর গন্ধবিকশিত জ্যোৎস্না রাতে যে যুবক সুন্দরী স্ত্রীর পানে পিছন ফিরিয়া দূর আকাশে চোখ মেলিয়া আছে, তাহার মনটা কোন্‌খানে ধরিতে না পারিয়া অকারণ সন্দেহে লীলার সমস্ত লাবণ্য কঠিন কুঞ্চিত হইয়া আসে।

হঠাৎ এই সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ দেখা দিল। দীর্ঘদিনের দুরারোগ্য রোগ ঘটিবার পূর্বে যেমন একটু একটু করিয়া লক্ষণ দেখা দেয়—এও ঠিক্ তেম্‌নি। আঠারো বৎসর পরে লীলার জননী সন্তান-সম্ভাবনায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। লীলার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। এ যে কী করিয়া হইতে পারে সে ভাবিয়া পায় না।

নীরেন মনে মনে নিশ্চিন্ত আছে। নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেই ক্ষুদ্র মানবকটি মাতৃগর্ভেই প্রথম ও শেষ নিঃশ্বাসের জন্য বৃথা চেষ্টা করিবে। যদি বা কোনোক্রমে পৃথিবীর আলো হাওয়া ভাগ্যে জুটিয়া যায়—সেও স্বল্পকালের জন্য।

হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে [illegible] পরমাশ্চর্য মহা[illegible]জ্ঞ সাধু বাবাটী খড়ি পাতিয়া বসিয়া আছেন; সকলের শুভ অশুভের সঙ্গে যাঁর আন্তরিক [illegible] কিছুদিন পূর্বে নীরেন তাঁর কাছে হাত দেখাইয়াছে। নীরেনের ভাগ্যগগনে শুভগ্রহের শুভ[illegible] মধ্যাহ্ন তপনের মতো। ফলে কেবলমাত্র সম্পত্তি নহে ঐশ্বর্যলাভ, সেই সঙ্গে বৃহৎ ভালোবাসা। কাজে কাজেই শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর গর্ভধারণের মধ্যে যদি কিছু থাকে তবে সেটুকু নিশ্চয়ই মধ্যখান হইতে তার দর বাড়াইবার জন্য।

কিন্তু ঘটিবার কালে ঘটিল অন্য। যথাসময়ে আশাতিরিক্ত করিয়া পড়িল হুলুধ্বনি, শাঁখ বাজিল বহুবার। রাত্রে লীলা বালিশের এককোণে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কালে কালে দেখা গেল সুস্থ সবল সুন্দর ছেলেটির আশু মৃত্যুসম্ভাবনার কোনো লক্ষণই নাই।

ইহার পরে অত্যন্ত সমাদরের ভরা বোঝাটা কমিতে কমিতে ফাঁকা ঠেকিয়া গেল।

সেদিন একজন বন্ধুর ব্যবসায়ে ফেল পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া নীরেন কহিল,

—ভয় নেই, আমি কিছু টাকা দেব।

টাকাটা শ' তিনেকের মতো। শ্বাশুড়ী শুনিয়া ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হইলেন। ভয়ানকভাবে মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—যেমন ঘরের ছেলে বাছা, হাতটা তেমনি কোরো। আমার খোকার ধন নষ্ট কোরনা।

নীরেন যেন নাড়া খাইয়া জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নের ঘোরটা কাটিলেও অভ্যাসের ঘোরটা কাটে নাই। আজ জাগিয়া উঠিয়া সহসা আবিষ্কার করিল, এ গৃহের কোথাও তাহার ঠাঁই নাই।

সেদিনটা শরৎকালের প্রভাত। সোনালী আলো তন্দ্রাভাঙা সকালের মুখে পড়িয়া ঝিলিমিলি করিতেছে। যেন রূপকথার রাজকন্যার মুখে যুগ যুগান্তরের পর সোনার কাঠির পরশ লাগিয়াছে।

বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রণাম সারিয়া কাশীর গলির একপ্রান্তে বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন রাজলক্ষ্মী। হাতে তাঁর কমণ্ডলু, পরণে তসরের থান। ভিজা চুল হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা। স্নানশেষের নির্মল দীপ্তি।

এম্‌নি সময় কে একজন তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—পিসিমা। রাজলক্ষ্মী চমকিয়া উঠিলেন।

যে আসিয়াছিল সে তেম্‌নিই পড়িয়া রহিল, পায়ের উপর মুখ রাখিয়াই কহিল,

—আমি তোমাকে নিতে এসেছি পিসিমা। রাজলক্ষ্মী দুইহাতে নীরেনের চিবুক ধরিয়া তুলিলেন, আর বাধা মানিল না, দুই চোখ ভাঙিয়া জল ঝরঝর ঝরিতে লাগিল।

* * * *

ষ্টেশনে লোক ওঠানামার বিরাম নাই। মালপত্র ওঠানামার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ। নানা মানুষের নানা ব্যস্ততা, গুঞ্জন, ফিরিওয়ালার ডাক, এঞ্জিনের ধুঁয়া, চাকার ঝক্‌ঝক্ সমস্ত মিলিয়া সে এক বিরাট কলরব। প্রশান্তি ভাঙিবার এই মহৎ ব্যাপারের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আজ কোনো বিরক্তি নাই। কোনো ক্ষোভ নাই। [illegible]মেশা এমনি একটা ঔদাসীন্যে তিনি সকলের প্রতি চাহিয়া আছেন। শিশুর কলরব যেমন মায়ের কাছে কেবলমাত্র কলরব নয়, তাহা অনির্বচনীয়, তাহা সঙ্গীত; এও তেম্‌নি।

বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। কী তার রঙ। কী তার দীপ্তি। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে কোথাও বাধা নাই।

হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—

বিশ্বনাথ এই তো আমি ফিরিয়া পাইলাম; এই তোমার কোলের কাছে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফের প্রতিবেশীরা জড়ো হইয়াছে। চাটুজ্যে তামাক টানিয়া আনন্দে হাসিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন,

—কী ফিরলে বড়গিন্নী। ছোটগিন্নী বল্‌ছিলো; সব ছেড়েচে যে সে ফিরবেনা কখনো।

পুঁটির মা লজ্জা পাইয়া কহিলেন,

—সব মায়া কাটিয়ে আবার এ-কী করলে দিদি।

প্রশান্ত সহাস্যে তিনি কহিলেন—পারি কৈ।

ন্যাড়া দিদিমার আঁচল চাপিয়া চুপ করিয়া তাকাইয়া আছে।

তাহাকে হাসিয়া বলিলেন,—তোর জন্যে পেয়ারা এনেচি। হরিচরণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,

—ফিরে এলে, মা, ফিরে এলে, এসো দাদা এসো তোমার ধন তুমি নাও, এবারে আমার ছুটি।

গৃহদেবতার সম্মুখে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন বিশ্বের সমস্ত লজ্জা হইতে আপনাকে ঢাকিবার জন্য একজন পায়ে মুখ লুকাইল। রাজলক্ষ্মী ক্ষমাসুন্দর দীপ্তচোখে দুইহাতে বধূর মুখখানি বুকে টানিয়া লইলেন।

শেষস্বপ্ন

মৃণালকান্তি দাশ

নিরুত্তাপ বর্ণহীন মুহূর্তেরা আসে আর যায়,
ফিরে ফিরে আসে শুধু রক্ত[illegible]ীত সময়ের স্রোত।
বাসনার বিহগেরে ডেকে [illegible]য় দীর্ঘ ছায়াপথ।
উধাও আনন্দ হাসি অন্ধ [illegible] অদৃশ্য ধারায়।
দিগন্তে ধূসর ছায়া, সম্মুখেতে কঠিন পাথার।
দিবারাত্রি রিক্তক্ষণ তারা শুধু ফিরে ফিরে আসে,
ঈশ্বরের অট্টহাসি হেরি নিত্য উদ্ধত আকাশে,
অন্ধকারে দেই তবু দ্বারে দ্বারে হানা বারবার।
এখন ভরসা শুধু দেবত্বের অপার মহিমা :
দেখা দেবে কবে সেই মায়ারাত্রি স্বপন-বিবশা,
অকস্মাৎ মানুষেরা ভুলে যাবে পৃথিবীর ভাষা—
কোথা সবে চলে যাব দূরে রেখে এ মাটির সীমা।
সেই দিন কতো দূর আজ তাই কেবল ভরসা,
সে আশ্চর্য্য স্বর্গরাজ্য দেখা দিবে কখন সহসা !

রাশিয়ার রূপান্তর

মহেন্দ্র নাথ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ার অভ্যুন্নতি।

[গত মে (১৯৩৯) মাসে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ অধিবেশন শেষ হ'য়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপূর্ণতা সাধন কোরে, রাশিয়া যে গৌ[illegible] অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে গেছে, কমরেড ষ্টালিন তাঁর অভিভাষণে প্রাঞ্জল [illegible]ষায় তা' বর্ণনা কোরেছেন। তা' ছাড়া কমরেড মলোটভ যে রিপোর্ট দাখিল কোরেছেন, তাতেও রাশিয়ার আভ্যন্তরিক উৎকর্ষের যথেষ্ট পরিচয় পাই। রাশিয়ার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কি এবং কি ভাবে তাকে সফল কোরে' তোলা যাবে, তার আভাষ তিনি আমাদের দিয়েছেন। কমরেড ষ্টালিন-এর অভিভাষণ এবং কমরেড মলোটভ-এর রিপোর্টের আলোচনা কোরেই প্রবন্ধটী লিখিত হ'লো, এতে রাশিয়ার আভ্যন্তরিক বিধি ব্যবস্থা, তার গৌরবময় অভ্যুন্নতি, তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে উৎসুক জনসাধারণ অনেক কিছুই জানতে পারবেন—এ' আশাই আমি কোরি। —লেখক]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯২৮—১৯৩২) রাশিয়ার জাতীয় জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে যে নবযুগের সূত্রপাত হ'য়েছিলো, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৩৩—১৯৩৭) তার গতি আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রাশিয়াকে যে অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে, তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হ'য়। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে লেনিন রাশিয়ার কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর সহযোগীদের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন কোরেছিলেন, সে আদর্শকে রাশিয়ায় পরিপূর্ণ ভাবেই রূপায়িত করা হ'য়েছে—এ কথা বোলতে আশা করি অতিশয়োক্তি হ'বেনা। ইহা কারও অজানা নয় যে, সোস্যালিজম্-ই রাশিয়ার চরম লক্ষ্য নয়—রাশিয়ার লক্ষ্য কমিউনিজম্ বা ধনসাম্যবাদ। কিন্তু আজও রাশিয়া তার সাধনার সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নি। ষ্ট্যালিন তাঁর অভিভাষণে বোলেছেন: The first phase of communism—socialism, has been essentially realised, তা ছাড়া ষ্টালিনের "Victory of socialism In Russia" নামক বইয়েও তিনি এ' কথা স্বীকার করেছেন। তবে দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ায় যে অসাধ্য সাধন করা হ'য়েছে তার তুলনা নেই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম কর্মনীতি ছিলো—শ্রেণী বৈষম্যের সমাধান। এই

নীতি পরিপূর্ণ ভাবেই কার্যে পরিণত করা হ'য়েছে। প্রবন্ধান্তরে তার আলোচনা কোরেছি। *

শ্রেণীবৈষম্যের ধূয়া তুলে যে পরগাছাশ্রেণী অন্যের রক্তজল করা শ্রমের ফলটুকু আরামের সাথে ভোগ করে আসছিলো, জাতীয় জীবনের সে সব সুবিধাবাদী ধুরন্ধরদিগকে রাশিয়া হ'তে নিশ্চিহ্ন কোরে দেয়া হ'য়েছে, অর্থাৎ "who will not work, neither shall he eat" লেনিনের এই মন্ত্রবাণী সেখানে কার্যকরী হ'য়েছে। শোষিত এবং শোষক বোলে সেখানে কোনো শ্রেণী নেই। সকলেই সেখানে সমান। যে' সকল যুক্তিহীন অজুহাতের উপর নির্ভর কোরে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ কোরত, সে সমস্ত অজুহাতের মূলচ্ছেদ করা হ'য়েছে। শ্রেণী বৈষম্যের এই সমাধানই ছিলো—রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক [illegible]বের সব চেয়ে কঠিন কর্মনীতি। কিন্তু তার সমাধানও সেখানে সম্ভব হ'য়েছে। দশ বছর আগে [illegible]ভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক, শ্রমবায়ীকৃষক এবং অফিস কর্মচারীর সংখ্যা ছিলো শতকরা ৭২ জন। সে সময়ে এক তৃতীয়াংশ লোক ছিলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক এবং তাদের মাঝে শতকরা ৫ জন ছিলো শোষক (Exploiters), কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবসানে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকরাষ্ট্রে শতকরা ৯৪ জনই শ্রমিক, কৃষক এবং অফিস কর্মচারী। শতকরা বাকী ৬ জন হ'লো সাধারণ সমবায় নীতির বহির্ভূত। এতেই বোঝা যায় রাশিয়ায় শোষক শ্রেণী বোলে কোনো শ্রেণী আজ আর নেই। সকলেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেবক—তার কল্যাণ-ব্রতই তার জীবনের সাধনা। মলোটভ তাঁর রিপোর্ট-এ বোলেছেন :

The exploiting elements were eliminated and disappeared from the face of our earth. তিনি আরও বোলেছেন—Socialist society in the U. S. S. R is composed at the present time of two classes on friendly terms with one another of workers and peasants. The overwhelming majority of the toilers in the U. S. S. R. are active and conscious builders of the classless socialist society.

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সোস্যালিজম্ এর বিজয় সেখানকার জনগণের মাঝে আভ্যন্তরিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক একতা সাধন কোরেছে—যা' অদ্যাবধি দুনিয়ার আর কোথাও সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট শক্তি এবং কম্যিউনিষ্ট পার্টির সমবেত সাধনায় যে এই যুগান্তরকারী অভ্যুন্নতি রাশিয়ায় সম্ভব হ'য়েছে, ইহা কারও অজানা নেই। তারা সোভিয়েট'র বিরুদ্ধবাদীদের শক্তিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত কোরেই ক্ষান্ত হয়নি—সেখানকার এই বিজয় এবং অভ্যুন্নতি যাতে অপরাজেয় হয় এবং চিরস্থায়ীত্ব লাভ করে, তার ব্যবস্থাও তারা কোরেছে। ষ্ট্যালিন বোলেছেন :—

"সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শোষক শ্রেণীর অবশিষ্ট অংশ নিশ্চিহ্ন করা হ'য়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিরা আজ শ্রমশীল জনসাধারণে

* রাশিয়ায় শ্রেণী বৈষম্যের সমাধান। জয়শ্রী, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

পরিণত হ'য়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'য়েছে।" (অনুদিত)

রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব যখন সোভিয়েট সরকারের হাতে এলো, তখন সোভিয়েট নেতৃগণ এই সত্য উপলব্ধি কোরতে পারলেন যে, সুবৃহৎ কলকারখানার প্রাচুর্য, বিজ্ঞানসম্মত শিল্প সম্ভারের বিস্তার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রচলন ব্যতীত সোস্যালিজম্-এর শক্তিশালী ভিত্তি নিরাপদ ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ শুধু পাগল হলো, চরকা আর খাদি, খাদি আর চরকা নিয়ে! এরা যে ভারতের পয়ত্রিশ কোটি নরনারীর প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে সমর্থ, এ' কথা আমরা কোনো মতেই বিশ্বাস কোরতে পারি না। বিংশ শতাব্দীর এ' কয়েক দশকের ইতিহাস আলোচনা কোরলে আমরা এ' সিদ্ধান্ত কোরতে পারিনা যে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সুস্পষ্ট ভাবে পরিচালিত হ'তে পারে। যাক্ এ' সমস্ত আলোচনা এখানে না করাই ভালো।

তাই সোভিয়েট সরকার ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুসারে কাজ আরম্ভ করেন। চার বৎসর শেষ হতে না হতেই তাদের আরব্ধ কার্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'লো। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় উৎপাদনের পরিমাণ অসম্ভবরূপে বেড়ে গেলো। লৌহ, কয়লা, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন আশাতীত রূপে সম্ভব হ'ল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে—ট্রাক্টার ও বিমান-পোত-শিল্পে সোভিয়েট সরকার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন কোরলেন। যে রাশিয়া কিছুদিন পূর্বে সমস্ত আধুনিক এবং উন্নত রাষ্ট্রের কাছে ছিলো অপরিচিত, অবজ্ঞেয়, কার্যারম্ভের প্রথম ধাপেই সে সমস্ত জগতের বিস্ফারিত দৃষ্টি আকর্ষণ কোরতে সক্ষম হ'লো।

তারপর ১৯৩৩ সাল হ'তে আরম্ভ হ'লো দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনন্যসাধারণ কার্যাবলী। বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্প-বিভাগের দ্রুত উন্নতি সাধনই ছিলো এই পরিকল্পনার প্রধান কর্মনীতি, এই প্ল্যান অনুসারে কার্য করার ফলে রাশিয়ার সুবৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। রাশিয়ার জাতীয় জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে আরম্ভ হ'লো ক্রমবিবর্ধমান অভ্যুন্নতির চমকপ্রদ ইতিহাস। নিম্নের হিসাব হ'তেই ইহা প্রতিপন্ন হ'বে :

কয়লা :—১৯৩৩ সালে ২ কোটি ১০ লক্ষ টন; ১৯২৮ সালে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টন; ১৯৩৬ সালে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টন এবং ১৯৩৮ সালে প্রায় ১৪½ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন করা হ'য়েছে।

লৌহ :—১৯১৩ সালে ৯২ টন; ১৯৩৭ সালে মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন লৌহ উৎপাদিত হ'য়েছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি :—১৯১৩ সালে ১৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট্ পাওয়ার্স; ১৯২৪ সালে ৫০০ কোটি ৭০ লক্ষ, ১৯৩২ সালে ১৩৫৪ কোটি, ১৯৩৭ সালে ৩৬৩০ কোটি কিলোওয়াট্ পাওয়ার্স বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয়।

পেট্রোলিয়াম ঃ—রাশিয়ার খনিগুলো হতে ১৯১৩ সালে ৯২ লক্ষ টন, ১৯৩৬ সালে ২ কোটি ৯২ লক্ষ টন এবং ১৯৩৮ সালে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টন উৎপাদিত হয়।

মাখন ঃ—১৯৩২ সালে সমগ্র রাশিয়ায় ৭১,৬০০ টন এবং ১৯৩৭ সালে ২০০,০০০ টন মাখন উৎপন্ন হয়।

পনীর ঃ—১৯২৭ সালে ৭,০০০ ডবল হন্দর এবং ১৯৩৭ সালে ৩৪,০০০ ডবল হন্দর উৎপাদিত হয়।

ছোট খাট শিল্পেও রাশিয়া অসাধারণ কর্মকুশলতার পরিচয় প্রদান কোরেছে। ১৯৩২ সালে রাশিয়ায় ৮ কোটি ২০ লক্ষ জোড়া বুট ও জুতা তৈরী হ'য়েছিলো ; ১৯৩৭ সালে হয় মোট ১৮ কোটী জোড়া। বলা বাহুল্য ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় প্রস্তুত জুতার সংখ্যা ছিলো মোটে ৩ কোটী জোড়া। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আমদানী পণ্যের মূল্য হিসেবে রাশিয়ায় উৎপন্ন প্রচুর খাদ্য বিদেশে রপ্তানী কোরতে হ'তো। আজ রাশিয়ার সমস্ত খাদ্য সেখানকার জনগণের জন্যই মজুদ থাকে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ায় শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। কমরেড ষ্টালিন বোলেছেন ঃ—

"আর্থিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গত পাঁচ বৎসরে সোভিয়েট রাশিয়ায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। পুরাণো কল অথবা চাষ আবাদের সেকেলে ব্যবস্থার কোনো চিহ্নই বর্তমানে রাশিয়ায় নেই। শিল্প ও কৃষিতে সম্পূর্ণ আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে।" (অনুদিত)

রাশিয়ার শিল্প সমাজতান্ত্রিক কর্ম-প্রণালী-ব্যবস্থিত ভিত্তিতে পরিচালিত হ'য়ে চরম উন্নতির পথে উন্নীত হ'য়েছে। সমাজতান্ত্রিক কর্ম-প্রণালী-ব্যবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান হ'তেই শিল্পজাত পণ্যের শতকরা ৯৯'৭ অংশ উৎপাদিত হয় ; বাকী ০'৩ অংশ উৎপন্ন করা হয় ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠান হ'তে। রাশিয়ার শিল্প সম্বন্ধে ষ্টালিনের অভিভাষণ পড়লে, এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শিল্পোন্নতিতে রাশিয়া অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহকে পেছনে ফেলে গেছে। ষ্টালিন যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, ১৯১৯ সালে শিল্পের যে পরিমাণ উৎপাদিত হ'য়েছে ১৯৩৪ সালে হয় তার শতকরা ২৩৮'৩ ভাগ ; ১৯৩৫ সালে হয় তার শতকরা ২৯৩'৪ ভাগ ; ১৯৩৬ সালে হয় তার শতকরা ৩৮২'৩ ভাগ ; ১৯৩৭ সালে হয় তার শতকরা ৪২৪ ভাগ ; ১৯৩৮ সালে হয় তার শতকরা ৪৭৭ ভাগ। এতেই বুঝা যায় রাশিয়ার শিল্প ধাপের পর ধাপ কি অসাধারণ অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নিম্নলিখিত রেকর্ড হতেই সোভিয়েট শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান অভ্যুন্নতির ব্যাপার স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'বে। কোন্ দ্রব্য সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদনের কত অংশ সোভিয়েটে উৎপাদিত হয় তার হিসেব দে'য়া গেল।

	১৯৩৬ (শতকরা)	১৯৩৮ (শতকরা)
কয়লা—	২·৯ ...	... ১১·২
লৌহ—	৩·৯ ...	.... ১৯·০
ষ্টীল—	৪·০ ...	... ১৫·৪
বিদ্যুৎ—	১·৯ ...	... ৮·৬
তাম্র—	১·৮ ...	... ৭·৬
এলুমিনিয়াম—	০ ...	... ৯·৯
সুপার ফস্‌ফেট্—	১·০	... ৯·৭

১৯২৯ সালের (ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের অর্থ সঙ্কটের বৎসর) সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপন্ন শিল্প ছিলো সারা দুনিয়ার উৎপাদনের শত ৩·৮ অংশ। ১৯৩২ সালে তা' দাঁড়ালো শতকরা ১১·০; ১৯৩৬ সালে তা' হ'লো শতকরা ১৫·২ অংশ।

সোভিয়েট রাশিয়ার যান্ত্রিক সংস্কার কার্য জাতীয় অর্থনীতির সাথে সমতা রেখে সম্পূর্ণ করা হ'য়েছে। প্রত্যেক বিভাগেই নূতন যন্ত্রপাতির আমদানী করা হ'য়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় নির্মিত কারখানা হ'তে ১৯৩৭ সালের শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৮০ অংশ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে উৎপাদিত ট্রাক্টারের শতকরা ৯০ অংশ উৎপাদিত হ'য়েছে। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলে অর্থাৎ চার বৎসর তিন মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা হ'য়েছে। এবং এই সময়ের মাঝেই রাশিয়ার গৌরবময় শিল্প-সংসদ গড়ে উঠেছে। ১৯৩২ সালের (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর) তুলনায় ১৯৩৭ সালে রাশিয়ার শিল্প উৎপাদনে শতকরা ১২০ অংশ বর্ধিত হ'য়েছে। যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা' বৃদ্ধি হ'বার কথা ছিল ১১৪ অংশ। শ্রম বিভাগে ষ্টেখানভ্ প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করাতেই শ্রমশিল্পে রাশিয়া যুগান্তর আনয়ন করেছে।

যৌথ প্রথা বা সমবায় নীতি অনুসৃত হ'বার পর রাশিয়ার কৃষি বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। সমবায় নীতি প্রবর্তিত হওয়ার—পূর্বে (১৯২৬—১৯২৯) গড়ে বাৎসরিক কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ছিলো শতকরা ১·০ অংশ। সমবায় নীতি প্রবর্তিত হ'বার পর (১৯৩৩—১৯৩৭) তা' ১২·০ অংশ দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৮ সালে রাশিয়ার কৃষি উৎপাদিত পণ্য ছিলো জার্মানীর ৩·৫ গুন; এবং আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের ২/৩ অংশ। বর্তমান বৎসর আমেরিকাকেও পেছনে ফেলতে পারবে বলে রাশিয়া আশা করে। নিম্নের রেকর্ড হ'তে বোঝা যাবে পণ্য উৎপাদনে রাশিয়া, জার্মানী, ইতালী, জাপানের সম্মিলিত পণ্য হ'তেও বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম হোয়েছে।

			উৎপন্ন (মিলিয়ার্ড হিসাবে)
রাশিয়া—১৯৩৭	..	...	১১৫'৫
জার্মানী—১৯২৮	...	...	৬৮'৫
বৃটেন —১৯২৮	...	....	৬৪'২
ফ্রান্স —১৯২৮	...	...	৩৮'২
জাপান—১৯২৫	...	...	২৩'০
ইতালী—১৯৩৭	...	...	১৮'৮

ক'এক বৎসর পূর্বে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যই রাশিয়াকে অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট হাত পাততে হ'তো। শিল্প ও কৃষি বিভাগে রাশিয়ার অসাধারণ উন্নতি বিদেশী আমদানী দিনদিনই কমিয়ে এনেছে। নিম্নের রেকর্ড হ'তে তা' পরিলক্ষিত হ'বে :

	১৯১৩ শতকরা		১৯২৮ শতকরা		১৯৩৫ শতকরা
শ্রম যন্ত্রপাতি—	২১'	...	২১'	...	১'
কৃষি যন্ত্রপাতি—	৪১'	...	১৬'	...	০'
ট্রাক্টার —	১০০'	...	৬৬'	...	০'
মোটরকার —	১০০'	...	৬৯'	...	০'৩
এলুমিনিয়াম —	১০০'	...	১০০'	..	২'
রবার —	১০০'	...	১০০'	...	৬০'
তুলা —	৪৭'	...	৪১'	...	৭'
কাগজ —	৩৯'	...	২৪'	...	০'

উপরের রেকর্ড হ'তে বুঝা যায় ১৯০৫ সালে অর্থাৎ চার বৎসর পূর্বে রাশিয়ায় বিদেশী পণ্যের আমদানী বহুলাংশে কমে গেছে ; এবং ক'একটী পণ্যে রাশিয়া আত্মনির্ভরশীল হ'য়েছে। ১৯৩৫ সালে রাশিয়া তুলা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হ'তে পেরেছে। রাশিয়ার এমন দিন ছিলো—যখন চিনির জন্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর তাকে নির্ভর কোরতে হ'তো। কিন্তু ১৯৩৩ সালের মাঝেই চিনি উৎপাদক দেশ সমূহের মাঝে রাশিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। তারপর ১৯৩৫ সালে চিনি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। রাশিয়াতে ১৯২৭ সালে ১৯ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হ'য়েছিলো। কিন্তু ১৯৩৭ সালেই তার পরিমান দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ টন।

অন্য ছোটো খাটো প্রয়োজনীয় (যেমন মাছ, মাংস প্রভৃতি) দ্রব্যাদির জন্যও রাশিয়াকে বর্তমানে পর মুখাপেক্ষী হ'তে হয় না। এক কথায় রাশিয়া বর্তমানে তার সমগ্র জনসমষ্টির খাদ্য জোগাতে সমর্থ—বর্তমানে সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল।

ভবিষ্যতে রাশিয়াকে কেবলমাত্র কাফি, কোকো এবং এরূপ দু'একটা দ্রব্যের জন্য অন্যান্য

রাষ্ট্রের নিকট হাত পাততে হবে। সুতরাং কোনোদিন যদি অন্যান্য রাষ্ট্র তাদের পণ্য আমদানী বন্ধ করে, তা' হ'লেও রাশিয়ার কোনো ক্ষতি হ'বে না। রাশিয়ার শিল্প সম্পদ সম্বন্ধে Mr. J. Millar (European Travelling Scholarship holder from Sheffield University) বোলেছেন :

"......within the next ganeration the Soviet Union will be as powerful, industrially, as the rest of the world put together."

যে কোনো দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা যে ক্রম-বিবর্ধমান সে বিষয়ে আমাদের এতোটুকু সন্দেহ নেই। সামরিক শক্তিতেও যে সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র হতে অধিকতর শক্তিশালী তার আলোচনা প্রবন্ধান্তরে কোরেছি। *

রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাশিয়া যে বর্তমানে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, এ কথা অস্বীকার কোরবার উপায় নেই। কমরেড স্টালিন ১৯৩৩ সালের রাশিয়ার সাথে ১৯৩৮ সালের রাশিয়ার তুলনা কোরে, সেখানকার আভ্যন্তরিক ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন, নিম্নে তার রেকর্ড দেয়া গেলো।

	১৯৩৩ সাল	১৯৩৮ সাল
জাতীয় আয়—	৪৮৫০ কোটী রুবল......	১০৫০০ কোটী রুবল
মজুর ও কর্মচারীর সংখ্যা—	২২০০০০০০	২৮০০০০০০
" " বেতন—	৩৪৫৯ কোটী রুবল......	৯৬৪২ কোটী ৫০ লক্ষ রুবল
শিল্প কারখানার মজুরদের গড়ে সাংসারিক বাৎসরিক আয়—	১৫১৩ রুবল	৩৪৪৭ রুবল
যৌথ চাষাবাদের নগদ আয়—	৫৬১৬ কোটী ৯০ লক্ষ রুবল	১৪১৮০ কোটী ১০ লক্ষ রুবল (১৯৩৭)

[১ রুবল = ১ টাকা ৮ আনা]

শ্রেণী বৈষম্য সমাধানের চরম সাফল্য সম্বন্ধে লেনিন বোলেছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া হ'তে শোষক আর শোষিতদের মাঝে যে পার্থক্য তা' অপসারিত কোরলেই কম্যিউনিজম্‌এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'বে না; তা' করতে হ'লে "the difference between town and country"রও অপসারণ করতে হ'বে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়েই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে লেনিনের উপদেশ কিয়ৎ পরিমাণে কার্যে পরিণত করা হ'য়েছে। আগেকার অনুন্নত পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অবস্থার উন্নতিমূলক সংস্কার করা হ'য়েছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আলোকিত এবং উন্নত মহলের সমবায়ী কৃষিপ্রথার প্রবর্তন করা হ'য়েছে।

* সামরিক শক্তিতে সোভিয়েট।—অগ্রণী—১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

কমিউনিজম্‌এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তারাও আজ এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ কোরতে কৃতসঙ্কল্প।

কমরেড মলোটভ্‌ তাঁর রিপোর্ট-এ বলেছেন—A real cultural revolution has taken place in the U. S. S. R. during the second Five Year Plan. কমরেড ষ্টালিন ও তাঁর অভিভাষণে বলেছেন—"সংস্কৃতিগত উন্নতির দিক হ'তে গত পাঁচ বৎসরকে সংস্কৃতিগত বিপ্লবের যুগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হ'য়েছে। কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত বিদ্যার্থীর সংখ্যাও বর্ধিত হ'য়েছে। রাশিয়ায় এক নূতন বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর অভ্যুত্থান সম্ভব হ'য়েছে।" প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী শিক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২১'৩ কোটি হ'তে ২৯'৪ কোটীতে দাঁড়িয়েছে। কলেজের ছাত্র সংখ্যাও বর্ধিত হ'য়ে ৫৫০,০০০এ দাঁড়িয়েছে! অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রেও প্রভুত সংস্কার কার্য সম্ভব হ'য়েছে। রাশিয়ার আর একটা কৃতিত্ব হ'লো—সৈন্য বিভাগের নিরক্ষরতা দূর করে তাদের মাঝে শিক্ষার প্রচলন করা। এ ব্যাপারেও সোভিয়েট সরকার সফলকাম হ'য়েছে। রাশিয়ার গৌরব "লাল ফৌজ"এ (Red Army) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হ'য়েছে। অতীতে জারএর আমলের সৈন্য বিভাগে শতকরা পঞ্চাশ জন সৈনিক ছিলো একবারে নিরক্ষর, বলা বাহুল্য "লাল ফৌজ" যখন তার বিংশতম জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন করে, তখন তার মাঝে একটী সৈন্যও অশিক্ষিত ছিল না। "লাল ফৌজ"-এর অধিক সৈন্য সেকেণ্ডারী স্কুলের ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য শেষ করেছে। তা' ছাড়া তাদের অনেকেই প্রবেশিকা এবং কলেজ কোর্স সমাপ্ত করেছে।

ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকে নিয়েই রাষ্ট্র। এদের যে কোনো একজনকে বাদ দিলেও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতা ব্যহত হয়। তেমনি এদের যে কোন একজনের কল্যাণে রাষ্ট্র যদি অমনোযোগী হয়, অবহেলা করে, তা' হলে বুঝতে হবে রাষ্ট্রের কর্ম প্রণালীর মাঝে, তার অনুসৃত নীতির মাঝে গলদ আছে। তা' সর্বসাধারণের অথবা সর্বশ্রেণীর কল্যাণের জন্য নয়। সাথে সাথে রাষ্ট্রের দুর্বলতাও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সে রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি এবং কর্মপ্রণালী জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণের পথে অন্তরায়, যাতে শুধু একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী বা জাতির অচিরস্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়, তা' সার্থক রাষ্ট্র নয়। এবং দুদিন আগে হোক পরে হোক তার পতন অনিবার্য। বিশ্বের অতীত ইতিহাসের ক'এক পাতা আলোচনা করলেই এ উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হ'বে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং হিংসাবৃত্তি যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে তখন একটা প্রতিষ্ঠান অথবা একটা পরিবারকে যেমনি পতনের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা করা যায় না, তেমনি যে রাষ্ট্র স্বার্থলিপ্সু, বিভিন্ন শ্রেণী অথবা বিভিন্ন জাতির প্রতি যার সমান সহানুভূতি নেই, তার পতনের অনিবার্যতাও অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্র পরিচালনায় এই উদারনীতির প্রবর্তন করেছে বলেই রাশিয়া বর্তমান বিশ্বের আদর্শ রাষ্ট্র। জাতিধর্ম সমাজ, শিক্ষা সংস্কৃতি অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকটী নরনারীর কল্যাণের জন্য রাশিয়া সদা-তৎপর। রাশিয়ার কর্ণধার ষ্টালিন হ'তে আরম্ভ করে কারখানার একজন শ্রমিক পর্য্যন্ত এ কথা জানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে নিয়ে যদিও প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্র; তথাপি ব্যক্তি, যত বড় প্রতিভাশালীই হোন না কেন, রাষ্ট্র অথবা প্রতিষ্ঠান হ'তে বড় নয়। জনসমাজই সেখানে বড়, তাদের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্র অথবা প্রতিষ্ঠানের সাধনা।

রাশিয়ার প্রত্যেকটী নর-নারী, এমন কি প্রত্যেকটী দুগ্ধপোষ্য শিশু সুখে শান্তিতে বাস করুক, নব জীবনের আলোর প্রাচুর্যে তাদের জীবন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক, রাশিয়া তাই চায় এবং তার জন্যই রাশিয়ার সাধনা, রাশিয়া তার সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী অনুসরণ করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক আমরা তাই চাই।

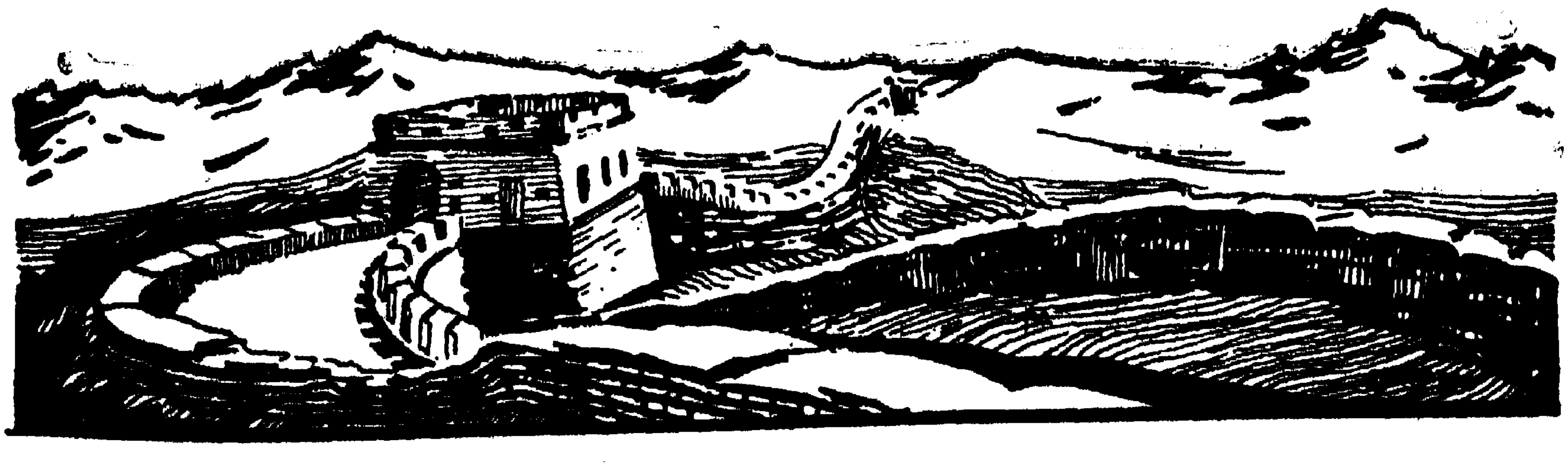

ফ্যাক্টরী গেটের লোকটা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

[সি, এইচ, নিউম্যান-এর 'দি ম্যান অ্যাট দি ফ্যাক্টরী গেট' কবিতার অনুবাদ।]

একটা লোক জার্ম্মানীর হাজতে নির্য্যাতিত হ'চ্ছে।
নিরীহ মানুষ, অপরাধ করেনি কোনো।
এর মতো আরো অনেক লোক আছে অ্যামেরীকার সব কয়েদখানায়,
এর মতো আরো অনেক ঘোরা-ফে... ক'রছে অ্যামেরিকার পথে পথে,
লক্ষ-লক্ষ লোক পথে-...থে মৃত্যু-প্রতীক্ষায়।

এই লোকটাকে চেনো তুমি? গরীব শ্রমজী...র ছেলে,
হ্যামবুর্গের বন্দরে কাজ করতো ডকে;
সৈনিক সেজে যুদ্ধে গিয়েছিলো, অপরাধ ...রেনি কোনো,
জার্ম্মেনীর হাজতে নির্য্যাতিত হ'চ্ছে তবু।

ওরা ওর চোখ উপরিয়েছে। রগ কেটে দিয়েছে শরীরের।
ওরা ইস্পাতের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়েছে ওকে।
ওর পায়ের গোড়ালীর নীচে জলন্ত ম্যাচবাতী ধরেছে—
'বসো। ওঠো। স্বীকার করো। কে সে?
রাইখ্‌ষ্ট্যাগে আগুন ধরিয়ে দিলো কে?
কে?'

আজ খুব ভোরে ফ্যাক্টরীর গেটে লোকটাকে মনে পড়ছে তোমার?
যে-সব ইস্তাহার তোমাকে আর তোমার বন্ধুদের দিয়েছে সেগুলি
স্মরণ করতে পারো?
শ্লোগানগুলি মনে পড়ে কি তোমার:
'মজুরী হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করো। চালাও সংগ্রাম বুভুক্ষার বিরুদ্ধে।
চালাও সংগ্রাম, যুদ্ধ আর ফ্যাসিজম্‌-এর বিরুদ্ধে।
তুমি যা' চাইছো আমরাও তাই।'
এই লোকটাকে মনে ক'রতে পারো?

উঁচু টুপি মাথায় একটা লোক বার্লিনের গারদে মাথা খুঁড়ে' মরলো।
ওর মাথা কুঠারের ডগায় সাংহাইয়ের পথে-পথে।
হাভানা উপসাগরে হাঙরের পেটে পাওয়া গেলো ওর হাত আর পা।
ওর শরীর পুড়িয়ে ফেলা হ'লো অ্যালাবাসার গাছের নীচে।
নাগরীকেরা, ভাগ্য যদি ফেরে এই মোহে, রেখে দিলো ওর আঙ্গুলগুলি

আজ খুব ভোরে ফ্যাক্টরীর গেটে লোকটাকে মনে পড়ছে তোমার ?
মনে আনতে পারো ?
ভালো জুতো বানাতো, গরীব মাছ-ফিরিওয়ালা,
ছিলো অর্গানাইজার সানফ্র্যান্সিস্কোর কোনো শ্রমিকসঙ্ঘের।
কোনো অপরাধ করেনি, নিরপরাধ লোক, ছিলো সাম্যবাদী,
পীড়িত জনগণের নেতা।

ওরা ওর চোখ উপড়িয়ে নিলো।
ওর পায়ের গোড়ালীর নীচে ম্যাচবাতী জ্বালিয়ে ধরলো।
ইস্পাতের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মারলো ওকে।
'বসো। ওঠো। স্বীকার করো। লোকটা কে ?
রাইখ্‌ষ্ট্যাগে আগুন ধরিয়ে দিলো কে ?
কে আগুন নিয়ে খেলা করলো আর ধরিয়ে দিলো অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা ?'

বিয়ে বাড়ী

প্রতুল চন্দ্র ঘোষ

সমস্ত বাড়ীটা আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে, ওখানে মিশিয়া আছে হাসির রেশ, সংবাদ আদান প্রদানের বিনম্র কথোপকথন, ভোজ্য বস্তুর উগ্র রসাল গন্ধ। আপ্যায়নে, অভিবাদনে সকলের চিত্ত উৎফুল্ল। হাসিতে হাসিতে অনেক কঠিন কাজ ভৃত্যদের দ্বারা সুসম্পন্ন করানো হইতেছে। গৃহিণীরাও অর্দ্ধভুক্তাবস্থায় সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়েন নাই। তাহাদের খাওয়ার সময় কোথায়? খাওয়ায়-ই বা কে? দীর্ঘ সাত আট বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া যে-ছেলেটী এই আনন্দোৎসবে গৃহে পদার্পণ করিয়াছে তাহার ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে গৃহিণীরা নিজেরাই উদ্ব্যস্ত। 'আহা-হা, সুপ্রকাশ কতোদিন দেশে আসে নাই...... 'ও মেজবৌ'!—বৃদ্ধা কর্ত্রী ঠাকুরাণী ভাঙ্গা গলায় বলিলেন,—'দু'খানা চিতুই পিঠা কোন ফাঁকে করা যায় না?' ফাঁক্ যে কোন দিক দিয়াই নাই তাহা তিনিও জানেন। এই বিয়ে বাড়ীর শ্রান্তিহীন অনবসরে কে ওই সব হাঙ্গামা পোহায়? 'কোথায় চালের গুঁড়া রে', 'কোথায় শিল্-নোড়া রে',—'না, মা, ওই উয্যুগ্ কল্লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।'—মেজবৌ নিতান্ত অনিচ্ছায় শাশুড়ী ঠাকুরুণকে ঠেকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু, সুপ্রকাশকে নিয়াই সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত নয়। যাহার উপলক্ষ্যে উৎসবের এই আতিশয্য, সে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে পড়িয়া রহিলেও, আরো অনেক অতিথি ও পরিজন এক সঙ্গে ঘনীভূত হইয়াছে। সবাই ব্যস্ত; সবাই-ই প্রফুল্ল। বিবাহ সংক্রান্ত কাজও কম নয়। বরের বাড়ী হইলেও, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি আছে, বর উঠিয়া যাইবার দিন স্ত্রী-আচার এবং জ্ঞাতিভোজন আছে; ফুলশয্যার রাত্রে কন্যাযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি বহু অতিথিদের ভূরিভোজন, হৈ-চৈ ইত্যাদিও যথারীতি সম্পন্ন করিতে হইবে। সব চাইতে মস্ত অসুবিধা বাড়ীটা অত্যন্ত বেমানানভাবে সঙ্কীর্ণ; চলাফেরা করিতে গা'য়ে গা' ঠেকে। কিন্তু ইহার মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া নিতে হইবে।

'ওরে নীলকণ্ঠ, জলের ড্রাম্ দুটো আগেই ভর্ত্তি করে রাখিস্'—গৃহকর্ত্তা ভৃত্যকে হুকুম দিয়া সরিয়া পড়িলেন। মফঃস্বল সহরে জলের ভয়ানক অভাব। রান্নার জল, খাবার জল, এমন কী হাত ধুইবার জল পর্য্যন্ত সমস্তই রাস্তার কল হইতে সময় থাকিতে ধরিয়া রাখিতে হয়। তাহা ছাড়া, মেয়েদের স্নান করিবার জল যে কতো বাল্‌তী লাগিবে, কে আগে তাহা ঠিক করিয়া দেয়? শেষের দিকে যাহারা গা ধুইতে আসেন, তাহারা তো শুধু নমোনমঃ করিয়া শুদ্ধ হইয়া যান্। আর, ছেলেরাও হইয়াছে এমনি, দু'দিন রাজধানী ঘুরিয়া আসিয়াছে তো অমনি পুকুরে স্নান বন্ধ হইয়া গেল। বাথ্ রুম্ না হইলে নাকি স্নানই হয় না! শোন কথা! দুই-দুইটা চাকর শুধু জল টানিতে টানিতেই হিম্‌সিম্ খাইয়া গেল।

বরের ঠাকুরমা ভাঁড়ার ঘরের জিনিসগুলি গোছাইতে গোছাইতে বলিলেন,—'অ বৌ, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব সব যোগাড় হয়েছে...গিলাটা কই...না বাপু কোন জিনিস যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়!'

—'হাতের কাছে যদি সব জিনিস পাবেন, তবে আর বিয়ে বাড়ী হ'লো কী'?—মঞ্জরী শিশুদের প্রথম বৈঠকে খাবার দিতে দিতে বলিল।

পরিবেশন করিতে মঞ্জরী নাকি ওস্তাদ। পাতলা, ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘায়ত দেহ নিয়া মঞ্জরী কালেজিক শিক্ষায় একেবারে ডুবিয়া যায় নাই। সুপ্রকাশ বলে, 'বাংলা দেশের একটীমাত্র মেয়ে শুধু কালচার্ড আছে, সে ওই মঞ্জরী।' কিন্তু সুপ্রকাশের এমনধারা বিশেষণ আরো অনেকের উপর সময় বিশেষে প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

—'ঠাকুরমা, গিলাটা তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। কিছুই আপনি দেখতে পান না কেন?'—হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী 'ঠাকুরমা'কে বলিল। যে-পার্শ্বে ভাঁড়ার ঘর, তাহারই কোল ঘেঁসিয়া যে-বারান্দাটুকু অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে, সেইটাই সর্ব্বসাধারণের ডাইনিং হ'ল। রান্নার ঘরখানি বাহিরের উঠানের পার হইয়া দক্ষিণ কোণে একঘরে হইয়া আছে। টানা-পোড়েন করিতে করিতে মঞ্জরী রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। এক ঝাড় চুল ঘাড় ভাঙিয়া, পিঠ ছাপাইয়া বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। মাথাটা একটু পিছনের দিকে হেলাইয়া চলিলেই চুলের গোছা দিয়া ঘর ঝাট দেওয়া যায়। সুপ্রকাশ বলে,—। কিন্তু সুপ্রকাশের কথা এখন থাকুক্।

—'বাবা! বাচ্চাদের খাওয়ানো যে কী ঝক্‌মারী! খাও, লক্ষ্মী ছেলে তুমি বাদল!... ছিঃ, ভাতগুলো অমন করে ছড়ায় না, ভাতে শাপ দেয়...ও বুড়ি, তুই আবার শীলার মাছখানা তুলে নিলি কেন...? না ঠাকুরমা, আমি পার্ব্বনা এদের সাম্‌লাতে।' বকিতে বকিতে মঞ্জরী কাজ করিতে ভালবাসে।

—'ওরে বাপ! কতো বড়ো মাছ...!' ছেলেরা হুড়মুড় করিয়া খাওয়া ছাড়িয়া মাছ দেখিতে ছুটিল।

গোটা কয়েক সুবৃহৎ কাতলা মাছ উঠানের উপর ধপাস্ করিয়া আনিয়া ফেলা হইল। কুলি দুইটার কপাল দিয়া দরদর্ করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে।

ছোট কর্ত্তা মাছ কুটিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। এক বাল্‌তী ছাই, বড়ো বড়ো দা-বঁটী নিয়া মেয়েরা ও বৌ'রা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মাছ কুটিতে কুটিতে কতো কথা...কে কবে ইহার চাইতেও বড়ো মাছ দেখিয়াছে...কাহার বিয়েতে মাছ কুটিতে গিয়া সে কী কাণ্ড... ইত্যাদি নানা রসাল গল্পে চৌবাচ্চার ধারটা দেখিতে দেখিতে সরগরম্ হইয়া উঠিল।

রাত্রি ন'টায় বিবাহের লগ্ন। এখন পর্য্যন্ত কিছুরই জোগাড় নাই। গিন্নী ঠাকুরুণ শুধু ঘর বাহির করিতে লাগিলেন।

—'চূড়া বৃদ্ধির কাপড় এনেছে...বরকর্ত্তা তো এখনও উপবাসী ; ও'দিকের কাজটা সেরে নিলেই তিনি কিছু মুখে দিতে পার্ত্তেন্...'।

কিন্তু, কে কাহার কথা শোনে? কোন কাজেরই শ্রী-শৃঙ্খলা নাই ; অথচ কোনটাই আটকাইয়া রহিতেছে না। স্ত্রী-আচার একটু পরেই আরম্ভ হইবে...তবে তাহার আগে নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলা দরকার। সুপ্রকাশের কোন কাজ নাই ; শুধু, এখানে ওখানে ঘুরিয়া তদ্বির-তদারকের নামে অযথা কাজের লোকদের সময় নষ্ট করিতেছে।

—'বুঝলে মঞ্জরী,' সুপ্রকাশ মঞ্জরীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাজের আসল জিনিষটাই হ'লো গিয়ে 'ডাইরেক্সন্'...পরিশ্রম অনেকেই করে, করতে জানেও,...কিন্তু 'সিস্টেমেটিক্যালী' কর্ত্তে পার্ল্লে যে কতোখানি সুবিধা হয়...'।

—'হ্যাঁ, বোঝা গেছে আপনার ডাইরেক্সন্,' মঞ্জরী হাসিয়া বলে,—'সামান্য কয়খানা পাতা কেটে রাখবার বন্দোবস্ত করতে পার্ল্লেন না...'।

ততক্ষণে সুপ্রকাশ সরিয়া পড়িয়াছে।

—'অ ঠাকুরমা, বিয়ে বলে কী সামান্য এক পেয়ালা চা-ও খেতে পার্ব্ব না?'...

আঃ, এইবার আমরা বরকে দেখিতে পাইলাম। পেশীবহুল সুদীর্ঘ গৌরকান্তি যুবক। মুখে-চোখে একটা অকৃত্রিম সারল্যে সবাইর নিকট প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই উপযাজক হইয়া দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—এমনি সুশ্রী ও সু-আলাপী সে। বরের নাম হিরণ।

—'চা খাবি কি রে? আজ সারাদিন যে কিছুই খেতে নেই...' ঠাকুরমা সস্নেহে প্রতিবাদ জানাইলেন।—'দেখিস্, আবার যেন কোন হোটেলে গিয়ে না ঢুকিস্।

—'খেলোই বা এক পেয়ালা চা, ঠাকুরমা', আর একটি অনূঢ়া মেয়ে সস্মিত মুখে বলিল; —'এক পেয়ালা চা বৈ ত নয়।...এখন আর সেদিন নেই...বারণ কর্ল্লে হোটেলে গিয়ে ত ঢুকবেই।'

কিন্তু হিরণ আর হোটেলের দিকে পা-ও বাড়াইবে না। ওই বারণই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আচার অমান্য করিবে কেন? একদিন না খাইলে শরীরটা বরং সুস্থই থাকিবে।

সকাল গড়াইয়া দুপুরের দিকে চলিল। একে একে নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বর উঠিয়া যাইবার দিন সাধারণতঃ মহিলারাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ থাকেন।

মাধ্যাহ্নিক গুরুভোজনের পর স্ত্রী-আচার,...তাহার পরই বর গিয়া সজ্জিত মোটর গাড়ীখানায় উঠিবে। বরযাত্রী, নাপিত, পুরুত, চাকর প্রভৃতিরাও প্রসেসনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইবে। মফঃস্বল সহরের প্রসেসন্! তিনটী রাস্তার পুলিশ লাইসেন্স নেওয়া হইয়াছে,...অর্থাৎ, উক্ত তিনটী রাস্তাই ঘুরিয়া বরকে ইতর জনসাধারণকে দর্শন দিয়া যাইতে হইবে। না হইলে, কনের বাড়ী এখান হইতে ঢিল ছুড়িলে নাগাল পাওয়া যায়...অত্যন্ত আস্তে আস্তে হাঁটিলেও পাঁচ

মিনিটের বেশী লাগে না। কিন্তু, বরযাত্রীরা পদব্রজে বিবাহ-আসরে যাইবে। বলুন একবার তাহাদের কাছে এই কথা? হুমকীর চোটে আপনার মাথার চাঁদি না ফাটে ত কী!

—'বাইরের ঘরে একটা ব্যাচ বসাইয়া দেওনা? বেলা যে বারোটা বাজে', আসন বিছাইতে বিছাইতে গৃহকর্ত্তা অন্দরের দিকে হাঁকিয়া বলিলেন।

—'এই যে দিই, আপনি সরুন, আমরাই সব ঠিক করে নিচ্ছি'—তিন-চারিটি মেয়ে কোমরে আঁচল জড়াইয়া, চুড়ি ও চুল টাইট করিয়া পরিবেশন করিতে আসিল।

আসন বিছানো হইল। ধোয়া পাতা, লবণ, জল ঠিক করিয়া রাখা হইল। বেগুন ভাজা, ছ্যাচড়াও তো আগে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। হ্যাঁ, এইবার আসুন আপনারা সবাই। হুড়মুড় করিয়া নিমিষেই ঘরখানি ভরিয়া গেল। অবগুণ্ঠনমুখীরা স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—'এইখানে আর একখানা পাতা পেতে দেখি...আমার ছোট মেয়েটাও এই সঙ্গে বসে যাক্' একজন বর্ষীয়সী মহিলা একপার্শ্বে একটু জায়গা করিয়া নিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

—'সরুন, সরুন...দরজার মুখ থেকে অন্য এক ধারে সরে দাঁড়ান', একটা বড়ো ভারী গামলায় ভাত নিয়া বনছায়া পরিবেশন করিতে আসিল।

বনছায়া সুডৌল সুপরিপুষ্ট শ্যামলা মেয়ে। দেহবিন্যাসে তাহার উপর বিধাতার অহেতুক পক্ষপাতিত্ব প্রথম দর্শনেই ধরা পড়ে। মুখে চোখে গ্রাম্য জড়তা, কিন্তু কী পরিচ্ছন্ন সারল্য! সুপ্রকাশ বলে, 'সমস্ত বাংলা দেশ ঘুরে এতদিনে একটী 'শ্রীমতী' দেখতে পেলাম'। সুপ্রকাশের দৃষ্টি নিয়া আমরাও তুলনা করতে পারি,—'মঞ্জরী যদি হয় ঝর্নার উচ্ছল জলতরঙ্গ, বনছায়া তা'হলে কালো দীঘির শীতল জল বুদ্বুদ'। হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী হয়ত ভাঙিয়া পড়িবে, বনছায়া কিন্তু একটী শব্দও বাহির করিবে না। মরিয়া গেলেও সে হি-হি করিয়া সকলের সামনে হাসিতে পারিবে না। এমনি স্থির, অচঞ্চল সে। কিন্তু যাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না সে ওই মধুমালতী। ডালের বাটী নিয়া সে-ও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধুমালতীর সম্বন্ধে সুপ্রকাশ আজ পর্য্যন্ত কিছুই বলে নাই। কোন প্রকার আধিক্যে বা হ্রস্বত্বে মধুমালতীকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। কোনরূপ বিশেষণে মধুমালতীকে বিশ্লেষণ করিতে গেলেই যেন সে ছোট হইয়া যাইবে।

ধীরে সুস্থে মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপ্ত হইল। আরও কয়েকটা বৈঠক শেষ করিয়া পরিবেশনকারিণীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এইবার তাহারাও দুইটী মুখে দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। কয়েকটা ডে' লাইট ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে...লণ্ঠনও গোটা চারেক তেল ভরিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইল। এইবার স্ত্রী-আচার আরম্ভ করা যাইতে পারে। বরকে ধরিয়া ছাদনাতলায় আনা হইল। স্নানের পর্ব্ব এখানেই সমাধা করিতে হইবে। পান চিবাইতে চিবাইতে ঠান্‌দিদি বৌদিদি স্থানীয়া মহিলারা রঙ্গ কৌতুক

আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাসি ঠাট্টায়, কলগুঞ্জনে কে আর এখন বিশ্বাস করিবে এই বৃহৎ পরিবার আকণ্ঠ দেনায় ডুবুডুবু....শিক্ষিত ছেলেরা বেকার, মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে এই ঘরেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি পরিণত বয়সে ইহাদের সবাইকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এমনি কালের নিষ্ঠুর চক্র,...জীবনের খরস্রোতে এমনিই মানুষ নূতন আবেষ্টনীর নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত্ত এবং তৃপ্ত...।

—'ছিঃ, আজকের শুভদিনে চোখের জল ফেল্‌তে নেই। ওঠো সুপ্রকাশ, ছাখো গিয়ে লাইট কয়টা জ্বালাতে পারো কিনা।'—অন্ধকার ঘরে সুপ্রকাশের চারিদিকে কাহারা যেন ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

—'তাহ'লে সাত-আট বছর পর দেশে ফিরলেন কেন? উঠুন, চটপট কাপড় বদলিয়ে নিন...প্রসেসনের গাড়ী তো এসে গেচে',—মঞ্জরীর গলার মতনই যেন মনে হইল।

উঠিতে হইবে ঠিকই : বিগত স্মৃতির উপলক্ষে শোক পুনরুজ্জাবিত করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান বা সময় নহে। কিন্তু সুপ্রকাশ বিবাহ বাসরের দিকে কিছুতেই পা বাড়াইতে পারিবে না। একমাত্র মৃত্যুর গাঢ় কালিমাই কী সুপ্রকাশের জীবনে অন্ধকার ঘনাইয়া আনিল? কে জানে..? দীর্ঘদিন যে লোক আত্মীয় স্বজন ছাড়া তাহার সম্বন্ধে ত জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না!

—'আচ্ছা, আস্‌ছি আমি', সুপ্রকাশ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

প্রাথমিক স্ত্রী-আচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বর এখন প্রসাধনে ব্যাপৃত। মঞ্জরী--বনছায়া—মধুমালতী এবং আরো কয়েকটী অনূঢ়া মেয়ে বরকে সাজাইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

—'ওই সাদা গরদের পাঞ্জাবীটাই পরে ফেলুন হিরণদা...'

—'তার উপর এই মাদ্রাজী চাদরটা...'

—'বাক্‌স্কীনের চটী জুতা জোড়াটা আবার কোথায় রাখলেন...'

—'বাঃ, একেই বলে স্টাইল!'

সবাই সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হিরণ হাসে, আর নিজের ইচ্ছামত বেশবিন্যাস করে। চুলে 'এন্‌জোরা' মাখিয়া, মুখে 'স্নো'র উপর 'কিউটিকুরা' পাউডারের প্রলেপ ছড়াইয়া বর্ডার দেওয়া রুমালখানায় অনেকখানি 'কোটি' সেন্ট ঢালিয়া হিরণ কুমার দিব্যি ফিটফাট হইয়া নিল।

বনছায়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া মঞ্জরীকে বলিল,—"হিরণদা কিন্তু সত্যিই খুব 'বাবু'...দেখেছিস্ প্রসাধনের ঘটাখানা।"

—"আবার সঙ্গে করে ক্যামেরাও নিয়ে এসেছেন, মনে হয় বিয়ের রাত্রে নিজেই 'অটো ষ্টার্ট' দিয়ে যুগল ফটো তুলে নেবেন" হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী মধুমালতীর গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

হিরণের স্যুটকেসটা খোলা পড়িয়া আছে। একগাদা কাপড়-জামায়, নানাবিধ প্রসাধনের দ্রব্যসম্ভারে...ফটোর এলব্যামে...অর্দ্ধলুক্কায়িত সিগ্রেটের সুদৃশ্য 'কেসে'...আরো কতো কী জিনিষে পেটরাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা কৌতূহল নেত্রে সমস্ত জিনিষ খুঁটানাটি করিয়া

দেখি্যা নিতেছে। মফঃস্বলের মেয়ে আর রাজধানীর সৌখীন বর। অল্প-বিস্তর হিংসা হওয়াও তো অস্বাভাবিক নহে।

ওই কোণের মেয়ে দুইটী অস্ফুটস্বরে আবার কী কথা বলিয়া হাসিতেছে? মধুমালতীর মুখটা মলিন কেন? বিয়ে বাড়ীতে বয়স্কা কুমারীদের দেখিলে কষ্ট হয়। সবাই নিজ নিজ ভাগ্য বিড়ম্বনায় সঙ্কুচিত.. কবে তাহারা পিতামাতার সুখনিদ্রা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে কে একবার বা এই কথাটা মনে মনে চিন্তা করে...?

—'মালতী, তোর নাকি বৈশাখেই?' মধুমালতী হাসে, কিন্তু উত্তর দেয় না।

—'নে হ'লো তোদের? এবার আয় ইদিগে...মঙ্গলঘটে প্রণাম করে সবাইকে প্রণামী দিয়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠ্' গৃহকর্ত্রী আসিয়া হিরণকে টানিয়া নিলেন।

—'কই, কে বর নিতে এসেছে, ..এদিকে আস বাপু যা'র যা প্রণামী এইবেলা মিটিয়ে দাও; নইলে হিরণ তো পিড়ি ছেড়ে উঠবে না।

হ্যাঁ, এইবার 'সামাজিকতার' একটু কিছু আভাষ পাওয়া যাইতে পারে! ঘরের একপার্শ্বে আমরাও স্থান সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

—'মাতৃপ্রণামী পাঁচ টাকা? এ কোন্ দেশী কুটুম্ গো',—কে যেন ঝঙ্কার দিয়া কনেবাড়ীর লোকটীকে নার্ভাস্ করিয়া দিল।

—'খবরদার হিরণ, কখ্খনো ও' পাঁচ টাকা ধরবি না...একমাত্র ছেলে, বিয়ের সময় মা'কে প্রণাম করে যাবে মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়ে...একখানা গিনি বে'র করুন মশাই! বর্ষীয়সী মহিলাটীর বাক্যসুধায় আমরা যৎপরোনাস্তি তৃপ্তি পাইলাম।

বরকে যিনি উঠাইয়া নিতে আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন,—দেখুন, আমাকে যে-রকম বলে দিয়েছেন, আমি তাহাই দিতেছি।......অনুগ্রহ করে ইহাই গ্রহণ করুন.. ...মাতৃপ্রনামী কী আর সোণা-রূপায় নির্দ্ধারিত হয়?

—'রাখুন মশাই আপনার চালাকী, বলুন গিয়ে যে গিনি না দিলে বর কিছুতেই মা'কে প্রণাম করছে না,'—

—মহিলাটি থামিবার পাত্রী নহেন।

—'শুনেছিলুম আপনাদের নাকি কোনরূপ দাবী-দাওয়া নেই......এটা কী—" বলিয়া কনে বাড়ীর লোকটি মনে মনে ভাবে, 'দেখা যাবে কাল ভোরে! শয্যা তুলবার সময় তোমরা ক'টা টাকা দাও'। "একবার বাড়ীতে গিয়া বলুনই না?" মঞ্জরী তাহাকে উৎসাহিত করিয়া পাঠাইয়া দিল কিন্তু দেখা গেল মঞ্জরী-বনছায়া-মধুমালতী এবং অন্যান্য অবিবাহিতা মেয়ে কয়টির চোখে মুখে ভয়ার্ত্ত, অসহায় দৃষ্টি। হাসিতে গিয়া তাহারা সবাই যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বিবাহকালীন অনুরূপ দাবীও নিশ্চয়ই জানানো হইবে; এবং হয়ত নানা রকম ভাবে সবাই বিব্রত হইয়া উঠিবে। কোনরূপ অসামর্থতা তখনও বিবেচিত হইবে না।

—'ঠানদী, ওই পাঁচ টাকা নিয়েই ছেড়ে দিলে পার্তেন'। বনছায়া সেই বর্ষিয়সী মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

—'তোরা থাম বাপু! এ'রকম সব জায়গাতেই হয়......সবাই আবার এনে চাহিদা মিটিয়ে দেয়......আর ত্থাখ হিরণ', কূটরাজনীতিজ্ঞদের মতন তিনি হিরণকে বলিলেন,—'কাসি বিয়ের দিন তোর শ্বাশুড়ী যখন ভাতের থালা নিয়ে আসবে, তখন কিছুতেই যেন ভাতে হাত দিস্ না, যতক্ষণ না তোকে একটা মোটর-বাইকের প্রতিশ্রুতি দেন, বুঝলি'।

বুঝিল বৈ কি! ঘরের হাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিরণ পিড়ির উপর বসিয়া আছে ত আছেই। কনেবাড়ী হইতে গিনি আসিবে, তবেই না মা'কে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে ওঠা সম্ভব হইবে।

প্রসেসনের বাজনা নিরবচ্ছিন্ন স্বরে বাজিয়া চলিয়াছে। বাহিরের ঘরের হট্টগোল কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যেন অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রে এবম্প্রকার আনুষ্ঠানিক মর্য্যাদা এবং আবেদন রক্ষা করা যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

—'উপরে যাবি মঞ্জু, চল ছাদ থেকে বেড়িয়ে আসি'। মধুমালতী মঞ্জরীকে বলিল। মনে হইল, তাহার নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্টবোধ হইতেছে।

—'দাঁড়া না, দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়'? আগ্রহে, কৌতুহলে মঞ্জরী অন্যপার্শ্বে সরিয়া গেল। বনছায়াও কম উৎসুক নহে।

মধুমালতী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায়, সানাইর মিষ্টি সুরে, আনন্দোচ্ছল জনতরঙ্গে গৃহ এবং বাতাস প্লাবিত। ছাদে উঠিয়া মধুমালতী একবার দূরের দিকে চাহিল। 'তারায় ভরা মধুমাসের রাত'...নিকটেই বোধহয় একটা হাস্নুহাজার ঝাড় আছে! কী সুন্দর গন্ধ! মধুমালতী প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস নিল। এখান হইতেই বরের গাড়ীখানা দেখা যাইতেছে; বেশ সাজাইয়াছে কিন্তু উহারা।

হঠাৎ খুট্ করিয়া একটা দিয়াশলাইর কাটি জ্বালিবার আওয়াজে মধুমালতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। "ওঃ, সুপ্রকাশ বাবু তাহ'লে ছাদেই একা একা বেড়াচ্ছেন"। কী হ'লো ভদ্রলোকের? সারাদিন তো দিব্বি হৈ-চৈ রঙ্গ কৌতুক কর্লে'ন্......বরযাত্রী যাবার সময়ই চোখ-মুখ মলিন করে একেবারে শয্যাশায়ী; আচ্ছা সেন্টিমেণ্টাল ত! নাঃ, এবার আস্তে আস্তে সরে পড়াই ভাল"। মধুমালতী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিড়ির দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার আগেই সুপ্রকাশ এই দিকে ফিরিয়া নিয়াছে।

—'এই যে তুমি! নীচে যাওনি যে'? সুপ্রকাশ মধুমালতীর কাছে আসিয়া বলিল।

—'গরম লাগছিল তাই উপরে বেড়াতে এসেছিলাম; এবার নীচে যাচ্ছি।'

—'আচ্ছা এসো। তর্জ্জনী দ্বারা সিগারেটটার উপরে একটা টোকা মারিয়া সুপ্রকাশ সরিয়া দাঁড়াইল।

—'আপনার হঠাৎ মনখারাপ হয়ে গেলো কেনো? সকাল বেলা ত বেশ ছিলেন!' (মধুমালতীর এই সব কথায় দরকার কী? চলিয়া গেলেই ত পারে!)

—'ছিলাম নাকি?' সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল,—'কিন্তু মন-খারাপের ত সময়-অসময় নেই... হঠাৎ আরম্ভ হয়, আবার হঠাৎ-ই মিলিয়ে যায়!'

—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সুপ্রকাশ বাবু, যদি কিছু মনে না করেন।' (মধুমালতী কী নীচে নাবিবে না নাকি? ছাদে দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশের সঙ্গে এমন কী-কথা তোমার থাকিতে পারে বাপু! এখনই যদি কাহারও নজরে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কী-কেলেঙ্কারীটাই না হইবে একবার ভাবুন ত?)

—'স্বচ্ছন্দে! কি কথা জানতে চাও বল?' সুপ্রকাশ নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল।

সানাই-অলা আবেগের সহিত বাজাইয়া চলিয়াছে। পোঁ যিনি ধরিয়াছেন তাহার কী দম বন্ধ হইয়া যায় না? চাঁদের আলো আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। ঠিক যেন একখানা হাল্‌কা রূপার পাতে সমস্ত আকাশটা মোড়া। হাস্নুহানার গন্ধ-ও যেন স্নিগ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। জীবনের মধুমাস কী এখনই নাবিয়া আসিবে? অপেক্ষাকৃত জোরে কথা না বলিলে শুনিবার উপায় নাই। সিড়ির মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধুমালতী বলিল,

—'আপনি বিয়ে করছেন না কেন?

—'এতোক্ষণে একটা হাসির কথা শুনলাম... ...' হাসিতে হাসিতে সুপ্রকাশ বলিল,—'আঃ, এবার আমার মনটাও ভালো হয়ে গেল'।

কিন্তু কৈ, সুপ্রকাশের হাসিতে তেমন স্পন্দন নাই ত?

—'বলুন না, কেন বিয়ে করছেন না? আপনি অবিবাহিত থাকতে হিরণেরই বা বিয়ে হয়ে গেল কেন?'

—'শোন কথা! একের বিয়ে কী কখনও অন্যের জন্য আটকাইয়া থাকে? ধরো, তোমার যদি ভালো সম্বন্ধ না-ই জোটে, তুমি কী মনে করো সন্ধ্যামালতীকেও সেজন্য চিরকুমারী করে রাখা হ'বে?'

মধুমালতী হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল,—'আচ্ছা, সুদক্ষিণা মেয়েটি কে বলুন ত? মঞ্জরী বলছিল, তারই জন্য আপনার এই বৈরাগ্য। সত্যি?'

—'কে জানে কে!'

নাঃ, সুপ্রকাশ বুঝি ধরা পড়িয়া গেল।

—'আমি ত সুদক্ষিণা নামে কাউকেই চিনি না!'

—'মঞ্জরী আরো বলছিল তার নাকি বিয়েও হয়ে গেছে; তবে আর মিছে ওদিকে তাকিয়ে থেকে লাভ কী?'

সুপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পূর্ণিমার চাঁদ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

"The Suppression of the Communist Party, the persecution and arrest of Communists and their sympathisers tear the mask from these blatant upholders and agents of French Capital. Their vows and declarations of loyalty to democratic ideals are nothing but hypocrisy and lies...... The more brazenly and cynically shameless renegades like Blum, Paul Faure, and Jouhaux uphold the measures of the Daladier Government, the government of the new imperialist war; the more lies and slander circulated by the Soviet papers; 'Populaire,' 'Peuple' and the like. the more attentvely do the workers and peasants listen to the voice of the Communists, to their speeches and appeals. The French people no longer believe the horde of kept journalists and politicians with more than doubtful reputation."

এই হোলো ফ্রান্সের অবস্থা। দেশের জনগণকে বলিদান দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করাতে জয় নেই, গৌরবও নেই। এতে শুধু পৃথিবীর কাছে অবিশ্বাসী হোতে হয়।

ভারতবর্ষ

হাইড পার্কে বৃটিশ কম্যুনিষ্টদের সভা বৃটেন পুলিশের সাহায্যে ছত্রভঙ্গ ক'রেছে, কিন্তু উপনিবেশ ভারতবর্ষে বিশেষ আইন জারী ক'রে তাদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষব্যাপী বেশী জুলুম ও অত্যাচার চলেছে সমস্ত বামপন্থীদের উপর, বলা হচ্ছে যে একমাত্র তারা বৃটেন ও ফ্রান্স যে-গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে তার বিরোধী। তার উপর আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ পর্যান্ত ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হোলো না। বিংশ শতাব্দীর গৌতমবুদ্ধ গান্ধীজীও ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দার প্যাটেল "জ্বালাময়ী" ভাষায় বামপন্থীদের শুধু অকথ্য গালাগালিই দিলেন, আসল সমস্যা পড়ে' রইল। গান্ধীজী বললেন যে গণতন্ত্র তিনি চান না, তিনি চান ডিক্টেটরশিপ, নির্বিকারভাবে দেশবাসীরা তাঁর আদেশ পালন করবে, কোন প্রশ্ন করবে না। এ তিনি দাবী করছেন তাঁর প্রেম ও অহিংসার জন্য। এ-দেশ চৈতন্যের দেশ, বুদ্ধের দেশ, জগাই মাধাই 'উদ্ধারিল'র দেশ, অতএব আমরা বিস্মিত হই নি। দক্ষিণপন্থীদের এ-আচরণ ও নীতি নূতন নয়, অভাবিতও নয়। দুঃখ শুধু এই যে বামপন্থীদের ঐক্য নেই, নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি ক'রে, মাথা ফাটিয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে। সস্তা হৃদয়াবেগ নিয়ে জাতির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। ঐক্য, দৃঢ়তা, বিশ্বাস, একাগ্রতা সহিষ্ণুতা, স্থিরবুদ্ধি প্রয়োজন হয় সেজন্য। আজও যদি সে-সময় না এসে থাকে, তা হলে সুবর্ণ সুযোগ কাকে বলে বুঝি না।

১২ই এপ্রিল ১৩৪০
কলিকাতা

গ্রন্থ-পরিচয়

The State in Relation to Labour in India

By V. Shiva Ram, M. A., Ph. D.
Published from the University of Delhi.

বইটী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখক কর্তৃক প্রদত্ত দশটী রিডারশিপ বক্তৃতার সঙ্কলন। বর্তমান রাষ্ট্র কল্পনায় ও আর্থিক কাঠামোয় শ্রমিকের স্থান, laissez faire বা স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবিলয়, শ্রম ও শিল্পসমস্যায় রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধিষ্ণু হস্তক্ষেপ প্রথম দুইটী পরিচ্ছেদে এই সমস্ত বিষয়ের দার্শনিক আলোচনা আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে জার্মাণী, ইটালী ও সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ট্রেড ইউনিয়ন, সিণ্ডিক্যালিজম্ ও গিল্ড-সোসিয়েলিজমের মতবাদ আলোচিত হয়েছে, অবশিষ্ট পাঁচটী পরিচ্ছেদে আছে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন, ফ্যাক্টরী আইন, আই, এল্, ও, চুক্তির প্রয়োগ, শিল্পশান্তি এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগে কল্যাণ প্রচেষ্টা এই সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যার বিশ্লেষণ।

ট্রেড-ইউনিয়ান পন্থীর তরফ থেকে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিল্পপটে শ্রমিক অবস্থা বেশ তথ্যপূর্ণ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বইএর অর্ধাংশ যদিও বৈদেশিক অবস্থার পঠনে ব্যয় হয়েছে [তার মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ডীল স্থান পায় নাই] তবু এ বর্ণনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের মত একটী প্রধান শিল্পকেন্দ্র শ্রমিক সমস্যা সমাধানে পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলির কতখানি পেছনে পড়ে আছে।

কিন্তু অনবধানবশত লেখক কতকগুলি ভুল উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে একমাত্র সোভিয়েট রুষেই আয়ের সমতসাধনের জন্যে পরিবর্তনশীল কর-হার (graduated taxation) প্রচলিত হয়েছে। আয়ের সমতাসাধনের জন্যে সোভিয়েটতন্ত্র করের ওপর নির্ভর করেনি উৎপাদনযন্ত্রে যৌথস্বত্ব স্থাপন করে সরাসরি ধনবন্টন করেছে। লেখক বলেছেন যে 'নাৎসী সমাজতন্ত্রের' মূলনীতি হচ্ছে "শ্রেণীহীন রাষ্ট্র স্থাপনা" (establishment of a classless state)। ভুলক্রমে এও বলা হয়েছে যে বাঙ্গলা সরকার শ্রমিক বিষয়ক সংখ্যা সংগ্রহের জন্যে এবং আইন প্রচলনের পরামর্শ দেবার জন্যে একটী লেবার ইনটেলিজেন্স অফিস প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাঙ্গলা সরকারের একজন লেবার কমিশনার আছেন—কিন্তু উক্ত প্রকার কোন বিভাগ নেই। ফ্যাক্টরী রিপোর্ট, মাইনস্ রিপোর্ট এবং কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিভাগের প্রকাশিত তথ্য থেকে শ্রমিক-মালিক বিবাদ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংখ্যা, তালিকা ইত্যাদি দিয়ে বইটীকে আরো সমৃদ্ধ করা যেত। এদিকে নজর দিলে লেখক এমন একটী আইনের অকাট্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন যা দ্বারা শ্রমিকদের বেতন, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সম্বন্ধে আরো খবরাখবর

পাওয়া যায়—এবং যে খবরগুলি না পেলে লেখকের প্রস্তাবিত প্রগতিশীল আইনগুলি মোটেই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। গত দশ বছরে ভারত সরকার যেটুকু শ্রমিক সংস্কারক আইন পাশ করেছেন লেখকের মতে তার প্রধান কৃতিত্ব ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্‌গ্যানাইজেশন আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও তার পশ্চাদ্বর্তী শক্তিগুলির ক্রিয়া তাঁর চোখে পড়েনি।

এরূপ কয়েকটী ত্রুটীর কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে বইটীতে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা সংক্ষেপে বেশ ব্যাপক ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ভারতে শ্রমিক আইনের শোচনীয় দুরবস্থার জন্যে লেখক যথার্থভাবেই অপরিণত জনমতকে দায়ী করেছেন এবং তিনি ঠিকই বলেছেন, যে যতদিন না শ্রমিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর অধিকতর কর্তৃত্ব বিস্তার করে ততদিন তার দুর্দশার প্রতিকার হবে না। মালিক কেমন কারসাজি করে ফ্যাক্টরী আইনের শাসন এড়িয়ে যায়—সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বহু পাঠকের চমক সৃষ্টি করবে। "ফ্যাক্টরী ইন্‌স্‌পেক্টরের আগমনের সংবাদ যথাসময়ে পাবার উদ্দেশ্যে তারা রেল ষ্টেশনে তাদের বেতনভুকদের রেখে দেয়। যে খবর দিতে পারে সে পুরস্কৃত হয়। তারা জাল খাতা রাখে এবং যদি বা একজন ইন্‌স্‌পেক্টার হঠাৎ হাজির হয় তা হলে তাদের ওভারসীয়াররা তাকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখে এবং সেই ফাঁকে পাশের দুয়ার দিয়ে বালক শ্রমিকদের সরিয়ে ফেলা হয় কিংবা তুলার বস্তায় লুকিয়ে রাখা হয়।" "মালিকের পক্ষে আইন ভেঙ্গে ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে ধরা পড়লেও লাভ থাকে। দশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার জরিমানা এক ঘণ্টার বে-আইনী কাজ দিয়ে উসুল ক'রে নেওয়া যায়—এবং ইন্‌স্‌পেক্টরের পক্ষে ঘন ঘন আসাও সম্ভব নয়। জরিমানা অল্প হওয়ার কিছু কারণ বিচারকর্তা ম্যাজিষ্ট্রেটদের ফ্যাক্টরী আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, কিছু কারণ শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের ঔদাসীন্য।"

অতীন্দ্রনাথ বসু

পদাতিক—

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পি ১০৪।১, লেক রোড থেকে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আধুনিক কবিতার বই। ২৭ পাতার ক্ষুদ্র বইখানাতে কয়েকটী মাত্র কবিতা স্থান পেয়েছে। স্বচ্ছন্দগতি ছোট ছোট কবিতাগুলি নিপীড়িত মানবের দুঃখের অনুভূতিতে ভরা। ভাষা কোথাও কোথাও উপমার পাখায় ভর দিয়ে হেয়ালীর লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে; কিন্তু লেখকের কবি প্রতিভা বহু স্থানে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পৃথিবীর ঢাকনা খুলে কবি এর নগ্ন ও রূঢ় সত্য রূপটীকে উন্মুক্ত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন; ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কৃত্রিমতা, ছলনা ও বঞ্চনার প্রতি গভীর ঘৃণা, সর্ব্বত্র ছড়ানো রয়েছে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধতা। তলনিহিত ব্যঙ্গ কোন কোন স্থলে কাব্যরসকে ব্যাহত করলেও, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এই তরুণ কবির ভবিষ্যৎ আছে, কারণ এঁর ভাষার ওপরে দখল আছে, চিন্তার সবলতা আছে এবং সর্ব্বোপরি, অনুভূতির গভীরতা আছে।

নঃ

রামগড়ে, আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সুভাষবাবু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেছেন

মঙ্গলবার প্রাতে মৌলানা আজাদ ঝাণ্ডাচকে পতাকা উত্তোলন করিতেছেন।

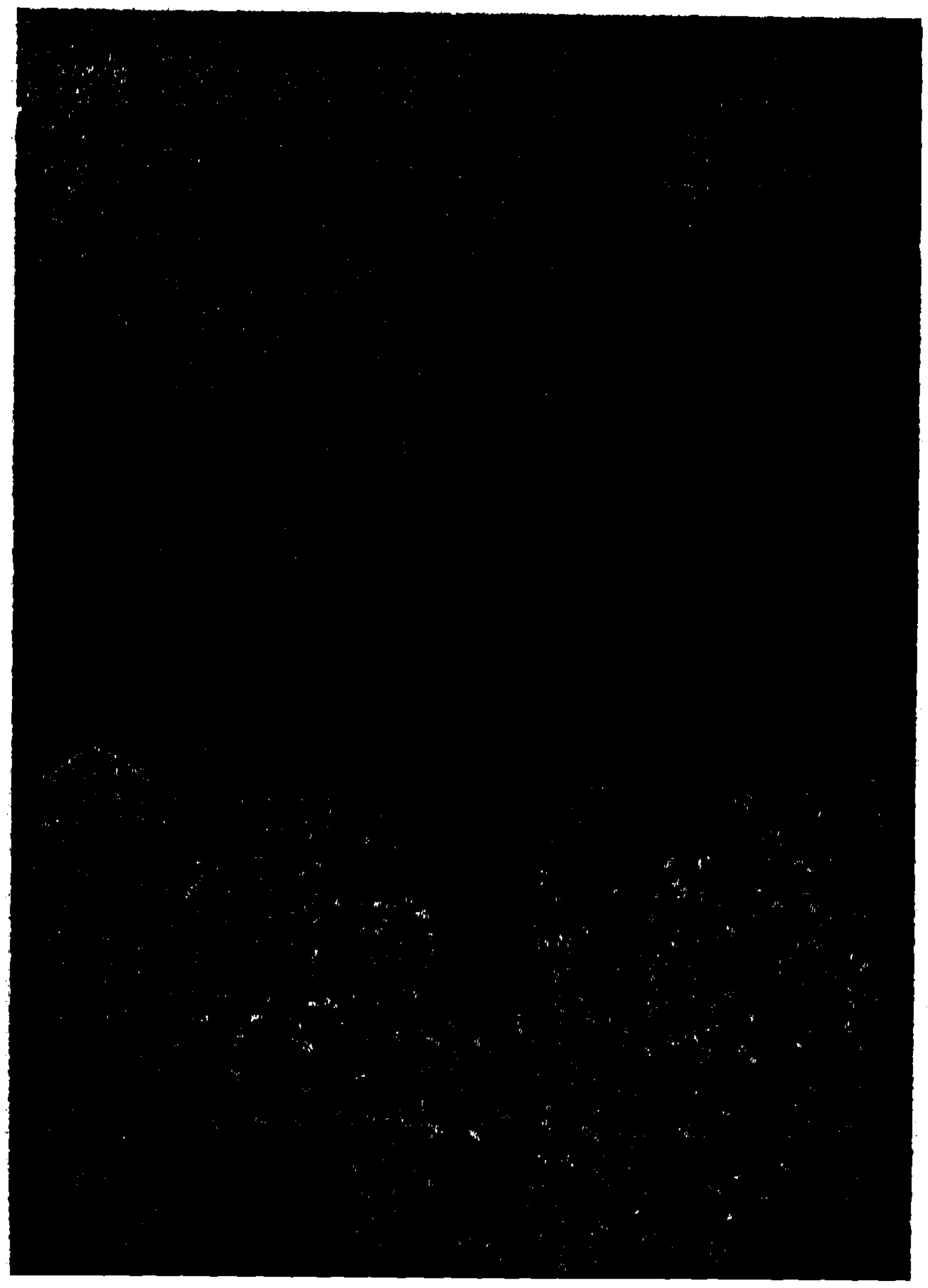

বিহারবাসী কৃষকগণ মিছিল করিয়া কংগ্রেসে যাইতেছেন

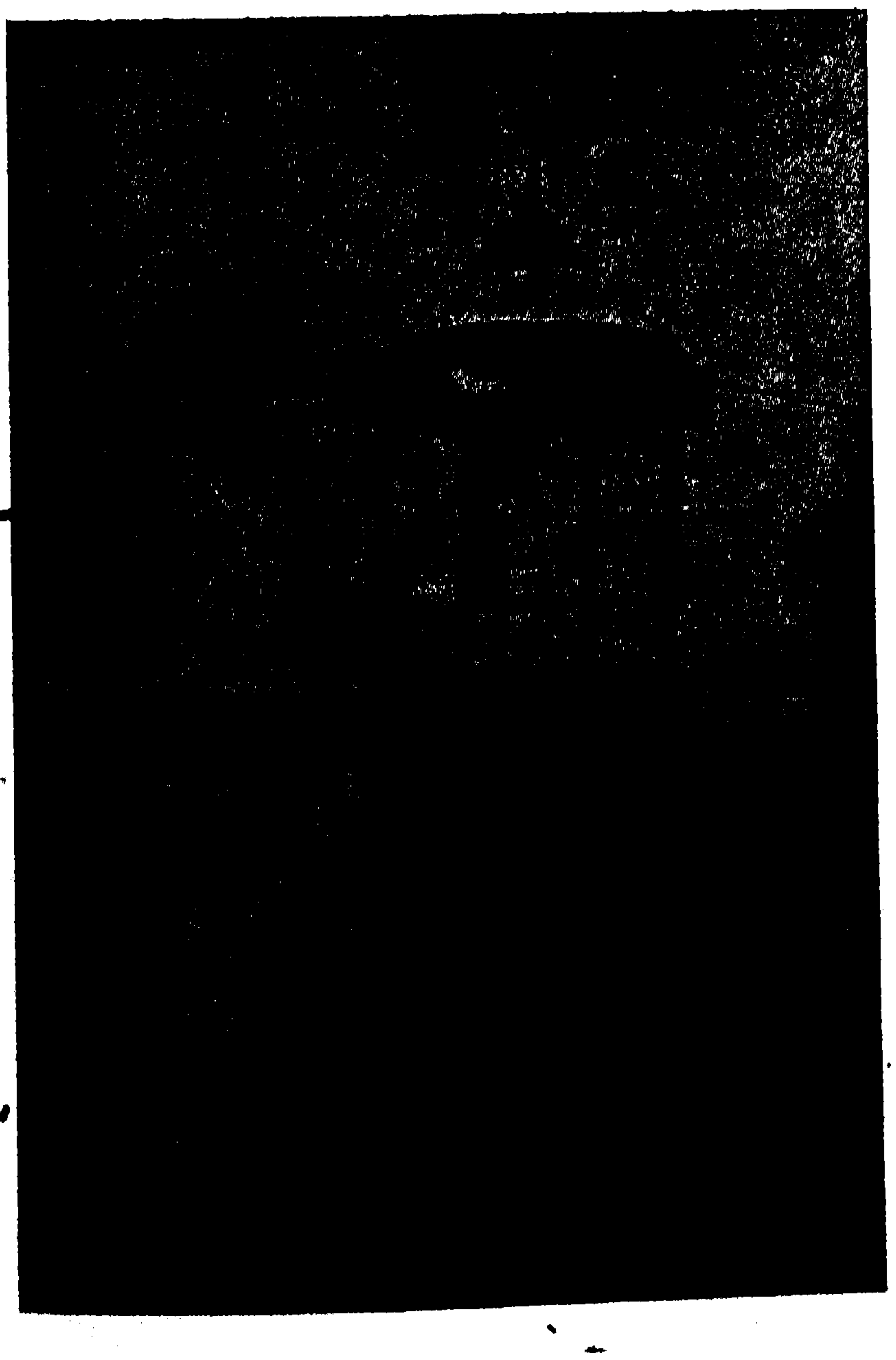

রামগড় কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশনের বক্তৃতা মঞ্চ

মজফর পুরীতে মহাত্মাগান্ধী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন

সম্পাদকীয়

রামগড় কংগ্রেস

(১) বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন :—

রামগড়ে গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ জাতীয় কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন হয়ে গেল। মূল সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ওর পূর্ব্বের তুই দিন ধরে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়েছে। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে কেবল একটীমাত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। সেটী হল পাটনার প্রস্তাব এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন ও জবাহরলাল সমর্থন করেন। ২৭টী সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল, কিন্তু সবগুলোই ভোটে বাতিল হয়ে গিয়েছে। মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র ১০ জন প্রতিনিধি ভোট দিয়েছেন। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের পক্ষ থেকে ইউসুফ মেহেরালী ঘোষণা করেন যে তাঁদের দল কংগ্রেসের (রাজেন্দ্রপ্রসাদের) মূল সরকারী প্রস্তাবকেই সমর্থন করবে ; কারণ জাতির এই সঙ্কটকালে জাতির ঐক্যকে বজায় রাখাই সঙ্গত। সংশোধন প্রস্তাবগুলোর মধ্যে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের তুইটী সংশোধনই উল্লেখযোগ্য ; তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনে আছে,—অবিলম্বে ভবিষ্যৎ গণপরিষদের অঙ্গ হিসেবে গ্রাম্য জনসভা গঠন করার কথা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার উচ্ছেদ, আধুনিক রীতিতে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন, ৪২ ঘণ্টা সপ্তাহ, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা।

(২) কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন :—

১৯শে বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় মূল অধিবেশন বসেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তুমুল ঝড় ও মুষলধারায় বর্ষণ নেমে আসায় অধিবেশনের কাজ চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সভাপতির ভাষণ পাঠ করা অসম্ভব হয়ে পড়ায়, সভাপতি মৌঃ আজাদ অভিভাষণটাকে "পঠিত" বলে ঘোষণা করে দিলেন এবং তার পরেই জবাহরলাল তাড়াতাড়ি মূল প্রস্তাবটী উত্থাপন করার পরে আচার্য্য কৃপালিনী সমর্থন করলেন। পনর মিনিটে সমস্ত কার্য্য নামেমাত্র শেষ করে, সভা পরের দিন প্রাতঃকালের জন্য স্থগিত হল। ২০শে প্রাতে ঝাণ্ডাচকে খোলা ময়দানে অধিবেশন হয়। জবাহর-উত্থাপিত মূল প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। মাত্র ষোল জন প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হাত তুলেছিলেন। পাঁচটী সংশোধন প্রস্তাব (শ্রীযুক্ত চিত্তেল, মহম্মদ আলী, গোপাল স্বামী, ডাঃ আশরাফ ইত্যাদি কর্তৃক) উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনীতে যেমন, এখানেও ঠিক একই নাট্যের পুনরভিনয় ঘটেছিল। সব সংশোধন বাতিল হয়ে যায়। ত্রিশ ভোটের অধিক কোন সংশোধনই পায়নি। বেলা দেড়টায় অধিবেশন শেষ হলো ; তার পরে গান্ধীজি বক্তৃতা

করেন। বক্তৃতার মূল কথা হল এই যে গান্ধীজির সর্ত্ত পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সংগ্রামের দায়িত্ব নেবেন না।

(৩) কংগ্রেস কর্ম্ম-পরিষদ ঃ—

সভাপতি এবারকার জন্য নিম্নলিখিত ১৩ জন সভ্য নিয়ে কংগ্রেসের কর্ম্ম-পরিষদ (Working Committee) গঠন করেছেন ঃ জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালিনী, রাজাজী, শ্রীযুক্তা নাইডু, আবদুল গফুর খাঁ, যমুনালাল বাজাজ, বল্লভভাই প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই, শঙ্কররাও দেব, প্রফুল্ল ঘোষ, আসফ আলী এবং ডাঃ সাইয়দ মাহ্মুদ্। একজন সভ্যের নাম পরে ঘোষণা করা হবে। যমুনালাল বাজাজ হবেন কোষাধ্যক্ষ ও কৃপালিনী সম্পাদক।

(৪) গ্রামে কংগ্রেস ও রামগড়ের শিক্ষা ঃ—

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের সবচাইতে বড় ঘটনাই হল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। গত প্রায় এক বছর যাবৎ কর্ম্মীদের সকল পরিশ্রম এবং শিল্পীদের সকল আয়োজন যে ব্যবস্থা গঠন করে তুলেছিল, কয়েক ঘণ্টার বর্ষণে তাকে বিপর্য্যস্ত, লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ লোকের থাকবার, চলবার ও আহার বিহারের কষ্ট ও দুর্ভোগ এবার চরমে উঠেছে; থাকবার ডেরাগুলোর মধ্যে কলকল করে জল ছুটেছে, কাপড় চোপড় সুটকেস সব কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত। থাকবার ব্যবস্থা অতি ঠুন্‌কো, খাবার ব্যবস্থা অতি মাত্রায় অব্যবস্থাপূর্ণ; গাঁয়ে কংগ্রেস করবার কল্পনা-বিলাস এবার প্রকৃতির এক আঘাতেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে; সবাই ত্যক্তবিরক্ত; এতগুলো লোককে গ্রামে একত্র করে অত্যাচার করার পিছনে কোন আদর্শবাদই নেই; আছে বুদ্ধিহীনতা! সকলেই আশা ও ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এর পর আর কংগ্রেস গ্রামে হবে না। গান্ধীজিও যেন সেই আশাই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সব কংগ্রেসেরই একটা বিশেষ শিক্ষা আছে, এবারকার রামগড়ের বিশেষ শিক্ষা হল এই যে, কর্ম্মীরা এমন স্থান নির্ব্বাচন ভবিষ্যতে করবেন যেখানে দুর্য্যোগ ও ঝড়বৃষ্টি হলেও যেন কোন অসুবিধা না হয়। আমাদের মতে, গ্রামে কংগ্রেস না হওয়াই সমীচীন। তাছাড়া মার্চ্চ মাসে অধিবেশন হওয়াও বিপজ্জনক। সময়টাও বদলানো দরকার।

(৫) রামগড়ের নির্দ্দেশ এবং ভবিষ্যৎ

রামগড়ের কংগ্রেসে গান্ধীবাদের জয়জয়কার হয়েছে; পাটনা প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা চৈত্র সংখ্যায়ই আলোচনা করেছি। কাজেই প্রস্তাবটীকে বিশ্লেষণ করবার দরকার নেই। একদিকে মৌঃ আজাদ এবং জবাহরের গরম গরম উক্তি ও আসন্ন অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভাবনার ঘোষণা। অন্যদিকে গান্ধীজীর অসম্ভব ও অবাস্তব শর্ত্তাবলী ও সাবধান-বাণী। এই দুই বিরোধী ঘোষণার মধ্যে পড়ে সাধারণ প্রতিনিধিদল দুই দিন ধরে আবর্ত্তিত হলেন; পরে ফিরে এলেন কিছু দুর্ব্বোধ্য চরকাপ্রশস্তি এবং কিছু ঘোলাটে যুদ্ধসঙ্গীতের গর্জ্জন দুই কানে নিয়ে। কিছুদিন যাবৎ আঃ কৃপালিনী ইস্তাহারের পর ইস্তাহার জারি করে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃজন করছেন। কংগ্রেস কমিটী-গুলো সব সত্যাগ্রহ কমিটীতে পরিণত করতে হবে, পাকা রেজেষ্টারী তৈয়ার করে প্রতিজ্ঞাপত্রে

নাম দস্তখৎ রেখে যুদ্ধের সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে, তারপরে এই সব সৈনিককে সূত্রযজ্ঞ ও চরকা-যজ্ঞ উত্থাপন করে আত্মশুদ্ধি, তথা যুদ্ধকৌশল, আয়ত্ত করতে হবে। আর ইতিমধ্যে গান্ধীজী লক্ষ্য করতে থাকবেন, সৈনিকরা যথোচিত পরিমাণে 'অহিংস' হয়ে উঠছে কিনা। যতদিন না হবে ততদিন যুদ্ধ ঘোষণা নেই। গান্ধীজী বলেছেন : "on this occasion, I am going to be very strict......" এবার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ; সৈনিক যদি না-ও পাওয়া যায় তাও ভাল, তবু হিংসাদুষ্ট সৈনিক দ্বারা কাজ হবে না। আর ইতিমধ্যে গান্ধীজীর দরকার হলে "পঞ্চাশ বার" পর্য্যন্ত ভাইসরয়ের বাড়ী গিয়ে আপোষের চেষ্টা করবেন, কারণ গান্ধীজী রামগড়ে বলেছেন যে গান্ধীজীর অস্থিমজ্জায় আপোষ ছেয়ে আছে, "you must know that compromise is in my very being. I will go to the Viceroy fifty times if there was need for it."

গান্ধীজীর মতামত সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর নীতি, কর্ম্মপন্থা ও আদর্শই রামগড় কংগ্রেস অবিসম্বাদিতভাবে গ্রহণ করেছে। গান্ধীবাদীয় কর্ম্মপন্থায় যে ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব পরিপূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হতে পারে না, তা আমরা বহু আলোচনায় দেখিয়েছি। ব্রিটিশ সরকারের শক্ত নিরেট মনোভাব হয়ত গান্ধীজীচালিত কংগ্রেসকে একদিন বাধ্য করবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। কিন্তু সে সংগ্রামের পূর্ণ পরিণতি গান্ধীজীর পরিকল্পিত কর্ম্ম-নীতির পথে হবে না। যখনই সরকারের পক্ষ থেকে কিঞ্চিত অবনমন বা নরম মনোভাব দেখান হবে, তখনই গান্ধীজী আপোষের মধ্য দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করবেন। কারণ গান্ধীজীর ধর্ম্মই তাই। তাছাড়া যদি কোন যুদ্ধ কংগ্রেসের দিক থেকে আরম্ভ হয়, সে সংগ্রাম সরকার পক্ষই বাধ্য করবেন সুরু করতে। কারণ সরকারের যে মতিগতি দেখা যায় তাতে "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ; প্রথম আক্রমণ ও যুদ্ধ ঘোষণা হবে ও হচ্চে সরকারের পক্ষ থেকেই। কৃপালনীর ইস্তাহার ও যুদ্ধায়োজনের জাঁক জমক যে রকম খাতিরজমা ভাবে চলেছে, তাতে মুর্খও বুঝতে পারে যে ব্রিটিশ সরকার এমন নিশ্চিন্তভাবে আত্মবিনাশে রাজী হবে না। সংগ্রামের আগেই কংগ্রেসকে সরকার ঘায়েল করবেন, ধ্রুব সত্য। তবে 'হাই কমাণ্ড' মন্থরগতিতে এই যে যুদ্ধায়োজন করে চলেছেন, তার উদ্দেশ্য কি ? একি তবে আসন্ন যুদ্ধের জন্য নয় ? না, কোন মেকি যুদ্ধের বহ্বারম্ভ দেখিয়ে সরকারকে ভয় দেখান এবং কোনরকম আপোষে বাধ্য করান ?

রামগড় আপোষ-বিরোধী সম্মেলন :— ১৯, ২০ মার্চ্চ

(১) সাধারণ অধিবেশন :—

কিষাণ নগরের আপোষ বিরোধী সম্মেলন এবারকার রাজনৈতিক ভারতের নূতন ঘটনা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সম্মেলন আহুত হয়েও যে পরিমাণে সফল হয়েছে তাতে অভ্যর্থনা সমিতির কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নেই। তাছাড়া অনাহুত যত লোক এই সম্মেলনে যোগদান করেছে তাতেও এর লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে সভাপতির অভ্যর্থনায় যে শোভা-যাত্রা হয়েছে, তা জনসমাগমে ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় অপূর্ব্ব। ১৯শে বিকেলে ৩টায় সম্মেলনের

সাধারণ অধিবেশন হয় ; এতে প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্রের হিন্দুস্থানী ভাষণ সেদিন সমস্ত জনসংঘকে অভিভূত করে তুলেছিল। সহজানন্দজীর বক্তৃতাও সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। বক্তৃতার পরে সভাভঙ্গ হবার পরক্ষণেই সেদিন তুমুল দুর্য্যোগ নেমে এসে প্রতিনিধি ও দর্শকদের অসম্ভব কষ্ট ও দুর্দ্দশা ঘটিয়েছিল।

২০শে মার্চ্চ দুপুরে দুটায় প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়, সেই বৈঠকে ৭টী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিকেলে ৫টায় সাধারণ অধিবেশনে বিনা বিরোধিতায় ঐ সাতটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের প্রস্তাব :—

সম্মেলনের মূল প্রস্তাব হলো জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে কৃষাণ, মজদুর, দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণ, ও অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে একত্র ক'রে এবং খণ্ড খণ্ড স্থানীয় সংগ্রামগুলিকে তীব্রতর ও কেন্দ্রীভূত করে' একটা সর্ব্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস ৬ই এপ্রিল থেকে এই সংগ্রামের উদ্বোধন ("Signal for the intensification of local struggles and the commencement of a struggle on an All-India basis & on an All-India front.") হবে। সংগ্রামের প্রবর্ত্তন ও পরিচালনার জন্য একটী "কর্ম্ম পরিষদ" ("council of action") গঠন করবার ভার শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু ও স্বামী সহজানন্দজীর উপরে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব মজলিস অহররকে অভিনন্দিত ক'রে, তৃতীয় প্রস্তাব কৃষাণ-মজদুর-যুব-ছাত্র আন্দোলন দ্বারা সূচিত গণজাগরণে আনন্দ প্রকাশ ক'রে ; চতুর্থ প্রস্তাবে সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করা হয়েছে, পঞ্চম প্রস্তাবে কৃষাণদের অর্থ-নৈতিক দাবীর ও ষষ্ঠ প্রস্তাবে শ্রমিকদের "যুদ্ধ ভাতা"র সমর্থন করা হয়েছে ; সপ্তম প্রস্তাব দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীজীর নীতিকে নিন্দা করে দেশীয় রাজ্যের গণ সংগ্রামকে সমর্থন করেছে।

(৩) আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের নির্দ্দেশ ও ভবিষ্যৎ :—

সম্মেলন থেকে আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান এসেছে ; সে আহ্বানে জাতি কতখানি সাড়া দেবে আজো তা ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু য়ুরোপে যে নাট্য অভিনীত হচ্ছে, সেই পট-ভূমিকায় বিচার করলে সন্দেহ থাকেনা যে সংগ্রামের উপযুক্ত লগ্ন আসন্নপ্রায়। কিন্তু সংগ্রামকে সফল করতে হলে তাকে তিলে তিলে গঠন করে তুলতে হবে। একদিনের উদ্দীপনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে ওঠে না, দীর্ঘ দিনের ব্যাপক ও সংহত কর্ম্মকৌশল জাতির স্তরে স্তরে সেই বিপুল শক্তিকে জমাট করে তোলে। আজকে স্বাধীনতার সংগ্রামেও সেই সব কর্ম্মীর প্রয়োজন দ্বারা নীরবে সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামকে গড়ে তুলবে। গ্রামে, গ্রামে, থানায়, মহকুমায়, জেলায়, প্রদেশে—সর্ব্বত্র একটা ব্যাপক, শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, যে ভিত্তি প্রতিপক্ষের কঠোর আঘাতেও ভাঙবে না। সংগ্রামের সেই ভিত্তিকে না গড়তে পারলে কেবল "জেল ভর্ত্তি" করে কোন সত্যিকার ফল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বারবার জেলে যাতায়াত করলেই সাম্রাজ্যবাদ

স্থানচ্যুত হবে মনে হয় না। কৃষক, মজুর, ছাত্র, নারী, দেশীয় প্রজা—ইত্যাদি সকল শক্তিকে একটী বিন্দুতে সংহত করে আনবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা না হলে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের নির্দ্দেশ হবে একান্ত নিষ্ফল এবং ভবিষ্যৎ হবে জাতির পক্ষে অপূরনীয় ক্ষতিকর।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

২৮শে মার্চ্চ কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন হয়ে গেল। কর্পোরেশন সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ণের পর এই প্রথম নির্ব্বাচন। নানা দিক্ দিয়ে এবারকার নির্ব্বাচনের বিশেষত্ব রয়েছে। কাউন্সিলার-দের সংখ্যাবিভাগ এবার সম্পূর্ণ বদ্‌লে নতুন করে করা হয়েছে: নির্ব্বাচিত সদস্য ৮৫, বাংলা সরকারের মনোনীত সদস্য ৮ এবং এই ৯৩ জন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হবেন ৫ জন অল্‌ডারম্যান্। কাজেই কর্পোরেশনের মোট সভ্যসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৯৮। এবারকার নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এইরূপ কংগ্রেস—২৬; হিন্দু মহাসভা—১৫; মুসলীম লীগ—১৮; অমুসলমান স্বতন্ত্র—৬; মুসলমান স্বতন্ত্র—৪; বিশেষ নির্ব্বাচনকেন্দ্র—১২ (ইউ-রোপীয় ১১+ভারতীয় ১); শ্রমিক—২; অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—২; সর্ব্ব সমেত এই ৮৫ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছে।

এবার প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাও খুব বেশী হয়েছে; সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ৫১০০০ ভোটারের মধ্যে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস এই দুইদলে মিলে প্রায় ৪১০০০ ভোটারের সমর্থন পেয়েছে; ৮৭০০ মুসলমান ভোটারের মধ্যে ৮০০০ ভোটার ভোট দিয়েছে। এদিকে মাত্র ৭৬০ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভোটার ২ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেছে; কিন্তু ২৬৭৯২ জন শ্রমিকের প্রতিনিধিও মাত্র দুজনই নির্ব্বাচিত হয়েছে।

এবারকার নির্ব্বাচনে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির আশাতীত সাফল্য। কলকাতার হিন্দুরা বিশেষভাবে রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন এবং জাতীয়-চেতনার বিশিষ্ট স্থানই হলো কলকাতা। কাজেই এবার কলকাতার মত স্থানে হিন্দুসভার আশাতীত সাফল্যে (৩৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন নির্ব্বাচিত হয়েছে) কংগ্রেসকর্ম্মীদের চোখ ফোটা উচিত। এতে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: প্রথমতঃ, মধ্যবিত্ত ও অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে একটা বড় অংশ হিন্দু স্বার্থরক্ষার দিকে উৎসাহশীল হয়ে উঠেছেন; বাংলা সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপে এই উৎসাহ জন্ম নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুসভা এবার ত্রিশূল ও গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদের দ্বারা ভোট সংগ্রহ করেছেন। এতে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট হবে বলে আমাদের মনে হয়। নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে যে কদর্য্য ও কলুষিত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে তা' সবারই জানা আছে। এই অসত্য ও পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে সন্ন্যাসীদের টেনে এনে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করবার রীতি সমর্থন-যোগ্য নয়। গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা ভোট কাড়াকাড়ি করবে এবং উকীল ব্যারিষ্টারদের 'জয়ধ্বনি' দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে—এ দৃশ্য সন্ন্যাসের ও গৈরিকের পক্ষে সম্মানজনক নয়।

তৃতীয়তঃ নির্ব্বাচনের পরে কংগ্রেস ও হিন্দুসভায় একত্র হয়ে কাজ করবার একটা রফা হয়েছে বলে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে ; সংবাদটা আশাজনক। কর্পোরেশনে যদি এই দুই দল একত্র হয়ে কাজ না করতে পারেন, তবে কলকাতার নাগরিক শাসন পরিচালিত হবে য়ুরোপীয় সভ্য ও প্রতিক্রিয়াশীল কাউন্সিলারদের দ্বারা। তাতে জাতীয় স্বার্থের হানি ঘটবে। আশা করি, এই নতুন ঐক্য একটা পাকা ভিত্তির ওপরে সংগঠিত হবে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলাদলির ওপরে একে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা হবে।

কলিকাতায় ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট

গত ২৫শে মার্চ্চ মনুমেণ্টের নীচে এক ধাঙ্গড় সভায় "মাগ্গী-ভাতার" দাবী নিয়ে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৬শে থেকেই ধর্ম্মঘট আরম্ভ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই পথে ঘাটে আবর্জ্জনাস্তূপ জমে কলকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতার জনসাধারণের অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ধাঙ্গড়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বি পি সি সি এক 'ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট সাহায্য সমিতি' গঠন করে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, অ্যাড্ হক কমিটী ও "আপোষ কমিটী" গঠন করে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন ; এ ছাড়াও বহু জেলা ও ওয়ার্ড কমিটী সাহায্য করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধাঙ্গড়দের সেবা না পেলে কলকাতার অভিজাত, মধ্যবিত্ত ধনী, দরিদ্র,—কারুরই একদিনও জীবন কাটে না ; অথচ এদের মানুষের মত খেয়ে-পরে বাঁচবার নিম্নতম দাবীটুকুও কলকাতার পৌরসভা আজ পর্য্যন্ত সুকৌশলে দাবিয়ে রেখেছেন ; বড় বড় কর্ম্মচারীদের বছরের পর বছর মাইনে বেড়েই চলেছে, অথচ এই দরিদ্র ধাঙ্গড়দের দুটা চারটা টাকা বাড়াবার বেলায় কর্ত্তৃপক্ষের অর্থাভাব ঘটে ; এই অমানুষিক হৃদয়হীনতার দিন অতি দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে—কলকাতার ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট সেই ইঙ্গিতই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে গেছে। কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়াটে লোক দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করায় নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় ; কাশীপুরে পুলিশ গুলি পর্য্যন্ত চালিয়েছিল। অবস্থা যখন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল তখন কর্ত্তৃপক্ষ আপোষে বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছেন ; গত ২রা এপ্রিল বিকেলে মনুমেণ্টের নীচে প্রায় ১৫ হাজার ধাঙ্গড়ের এক বিরাট সভায় আপোষের চুক্তিগুলি গৃহীত হয়। ঐ সভায় কর্পোরেশনের চীফ অফিসার এবং নব-নির্ব্বাচিত সদস্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আপোষের চুক্তি নিম্নরূপ : (ক) যতদিন যুদ্ধজনিত দামবৃদ্ধির অনুপাতে মাইনে না বাড়ে কিংবা সস্তাদামে বিক্রীর জন্য কর্পোরেশনের দোকান খোলা না হয়, ততদিন ৩০৲ পর্য্যন্ত যারা বেতন পায় তাদের প্রত্যেকের ১৲ মাসিক বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে। (খ) সমস্ত মামলা উঠিয়ে নেওয়া হবে। (গ) ধর্ম্মঘটের দিনগুলিরও মাইনে দেওয়া হবে। (ঘ) বরখাস্ত ধাঙ্গড়দের পুনরায় নিয়োগ করতে হবে। (ঙ) কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। (চ) উভয় পক্ষের লোক নিয়ে এক সাব-কমিটী হবে, তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধাঙ্গড়দের সমস্ত দাবীগুলি মেটান হবে।

আমরা আশা করি নতুন কর্পোরেশন ধাঙ্গড়দের নিকট প্রতিশ্রুত শর্তগুলি অচিরে পালন করবার ব্যবস্থা করবেন।

হাওড়ার ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট গত ২রা এপ্রিল থেকে আরম্ভ হয়—কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যাহৃত হয়।

বোম্বে বয়নশিল্প ধর্ম্মঘট

গত ৪ঠা মার্চ্চ বোম্বের দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেছিল। প্রায় এক মাস দশদিনব্যাপী ধর্ম্মঘট চালাবার পর, গত ১৩ই এপ্রিল গিরণী কামগড় ইউনিয়ান ধর্ম্মঘটকে প্রত্যাহার করেছেন। ধর্ম্মঘট আরম্ভ করবার আগে উভয় পক্ষে মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একটী মীমাংসা বোর্ড থেকে শতকরা দশ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় এবং মিল-মালিকেরা শতকরা ১০৲ দিতে রাজী হন। কিন্তু শ্রমিকেরা শতকরা ১৫৲ বেতন বৃদ্ধির ন্যায়সঙ্গত দাবীটী মিল মালিকেরা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হন না। অতএব ধর্ম্মঘট করতে শ্রমিকেরা বাধ্য হন। কিন্তু ৪০ দিন পরে দরিদ্র শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট চালাবার সামর্থ্য থাকে না। ধর্ম্মঘটীদের কোন ফণ্ড না থাকায় অর্থাভাবে অনশনের মুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের উপায়ন্তর রইল না। এই কারণে ইউনিয়ানের কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসতে ("disciplised retreat"-Nimbkar) পরামর্শ দিয়েছেন। সকল ধর্ম্মঘটের পরিণতি থেকেই একটী কথা প্রবল হয়ে ওঠে সেটী হল—অর্থাভাব। পূর্ব্বে থেকে এর ব্যবস্থা না করে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা অসমীচীন।

ভারতীয় জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করবার প্রস্তাব

সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রাম করবার ও সেই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশী—তখনই দুর্ভাগ্যবশতঃ দিকে দিকে নেতারা অনৈক্য ও বিভেদের উপর জোর দিয়ে, দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে তুলছেন। ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ভেতরে—ঐক্যের নামে বিবাদ ও বিভেদ যে দিন দিন কিভাবে বেড়ে চলেছে জাতীয়তাবাদী মাত্রেই তা জানেন, এ ছাড়াও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এই সঙ্কটকালে—তাদের একপেশে দাবী পেশ ও পরস্পরের "অত্যাচার" থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তোড়জোড় সুরু করবার উপযুক্ত সময় মনে করেছেন দেখলে, বাস্তবিক সন্দেহ হয়—ভারতবাসী—স্বাধীনতা থেকে আন্তরিকভাবে মুক্তি চায় কিনা। সংশয় হয় অধীনতা এই আত্মবিস্মৃত জাতির অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়ে বুঝিবা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে দিয়েছে। কারণ যাঁরা এই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির নায়ক ও চালক তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা ও বুদ্ধি সম্পর্কে এর পূর্বে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না।

সম্প্রতি লাহোর মুস্লিম লীগের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করবার প্রস্তাব, কেবলমাত্র মিঃ জিন্নার সভাপতির অভিভাষণেই নয়, লীগের সাধারণ সভায়ও গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন বাঙ্গালার বীরকেশরী—ফজলুল হক্। তিনি বলেছেন "ইস্লাম ও হিন্দু ধর্ম্মকে কেবলমাত্র ধর্ম্ম বললে চলে না—এরা দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা এবং হিন্দু ও

মুসলমান কোন সময়ে এক সম্মিলিত জাতিতে গ্রথিত হবে এই আশা করা স্বপ্নমাত্র।" কাজেই তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা প্রস্তাব করেছেন, যে সব স্থান মুসলমান-প্রধান ও যেগুলি ভৌগলিক অবস্থানের দিক্ দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত—সেগুলিকে "স্বাধীন রাজ্য" বলে স্বীকার করতে হবে এবং সেগুলি "autonomous, sovereign units" হবে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাল্প—সেখানে তাদের স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে "তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে"। অর্থাৎ মিঃ জিন্না কল্পনা করেন যে তিনিই একমাত্র বুদ্ধিমান এক ভারতবর্ষের বিলিব্যবস্থা তাঁর সুবিধা ও ইচ্ছানুযায়ীই হবে—অন্যান্য সম্প্রদায়ও যে অনুরূপ দাবী উত্থাপন ক'রে ভারতবর্ষকে আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত করতে পারে তিনি তা কল্পনা করেন না। যাহোক্ সুখের বিষয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশপ্রীতির অভাব নেই এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী মাত্রেরই উচিত এ ধরণের মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধতা করা। যে গণসাধারণকে নিয়ে দেশ ও জাতি—ভারতবর্ষের সেই অগণিত চাষী মজুর—তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কোন বিভেদ ছিল না এখনো নেই, যা কিছু গণ্ডগোল তা সাম্প্রদায়িক নেতাদের উস্কানি ও সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘটেছে—তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে—দুমুঠো ভাতের জন্য, রোগে ঔষধপথ্য না পেয়েও প্রাণ হারিয়ে মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে ভিটেটুকু পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে পথে বসে; তাদের সমস্যায়—কি হিন্দু কি মুসলমান—কোন বিভেদ নেই—তাদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ও তার আওতায় পুষ্ট পুঁজিবাদের সঙ্গে। আমরা আশা রাখি ভারতের জাগ্রত জনগণ এই সব ভুয়া নেতাদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিজেদের যথার্থ মুক্তির পথ বেছে নেবে।

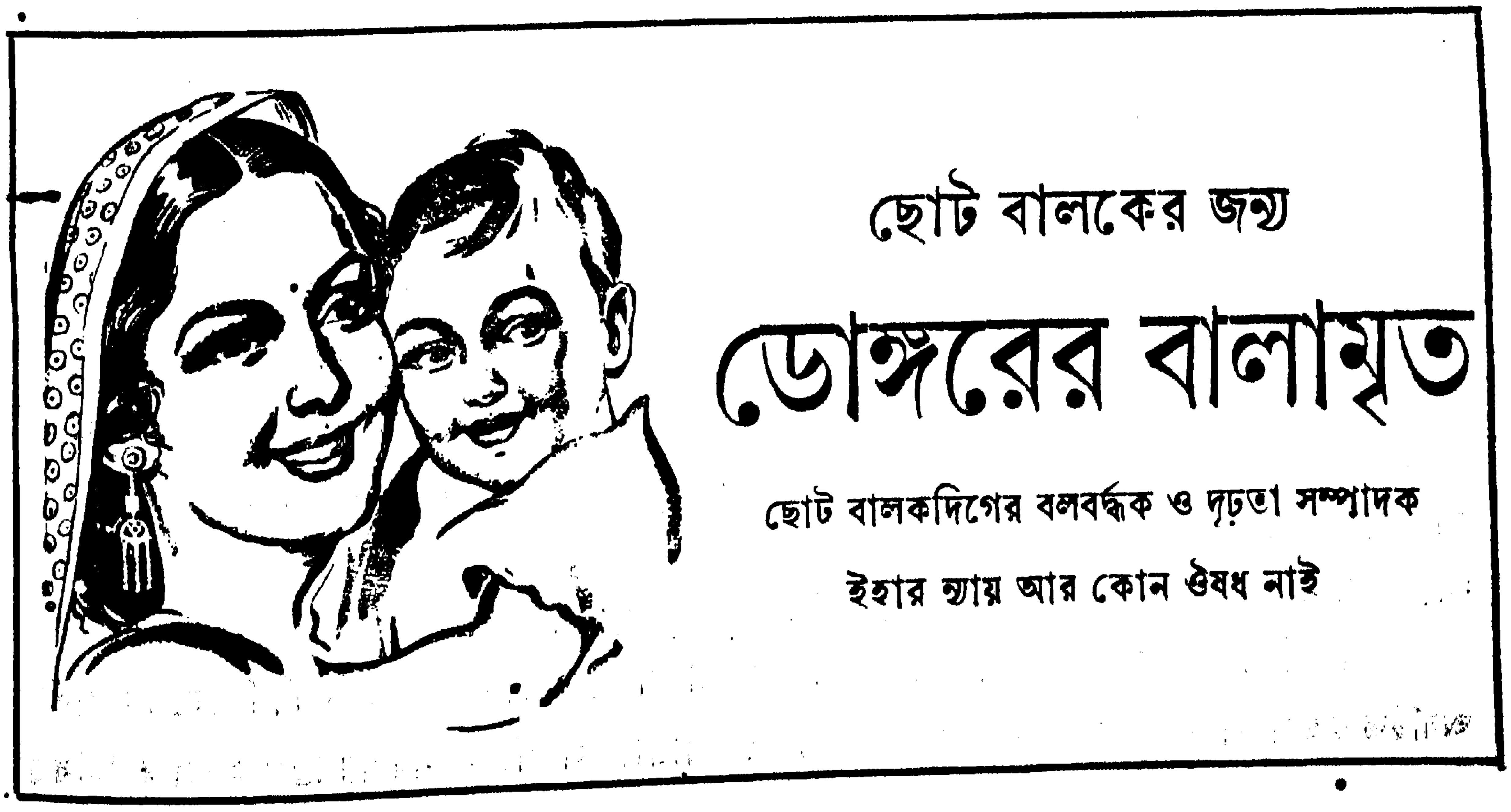

নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন

মাদ্রাজের পলাসা নামক স্থানে এবার কিষাণ সম্মেলন হয়ে গেল। শ্রীযুক্ত রাহুল সংকৃত্যায়নের সভাপতিত্বে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল, কিন্তু সম্মেলনের পূর্বক্ষণে রাহুলজী ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ায়, সোহন সিংহের সভাপতিত্বে গত ২৬শে, ২৭শে মার্চ্চ সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন হয়ে গেছে। রাহুলজীর অভিভাষণটী সভায় পাঠ করা হয়েছে। এই অভিভাষণে সভাপতি রাহুলজী বলেছেন : (১) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীত আমাদের চাষবাস ও জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। (২) চাষীরাই মজদুরদের সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে, কারণ স্বাধীন ভারতে জমিব্যবস্থার ওলটপালট না করলে উৎপাদন সম্ভারের (production forces) বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হবে না। তাছাড়া সাম্‌নে যে বুর্জ্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব আস্‌ছে, তাতে জমিদারী প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে সাবালক ভোটের ভিত্তিতে গণতন্ত্র স্থাপন করবার দায়িত্ব চাষী মজুরকেই নিতে হবে; ভারতীয় মধ্যবিত্তেরা এ কঠিন কাজ করতে পারবে না। (৩) বিগত জাতীয় সংগ্রামগুলিতে চাষীরাই প্রধান ও প্রবলতম শক্তি ছিল—বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও চাষীদের রাজনৈতিক সংগ্রামে থাকতে হবে, কেবল অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে লড়লেই হবে না। (৪) কংগ্রেস বরাবর শ্রেণী-সহযোগ প্রচার কোরে জমিদারের সঙ্গে আপোষ করে চলেছে এবং গান্ধীজীও বরাবরই অহিংসা ও সত্যের ছল কোরে জাতীয় সংগ্রামকে কেবল ভেঙ্গে চুরে দিয়েছেন। (৫) কৃষক সমিতিগুলো অকেজো হয়ে আছে, এবং সমস্ত আন্দোলনটী কয়েকজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র কোরেই চলেছে। সর্বক্ষণ কাজ করতে পারে এমন (whole time) কর্ম্মী, কৃষক আন্দোলনে বেশী নেই; এমন কর্ম্মী গঠন করতে হবে এবং তাদের যোগ্য রাজনৈতিক শিক্ষা দান করতে হবে।

অভিভাষণটীর বৈশিষ্ট্য হলো স্পষ্ট-বাচন এবং স্পষ্ট বাচন করবার মনোবৃত্তি সকলের না থাকলেও অধিকার সবারই আছে। এদিক দিয়ে রাহুলজীর ভাষণ প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতামতের মধ্যে বিতর্ক ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ যে কেবল চাষীদেরই প্রার্থিত তা' নয়; অর্থনৈতিক কারণে এই দাবি মধ্যবিত্তদেরও দাবি বটে। কংগ্রেস অতীতে সর্বত্রই জমিদারদের সঙ্গে আপোষ করেছে একথা সত্য নয়। খাজনা-বন্ধ আন্দোলন কংগ্রেস থেকেই অতীতে চালানো হয়েছে একথা ভুললে সত্যের অবমাননা করা হয়। রাহুলজী আক্ষেপ করেছেন কৃষক আন্দোলনের ক্ষীণতা দেখে। আমাদের স্বভাবতই বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। বাংলা দেশে একটা কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি তার কারণ কি?

খাকসার ভলাণ্টিয়ারের ওপর পুলিশের গুলি

গত ১৯শে মার্চ্চ লাহোরে যে শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে তার গুরুতর মর্মার্থ সম্বন্ধে সবারই অবহিত হওয়া উচিত। ভারত রক্ষা আইন অনুসারে পাঞ্জাবে সামরিক কায়দায় ড্রিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ

হয়েছিল ; এই নিষেধ অমান্য করে খাকসার দল থেকে সেদিন এক সামরিক কায়দায় শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। পুলিশ বাধা দেওয়ায় খাকসার দল কোদাল নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। এতে পুলিশ গুলি চালায়। ফলে ত্রিশ জন খাকসারের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দুজন পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রাণহানি হয়েছে। ফলে "আঞ্জুমান খাকসারান্" নামক দলটীকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

কিছুদিন যাবৎ এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীটীর অস্তিত্ব কয়েকটী প্রদেশেই অনুভূত হচ্চে। শিয়া সুন্নি গণ্ডগোলের সময়ে এরা লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদে দলে দলে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এবার পাঞ্জাবে। সীমান্ত প্রদেশে, ও সংযুক্ত প্রদেশে এদের প্রভাব আছে। সাম্প্রদায়িক আদর্শ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, এদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রায় চার লক্ষ হয়েছে। খাকসার নেতা "আলামা মাশরুকী" (এনায়েতুল্লা খাঁ) অমৃতসরের অধিবাসী এবং পণ্ডিত লোক। তার গঠন প্রতিভার ফলে খাকসার দল শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রবল শক্তি যখন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় তখন জাতির সর্ব্বনাশের পথ খোলসা হয়। এক্ষেত্রেও তাই হচ্চে।

এদিকে হিন্দু সভা থেকেও "রামসেনা" গঠন করবার তোড়জোড় হচ্চে। এর পরে আরো নানা সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দেশে যে সংকীর্ণতা ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে বেড়াবে, তাতে উদার জাতীয় মনোভাব ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কার প্রতি আমরা নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভারতব্যাপী ধরপাকড়ের হিড়িক

গান্ধীজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, সরকার যে দ্রুতগতিতে দমননীতি চালান আরম্ভ করেছেন এর মানে কি 'যুদ্ধ ঘোষণা' ? সরকার যে রকম বেপরোয়াভাবে ধরপাকড় করছেন তাতে যুদ্ধ ঘোষণাটা সরকার পক্ষ থেকেই হয়েছে, দেখা যাচ্ছে। রামগড় কংগ্রেস ও আপোষবিরোধী সম্মেলনের পর থেকে এই দমননীতি আরো বিস্তৃত ও আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। গত একমাসে বাংলা দেশের ওপরেই বিশেষভাবে জুলুমটা চলেছে। বাংলা দেশের বি পি সি সির ওপরে ও আপোষ বিরোধী সম্মেলনের সমর্থকদের ওপরেই যেন আক্রোশটা বেশী। বি পি সি সির জাতীয় সপ্তাহের যে কার্য্যক্রম ছাপান পর্য্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে ; রেলওয়েতে যাতায়াত পর্য্যন্ত বন্ধ করা হবে, ইচ্ছে হলে ; সভা সমিতি ইত্যাদি তো বন্ধ আছেই। তাছাড়া কর্ম্মীদের ওপরে নোটীশের তো বিরামই নেই। জয়প্রকাশ নারায়ণ, প্রফেসর রঙ্গ, মিঃ কামাথ, সেনাপতি বাপৎ ইত্যাদিকে ধরা হয়েছে ; বাংলা দেশেও মৌঃ আশরাবুদ্দিন, ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তি, সত্য বকসী ইত্যাদি ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিকাংশ কর্ম্মীকে ধরা হয়েছে ; কখন যে কার ওপরে দৃষ্টি পড়বে কেউ জানে না। সমস্ত আবহাওয়া অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই আবহাওয়ার মধ্য থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে

ওঠে যে ভারতবর্ষ আর একবার সংগ্রামের পথে প্রবেশ করছে, গান্ধীজীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও আপোষের সম্ভাবনা আজ আর বিন্দুমাত্রও নেই। বেচারী গান্ধীজী!

বিশিষ্ট-ব্যক্তিদের তিরোভাব

পর পর কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর তিরোভাবে সর্বসাধারণের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত রাজনৈতিক কোলাহলকে ভেদ করে এই বেদনা আমাদের জাতির অন্তরে গিয়ে আঘাত করেছে। গত ৫ই এপ্রিল ভোরে দীনবন্ধু সি, এফ, এণ্ডরুজ মহাপ্রয়াণ করেছেন। আমাদের জাতির স্মৃতিতে তাঁর স্থান অক্ষয় ও উজ্জল হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য। যে ঔদার্য্য এবং বিশাল চরিত্র তিনি, কথা দিয়ে নয়—কার্য্য দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, বর্ত্তমান যুগের বিদ্বেষক্লিষ্ট, জাতিগুলোর চোখের সমুখে ধ্রুবতারার মত তা' উর্দ্ধাকাশে জ্বলতে থাকবে। কী দক্ষিণ আফ্রিকায়, কী চম্পারণের আন্দোলনে, কী উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষে, কী বিহারের ভূমিকম্পে—সর্বত্র তার সেই উন্নত চরিত্রের উদ্ধত মাহাত্ম্য আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা তাঁর স্মৃতিকে প্রণাম করি।

মনীষী জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জ্জিও পরিষদ নির্বাচনের কর্ম্ম উপলক্ষ্যে শোচনীয় দুর্ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। তাঁর বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, স্পষ্টবাদিতা, বাংলার জাতীয় চরিত্রকে চিরদিন প্রেরণা দান করবে, তাঁর স্বদেশ সেবায় কারাবরণ কর্ম্মিদের আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

চট্টগ্রামের প্রাচীন নেতা মহিমচন্দ্র দাস পরলোক গমন করেছেন। জাতীয় সংগ্রামে তাঁর স্মৃতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হবে, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন দেশসেবা, কর্মোৎসাহ ও ত্যাগ তরুণদের কর্মকে অনলস ও উদার করে তুলবে। আমরা তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করছি।

ছাত্রকর্মী জ্যোতির্ময়ের শোচনীয় মৃত্যু

গত ৬ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ ছাত্র সম্মেলনে ছাত্রকর্মি শ্রীমান জ্যোতির্ময় ভৌমিক দলাদলি, ও দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। ফলে মাত্র ১৬ বছর বয়সে শ্রীমান জ্যোতির্ময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ছাত্রসঙ্ঘের মধ্যে দলাদলি আছে। একদল সম্মেলন আহ্বান করেছেন, অপর দলকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছেন। ফলে বচসা ও দাঙ্গা এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটেছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যে নীচ ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আমাদের পেয়ে বসেছে, তাতে সে মনোবৃত্তির অনিবার্য্য ফল ফলবে, এতে ব্যত্যয় হতে পারে না। আমরা আজকাল মৌখিক ঔদার্য্যের বেলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে টেনে আনি, কিন্তু কার্য্যকালে দলবুদ্ধির নাগপাশ আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলগত সঙ্কীর্ণতার ও গুণ্ডামির তীব্র প্রতিবাদ করি এবং বিভিন্ন দলীয় নেতা ও কর্মিদের কাছে অবিলম্বে এর প্রতিকার করবার জন্য আবেদন করছি।

দ্রষ্টব্য—এই সংখ্যার রামগড় কংগ্রেসের ছবি "ভারতবর্ষের" এবং আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের ছবি 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডের' সৌজন্যে পাওয়া গেছে। উক্ত পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জঃ সঃ

মেয়েদের কর্মক্ষেত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা কর্ম্মী, তাদেরই পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সব'চেয়ে বড় আদর ; যারা কোন বড় প্রয়োজন সাধন করবেন, পুরুষমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বড় পুরস্কার পান। কিন্তু আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে কোন কর্ম্মের প্রাপ্তি-স্বীকার নেই। তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি—যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে ; পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দধ্বনির মধ্যে যা' আমাকে পুরস্কৃত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরী শোধের কথা নেই। অন্য যে কোন আকারে উপকারের কাজ করি, তার জন্যে মজুরীর দাবি করা চলে, তার জন্যে বাহিরের দিক্ থেকে পারিতোষিক প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু যদি কোন কর্ম্মের সহায়তা না করে কেবলমাত্র আনন্দের পাত্র ভ'রে দিয়ে থাকি—সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, রস দিয়ে—তবে আনন্দই তার পুরস্কার।

সংসারে আনন্দভাণ্ডারের ভার ত মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্য্যের অমৃত মেয়েদেরই হৃদয়ে। তাদের স্নিগ্ধ স্পর্শে জীবনযাত্রার কঠোরতা কম হয়, তাদের হাসি আর চোখের জলে দুঃখসন্তাপে শান্তি আসে, তাদের সেবায় ও নিষ্ঠায় গৃহ কল্যাণে শোভিত হয়। এই জন্যে কবিকে পুরস্কার দেবার ভার ত তাদেরই, যে কবির কাজ হচ্ছে সংসারকে রসবর্ষণে শ্রী-দান করা।

যতদিন আমি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছি, অন্তরের মধ্যে এই আশ্বাস বারবার অনুভব করছি যে, দেশের মেয়েদের কাছে আমার কবিতা পৌঁচেছে। পুরুষদের মধ্যে সহজে রসভোগের বাধা তাদের বিদ্যার অভিমান, বুদ্ধির অহঙ্কার ; বিদেশী সাহিত্যে নূতন অধিকারের উত্তেজনায় তারা পুঁথিগত তুলনার সাহায্যে রসের যাচাই করতে বসে। কিন্তু যাচনদার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে আর পারে না। সহজ আনন্দ অনুভব করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই কাব্যের রসটিইকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নেয়। শিক্ষার দ্বারা, নানা সাহিত্যে প্রশস্ত অধিকারের দ্বারা এ শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, একথা সত্য ; কিন্তু যেখানে স্বভাবত সেই শক্তির দৈন্য, অথচ বই পড়া শিক্ষার দ্বারা সাহিত্য বিচাররীতির একটা বাহ্য কাঠামো

হাতে এসেছে, সেইখানেই দুর্বিবপাক, সেইখানেই সাহিত্যরাজ্যে মত্তহস্তী পদ্মবন দল্‌তে আসে।

আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ঠ হয়নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজ-বোধের ঐশ্বর্য্য আছে। সেই কারণে আমার এই অহঙ্কারটুকু সত্য হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহিত্য মেয়েদের কাছে এই যে আতিথ্য পায়, এটি বিশেষ মূল্যবান্। মেয়েদের আনন্দ পুরুষের শক্তির উদ্বোধন।

মাধুর্য্যই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুর হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুর হাতের পদ্মই তার পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে পৌরুষের নানা-প্রকার উদ্যম দেখতে পাই, সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারীচিত্তের প্রবর্ত্তনা আছে। সেখানে হাওয়ার মধ্যে একটা উৎসাহ নারীর মন থেকে প্রবাহিত হ'য়ে পুরুষের সাধনাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। যে সামাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যেবীর্য্যে কর্ম্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের জোরে মাটী থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়—একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকাশের আলোয়, বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে। প্রাণলক্ষ্মীর এই দিব্যদূতগুলি অলক্ষ্য আকারে, অশ্রুত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে। তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অনুপ্রাণণা পুরুষের শক্তিকে তেজ জোগাবার সেই অলক্ষ্য দূত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে। এখানকার মনোবিজ্ঞান যেমন বলে যে, মনের গূঢ়চেতন লোকে আমাদের মর্ম্ম উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস; আমাদের দেশ তেমনি করেই বলেছে পুরুষের উদ্যমের দ্বারা গোচরে যে কাজ হয়, অগোচরে তার শক্তিকে সচেষ্ট করে রাখে নারী-প্রকৃতি।

কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয়। তখন পুরাতন অভ্যাসের জায়গায় নতুন উৎসাহের দরকার হয়। নতুন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিত পথের দুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রচ্ছন্ন থাকতে চায়। মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি,—তাদের শাস্তি জীবন্মৃত্যু। একদিন আমরা ভারতবর্ষে আত্মীয় সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে নিবিড় নিবিদ্ধ একটী সমাজ পারিবারিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলাম। তাই আমাদের সংহিতাকাররা ব'লেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন ভারতবর্ষের এই গৃহধর্ম্মমূলক সভ্যতা ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে, সার্থক হয়ে উঠেছিল। তখন স্বভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই

সাজিয়েছে ; গৃহকে তারা সুন্দর করেছিল, পূর্ণ করেছিল। কিন্তু যে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেঙ্গে গেছে। **আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে। সে ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান।** **আজ আমাদের আশ্রয় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়।** আজ সমস্ত পুরাণ বাধ ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়চে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচতে হবে নূতন ব্যবস্থায়। এই বাঁচাবার ভার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নূতন উৎসাহে নূতন যুগের সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকে নিরন্তর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নূতন দিন আজ এসেছে। এদিন পূর্ব্বে কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী, তাঁরাও সর্ব্ব মানবের মুক্তিদান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য এশিয়ার মরুবালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে; সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রী-দূতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণ সাধনার প্রাচীন বার্ত্তা; আজ আমাদের পরম অগৌরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম যেদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তির পায়ের কাছে বসে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করচে। রাত্রে দেখি পূর্ব্বকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিদ্রুমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপ মোচনের প্রার্থনা করচে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি ব'লে ভক্তি করেছে। সেদিনকার বিশ্বযজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে? অমৃতের পাত্র কি কখনো নিঃশেষে রিক্ত হয়? গৃহপরিধির বাইরে আজ আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করা চাই। বিশ্বের প্রাঙ্গনে আজ দ্বার উন্মুক্ত, সর্ব্বত্র যাবার পথ অবারিত, আজ সেখানে আমরা কি নিয়ে যাব? যারা বণিক তারা পণ্য নিয়ে যায়, যারা দস্যু তারা লুট করবার অস্ত্র নিয়ে ছোটে, যারা জ্ঞানতাপস তারা আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে। ভারতের লোক কি কেবল এই বলে যাবে যে, আমরা পরের বুলি সংগ্রহ করতে এসেছি, আমরা অজ্ঞান, আমরা অশক্ত, আমরা অকিঞ্চন? তা' নয়, এই বলতে হবে আমাদের গুরুর মুখ থেকে আমরা অমৃতবাণী এনেছি। সেই কথা বলবার শুভ সময়কে তোমরা শ্রদ্ধার দ্বারা পুণ্যময় কর। বাহির পৃথিবী থেকে অতিথি আসবে—তোমরা কল্যাণশঙ্খ বাজাও। তাদের বল, তোমরা শান্ত হও, সান্ত্বনা লাভ কর, তোমাদের ক্ষতবেদনা দূর হোক্।

ভারতবর্ষ আতিথ্যকে বড় ধর্ম্ম বলেছে, কেননা আতিথ্যের দ্বারাই বিশ্ব পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য,—সে যে খুব বড়, তাকে অল্প-পরিধির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। খাঁচার মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, তাতেই পাখীর

ডানার সম্পূর্ণ সার্থকতা মেলে না। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের হাওয়ার যোগসাধন করলে তবে ঘরের হাওয়ার কলুষ দূর হয়। অতিথি গৃহীকে গৃহকর্ম্মের একান্ত সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে আসেন। এইজন্যে অতিথিকে দেবতা বলা হয়েছে, কেননা দেবতাই বড়র সঙ্গে যোগের দ্বারা ছোটকে উদ্ধার করে।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্ম্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্ন-বস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করচি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্ম্ম সাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে! এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্ত্তনা, তোমাদের মঙ্গল-ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে।

১৩৩২ সনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করবার জন্য ঢাকা দীপালি-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক আহূত এক বিরাট মহিলা সভায় প্রদত্ত কবির বক্তৃতা। বর্ত্তমানকালে এর উপযুক্ততা আছে মনে কোরে প্রকাশিত হোল। জঃ সঃ

ততঃ কিম

অশোক সেন

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই দিন থেকে যেদিন ইংরেজ ভারতে পদার্পণ করেছে, নূতন করে একটি দিন ধার্য্য করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করা নিরর্থক।" হাজরা পার্কে জাতীয় দিবসে একজন বিখ্যাত বক্তা একটি সভায় উচ্চ কণ্ঠে একথা প্রচার করেন। তিনি বিস্মৃত হ'ন যে পৃথিবীতে একটি বিরাট যুদ্ধ চলছে এবং সেই যুদ্ধের ফলাফলের উপর পৃথিবীর অনেক দেশের ভাগ্য নির্ভর করচে। কাজেই ১৯৪০ সালের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কোন সময়েও ছিল না, সেই জন্য ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের ৬ই তারিখ হ'তে যদি কোন জাতীয় নেতা দেশবাসীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আহ্বান করেন তা হলে তারও একটি তাৎপর্য্য আছে যা আমাদের মনে রাখতে হ'বে। এই তাৎপর্য্য ব্যর্থ হ'বে যদি মজদুর ও কিষাণ শ্রেণীর নায়কগণ এই আহ্বানে সাড়া না দেন, তাঁরা যদি মনে করেন যে ওয়ার্কিং কমিটির পরিচালিত ন্যাশনাল কংগ্রেস একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেই প্রতিষ্ঠান থেকে যদি সংগ্রাম ঘোষণা না হয় তাহ'লে কোন সংগ্রাম ব্যাপকভাবে চলতে পারে না। ১৯৪০ সালের বিশেষ কি তাৎপর্য্য তাহা পরে আলোচনা করা যাবে।

যাঁরা ন্যাশনাল কংগ্রেসকে মুক্তি সংগ্রাম চালনা করবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন তা'রা বিস্মৃত হ'ন যে মুসলমানগণের সহিত দুর্ভাগ্য বশতঃ কংগ্রেসের সম্বন্ধ অতিশয় সামান্য। যে কংগ্রেস জাতীয় আহ্বান দিবে সেই কংগ্রেস হতে নিখিল ভারত কিষাণ সভার সম্পাদক স্বামী সহজানন্দ আজ বিতাড়িত। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর কোন স্থান নেই। বাংলার জনপ্রিয় বি, পি, সি, সি, এর সহিত সেই জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে। পাঞ্জাবের অহররগণ এতে নাই, এবং দেখা যাচ্ছে যে এই জাতীয় কংগ্রেসের পরিধি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হ'চ্ছে, একথাও এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে যারা স্বাধীনতা কামী কংগ্রেসে তাদের স্থান কোথায়? সাম্যবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে দেশের সর্বহারা কিষাণ ও মজুর এমন অবস্থায় এসে পৌচেছে যে দেশে Democratic Socialistic Republic প্রতিষ্ঠিত না হ'লে তাদের বেচে থাকবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাদের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের মধ্যে স্বল্প কয়েকজন নেতা যদি জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থাকেন এবং বাহির হ'তে বিরাট কিষাণ ও মজুর আন্দোলন গড়ে তোলেন তাহ'লে তার চাপে কংগ্রেস বিপ্লবের পথে জয় যাত্রা করবে। যদি না করে তা হ'লেত তারা আছেনই তারাই জাতীয় বিপ্লব আরম্ভ করে দেবেন। ঘনীয়মান, আসন্ন জাতীয় বিপ্লবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে কংগ্রেস, যা ভারতীয় হিন্দু ধনিক সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান তার নেতারা মজদুর ও কিষাণ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করায়ত্ত না করে কোন আন্দোলন আরম্ভ করবেনা। যে সকল সাম্যবাদী এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁরা যে ভ্রান্ত পথে যাচ্ছেন সে কথা বোঝা শক্ত নয়। সত্যকারের স্বাধীনতাকামীর স্থান আজকার দিনে কংগ্রেসে নাই।

তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা বিশেষ দরকার যদিও সে কথা সকলেই জানেন এবং তা বহুবার বহুস্থানে ব্যক্ত হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস যতদিন পর্য্যন্ত জাতীয় দাবী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আহ্বানে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করেছে তারা সাড়া দিবে। সেই সংগ্রাম লবণ নিয়েই হোক কিংবা অসহযোগ আন্দোলন-ই হোক। যে দিন কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট থেকে তাদের সর্ব্বস্ব দাবী করতে পারবে সেইদিনই কংগ্রেসকে জনসাধারণ দেশের জাতয়ীতা বোধের প্রতীক বলে সম্মান করবে, এবং দেশের অগণিত নরনারীর নিকট থেকে আত্মবলিদান লাভ করবে; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এই জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ লোককে ধোকা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নায়েবী গ্রহণ করেছিলেন, সেই নায়েবী গ্রহণ করে তাঁরা বোম্বায়ে মজুরদের উপর গুলি চালান এবং বেহারে কিষাণ আন্দোলন দমন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিছুদিন আগে রাজগোপালের মন্ত্রীত্বকালে সাম্যবাদের নেতা বাটলিবয়কে মাদ্রাজের কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং পণ্ডিত রাহুল সংকীত্যায়নকে লোহার বেড়ী পরিয়ে জেলে প্রেরণ করেন সেইদিন থেকে সাধারণ লোক বুঝতে পারল যে শ্বেত রাজার কাল গোলামের কেরামতী। এর পর যদি কোন লোক বিশ্বাস করে যে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে কংগ্রেস যে-কংগ্রেস আজ ভারতীয় ধনী সম্প্রদায়ের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়, তাহলে তাদের বিশ্বাসকে মধ্য যুগের ভক্তি ও বিশ্বাসের পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব করা চলে না।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ঘোষণাকে আইনের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। কংগ্রেসের প্রস্তাবকে যদি কেউ অমান্য করে তাহলে কারও শাস্তি হয় না। সেই জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্থান লোকের চিত্তে। সেই চিত্তকে যদি কংগ্রেস আলোড়িত করতে পারে তাহলে জনসাধারণের কাছ থেকে সে অনেক কিছুই দাবী করতে পারে। কিন্তু সেখানে যদি লোকের মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহলে কংগ্রেসের শত আহ্বানেও কোন লোক সাড়া দেবে না। যদি নেতৃত্বে কোন লোকের একচুল অবিশ্বাস থাকে তা হ'লে সে নেতৃত্ব কখনও কার্য্যকরী হয় না।

কিন্তু সাম্যবাদীদের মধ্যে অনেকেই বলে থাকেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের বুর্জ্জোয়াদিগের স্থান আছে। তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে, যে গণ-আন্দোলন বুর্জ্জোয়াদিগের মুখাপেক্ষী সেই গণ-আন্দোলন মেরুদণ্ডবিহীন। সেই গণ-আন্দোলনের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা এক পাও অগ্রসর হবে না। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে তার কি কোন দাম নাই। আমরা বলি তার দাম আছে

তা হচ্ছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। যদি কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন করবার মতন ইচ্ছে থাকৃত কিংবা দেশের এবং দশের চাপে তাদের বাধ্য হয়ে জাতীয় আন্দোলন করতে হত, তা হলে কংগ্রেস আগেই জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করে দিত। কারণ বর্ত্তমান হাইকমাণ্ডের জাতীয় নেতৃত্ব রাখা চাই। এই অবস্থায় তর্কের খাতিরে না হয় মানা যাক্ যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদিগের নেতা মহাত্মা গান্ধী সংকীর্ণভাবে জাতীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি যদি এ ধরণের কিছু করেন তা হ'লে এ অনুমান করা অন্যায় হবেনা যে তিনি পুনরায় দেশের একচ্ছত্র নেতা বলে ঘোষিত হবেন এবং হয়ত এও আশ্চর্য্য নয় যে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু, যিনি আপোষ-বিরোধী সংগ্রামে প্রতিশ্রুত, তিনি পর্য্যন্ত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। দলে দলে লোক জেলে যাবে। দেশের কাগজওয়ালারা উচ্চ কণ্ঠে গান্ধীবাদের জয় ঘোষণা করবে। এবং সেই সুযোগে গান্ধী মহারাজ জেলের ভিতরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি করবেন। গান্ধীর সহিত ব্রিটিশ সরকারের সেই আপোষ নিষ্পত্তির ফলে বুর্জ্জোয়াদিগের জন্য দুই একটি অর্থ-নৈতিক গ্রন্থি ঢিলে করে দিবেন এবং আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপ ঘটনা হলেও হতে পারত, যদি সাম্যবাদীরা প্রচার না করতেন যে মহাত্মা গান্ধী একবার আন্দোলন সুরু করে দিন তখন দেখা যাবে গণ-নেতৃত্ব কার হাতে থাকে। মহাত্মা এখন দোটানায় পড়ে গিয়েছেন। তিনি এখন ফিকির খুঁজছেন যে কি করে এক ঢিলে দু পাখী মারা যায়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধের প্রয়োজন বোধে সামান্য দর দস্তুরী করে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদিগের হাতে শাসনের ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং তার ফলে সাম্যবাদীদিগকে দমন করা। একথা বল্‌লে লোকের কোন আপত্তি হবে না বোধ হয় যে মহাত্মা সাধুও বটে বুদ্ধিমানও বটে। তাঁর সাধুত্বের ফলে সাম্যবাদীরা নিষ্পেষিত হতে পারেন এবং তাঁর বুদ্ধির জোরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের হাত হ'তে কিছু কিছু অধিকার বুর্জ্জোয়াদিগের থালায় পরিবেশন করতে পারেন।

কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানটির উপর গান্ধীকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হবে সেটী হচ্ছে Official Congress organisation; এই Official Congress organisationটির প্রতি বাঙ্গালীর এবং অন্যান্য প্রদেশের গণ-সাধারণের যে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তা মনে হয় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কৌশলে আয়ত্তীকৃত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণকে সত্যাগ্রহী সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাতে পারবে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ইতিমধ্যে দেশবাসী বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছে, যে শুধু জেলে গিয়ে দেশের কোন উপকার হয় না। সত্যকারের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রঙ্গমঞ্চের বীরত্বে পর্য্যবসিত করবার সাধ হয়ত খুব বেশী লোকের হবে না। দুই দুই বারের ব্যর্থতায় মহাত্মা গান্ধীর আস্থা হয়ত নিজের উপর বেড়ে গিয়েছে; কিন্তু জনসাধারণ যে পুনরায় তাঁর আদেশে যূপকাষ্ঠের বলি হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

অবশ্য একথা মানি যে লোকে বিশ্বাসের উপরই কাজ করে এবং যাঁরা নিজেদের একমাত্র

বিপ্লবপন্থী বলে মনে করেন, তাঁরা এই কথাই বলেন যে মহাত্মা গান্ধীর জনসাধারণের উপর অশেষ প্রভাব আছে। তাঁরা তাঁদের প্রচার কার্য্যের দ্বারা massকে গান্ধীবাদের প্রভাব হতে মুক্ত করবেন। কিন্তু এখানে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে তাঁদের কথায় এবং কার্য্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। জনসাধারণ বলতে যেমন কৃষক এবং মজুর বুঝায় তেমনি স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর লোক এবং কোটী কোটী বেকার যুবক সম্প্রদায়কেও বুঝায়। গত দেড় বৎসর ধরে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর কাজ এবং বক্তৃতা দ্বারা এই শ্রেণীর লোককে সম্পূর্ণ ভাবে না হোক আংশিক ভাবেও গান্ধীবাদের প্রভাব হতে মুক্ত করেছেন। কাজেই আশা করা গিয়েছিল যে সাম্যবাদীগণ সুভাষ বাবুর কাজকে নিজেদের কাজ বলে মনে করবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সাম্যবাদীর মধ্যে যে গোষ্ঠীটি সর্বাপেক্ষা মুখর তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বলেন, কী অসহ্য! শুধু শুধুই সমালোচনা কোনরূপ গঠনমূলক সংগ্রাম নাই! শুধুই exposure! এইরূপ সমালোচনাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতের সাম্যবাদীগণ স্বল্পবিত্ত সম্প্রদায়েরই একটি শাখা, যাঁরা বুর্জ্জুয়াদিগের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাস করেন। এই শ্রেণীর মার্কসবাদীকে রুষ দেশে menshevik বলা হ'ত। রুষ বিপ্লবে এদের অবদান সকল সাম্যবাদীই জানেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁরা চীনের দৃষ্টান্তের অবতারনা করেন। তাঁরা যে বুর্জ্জোয়া পরিচালিত কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মভাবে কাজ কচ্ছেন তার সপক্ষে এই কথা বলেন "চীনের Communist গণ কি জাতীয় নেতা চিয়াং কাই-শেকের সহিত একযোগে লড়াই করছে না। এই চিয়াং কাইশেক কি Communist দের সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু ছিলেন না।" তাই যদি সম্ভবপর হয় তা হলে তাঁরা যে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করছেন তাঁদেরই বা দোষ কি? এই সংযোগে কাজ করবার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সন্নিকটতর হবে না কি? এই প্রসঙ্গে এই কথা মনে রাখতে হবে যে চীন দেশ অতি অল্প দিন হল জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হয়। জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করা এক কথা, আর দেড় শত বৎসরের অধিক ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরেজদের তৈরি বুর্জ্জোয়াদিগের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা স্বতন্ত্র কথা। চেকোশ্লোভাকিয়াতে ধনিকগণ নিজেদের দেশ রক্ষা করবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই করেন নাই যদিও রুষ রাষ্ট্র তাদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। Colonial Countryতে বুর্জ্জুয়াদিগের Role কি, সে বিষয়ে পুস্তক পাঠ করে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা, এই বৈপ্লবিক যুগে তাদের আচরণ অনুধাবন করা অধিকতর সমীচীন ও শিক্ষাপ্রদ। মার্কসবাদীদের শাস্ত্রে বুর্জ্জোয়াগণ একটি বিশেষ পরিবেষ্টনে কতদিন বিপ্লবপন্থী থাকবেন সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া শক্ত। আমার মনে হয় যে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াগণ ১৯৩৬ সালের reform পেয়েই মোটামুটী ভাবে সন্তুষ্ট আছে। Federation সম্বন্ধে একটা সংগ্রাম-হীন আপোষ তাঁরা প্রতীক্ষা করে আছেন। ১৯৩১ সালের পরে ভারতীয় বুর্জ্জুয়াদিগের বৈপ্লবিক role শেষ হয়ে গিয়েছে। ১৯২৯ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁরা ছিলেন।

কারণ তখন দুনিয়া ব্যাপী Economic Crisis দেখা দিয়েছিল, সরকারী কাগজের দাম কমে গিয়ে অর্দ্ধেকে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল; শেয়ারের দাম কমে গিয়ে এমন এক জায়গায় এসেছিল---যে দিন ভারতীয় ধনিকের মনে হয়েছিল যে হয়ত একদিন সে গুলোকে কাগজের দরে বিক্রী করতে হবে। এই অবস্থায় তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর পেছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন এই আন্দোলন ধনীর দিক হতে সফল হল, তখনই মহাত্মা গান্ধী সেই আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন; জনসাধারণের লাভ ক্ষতির কথা কেউ ভেবে দেখলেন না। এই যুগ সন্ধিতে মহাত্মার সঙ্গে চিয়াং কাই শেকের তুলনা করা উচিত হবে না। তিনি আপোষ পন্থী। বেশী হাঙ্গামা না করে তিনি ইংরেজ সরকারের সহিত সম্মানজনক আপোষ করিতে চা'ন। চীনের প্রাচীন বামপন্থী নেতা ওয়াং চিং ওয়াইও জাপানের সহিত এইরূপ একটী ব্যবস্থা করতে চান। মহাত্মা গান্ধীর সহিত চীনের মহাত্মা ওয়াং চিং ওয়াই এর সহিত বরং তুলনা হতে পারে।

যে কথার অবতারনা করে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম সেটা এই যে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের—কটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সে তাৎপর্য্য আমাদের ভুললে চলবে না।

আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবস্থা অতিশয় শঙ্কটাপন্ন। দুমাস পরেই হোক ছ'মাস পরেই হোক পৃথিবীতে যুগের পরিবর্ত্তন ঘটবে। যদি এই মহাসমরের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তখন ভারতে যে ভয়াবহ লোকক্ষয়কর অন্তর্বিপ্লব ঘটবে তাতে সন্দেহ নাই। সেই দিনের জন্য অন্ততঃ বিপ্লবীদের একটি সুচিন্তিত কর্ম্ম পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে হ'বে। সেদিন যদি আমরা মনে করি যে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে পারবে তাহলে আমাদের কিছুই করবার নেই। কিন্তু মহাত্মাজী বিপ্লব-পন্থী নন'। তিনি ধনীসম্প্রদায়ের বন্ধু এবং জমিদার ও ব্রিটিশ করদরাজ্যদিগেরও বন্ধু। এদের অধীনস্থ সমস্ত শক্তি তখন সম্মিলিত হবে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কোটী কোটী নিরস্ত্র নিপীড়িত বুভুক্ষু জনসাধারণ, যদি সাম্যবাদের পতাকাতলে এদের আনা যায় তাহলেই ভারতের গণবিপ্লব জয়ী হবার সম্ভাবনা; কিন্তু আজ যাঁরা গণবিপ্লবের নেতা তাঁদের শক্তি ছিন্নভিন্ন। বহুধা বিভক্ত বামপন্থীগণের সাধ্য কি যে ভারতের অন্তর্বিপ্লবে সম্মিলিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করে। আর একটি সম্ভাবনা আছে যে ইংরেজের ক্ষমতা অন্যত্র নিয়োজিত হলে তারা তাদের সরকারী ক্ষমতা এমন একটি দলের হাতে দেবেন যে দলটি ভারতের অন্তর্বিপ্লব দমন করতে পারবে। ভারতীয় Communist Partyর চেষ্টার ফলে যদি তখন সর্বত্র এই ধ্বনি উত্থিত হয় "all power to Congress." তা হলে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসকেই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা ভুল হবে না। ভারতের Communist গণ, কৃষকেরও বন্ধু শ্রমিকেরও বন্ধু তাঁদের অনেক কর্ম্মী কিষাণ ও শ্রমিকক্ষেত্রে তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে তাদের নায়কত্ব অর্জ্জন করেছেন। কৃষক ও শ্রমিকগণ তাদের নিতান্ত অজ্ঞাতসারে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনীত হয়েছে। যখন তাদের কাছে

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল-রূপ বুঝিয়ে দেওয়া হবে তখন সাম্যবাদীদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বলিত কর্ম্ম পদ্ধতির কি অবস্থা হবে তাকি তাঁরা ভেবে দেখেছেন ?

অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের অবদান যে কতবড় তা তাঁরা অস্বীকার করলেন। তিনি যদিও বামপন্থী তা হলেও তাঁর স্থান কোন একটি বিশেষ দলের সহিত জড়িত নয়। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র প্রতীক। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের মনে আশার সঞ্চার করে দিয়েছেন। যে ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের সহকর্ম্মী হয়ে দেশের কৃষক ও মজুরদের অবস্থার সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করতে পারে নাই, যাঁরা গৌণতঃ ও মুখ্যতঃ ব্রিটিশ শাসকদের মূল নীতি অনুসারে এতদিন কাজ করে এসেছিলেন সেই জাতীয় কংগ্রেসের স্বরূপটি বিদ্রোহী সুভাষ চন্দ্র শত শত জনসভায় প্রচার করে লোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। তিনিই একমাত্র যিনি বুঝিয়ে বলেছেন যে হিন্দু মুসলমানদের বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব তখনই চলে যাবে যখন আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হব। তিনি হিন্দু হোয়েও এই একটি বিরাট সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাতে করে আশা করা যায় যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ অন্তর্হিত হবে, এবং ভারতবর্ষের এই দুটী সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

ভারতীয় Communist Party সম্পর্কে হয়ত তাঁরা সেই মতের কোন একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা সম্বলিত কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাস করেন। সেই অতিশয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে সাধারণ লোকের নিকট সুপরিস্ফুট করবার ক্ষমতা এই প্রবন্ধ লেখকের নাই। শোনা যায় এই কর্ম্ম পদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে কলিকাতায় ধাঙ্গড় দিগের ধর্ম্মঘট এবং বোম্বায়ে কাপড়ের Millএর শ্রমিক ধর্ম্মঘট, এইরূপ ধর্ম্মঘট এবং কৃষকদিগের অর্থ নৈতিক অভিযোগ চলতে থাকবে! শোনা যায় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মঘট এবং কৃষক আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দিবে যখন কংগ্রেস থেকে National Call আসবে। কারও কারও মনে হতে পারে যে অর্থনৈতিক অভিযোগ আশ্রয় করে শ্রেণী সংগ্রামকে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক সংগ্রামে নিয়ে যাওয়া কেতাব দুরস্ত মার্কসপন্থীদের কাজ হতে পারে কিন্তু এর জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দখল করবার মত সে সময় হয়ত পাওয়া যাবে না। এই কথা আজকার দিনে মনে হয় যে বর্ত্তমানকালে এই শ্রেণী সংগ্রামের কয়েকটা ধাপ বাদ দিয়া যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা অধিকার করা যায় সেইরূপ কোন কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবনা করা কি সময়োপযোগী নয় ?

এই প্রসঙ্গে একটি সামান্য কথা বলে রাখতে চাই। যাঁরা সত্যকারের বিপ্লবী তাদের পক্ষে বৈপ্লবিক আত্মীয় খুঁজে বের করা শক্ত নয়। কিন্তু যারা বৈপ্লবিক শ্রেণী হতে আসেন নাই এবং যাহাদের সকল সহকর্ম্মীরাই স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর লোক, এবং যাঁরা শ্রমিক এবং কিষাণদের শুধু দরদী তাঁদের পক্ষে মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রামের কথা বুঝা যেমন সহজ তেমনি পরিবর্ত্তনশীল সমাজের

বিভিন্ন মুহূর্ত্তের বিভিন্ন সমস্যা ও শ্রেণীসজ্ঘাতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সত্যকারের কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবন করা শক্ত। কারণ যে শ্রেণীর নেতা তারা হয়েছেন তাঁদের সহিত তাদের নাড়ীর কোন টান নাই। কোন শ্রমিক এবং কৃষক কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কেন শোষক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত না হলে তাদের মুক্তির কোন আশা নেই। ভারত ইতিহাসের কোন অভিজ্ঞতা সম্যকভাবে আয়ত্ত করা শক্ত। কারণ ধর্ম্মঘট ব্যতীত জাতীয় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কম্যুনিষ্টদের অল্পই আছে। জাতীয় সংগ্রামের পরিধি যে কত ব্যাপক, এর মধ্যে কত প্রকারের শক্তি, স্বার্থের সজ্ঘাত কাজ করছে তার সমস্যা উপলব্ধি এবং বিশ্লেষণ করা অতিশয় সুকঠিন কাজ। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্টগণ কতকগুলি স্থূল কথার উপর কাজ করছে। যেমন কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান; এর মধ্যে বিভেদ আনা আত্মঘাতী পাপ। এই কংগ্রেসকে জনগণের নেতৃত্ব রাখবার জন্য গণ-আন্দোলন পরিচালনা করবার ভার নিতেই হবে। এই গণ-আন্দোলন আরম্ভ হলে সত্যকারের গণনেতাদের উপর গণনেতৃত্ব চলে আসবে। এ যুক্তি যেমন সত্য তেমনিই মিথ্যা। সত্য শুধু এই দিক থেকে যে তারা জানেন যে ইংরেজ আজ আংশিক ভাবে বিপন্ন। এই বিপদের মাত্রাটা একটু বাড়লেই ইংরেজের হাত থেকে তাঁরাই সত্যকারের স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করবে যাঁরা সেদিন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার থাকবেন। ইংরেজ বেশ জানে দ্বৈতশাসনমূলক reforms তারা দিয়েছিল আগের বারে যে বুর্জ্জুয়াদিগের হাতে, তারা অতিশয় অবহেলায়, বোকামী করে Indian National Congressএর কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করেছে। এবারকার Working committee আগেকার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ হতে অনেকাংশে অভিজ্ঞ এবং কর্ম্মকুশল। তাঁরা অর্থবলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব বজায় রাখবেন। তারাও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনসংস্কার গ্রহণ করেছিলেন এবং জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, যে তারা এই শাসনপদ্ধতি ভাঙবার জন্য মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। অসন্তোষ লোকের মধ্যে বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস হাতে থাকাতে সেই অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নাই। কংগ্রেস-নেতৃত্ব এক হাতে রেখে এবার তাঁরা চেষ্টা করছেন। অপর হাতে তাঁরা বৃটিশ-সরকারের সহিত দর কষাকষি করছেন তাঁদের একটু দাম বাড়িয়ে দেবার জন্য। এও সম্ভব যে তাঁরা গণনেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য তাঁদের সুশাসিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্যাগ্রহীর দ্বারা স্থানে স্থানে সামান্য ভাবে আন্দোলন চালাতে পারেন। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আপোষ। এই আপোষটি যখনই সম্পন্ন হবে তখন গণ-আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করলেও গায়ে কাটা দিয়ে উঠে।

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আজ বাঙ্গলা দেশে ওয়ার্কিং কমিটী পরিচালিত কংগ্রেসের ওপর জনসাধারণের একটী তীব্র বিদ্বেষ ভাব আছে। বাঙ্গলা দেশের আত্মসম্মানকে তাঁরা প্রবলভাবে ঘা দিয়েছেন। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং কার্য্যকলাপ বাঙ্গালা দেশে যতটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে অপর কোথাও সম্ভবতঃ সেইরূপ নগ্ন বিভৎস রূপ ধারণ করে নাই। এই নিয়ে বাঙ্গলার জনসাধারণের একটা সত্যকারের অভিযোগ আছে।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে এড্ হক্ কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত B. P. C. C. বাঙ্গালার Communist Party স্বীকার করে তাঁদের সহিত একযোগে কাজ করছেন। এর চেয়ে বড় অপমান বাঙ্গালী কারও কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত পায় নাই।

আজকার দিনে যা সকলের চাইতে বড় প্রয়োজন তা বামপন্থীদিগের সংহতি। বামপন্থীগণ সংহত হলে তাঁরা আসন্ন সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ বন্ধ করতে পারেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে একটী বিরাট অংশের সাহায্য লাভ করতে পারেন। কারণ তারা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের সহিত কখনও একযোগে কাজ করবেন না, যেহেতু মুসলমান সমাজের অধিকাংশ লোকই গরীব এবং উৎপীড়িত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সংহতি কখনই সাম্যবাদীদের প্রোগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ জনসাধারণের নিকট তাদের কর্ম্মপদ্ধতি অতিশয় উদ্ভট মনে হয়।

তথাকথিত Communist বিপ্লব পন্থীদিগকে বাদ দিলেও দেশে বামপন্থী অনেকেই আছেন যাঁরা আজ তাঁদের প্রভাবে পড়েন নাই। তাঁরা যদি সুভাষ বসুর পতাকাতলে আসেন তাহলে আশা করা যায় যে সত্যকারের আপোষ বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। সুভাষবাবু বক্তৃতা ছাড়া কোন struggle করছেন না; এ কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়। struggleএর মধ্যে বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে এতদিনের অনুসৃত ভ্রান্ত পথ হতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পথে আনয়ন করা যে প্রকাণ্ড বড় কাজ তা' যারা স্বীকার না করেন তাদের সহিত যুক্তি তর্ক করা নিরর্থক। সুভাষবাবুকে কোন একটী হটকারী কাজের মধ্যে ফেলে তাকে কর্ম্মক্ষেত্র হোতে অপসারিত করা যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁরা সাধারণ বামপন্থী তাদের সকলেরই ইচ্ছা যে তিনি বাইরে থেকে আপোষ বিরোধী মনভাব সকলের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন। এই ভিত্তির উপর যে organisation গড়ে উঠবে তা ভারতবর্ষে নূতন যুগের অবতারণা করবে।

এই প্রবন্ধে বাঙ্গালীর প্রতি একটী বিশেষ নির্দ্দেশ দিতে চাই। বাঙ্গালী যেন ভুলেও মনে করেন না যে—ওয়ার্কিং কমিটী পরিচালিত কংগ্রেস হতে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের বল কমে যাবে। তাঁদের মধ্য থেকে যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয় তাহলে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। জাতীয় ঐক্যের বুলিতে যদি বাঙ্গালী বোম্বায়ের ক্রোড়পতি চালিত কংগ্রেসের নিকট হতে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাঁদের সেই অপমানকে স্বীকার করা রাজনৈতিক মৃত্যুর কারণ হবে। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার অধিকার প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আছে। আমি বাঙ্গালী, আমি ত্রিশঙ্কুর ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঝুলতে চাই না আমার সকল কাজ এবং সকল প্রচেষ্টা বাঙ্গালার সহিত জড়িত। আমি বাঙ্গলার স্বাধীনতা এবং সাতন্ত্র্যের জন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত যদি এইরূপ মনোভাব কারও থাকে তা হলে সে মনোভাব রুষদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি শ্রদ্ধা করবে। যে সকল বাঙ্গালী বোম্বাইএর পতাকাতলে নিজেদের আত্মবলিদান করছেন তাদের সঙ্গ যেন সকল বাঙ্গালীই পরিহার করেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা যারা জাতীয়তাবাদী তাদের কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। আমরা মার্কসবাদকে শ্রদ্ধা করি এই জন্য যে শ্রেণী সংগ্রাম কিংবা জাতীয় সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের মতন শক্তিশালী অস্ত্র আর নাই। কিন্তু কোন কোন দলের হাতে এই অস্ত্র পলায়নের পথ সুগম করে, আর কাহারো হাতে এই অস্ত্র আক্রমণ ও শত্রুকে ধ্বংস করতে সহায়তা করে। যাঁরা সাম্যবাদীদিগের মধ্যে সাহসী তাঁরা দ্বিতীয় পথই গ্রহণ করবেন আশা করা যায়।

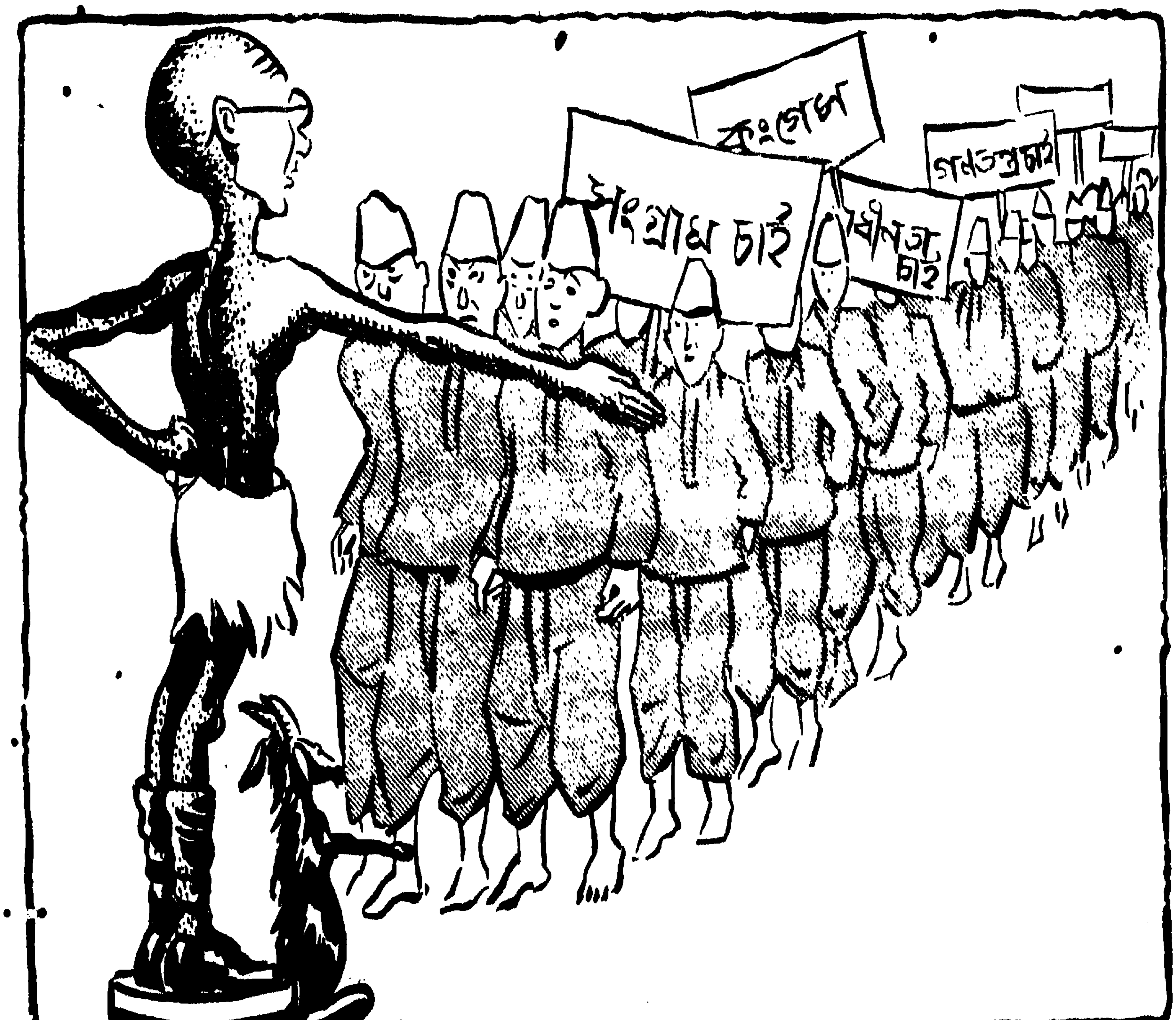

রোড ক্লোজড্

দিনের কবিতা

যজ্ঞেশ্বর রায়

সর্ব অঙ্গে জ্বর লয়ে পুড়িছে আকাশ,—
তামাটে আকাশ। মেঘের প্রলেপ নাই ;
পাখীরা কোথায় গেছে, দেয়না বাতাস।
শ্বাস কষ্টে ফুস্‌ফুস্‌ করে হাঁই পাই।

কালো পিচ গলে যায় মোটারের তলে।
ফুট্‌পাথে "ম্যায়্‌ ভুখা" নিজ রক্ত খায়।
তাম্র-মুখ জনতার সঙ্‌-যাত্রা চলে ;
—দেয়াল-ছবির মেয়ে ডাকে ইসারায়।

পান্থশালা-দোর খোলা—পানপাত্র ভরা—
কর্ম্মহীন শ্যাম চক্ষু,—দৃষ্টি বিষ মাখা
ছেঁড়া সোল ফট্‌ফট্‌—বিড়ি জ্বলে কড়া
—রূপালী লোহার পথে ট্রাম আঁকা বাঁকা।

গৃহচূড়ে শকুনীরা অট্ট হাসি হাসে,
জ্বলে বিশ্ব, দাব-দাহে চক্ষু বুজে আসে॥

সাতটী লাল রবিবার

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম রবিবার—লাউড স্পীকারের বিশ্বাসঘাতকতায় সভা পণ্ড

ওয়ার্ড থিয়েটারে আমাদের সভা বসবার ঠিক হ'য়েছে। ওয়ার্ড থিয়েটারটা হল ঠিক ট্রাম লাইনের ধারে চওড়া বড় রাস্তার ওপরেই। থিয়েটারের লাগোয়া বিয়ারের দোকানী একটার পর একটা গ্লাস ভর্ত্তি করে চলেছে। কোণটার যেখানে রাস্তাটা চওড়া হ'য়ে গিয়ে চৌমাথায় মিশেছে, তিনজন ফিরিওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিনিস বিক্রী করছে। একটা বুড়ী তার গলায় ঝোলান ট্রে থেকে সাবান তুলে সবায়ের দিকেই বাড়িয়ে ধরছে।

থিয়েটার হলের ভীৎ বেশ উঁচু। আমাদের দলের লোকেরাই এটা তৈরী করেছে। সিণ্ডিকেটের একজন সভ্য বলল 'প্রথম তলায় এক ফুট চওড়া একটা লোহার কড়ি আছে; কড়িটা এত মজবুত যে অনায়াসেই আট হাজার লোকের ভার বইতে পারে। বিস্কের এক কারখানায় ও জন্মেছে, মজুরদের নৈপুণ্যে আর হাতুড়ীর ঘায়ে ও বর্ত্তমান আকার পেয়েছে, হাজার হাজার মজুরের ভারেও ও নুইবে না। আমাদের বক্তৃতা আর চীৎকার যখন ওর কানে গিয়ে পৌঁছুবে তখন আনন্দে ওর বুক ফুলে উঠবে। এই সেদিনও ও যখন কারখানায় ছিল মজুরদের কথাবার্ত্তার শব্দ ওর কানে গিয়েছে—সেই একই ধরণের কথা একই ভাষা ও আবার শুনবে। সাধারণতন্ত্র বা ব্যবস্থা-পরিষদের ও কিছুই জানে না। ও জানে মজুরদের সংঘ, প্রতিনিধির দল, চাঁদা, আন্দোলনের উত্থান পতন, মজুরদের ধর্ম্মঘট, ইচ্ছাকৃত কাজ পণ্ড করা আর বর্জ্জন। হলের মধ্যকার বড় বড় থাম দুটোও ঠিক এই কথাই বলবে। থিয়েটারের অন্যান্য অংশগুলো, কড়ি বরগা, বাঁকে লুকানো আলোগুলো, দরজা ও দরজার পর্দ্দাগুলো, কাঠের চেয়ারগুলো আর যন্ত্র সঙ্গীতের জন্যে তৈরী মঞ্চটা সবাই ঐ এক কথাই বলবে। নাট-বলটু—ঝাপসা আলোর কাঁচ—যন্ত্রপাতি—কারখানার মজুরী—ঝগড়া—ষ্ট্রাইক আর বিদ্রোহ! কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যদি কোন রবিবার রাত্রে এই থিয়েটারে নাচিয়ে মেয়েদের পায়ের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ত কি এসে যায়। একজন বুর্জ্জোয়ার কাছে এটা হল থিয়েটার—শুধু নাচগানের রকমারী—হাঁটু আর উরুৎ। এদের বিয়োগান্তক নাটক হল সাধারণ আইনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মিলনান্তক নাটক হল সব চমৎকার চমৎকার দৃশ্য আর কথার আড়ালে নোংরামি। সুন্দরী মেয়েরা তাদের উরুৎ দেখাবেই—থিয়েটার যদি চালাতেই হয় ত সুন্দরীরা ঘাঘরা তুলে নাচবেই। কড়ি বরগা আর থামের কাছে এগুলো অর্থহীন। কিন্তু আজকের সভায় এই লোহা আর কড়ি বরগা যেন

তাদের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। "অত্যাচারের বিরুদ্ধে!" "যে সমস্ত কমরেড জেলে আছে তাদের মুক্তির জন্যে?" থিয়েটার আজ যেন হাসছে।

থিয়েটারের বারান্দায় যে দলটী দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে প্রগ্রেসো গণজালে বলল, আজ প্রথম সে ছুটী পেয়ে থিয়েটারে এসেছে—এর আগে তার ভাগ্যে কখনও এরকম ছুটী জোটেনি। দরজার ওপর ঝুঁকে পড়ে ন'খ দিয়ে তার পা'জামায় লাগা শুকনো আলকাতরা খুঁটতে খুঁটতে সে কথাগুলো বলল তারপর হঠাৎ রাস্তায় ট্রামে তার এক বন্ধুকে দেখতে পেয়ে ছু'হাতের ছু'টো আঙ্গুল মুখের মধ্যে পুরে জোরে শিষ দিয়ে উঠলো "একতা চাই।" "জমি আর স্বাধীনতা চাই!" চীৎকার করে বন্ধুকে সে সম্বর্ধনা করল। এই প্রগ্রেসো যখন থিয়েটার তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল তখন একদিন পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনমাস ওর জেল হ'য়েছিল। ছাড়া পাবার পর মনে মনে ভাবল, এইবার গিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসতে হ'বে আর কাজ কতদূর এগিয়েছে দেখেও আসতে হ'বে। থিয়েটারের অনেক ইটই তার হাতের গাঁথা। প্রগ্রেসো বেশ উঁচুদরের মজুর—খুঁটিনাটি সব কাজেই তার নজর ছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা সে হাজির হল থিয়েটারে। —বাঃ দেয়ালগুলো কি চমৎকার হয়েছে! রেখাগুলো কি সুন্দর! ইস্পাৎগুলোকে বেঁকিয়ে কি চমৎকার করেছে! চারদিকে কাঁচ আর আলোয় সব ঝল্‌মল্ করছে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আর হাসলো। ছু'জন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে লোভীর মত দেয়াল চিত্রে আঁকা মেয়েদের উরুৎএর দিকে তাকিয়েছিল—প্রগ্রেসো তাদের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে একটা সিগারেট ধরাল—আর আধখানা দেশলাই পকেটে রেখে তাদের মুখের ওপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিল। জেল থেকে রোজ ত আর কেউ ছাড়া পায় না! প্রগ্রেসো এগিয়ে গেল। থিয়েটারের নাম লেখা। 'পারানিমফরায়ল'—কি সুন্দর নাম! থিয়েটারের মালিক লোকটা নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমান! বিকেলের দিকে সেদিন আর কোন অনুষ্ঠান নেই—ভালই হ'য়েছে। ভেতরে গিয়ে সবটা একবার সে চোখ বুলিয়ে নেবে আর দেখবে যদি তার যন্ত্রপাতিগুলোর কোন খোঁজ পায়।

থিয়েটারের পরিচালক তখন থিয়েটারের লাগোয়া মদের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন—প্রগ্রেসো তাঁর সামনে এসে বলল, সে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

প্রগ্রেসো তার মাথা থেকে টুপি নামায়নি। ভদ্রলোক তার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন। দৃশ্যটা তাঁর কাছে যেন কেমন কেমন মনে হল। প্রগ্রেসো জানাল তার কি চাই। পরিচালক বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন 'এখানে কারো যন্ত্রপাতি রাখা নেই আর তোমারও কোন দরকার নেই এখানে—যাও।'

—'কিন্তু এখানে ছমাস কাজ করেছিলাম যে।'

—কাজ করেছিলে ত তার মজুরিও পেয়েছ—যাও—ভাগো।' পরিচালক দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। আর প্রগ্রেসো ভেতরে সিঁড়ির দিকে হাত দেখিয়ে বলল 'আমি ওপরে

যাচ্ছি—আমার সব দেখা শেষ করে ফেরার পথে তোমাকে বিদায় জানিয়ে যাব—আর যদি ইচ্ছে যায় ত কিছুক্ষণ থেকেও যেতে পারি'। তারপর দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল 'এ সব যা দেখছ এগুলো তোমার চেয়েও আমার আপনার বেশী—তোমার চেয়েও আমার অধিকার বেশী এর ওপর'। কথা বলতে বলতে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চড়ে গেল। পরিচালক কি একটা বলতে গেলেন কিন্তু এক মুখ বিয়ারে গলা আটকে বিষম লেগে কাশতে লাগলেন—তারপর দৌড়ে গেলেন টেলিফোনের কাছে। 'দূর ছাই! আমার নম্বরটা আবার জরুরী নম্বরগুলোর মধ্যে নেই—নম্বরটা আবার কত—92741 না 92417; হ্যাঁ' ইতিমধ্যে প্রগ্রেসো দোতলায় অদৃশ্য হয়েছে। ওপরে উঠে প্রথমে ধীরে সুস্থে সে সব দেখতে লাগল। লোহার কড়িগুলো সমানভাবে আছে কিনা? কাঠের কড়িগুলো কি কাঠ? দালানটা তার ভালই মনে হল। বিজলীর তার যে কোথা দিয়ে নিয়ে গিয়েছে তা সে খুঁজে পেল না। মোটের ওপর যা দেখল তাতে সে সন্তুষ্ট। টোকা মেরে কড়িগুলোয় শব্দ করে—থামগুলো চাপড়ে সে উঠে গেল সারি বাঁধা আসনগুলোর ওপর। নীচে তাকিয়ে দেখল কাঁচের ভেতর দিয়ে গোলাপী আলো নীচে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সেখানে বসে বসেই সে শেষ করল—কিন্তু 'পারাণিমফরয়েল' কথাটার মানে কি?

প্রগ্রেসো যখন নীচে নামবার যোগাড় করছে ততক্ষণে দু'জন পুলিস এসে পড়েছে সিঁড়ির গোড়ায়। তারা প্রগ্রেসোকে দেখে রিভালবারএর জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল। প্রগ্রেসো তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'নীচে নেমে এস'—নীচে থেকে বলল। প্রগ্রেসোর মাথায় হঠাৎ কুবুদ্ধি চাপল। সে জিগেস করল, 'কি জন্যে? তোমরা কি আমার ছবি তুলবে নাকি?'

নীচে থেকে ওরা আবার বলল 'শীগগীর নেবে এস।' প্রগ্রেসো যেন রিভালবার বার করছে এই রকম ভাব দেখিয়ে খালি পকেটে হাত পুরে বলল 'তোমরা যদি আমার ছবি তোল ত বেশ আমার কোন আপত্তি নেই।'

শেষে অবশ্য প্রগ্রেসো ধরা পড়ল। একজন সার্জেন্ট তার চালান লিখল এই বলে যে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে আবার স্বাধীনতা হারাবার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছে। প্রগ্রেসো তর্ক করল "সবায়েরই ত ছেলে বৌ আছে—যে নিজে দেখা শোনা করতে পারে ভালই আর না হ'লে পাড়াপড়সী ত আছেই; কিন্তু হাতের কাজ হল ছেলে বৌএর বাড়া—আমাদের হাতের কাজ হল আমাদের সত্যিকারের ছেলে মেয়ে—কাজের মজুরীর চেয়েও কাজটা আমাদের অনেক আপনার। তোমরা জিনিসগুলো যেভাবে দেখ তা হল নীচ বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি—আর তা মিথ্যে!" প্রগ্রেসো অবশ্য কথাগুলো বলেনি তবে এই কথাগুলো যে তাঁর রক্তের সঙ্গে সে সময় ফুটছিল তা সে অনুভব করেছে।

প্রগ্রেসো তার দলের সঙ্গীদের কাছে গল্পটা বলে একচোট হেসে নিল। সকালের সূর্য্য আকাশে শান্তির আশীর্ব্বাদের মত দেখা দিয়েছে। দল ক্রমেই বাড়ছে। থিয়েটার হলের

অর্দ্ধেকটা ভরে উঠেছে। সামার লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে পড়ল। তাকে দেখতে মাঝামাঝি ধরণের—বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। দলের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানাল। সামার ঘাড় নেড়ে তাদের উত্তর দিল। গ্যালারীর দিকে চোখ তুলে আমায় দেখল—গ্যালারীগুলোয় মে মাসের সূর্য্যের আলোয় ঝিলমিল করছে। সভা বসতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী আছে। আজকের সভা যে খুব বেশী জরুরী তা নয়—কতকটা নিয়ম মাফিক। মানুষের ও ঈশ্বরের গড়া আইনগুলোর বিরুদ্ধে সিণ্ডিকেটগুলোর লড়াইএর এ একটা উদাহরণ শুধু। সমাজ-তন্ত্রী, সাধারণতন্ত্রী পুরোহিত আর সেনাধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে লড়াই। কিছুদিন ব্যবস্থা পরিষদ নিয়ে যারা গলাবাজী করেছিল সেই বুর্জ্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই—নাক উঁচু বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে এমন কি সময় সময় নিজেদের বিরুদ্ধেও। দেখে শুনে সামার একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যেন। সে ভাবলে লোকগুলো কি চায়? তাদের ইচ্ছেটা কি? নিজেকে কতবার সে এ প্রশ্ন যে করেছে। তবু আজও সে এদের পূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যে এদেরই একজন কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?

কিছু জিনিসপত্র হাতে করে ষ্টার গ্রাসিয়া এল—ভীড়ের মধ্যে সে কাপড়ের লাল্ গোলাপ ফুল বিক্রী করছে—জেলে আবদ্ধ কমরেডদের সাহায্য উদ্দেশ্যে। কাজে সে এমন তন্ময় যেন পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। সামারের সামনে এসে সে তার কোটের বোতাম ঘরে একটা ফুল পরিয়ে দিল গম্ভীরভাবে। কিন্তু এই গম্ভীর ভাব বজায় রাখা তার পক্ষে মুস্কিল হয়ে উঠল—একবার ঠোঁটের ডগায় হাসি আসতেই তার সব গাম্ভীর্য্য গেল উপে। সামার তার হাতে একটা শিলিং গুঁজে দিয়ে দুষ্টুমি করে ভিলাকাম্পার কথা জিগেস করল। ষ্টার অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে ভ্রূ তুলে তাকে শাসনের ভঙ্গীতে বলল 'শোন—আমি ভিলাকাম্পার বিষয় শুনতে চাই না' কথা শেষ করে সে ভেতরে চলে গেল—তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল বারান্দাটা যেন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে থিয়েটারের মধ্যে ভীড় ক্রমেই বাড়ছে, দুজন কমরেড ওপরে উঠে লাউড স্পীকারগুলো ঠিক্ করবার কাজে লেগে গেছে। একটা বুড়ো লোক তার প্রায়ান্ধ চোখ আর সাদা দাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গুণ গুণ করে গাইছে "ইণ্টার ন্যাশানাল।" বিপ্লবে বিশ্বাস তার শিরদাঁড়া সোজা করে দিয়েছে। অন্যরা বই আর পত্রিকা বিক্রী করছে ঘুরে ঘুরে। থিয়েটারের সামনেটা নানারকম পোষ্টার আর কার্টুন ছবি দিয়ে সাজান হ'য়েছে। পতাকাগুলোয় সি, এন, টি, এফ, এ, আই (National confederation of labour, Federation of Iberian Anarchists) লেখা। সি' এন, টি লেখাটা 'পারাণিমফ'এর পর 'রয়েল' কথাটার মানে বদলে দিয়েছে। সাধারণতন্ত্র পত্তন হ'বার পর স্পেনে রয়েল কথাটার আর কোন অর্থ নেই। দূরে মজুর বস্তীর একটা গীর্জ্জার ঘণ্টা বৃথাই বাজছে—শোনবার কেউ নেই সেখানে। ছোট খাটো দোকানদার আর শিল্পীরা রবিবার গায়ে দেবার কোট চড়িয়ে আধ খোলা কপাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে—ব্যাপার কি? হঠাৎ কোন পথ চলতি মোটরকারের কাঁচে সূর্য্যের আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে এসে পড়ল দাঁতের ডাক্তার আর ধাইএর ঝক্‌ঝকে সাইনবোর্ডের ওপর।

সবায়ের' ঠোঁটের ডগায় আর মুখের ভাবে রক্ত আর বিপ্লব। সি, এন, টি, এফ, এ, আই আদ্যাক্ষরগুলো যেন বাতাসে দুলছে। সামাজিক বিপ্লবের সব কিছু নির্ভর করছে সব কিছু অস্বীকার করার ওপর। "রাজনীতি নিপাত যাক, মিলন চাই না, ভোট চাই না সন্ধি চাই 'না— চাই সোজাসুজি লড়াই।" প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে তর্কাতর্কি। ব্যাজ আর শ্লোগান নিয়ে ঝগড়ার পর ঠিক হল এই সম্মেলনের নামের আদ্যাক্ষর থাকবে—সি, এফ, এ, এন, আই, টি। দশটা বাজতে পাঁচের সময় দেখা গেল হলের মধ্যে আর তিল ধারণের স্থান নেই। থিয়েটারের সামনে রাস্তায় হাজার হাজার লোকে ভরে গিয়েছে। রবিবারটা কেমনভাবে কাটাবে সে কথা ভেবে কেউ কেউ পকেটের পয়সা গুণছে—আর মাঝে মাঝে হতাশভাবে লাউড স্পীকারের দিকে তাকাচ্ছে। লাউড স্পীকারের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে—কেউ বক্তৃতা দেবার আগে গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে যেন। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তাটা অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

"আর ন্যায় বিচার! ভগবানের ন্যায় বিচার? শাসনতন্ত্রের ন্যায় বিচার? না প্রগ্রেসো যে এই থিয়েটার গড়েছিল—তার ন্যায় বিচার কোনটা ঠিক?" কিন্তু ন্যায় বিচারই সব নয়— ওটা হল শুধু শ্লোগান।

সূর্য্যের আলো দেয়ালে লেগে ঠিকরে পড়ছে; একটী তরুণী মেয়ে সামনের এক বাড়ীর দোতলা বারান্দা থেকে গীর্জ্জায় যাচ্ছে দুজন যুবককে ডেকে বলল 'আজ প্রথম আমি নাচতে যাব—আর আজ বিকেলে স্নানও করব ভাল করে—রাত নটা আন্দাজ তোমরা আসতে পার' রাস্তায় যেন বিবাহোৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছে। মেয়েটীর গলার স্বরে ফুলশয্যার সগুপ্ত বাসনা লুকিয়ে রয়েছে। স্বচ্ছন্দে সে মজুরদের কাছে তার নগ্নতার ইঙ্গিত করল—সে তার উন্নত বুক আর অনাবৃত বাহু দিয়ে সকালের সূর্য্যকে অলঙ্কৃত করছে। ষ্টার আবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার হাতে বই আর কাগজের বাণ্ডিল। তার গায়ের লাল জামার ছায়া দেয়ালে পড়তেই সে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠল আর লজ্জায় সে পালাল।

"রাজবন্দীদের সাহায্যের জন্যে বই কিনুন। ফাসিস্ত-স্যোসালিষ্টদের উচিৎ জবাব দিন। দাম দু'পেন্স। সম্মিলনের ব্যাজ কিনুন।" বাঁ হাতে বুকের ওপর জিনিসগুলো ধরে তুলে তুলে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা চেয়ারে ভিলাকাম্পা বসে। চোখের পাতার ওপর ভেঙ্গে পড়া একগোছা কোঁকড়ান চুল হাত দিয়ে সরিয়ে ঠোঁট কামড়ে ষ্টার অন্যদিকে চোখ ফেরাল। হলটা ভরে উঠেছে মানুষের মাথায়—দুদিন খাটুনির পর এরা আজ বিশ্রাম নিচ্ছে যেন। এদের মুখে বিরক্তি বা অধৈর্য্যের চিহ্নমাত্র নেই। চেনা মুখগুলোর দিকে ষ্টার হাসি মুখে চাইছে। দোরের কাছে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল। একজন যুবক তার রিভালবার উঠিয়ে একটা লোককে বেরিয়ে যেতে বলছে। প্রগ্রেসো দৌড়ে গিয়ে তার রিভালবার নামিয়ে দিল। যুবকটী বলল 'দেখছো না এটা একটা পুলিশের চর।' প্রগ্রেসো পুলিশের চরটীকে

চলে যেতে অনুরোধ করল। সে না গিয়ে রাগের স্বরে বলল 'কি ? এরা আমায় মেরে ফেলবে ভয় দেখাচ্ছে ? প্রগ্রেসো তাকে স্বান্তনা দিল "কি সব বাজে কথা। যেতে দাও—মেরে ফেলবে তাকি সম্ভব!" "হ্যাঁ তাই—" সামনের লোকগুলোর দিকে চেয়ে সে বলল ',এরা তার স্বাক্ষী' প্রগ্রেসো ফিরে সবাইকে জিগেস করল—সত্যি কিনা! সকলেই বলল; না—তারা রিভালবারই দেখেনি। প্রগ্রেসো তখন লোকটাকে বলল—দেখলে—আসলে তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ তাই তোমার চারদিকে রিভালবার দেখছো আর ভাবছো সবাই বুঝি তোমায় মারতে আসছে এখন যাও তোমার মনিবকে গিয়ে বলগে যে ওরা ওদের সভায় পুলিশের চরকে বরদাস্ত করবে না বলেছে।

ঘটনাটা এই খানেই থামলো। লোকগুলো হাঁসতে লাগল ও অন্য কথায় মন দিল। ষ্টার ভিলাকাম্পার দিকে আর একবার তাকালো। ষ্টারের বাপের পাশেই ভিলাকাম্পা বসেছে। ষ্টারকে দেখতে পেয়ে সে বুর্জোয়া ভঙ্গীতে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তাকে ডাকলো। ষ্টার তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুহূর্ত্তের জন্য তাকালো ভিলাকাম্পার পোষাকের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে। ভিলাকম্পা তখন চোখের ভাষায় বলছে 'ভেবোনা আমি তোমাদের মত খুকীদের ভোলাবার জন্যে এই পোষাক পরে এসেছি।' ষ্টার তাকে একটা বই বিক্রী করল—আর একটা গোলাপফুল—তার বোতামের গর্ত্তে পরিয়ে দিয়ে বলল—'আমার কাছে মাত্র দুটো ছিল—একটা সামারকে দিয়েছি।' ভিলাকাম্পা জানত, সে দেখেছে আগেই। ষ্টারকে উৎসাহ দিয়ে সহানুভূতির সুরে ২।৪টা কথা বলল—তার পর উঠে দাঁড়ালো—সামারকে খুঁজে বার করবার জন্য। টুপি আর শাদা শার্টের ভীড়ে সে কোথায় ঢাকা পড়েছে। ভিলাকাম্পা আবার বসে পড়ে ষ্টারের গতি ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে রইল। তার ব্যাজ আর বই খুব বিক্রী হচ্ছে। দেখে শুনে ভিলাকাম্পার মনে হোল বিপ্লবটা যেন ছেলে মানুষী—তখনকার মত নিজেকে বিপ্লবী বলে ভাবতে তার লজ্জা হল। গ্যালারীর ওপর বসে অনেকে নীচের লোকদের সঙ্গে চেঁচিয়ে বিপ্লব সম্বন্ধে তর্ক করছে। ময়লা চেহারা—বেশ আত্মস্থ ভাব দেখতে একটা লোক একগাদা কাগজপত্র বগলে করে এলো আর দেখে শুনে আবার চলে গেল। লোকটা আমষ্টারডামের তিনজন ধনী 'জু' এর একজন। ষ্টোনের টাকার বাজারের হাল চাল কিরকম তাই সে ঘুরে ফিরে খবর নিচ্ছে—রাজনৈতিক আসরে —মজুরদের আড্ডায়। গ্যালারীর তৃতীয় সারে আরো একটা মজার ব্যাপার হল একজন দক্ষিণ আমেরিকার লোক। লোকটা নিজেকে একজন সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিচ্ছে—বেশ ভূষায় মাকড়ীতে আর আংটীতে তাকে দেখতে হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ানদের সর্দ্দারের মতন। তার কাছে নাকি একরকম বৈজ্ঞানিক আবিস্কৃত গুড়ো পদার্থ আছে যার একটু খানিতেই সমস্ত সিভিল গার্ডকে ধ্বংস করা যেতে পারে। আর ঐ মতলব নিয়েই নাকি ও এসেছে। আমরা তাকে 'অল-কাপন' বলে ডাকতে লাগলাম। নামটা তার যোগ্যাই হ'য়েছে। সে আশা করে আছে তার ঐ মতলব হাসিল করবার জন্যে একটা বিশেষ কমিটী গঠন করে ভার দেওয়া হ'বে। ষ্টার তার কাছে যেতেই সে ব্যাজ আর বই কিনলো। স্থানীয় ফেড়ারেশনের তরফ থেকে প্রকাশিত

ইস্তাহারের বাণ্ডিল গ্যালারীর ওপর থেকে ছুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। ষ্টার একটা বাণ্ডিল কুড়িয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বিলি করতে লাগল। সকলে হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়ছে। ছাপানো কথাগুলো—সবাইকে বেশ স্পর্শ করেছে মনে হল।

সভাপতি তাঁর আসন নিলেন। বুর্জ্জোয়া সাংবাদিকেরা তাঁর কাছে ঘেসে বসেছে। ওদেরকে ঢুকতে দিয়েছে কে? একজন এগিয়ে এসে বলল—যে সব কমরেডরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে ভেতরে বারান্দায় উঠে আসতে বলা হোক। রাস্তায় ভীড় করা নাকি পুলিশে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছে। বারান্দা ক্রমে ভরে উঠল। একজন কমরেড মাইক্রোফোনের তার ঠিক করে দিতেই সভার কাজ সুরু হল। সভাপতি ২।৪টি কথা বলেই প্রথম বক্তাকে বলতে বললেন। রাস্তায় লাউডস্পীকারে শোনা যেতে লাগল—"বর্ত্তমান সরকার—ধনতন্ত্রের দাস, কমরেডদের খুন করছে"......"মন্ত্রীদের হাতে আমরা যে ক্ষমতা তুলে দিয়েছি তাঁরা তার অপব্যবহার করছেন—।" একথায় একজন প্রতিবাদ করল 'আমরা এ কথা কখনও স্বীকার করবো না—এতে আমাদের শত্রুদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, আমাদের এই সম্মেলন বুর্জ্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে কোন সম্পর্কই স্বীকার করবে না'—চিৎকারের ঝড় বয়ে গেল—প্রতিবাদকারীর কথা গেল ডুবে। সে কিন্তু বলে চলল 'এ হচ্ছে সুবিধাবাদ......।' একজন তাকে উত্তর দিল 'বেশত তাতে হয়েছে কি?' রাস্তায় লাউড-স্পীকার আবার চিৎকার সুরু করল 'নীচ বুর্জ্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সবহারাদের ওপর অত্যাচার করছে, জেল দিচ্ছে আমাদের ভায়েদের গুলি করে মারছে।' তিন হাজার মজুর বাইরে দাঁড়িয়ে, কথা গুলো তাদের গায়ে এসে বিঁধছে যেন। সৈন্যদলের কর্ত্তা একদল সৈন্য নিয়ে রাস্তায় অপেক্ষা করছেন আর মাঝে মাঝে রক্ত চক্ষুতে তাকাচ্ছেন লাউডস্পীকারের দিকে। লাউড-স্পীকারের তার কেটে দিতে অনেক্ষণ তিনি হুকুম পাঠিয়েছেন—অথচ তার এখনও কাটা হয়নি। বিজলী মিস্ত্রীটী শপথ করে তাঁকে বলল, তার ত সে কেটে দিয়ে এসেছে। লাউডস্পীকার তখনও বলছে 'যে অসাধুতাকে তোমরা প্রশ্রয় দিয়েছো—যার বোঝা তোমরা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছ—তাকে আমরা ধ্বংস করব। অভিজাত জমিদারতন্ত্র যেমন নিজের ভারেই ধ্বংস হয়েছিল তেমনি বুর্জ্জোয়াদের মোটা মাথা নিজের ভারেই ভেঙ্গে পড়বে।' আবার সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম হ'ল—তাড়াতাড়ি কর তার কেটে দাও। কে একজন একটা তারের সংযোগ কেটে দিল। কিন্তু বারান্দায় আর দোতালার লাউডস্পীকার তখনও থামেনি। এতক্ষণে দ্বিতীয় বক্তা বলা সুরু করেছেন—তিনি 'পেছিয়ে পড়া নীতির নিন্দা করছেন। ১৯১৯ সালে এই পেছিয়ে পড়া নীতির দুঃখ প্রথম তাঁকেই ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর কথায় কথায় তীব্রতা—শীষের শব্দ যেন একটা ধূমকেতু আকাশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। "বিশ্বাসঘাতকতা, ভীরুতা, দুঃখ, পাপ, বারুদ, বন্দুক, বিপ্লব, এফ, এ, আই, সি, এন, টি, এফ, এ, আই, সি, এন, টি," লাউডস্পীকার চিৎকার করে ঘোষণা করছে। রাস্তা ভরে গেছে লোকের ভীড়ে। যানবাহন চলাচল বন্ধ। হাজার হাজার কণ্ঠে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক' চিৎকার উঠল। সৈন্যরা বিপদজ্ঞাপক বাঁশি বাজাল। জনতা নিঃশ্চল। ইত্যাবসরে

সৈন্যরা তৈরী হ'য়ে নিয়েছে। লাউডস্পীকার বলে চলল "সি, এন, টির জয়', 'বুর্জ্জোয়া সাধারণ তন্ত্র নিপাৎ যাক'। কেন্দ্রীয় পুলিস বিভাগ থেকে যে কোন উপায়ে সভা ভেঙ্গে দেবার হুকুম টেলিফোন মারফৎ নিয়ে একজন সার্জ্জেণ্ট উপস্থিত হ'য়েছে। সৈন্যরা বন্দুক তুলল। বিপদজ্ঞাপক বাঁশি শেষবার বেজে উঠল। গুলি গোলা পাথর জনতা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ল। ট্রাম গাড়ীর আরোহীরা ভয়ে নেমে পড়ে দৌড়তে লাগল --একজন ভদ্র মহিলা তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন—আর পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন 'জানোয়ার—জানোয়ার সব।' একজন মজুর তাঁকে ধরে তুলল—জিজ্ঞেস করল 'জানোয়ার কাদের বলছো!' তিনি উত্তর দিলেন 'তোমরা মজুররা।' মজুরটি হেসে বলল 'ভয়ে মাথা খারাপ করো না—বলাৎকার এখনও সুরু হয়নি।' লাউডস্পীকার তখনও বলে চলেছে 'ওরা রাস্তায় আমাদের ভায়েদের হত্যা করছে'। লাউডস্পীকারটাই আজ সভাটা পণ্ড করে দিল। মাইক্রোফোনের সঙ্গে ওদের সংযোগ কেটে দেওয়া হ'য়েছে—বিজলী তারের সঙ্গেও ওদের কোন যোগ নেই—এখন ওদের চিৎকার করা কোন মতেই উচিৎ নয়।" ওরা নিজে থেকে চিৎকার করে সভার ক্ষতি করছে। বক্তৃতার কথা গুলোর প্রতিধ্বনি করছে—জনতার চিৎকার কোলাহলে ওরাও চিৎকার করছে আপনা থেকে। সৈন্যরা এগিয়ে আসতে আসতেই থিয়েটার হল খালি হ'য়ে গিয়েছে। খালি থিয়েটার হল থেকে লাউডস্পীকার চিৎকার করছে 'বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হোক'—জনতাকে উত্তেজিত করার ভার তারাই নিয়েছে। ঐ বিশ্বাস-ঘাতক লাউডস্পীকার গুলোর জন্যে কি গুলি নেই? একটা দুটো করে গুলি গিয়ে লাগল একটা লাউডস্পীকার—সেটা বন্ধ হ'ল। 'আন্তর্জ্জাতিকের' শব্দ গুলির শব্দে ঢাকা পড়েছে। ট্রামকারটাকে ব্যূহ করে মজুররা আশ্রয় নিয়েছে। একটা চলতি মোটরে গুলি মেরে রাস্তায় উল্টে পড়ে সুবিধে করে দিয়েছে তাদের। জনতার অর্দ্ধেক আশ্রয় নিয়েছে থিয়েটার হ'লের পেছনে। উচুতে একটা লাউডস্পীকার তখনও চিৎকার করছে 'জানোয়াররা তোমরা করছ কি? মানুষের আত্মার কথা ভেবে দেখ'।

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সঙ্গে টেলিফোনে তথা বার্ত্তা চলল। আরো সৈন্য এল—আরো পুলিশ। ওপরের লাউডস্পীকারটা লক্ষ্য করে আরো গুলি চলল। গুলির শব্দে ও লোকেদের চিৎকার রাস্তা ভরে উঠেছে। বিপ্লব এসেছে। আর কি চাও! পুলিশ আর সৈন্যরা জনতাকে আক্রমণ করল—গুলি চলল। মজুরদের সঙ্গে ওদের লড়াই চলল প্রায় আধঘন্টা। লাউড-স্পীকারটা কেঁপে কেঁপে শেষবার বললো 'শান্তি ও শৃঙ্খলার ওপর দেশের স্বার্থ নির্ভর করছে'। 'গুলির আঘাতে সেটা চুরমার হ'য়ে গেল। তিনজন মৃত কমরেড পড়ে রইল রাস্তায় প্রায় পঞ্চাশ জন আহত মজুরকে হাতকড়ি লাগিয়ে ওরা ধরে নিয়ে গেল। বিয়ারের দোকানী দোকান গুছুতে গুছুতে আপন মনে বলছে। আমার স্যোসালিষ্টদের ভোট দেওয়ার খুব কাজ হয়েছে।'

(ক্রমশঃ)

শৃঙ্খল

নির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অসহ্য কামনা কভু লাঘব করিতে চাহিব না।
আরো অশ্রু, দিয়ে আরো বাষ্পময়ী বাণী বেদনার,
সুদূরে নিকটে কোথা চিহ্ন নাই স্বর্গ-সান্ত্বনার,
আত্মারে অনলে ঘেরি' প্রেম শুধু হানিছে যন্ত্রণা।
ব্যথাতুর হিয়া তোর একী নিত্য মৃত্যুর প্রার্থনা,
মৃত্যু, অনিবার্য্য সে ত! এজীবনে বরং আমার
মরণ মধুর অতি,— দংশন ক্ষণিকমাত্র তার,
নির্ব্বাপিত উৎসবান্তে অনির্ব্বাণ অনন্ত বেদনা।

প্রতিরোধ ব্যর্থ জানি। ব্যথা তাই বহি দ্বারে দ্বারে,
হৃদয় করিয়া জয় বক্ষে মোর কে লবে আসন
সুখে দুখে অবিরাম মালা গাঁথি' হাসি অশ্রুধারে ?
শৃঙ্খল বন্ধন বিনা এ সংসারে প্রেম দুঃস্বপন,
নিষ্ফল বিস্ময়ে তাই সর্ব্বরিক্ত নিঃসঙ্গ আঁধারে
আমি সে বীরের বন্দী, শৃঙ্খলিত যুগল চরণ॥

[প্রখ্যাত ইতালীয় শিল্পী 'মাইকল্ অ্যানজিলো'র (Michel-Angelo : 1474-1564) সনেট্গুচ্ছ হইতে একটির (To Tommaso de' Cavalieri) অনুবাদ।]

রাশিয়ার রূপান্তর*

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

মহেন্দ্রনাথ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যে বন্ধন আজ দুনিয়ার কোটী কোটী নর-নারীকে অক্টোপাশের মত বেঁধে রেখেছে, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবই প্রথম অভিযানে তার দশ কোটী লোককে মুক্ত করেছে—তাদের জীবনে এনে দিয়েছে অনাগত জীবন ধারার কলকল্লোল। তারপর সেই গৌরবময় বিজয়কে কেন্দ্র করে, সাংঘাতিক অন্তর্বিপ্লব এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই কোটী কোটী লোক ধনবাদী বিশ্বের উপর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গর্বোন্নত পতাকা উন্নীত ও সু-প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবেম্বরে বিপ্লবের প্রথম জয় হ'তে আরম্ভ করে, কম্যিউনিজম্-এর আদর্শে নূতন সোস্যালিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি সু-প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত রাশিয়ার শ্রমিকগণকে দুর্গম, বিঘ্নসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে বর্ত্তমানের অপরাজেয় অবস্থায় উপনীত হ'তে হ'য়েছে, রাশিয়ার এই ক' এক বছরের ইতিহাস, যেমনি চমকপ্রদ তেমনি গৌরবময়।

১৯৩৬ সালে লর্ড লণ্ডনবেরীর সাথে সাক্ষাৎকালে কম্যিউনিজম্-এর সাংঘাতিক শত্রু হিট্‌লার মন্তব্য করেছিলেন :

The present development of Russia gives cause for reflection. In 1917 Russia was down and out. In 1920, she was torn by Civil War. In the years 1924 and 1925, the first sign of convalescence began to appear with the creation of the Red Army. In 1927, the First Five Year Plan was begun and later carried out. In 1932, came

* ["জয়শ্রী"তে "রাশিয়ার রূপান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধে 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী' পরিকল্পনায় রাশিয়ার অভ্যুন্নতি সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পূর্ব প্রবন্ধেই আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হ'য়ে যাওয়ায় ভিন্নভাবে এ প্রবন্ধটী লিখতে হ'ল। ইতিহাসের দিক থেকে ইহার সার্থকতা আছে মনে করেই, এর আলোচনায় ব্রতী হ'য়েছি।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কম্যিউনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ অধিবেশনে (মে, ১৯৩৯ ইং) কমরেড মলোটভ যে Report দাখিল করেছেন, তার উপর ভিত্তি করেই এ প্রবন্ধটীও লেখা হল। এতে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কর্ম্মনীতি কি, কিভাবে তাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে রূপায়িত করা হবে, হয়তো তারই একটুখানি আভাস, তারই একটু ইঙ্গিত জনসাধারণ পাবেন, এ আশাই আমি করি।
—লেখক]

the Second Five Year Plan, which is now in full swing. Russia has a solid trade, the strongest Army, the strongest Air force in the World. These are facts which can not be ignored.

মনে হয় এর মাঝেই রাশিয়ার ক্রম বর্দ্ধমান অভ্যুন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লুকানো, এবং এই গৌরবময় কাহিনী বের হ'য়েছে রাশিয়ারই একজন শত্রুর মুখ থেকে। ১৯২৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়াকে যে কী সাংঘাতিক অন্তর্বিপ্লব এবং বিরুদ্ধবাদী বৈদেশিক শত্রুর প্রত্যক্ষ এবং অ-প্রত্যক্ষ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে চলতে হ'য়েছে, তা' আমরা জানি। এবং তার আলোচনা করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু বহিঃশত্রুর গোপন ষড়যন্ত্রই নয়, গৃহ-শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্রচণ্ডতাও রাশিয়াকে ব্যর্থ করতে হ'য়েছে। প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য সে কী অপরিমেয় কর্তব্যনিষ্ঠা—কী দুরন্ত সেই সংকল্প! সাধনার মাঝে সত্যিকার শুভেচ্ছা এবং একনিষ্ঠতা না থাকলে, সাধনার শক্তি যত বেশী হোক না, কেহই তাতে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। ভাল-হোক, মন্দ হোক, কর্তব্য কার্যে একাগ্রতাই সাধকের কর্মপ্রেরণাকে বিজয়ের সাফল্যে মণ্ডিত করে তোলে। সাধনার পথে হিট্‌লার-মুসোলিনীরও একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা আছে বলেই, তাঁদের প্রচেষ্টা সফল। হ'তে পারে তাঁরা জন-সমাজের কল্যাণের পথ বেছে নেননি, হ'তে পারে তাঁরা আদর্শবাদী তরুণ বিশ্বের শত্রু কিন্তু তাঁদের প্রতিভা, সিদ্ধিলাভ করবার জন্য তাঁদের একাগ্র এবং একনিষ্ঠ সাধনাকে অস্বীকার করবার উপায় কোথায়? জার্মাণী এবং ইতালীতে জনগণের কল্যাণের পথ সেখানকার অনুষ্ঠিত কর্মনীতিতে রুদ্ধ হ'য়েছে বলেই এবং ব্যক্তির স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠা সমাজের কল্যাণের পথে বাধা জন্মিয়েছে বলেই আজ দুনিয়ার অধিকাংশ লেখক ফ্যাসিজম্ এবং ন্যাশানাল সোস্যালিজম্ বনাম ফ্যাসিজম্-এর ধ্বংস কামনা করে।

রাশিয়া ডিক্‌টেটর-এর দেশ। সেখানে ডেমোক্র্যাসির কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ আমাদের মনে রাখতে হবে জার্মাণী অথবা ইতালীর মত রাশিয়াতে ব্যক্তি ডিক্‌টেটারের প্রতিষ্ঠা নয়। সেখানে হ'ল সর্বহারা শ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব (Proletarian Dictatorship) ডিক্‌টেটারসিপ আর ডেমোক্র্যাসিতে পার্থক্য আছে। ডিক্‌টেটারসিপ বিপ্লবপন্থী—কিন্তু ডেমোক্র্যাসির যে তাই হ'তে হবে এমন কোন কারণ নেই। তা' ছাড়া এ দুয়ের মাঝে আরও একটা পার্থক্য আছে। সেটা হল রাষ্ট্রীয় প্রগতির লক্ষ্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা। ডিক্‌টেটারসিপ-এর লক্ষ্য স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, নিশ্চিত। ডিক্‌টেটারসিপ শুধু প্ল্যানই তৈরী করে না, মনে প্রাণে তাকে অনুসরণ করে, কার্যে পরিণত করে, তবে সে ক্ষান্ত হয়। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সে তার প্ল্যানকে ব্যর্থ হতে দেবে না। যেভাবেই হোক, তাকে সফল করে তুলবেই। ডেমোক্র্যাসি সেরূপ কোন কিছু অঙ্গীকার করতে পারে না। কিন্তু রাশিয়া প্রগতির পথে যতদূর অগ্রসর হয়েছে জার্মাণী অথবা ইতালী তার অনেক পেছনে। তারও কারণ আছে রাশিয়ার ডিক্‌টেটারসিপের প্রতি রাশিয়ার আপামর জনসাধারণের নিবিড় সহানুভূতি আছে। কারণ, সেখানে ডিক্‌টেটারসিপ হল তাদেরই। কিন্তু জার্মাণী অথবা ইতালীতে তা' নয়। সেখানে

ব্যক্তি-ডিক্‌টেটারসিপ প্রতিষ্ঠিত বলে, তার প্রতি সর্বশ্রেণীর জনগণের সমান সহানুভূতি নেই। কাজেই রাষ্ট্রীয় প্রগতির পথে তারা রাশিয়ার পেছনে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাশিয়া যে বিনা বাধায়, সহজ, সরলভাবে অভ্যুন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়েছে, তা নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে রাশিয়াকে সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির সাথে অবিরাম লড়তে হ'য়েছে এবং এই সংঘর্ষের মাঝেই তা' সফলতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের গুপ্তচর এবং এজেন্টগণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের মাঝে অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত করবার চেষ্টা করেছে; ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নানা প্রকার কুৎসিৎ উপায় অবলম্বন করে সোভিয়েট-এর অভ্যুন্নতির পথে বাধা প্রদান করেছে। ট্রটস্কি, বুখারিন এবং রায়কভাইট পন্থীদিগকে সোভিয়েট-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে। কিন্তু সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, ধনতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সর্বপ্রকার কুৎসিৎ দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে সোভিয়েট দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্ধারিত পথে এগিয়ে গিয়েছে। পরাজয় বা ব্যর্থতাকে বরণ করেনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতো পরিপূর্ণভাবে সফলতা লাভ করেছেই, তা' ছাড়া কোন কোন বিভাগে অভ্যুন্নতি পরিকল্পনাকেও অতিক্রম করেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতা সম্বন্ধে কমরেড মলোটভ বলেছেন:

The Victory of the Second Five Year Plan is apparent to everyone. The basic historic task of the Second Five Year Plan has been fulfilled.

সাধনার পথে বাধা বিঘ্ন আসবে। জাতীয় জীবনের চলারগতিকে প্রতিরোধ করবেই। কিন্তু সেজন্য সোভিয়েট শঙ্কিত নয়। কমরেড ষ্ট্যালিন বলেছেন:

The revolution does not usually develop along a straight, continuously ascending line, not as a continuously swelling upsurge, but it develops in zig-zags, in advances and retreats, ebb and flows of tides, which in the course of development harden the forces of revolution and prepare for its final Victory. (Stalin—Results of the work of the 14th conference of the Russian Communist Party.)

নব্য রাশিয়ার কম্যিউনিষ্ট পার্টি এই মন্ত্রবাণীরই উপাসক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৩৩—১৯৩৭) পরিপূর্ণ সফলতা এবং সোস্যালিজম্ প্রতিষ্ঠার বিজয়কে কেন্দ্র করে রাশিয়া ১৯৩৮ সাল হ'তে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৩৮—১৯৪২) কর্মপন্থা অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে। এই সময়কে বলা যেতে পারে—the period of the completion of the bulding up of the class-less socialist society and of the gradual transition from Socialism to Communism. সোভিয়েট রাশিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে শিল্পে, কৃষিতে এবং উৎপাদন পরিমাণে অন্যান্য শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহকে সে অতিক্রম করেছে, তাতে সন্দেহ নেই; তথাপি অর্থনৈতিক ব্যাপারে (Economic Sphere) রাশিয়া এখনও সে সকল রাষ্ট্রকে পেছনে ফেলতে পারেনি। বর্তমান পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতিতেও সে তাদের পেছনে ফেলে যাবে, এই তার সংকল্প।

অভ্যুন্নতির পথে অগ্রগতিতে রাশিয়া যে পৃথিবীর মাঝে অগ্রগামী, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। অন্যান্য শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হতে রাশিয়ার লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। রাশিয়ার জনসংখ্যাকে সম্মুখে রেখে উৎপাদন পরিমাণ ভাগ করলে দেখা যায়, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মাণী এবং ফ্রান্স হতে রাশিয়ার একজন লোক কম অংশ ভোগ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, গত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবসানে রাশিয়ার জনসাধারণের প্রত্যেকের অংশে বিদ্যুৎ গড়ে ফ্রান্সের অর্ধেক, ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ, জার্মাণীর ৩২ এবং আমেরিকার ৫২ অংশ। কয়লাও এই সকল রাষ্ট্র হতে রাশিয়ার একজন লোক কম উপভোগ করেছে। তা ছাড়া সুতা, কাগজ, সাবান এবং এরূপ আরও দু' একটা জিনিষে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি লোক বেশী অংশ ভোগ করে থাকে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে হলে উৎপাদন শক্তির অর্থনৈতিক ব্যাপারেও রাশিয়াকে অগ্রগামী হতে হবে। অর্থাৎ লোকসংখ্যানুপাতে রাশিয়াকে তার উৎপাদন পরিমাণ আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই "the first victory of Communism may be achieved in its historical contest with capitalism." তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ব্যাপারে ক্রমোন্নতিও রাশিয়ার দৃঢ়সংকল্প এবং রাশিয়া আশা করে যে, আমেরিকা ও ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অতিক্রম করবে। এই সংকল্পে রাশিয়া ব্যর্থ হবে, এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই। কারণ, কোনদিন সংস্কৃতিগত অভ্যুন্নতিকে রাশিয়া ব্যর্থ হতে দেয়নি। লেনিন বলেছেন—"The Productivity of labour is at bottom the most important, the most decisive for victory of the new state of society." বর্তমানে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন প্রণালীর প্রবর্তক প্রতিভাশালী শ্রমিক আলেক্সি ষ্টৈখানভ-এর কর্মপন্থা অনুসরণ করে, কারখানা এবং সমবায়ী কৃষি-প্রতিষ্ঠানে সংহত কর্মানুষ্ঠানের মাঝে রাশিয়া অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার অভাব পূরণ করতেও সক্ষম হবে। রাজনৈতিক ব্যাপারে বর্তমানে রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীর মাঝে অগ্রগামী। উৎপাদন শক্তিতেও রাশিয়া তাই, জনসংখ্যার অনুপাতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে রাশিয়া যখন সমর্থ হবে, তখনই—"will the significance of the new era in the development of the U. S. S. R. be really revealed, the era of transition from a Socialist Society to Communist Society."

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় (National Income) বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করা হয়েছে। রাশিয়া আশা করে গত দুটী পরিকল্পনায় তার যে আয় ছিল, বর্তমান পরিকল্পনানুসারে তা তার চেয়ে অধিক হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ার জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে—২০,৫০০ কোটী এবং ৫০,৫০০ রুবল; তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ার জাতীয় আয় ৭৮,০০০ কোটী রুবল-এ পরিণত করা হবে। ১৯৩৭ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে রাশিয়ার উৎপন্ন পণ্যের মূল্য ছিল—৯৫,০০০ কোটী রুবল।

১৯৪২ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে তা ১৮০,০০০ কোটী রুবল-এ পরিণত করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদিত পণ্যেও রাশিয়া অনুরূপ উন্নতি করতে পারবে বলে আশা করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর কৃষি উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ছিল ২০,০০০ কোটী রুবল; ১৯৭২ সালে তা ৩০,৫০০ কোটী রুবল-এ পরিণত করা হবে বলে পরিকল্পিত হয়েছে। কৃষি কার্যে ষ্টেট-এর মূলধন দাঁড়াবে ১০'৭ বিলিয়ন রুবল; এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যে তা হবে ৩৫'৮ বিলিয়ন রুবল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় তা ছিল ২০'৭ বিলিয়ন রুবল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে রাশিয়ায় পৃথিবীর মাঝে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুটী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ভল্‌গা এবং ইউরাল নদীর মধ্যভাগে "বাকু"র (Baku) মত আর একটা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মধ্য থেকে সাত কোটী টন তৈল উৎপাদিত হবে। তা' ছাড়া কুলিবাইসেভ জেলায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আর একটী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে দুটী হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপিত হবে এবং তাদের শক্তি হবে ৩'৪ কোটী কিলোওয়াট্। এই পরিকল্পনার কার্যকালে মস্কো গর্কি অটোমোবাইল কারখানার প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণ হবে। এ ছাড়া এই পরিকল্পনার সময়ে ছোট বড় শত সহস্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমগ্র রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষি কার্যের ক্রমোন্নতির জন্য ১৫০০ যন্ত্র এবং ট্রাকটার ষ্টেশন স্থাপন করা হবে বলে পরিকল্পিত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাশিয়ার সমস্ত জনসাধারণের, সমস্ত নর-নারীর কল্যাণ কামনা। উন্নতির পথে তাদের জীবন-ধারার আমূল পরিবর্তন—যে উন্নত এবং গৌরবময় জীবনধারা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং ধনী রাষ্ট্রসমূহের কোন ধারণাই নেই। ইহাতে সহর ও পল্লীর শ্রমিকদের জীবন সুখে শান্তিতে বিমণ্ডিত হয়ে উঠবে। বর্তমান পরিকল্পনায় শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সাতাশ কোটী হতে বত্রিশ কোটীতে দাঁড়াবে। শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে যে তাদের ব্যক্তিগত পারিশ্রমিক হ্রাস পাবে এমন কোন কারণ নেই পক্ষান্তরে তাদের পারিশ্রমিক শতকরা ৬০ অংশ বৃদ্ধি পাবে। এবং সমবায়ী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে শতকরা ৭০ অংশ। ইহাতে দেখা যায়, এই পরিকল্পনার সময়ে শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবিদের আয় গড়ে শতকরা ৭০ অংশ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েই সহর এবং সহরতলীর মাঝে যে পার্থক্য তা' অপসারণের নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এবং এই কাজ কতকটা অগ্রসরও হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনায় আয় এবং ব্যবসার উন্নতির দ্বারা, তা' আরও উন্নীত করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। সহর এবং পল্লীগ্রামে যাতে কোন পার্থক্য না থাকে, লেনিন তাঁর সহকর্মীদের এই উপদেশই দিয়ে গেছেন। সহর ও পল্লীর মাঝে পার্থক্য রাখলে শ্রমিক এবং কৃষকদের মাঝেও—অনিবার্যভাবেই বিভেদের সৃষ্টি হয়। তাতে কম্যিউনিজম্-এর আদর্শও রক্ষিত হয় না। আর্থিক এবং সংস্কৃতিগত

ব্যবস্থায় সহর ও পল্লীগ্রামে, অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে যে পার্থক্য তা অপসারিত করে, রাশিয়ার এই দুই শ্রেণীর মাঝে সর্বপ্রকার সমতা স্থাপন করাও সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম কর্মনীতি। স্মরণাতীত কাল হতে রাশিয়ার কৃষকরাই দুর্বিসহ অত্যাচার ও অবিচারের মাঝে তাদের হীন জীবনযাত্রা পরিচালিত করে এসেছে। তাই নতুন দিনের আলো যখন রাশিয়ার জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলল, তখন কৃষকগণকে অন্ধকারের মাঝে ফেলে রাখা রাশিয়ার মত আদর্শ রাষ্ট্রের পক্ষে কোনমতেই সমীচীন হবে না। তাই রাশিয়ার কমিউনিজম্ সাধনার অগ্রদূত শ্রমিকগণ কৃষকগণের জীবনধারা উন্নত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সমাজ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং এরূপ জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্র কর্তৃক যে আয় পরিকল্পিত হয়েছে, তার পরিমাণ হবে ৫৩ বিলিয়ান রুবল অর্থাৎ তা শতকরা ৭০ অংশে বর্ধিত হয়েছে।

রাশিয়ার জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর দান অপরিসীম। কারণ, বর্তমানে তারাই সেখানকার—"The most advanced class in Socialist Society." বিপ্লবের সূচনা হতে আরম্ভ করে, বিপ্লবের চরম অবস্থা পর্যন্ত তারাই ছিল অগ্রগামী। তারপর বিপ্লবের পরে তাদের অসামান্য কর্মপ্রবাহেই, তাদের প্রাণপণ সাধনার বলেই, তাদের অক্লান্ত সেবায়ই, রাশিয়া তার বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এই শ্রমিকরাই রাশিয়ার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছে। তারাই রাশিয়ার প্রকৃত সংগ্রামশীল দল।

রাশিয়ার বর্তমান অভ্যুন্নতির পথে তাদের সাধনাই যে রাশিয়াকে নব জীবনের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করবে, এ কথাও সেখানকার শ্রমিকরা ভাল করেই জানে। কাজেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, রাশিয়াকে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কোন সমস্যার সমাধান করতে হবে,—এ কথা সেখানকার শ্রমিক শ্রেণী ভালভাবেই জানে এবং তারা তাদের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে দ্বিধা করবে না।

"Engage along the whole line in economic competition with the economically mo t developed capitalist countries of Europe and with the United States."

কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনের—এই বাণী রাশিয়ার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মাঝে যে প্রবল উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করবে, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। আগের মতোই তারা রাশিয়ার সংস্কৃতিগত আন্দোলনে—বৈপ্লবিক কর্মপন্থায়, তাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত কোরবে এই আমাদের বিশ্বাস।

রাশিয়ার সংস্কৃতিগত আন্দোলনে তার আর একটী গৌরবের বস্তু, রাশিয়ার যুবক সম্প্রদায়—।

খ্যাতনামা ভ্রমণকারিণী মিস্ রাশিটা ফরবেশ (মিসেস ম্যাকগ্রাথ) রাশিয়ার যুবশক্তি সম্বন্ধে বলেছেন,—"আমি মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম, কেবল

দেখেছি, জাতীয়তার ভিত্তিতে যুবকগণ কি চমৎকার ভাবে বিভক্ত হয়েছে। তার ফলে তারা স্ব স্ব এলাকার প্রজাতন্ত্রের স্বপ্নে যেমন বিভোর, তিমনি আদর্শ সাম্যবাদের কেন্দ্রস্থল মস্কোর প্রতিও তাদের প্রাণে প্রবল টান।" (অনূদিত)

যৌবনের শক্তি অস্বীকার করবার মতো উপায় কারও নেই, যৌবন চিরদিনই দুরন্ত, দুর্বার তার শক্তি—অপ্রতিহত তার দুর্জয় সংকল্প। জাতীয় জীবনের একঘেয়ে গতানুগতিকার মাঝে যারা বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়, জাতির অবাঞ্ছিত দুর্বলতায় যারা রসপুষ্ট শক্তির প্রাচুর্যে জাতিকে শক্তিশালী করে, তারা আর কেহই নহে, তারা দেশের যুবশক্তি। মানুষ যেখানে মানুষের টুটি চেপে ধরছে—মানুষ যেখানে মানুষকে তার সত্যিকার অধিকার হ'তে বঞ্চিত করেছে, অন্যায় অবিচার যেখানে জনগণের মুক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে, যুবশক্তি সেখানে তার বলিষ্ট চিন্তাধারা, মহান আদর্শকে সম্মুখে রেখে সকল অন্যায়ের প্রতিরোধে তার দুবাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের যুবশক্তি অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। সে যাই বলুক না কেন,—অন্তত এ অপবাদ তাদের কেউ দিতে পারবে না। দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদরূপে আত্মদান করেছে, দেশের যুবশক্তি। যৌবনের শক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না—যৌবনকে সকলেই করে পূজা।

তাই রাশিয়ার মত আদর্শ রাষ্ট্রের যুবশক্তি যে সেখানকার বর্তমান সংস্কৃতিগত আন্দোলনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এতে আশ্চর্যের আর কীই বা আছে!

বর্তমানে রাশিয়ার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যই হল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুরোভাগে স্থান প্রতিষ্ঠিত করা। রাশিয়ার দৃঢ়বিশ্বাস, বর্তমানের এই সংস্কৃতিগত প্রতিযোগীতায় নিজের আভ্যন্তরিক সংস্কার সাধন ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছা তার নেই। বর্তমানে রাশিয়া একনিষ্ঠভাবে যে আদর্শের পথ অনুসরণ করে চলেছে, অন্যান্য রাষ্ট্রের কোন অনিষ্ট করবার গোপন এবং হীন ষড়যন্ত্র তার মাঝে নেই।

রাশিয়া চায়—জাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেকটী নর-নারী জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করুক, তাদের শোষিত জীবনের অবসান হোক। রাশিয়া চায়—দুনিয়ার প্রত্যেকটী নর-নারী প্রাণ রসের প্রাচুর্যে রসপুষ্ট হোক, বিশ্বের সমগ্র জনগণের মাঝে গড়ে উঠুক সুনিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন!

কিন্তু কে না তা' চায়! কার প্রাণ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উদাত্ত প্রেরণায় উদ্দীপিত না হয়।

কবি ও কাব্য

সত্যনারায়ণ সেন

প্রেম ?
ও নাম নিয়োনা বন্ধু, অন্ধ কুলুঙ্গীতে
সযত্নে ঢাকিয়া রাখো ঐ তব নিকষিত হেম
মানুষের প্রেম ;
সাকী ও কুসুম ল'য়ে রচিয়োনা কবিতা-চয়ন,
দক্ষিণের মুক্ত বাতায়ন
রুদ্ধ করি বাহিরেতে আসো
চাহো ঊর্দ্ধচোখে
পুড়ে যাক্ সকল স্নিগ্ধতা মধ্যাহ্নের খর সূর্য্যালোকে।
হায় কবি,
যাহারা আঁকিতে চাহে জীবনের ছবি
সঙ্কুচিত করি চারিধার
ভয়ঙ্কর হিংস্ররূপ খাপছাড়া বাঁকা তলোয়ার,
মানুষের ভালোবাসা, প্রাণের প্রবাহে
ভীরুতার অপবাদে মুছে দিতে চাহে,
সুন্দরের রচে মৃত্যুভূমি
তাহাদের ক্ষমা করো' তুমি।
বস্তুকে চিনেছে ওরা, চাহে তাই বাস্তবের গা
কাব্যের অন্তরে খোঁজে রুটির সন্ধান !
দুর্দ্দিনের আর্ত্ত-কলরব উঠিবে শিহরি
কমনীয় কবিতার সারা অঙ্গ ভরি—

জীবনের রূপ
শুধু যেন ক্ষুধা আর দীনতার স্তূপ
অন্য কোনো অনুভূতিহীন
কর্কশ পাষাণ সম বীভৎস কঠিন ;
নিবে যাক্ সন্ধ্যাতারা গাঢ় করি দিগন্তের কালো,
রজনীগন্ধার বুকে গোধূলির আলো
শান্ত নেত্রে পড়ুক ঝরিয়া,
সিক্ত হোক্ মানুষের হিয়া
ভাষাহীন অশ্রুজলে, রূপহীন পরম প্রীতিতে
নয়নের অন্তরালে একান্ত নিভৃতে—
সেদিকে চেয়োনা তুমি কবি
কল্পনা বিকাশ ওই বিকশিত ফুলের সুরভি,
সত্য তার কণ্টকিত বৃন্ত আর দল
মানুষের "ভালো লাগা" অবস্তু নিষ্ফল।

মুক্তিস্নান

অনিল কুমার সেনগুপ্ত

(শেষাংশ)

রাতের অন্ধকার তখন মিলিয়ে এসেছে, ভোরের আলোর একটু ক্ষীণরেখা পূবের দিগন্তে দেখা দিয়েছে।

রুণকি ঘুম থেকে উঠে ভাবল, বাইরে একটু রাস্তা ধরে বেড়িয়ে আসবে। এমনি সে আজকাল প্রায়ই সকালবেলা বাইরে একটু বেড়াতে যায়; বেশীদূর বেড়াবার হুকুম ম্যানেজার দেয়না, আর তার ওপরেই ম্যানেজারের যত কড়া নজর। কয়েকদিন ধরে রুণকির হাবভাব ম্যানেজারের চোখে ভাল লাগেনি। এর আগে রুণকি শুনেছিল, ৭।৮ বছর আগে ঠিক তারই মত ১৪।১৫ বছরের একটি কিশোরী মেয়ে তাদের দল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেও ঠিক তারই মত নানা রকম খেলা দেখাত, ম্যানেজার তাকে খুব ভাল করে ট্রেনিং দিয়েছিল, তাকে দিয়ে ম্যানেজার কম রোজগার করেনি। সেই মেয়েটি অবশ্য পালিয়েছিল সার্কাস পার্টির একটা লোকের সঙ্গে। ঐ লোকটি নাকি তাকে খুবই বড় রকমের একটা লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়েছিল, রুণকি ভাবে ম্যানেজারের তার ওপরে কড়া নজরের কোন মানে হয় না। সে পালাবে কোথায়? আর কার সঙ্গেই বা পালাবে? ম্যানেজারের কিন্তু এই বয়েসের মেয়েদের ওপর বড্ড নজর। এই বয়েসেই মেয়েগুলো বেশী বিগ্‌ড়ে যায়, ভাল করে ট্রেনিং দেওয়ার পর মেয়েগুলো যদি আরও বড় রকমের লোভের বশে দল ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে সে সত্যিই দুঃখের কথা,

আর এত অল্প টাকায় অল্পবয়সী ওস্তাদ বিদেশী মেয়ে সে পাবে কোথায়? কাজেই তো তাকে ঐ সব খেলার জন্য ভারতীয় মেয়ে জোগাড় করতে হয়, কিন্তু ম্যানেজার ভাবে ভারতীয় মেয়েরা ১৮।১৯ বছর বয়সেই কি রকম যেন দুর্ব্বল আর অকেজো হয়ে পড়ে।

বুলানী, মুনিয়া আজ তাই ম্যানেজারের কাছে এক রকম ভার স্বরূপ হয়ে পড়ে রয়েছে, তাদের দিয়ে আজকাল পয়সা রোজগার বড় একটা হয় না। ম্যানেজার বুঝতে পারে মেয়েদের এই দুরবস্থা হয় কেন। দলের নারী পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রাই তো এর জন্য ষোল আনা দায়ী। ম্যানেজার কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করবার চেষ্টা কোনদিনই করেন নি, আর করবেই বা কেন? এর জন্য তার নিজের দোষও তো কম নয়, তার নিজের ভোগের পরিতৃপ্তিও তো চাই। তার ঐ বিরাট দেহযন্ত্রটা তো কেবল পয়সাই চায়না, সেটা পৃথিবীর পাশবিক ভোগ সুখেরও কাঙাল। রুণকি ভাবতে ভাবতে অনেক দূর এসে পড়েছে, ভোরের আলো আর বাতাস তার সব কিছু সৌন্দর্য্য, সুষমা আর মাধুর্য্য দিয়ে রুণকির শরীর এবং মনে একটা আমেজ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

গত রাত্রে সে গুলদার কুৎসিত প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে মনে করেই আজ

তার এত আনন্দ লাগছিল, সে-রাত্রে গুলদার ব্যবহারের কথা স্মরণ করে সে আর একবার চমকে ওঠে, তার সেই আগেকার নিষ্পাপ গুলদা আর আজকের লম্পট গুলদা—দুজনের ভিতর কত তফাৎ! রুণকি ভাবে কিভাবে সে এই অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে—একটা হতাশায় তার মন ভরে ওঠে, দুর্ভাবনায় তার মাথার রক্ত গরম হয়ে যায়, চারিদিকে অন্ধকার দেখে, মাটীতে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, পরক্ষণেই তার মন বলে ওঠে, "পারব, আমি নিশ্চয়ই পারব নিজেকে ঠিক রাখতে, ঐ গুলদা আর দলের যত পাষণ্ডগুলোর অত্যাচার থেকে।"

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল, তাই তো অনেক দূর যে সে এসে পড়েছে, এখন ম্যানেজারের ঘুম ভাঙ্গার আগে ফিরতে পারলে হয়। রুণকি ফেরে, ঘরে যেতে যেতে শুনতে পেলে, বুলানী আর মুনিয়া বলাবলি করছে, "ওরে ছুঁড়ি, এর মধ্যে ঢুকেছিস তো সেদিন, তা তোর পীরিত তো বাপু কারুর সঙ্গে কম নয়, সে-দিনের ছোঁড়া গুলদা সেও তোর একটা নাগর হয়ে গেল।"

ওদের আলাপ শুনে রুণকি অতি সহজেই বুঝতে পারে এই ছুঁড়ি হচ্ছে, সেই নতুন নাচ-ওয়ালী মেয়ে রঙ্গিলা, গুলদার সঙ্গে তার এই টলাঢলি সে আগেই লক্ষ্য করেছে, গুলদার ওপরে মনটা তার আর একবার বিষিয়ে ওঠে, রুণকি ভাবে পুরুষগুলো তো চিরকালই এমন হয়। কিন্তু মেয়েরাও কি সবাই এমনি করে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারে।

রুণকি ভাবে সেই গুলদা এরকম হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? তার জীবনে সবচেয়ে আগে যে পুরুষের কথা মনে পড়া উচিত, সে হচ্ছে তার বাবা, উঃ তার বাবা কি ভীষণ লম্পট আর উচ্ছৃঙ্খল আর কি দারুণ মাতাল, রুণকি শুনেছে তার বাবা যখন পশ্চিম ভারতে কোন এক জায়গায় খনির কুলী-সর্দ্দার ছিল, তখন তার মাকে ভালবেসে ছিনিয়ে নিয়ে আসে এবং বিয়ে করে, আর এই ভালবাসার পুরস্কার স্বরূপ সারা জীবন ধরে মায়ের সর্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এসব কথা সে গুলদার মুখ থেকেই বছর খানেক আগে শুনেছে। গুলদা তাকে আরও বলেছিল, "জানিস রুণকি তোর বাপটা কি পাজী, ম্যানেজারের কাছেই তোর সব গল্পই শুনেছি; ম্যানেজার বলেছে, তোর বাপ তোকে তার কাছে একদম বেচে দিয়েছে। কেবল যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন ম্যানেজার তাকে মাসে মাসে ৫০।৬০ টাকা করে দেবে এই ব্যবস্থা আছে।"

গুলদা তারপরে রুণকিকে কাছে টেনে এনে তার মাথাটি কোলের উপর রেখে একান্ত অকৃত্রিম স্নেহের সুরে বলেছিল, "তোর দিব্যি বলছি রুণকি, আমার যদি এ রকম বাপ্ হত তবে আমি তাকে খুন করে ফেলতুম, বাপ আবার কারুর এমনি ধারা বদ্‌মায়েস হয়, আর তোর মত সুন্দর মেয়েকে কেউ এমন করে বেচে দিতে পারে, আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনা রুণকি, তোকে ছেড়ে মানুষ থাকতে পারে কি করে! চ' তোতে আমাতে একদিন পালিয়ে যাই, এই বদ্‌মাইসদের দল থেকে—একটা ভাল দেখে কাজ জুটিয়ে নিয়ে তোতে আমাতে সংসার পাতব, তোকে কিন্তু একটুও শ্রম করতে দেবনা পয়সার জন্যে......। সে তুই পারবিও না আর আমার তাতে মান কমবে বই বাড়বে না।"

এমন কত কথাই গুলদা তাকে নির্জ্জন সন্ধ্যায় উদাস আকাশের তলায় বসে বলেছে, সেই গুলদার সঙ্গে এখন তার সম্পর্কই কি হয়ে দাঁড়িয়েছে, গুলদার জ্বলন্ত চোখ দুটো দিয়ে যেন একটা অস্বাভাবিক পাশবিক ক্ষুধার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, রুণকি আজকাল আর তার দিকে তাকাতেই পারেনা, ওর মাথা ধরে আসে।

রুণকি একবার পার্টির সব পুরুষ আর নারীর কথা ভাবে, সে দেখল সকলেরই জীবন যেন একটা পঙ্কিল কুৎসিত আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে। পুরুষের সঙ্গে নারীর দেহের সম্পর্কটাই যেন এদের জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য, কেউই এই পাশবিকতার থেকে মুক্ত নয়। নরনারীর এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আজ আর তার কিছুই জানতে বাকী নেই, সারা জীবন তাকেও কি এই পশুর দলে থাকতে হবে, আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সমস্ত দেহমনকে ছেড়ে দিতে হবে ঐ লম্পটগুলোর পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য! কিন্তু রুণকির উপায় কি? আবার তাকে সেই আগের মত স্বল্প পোষাকাবৃত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে খেলা দেখাতে হয়, গুলদার অত্যাচারের কবল থেকে মাঝে মাঝে বাঁচাতে হয়। গুলদা ছাড়া দলের অন্যান্য লোকের হাত থেকে লাঞ্ছিত হবার ভয়ও তাকে করতে হয়।

এই তো সেদিন 'সো' ভাঙ্গবার পর রুণকি যখন তাঁবুর পশ্চিম দিকে মোটা পরদা সরিয়ে মেয়েদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার কানে গেল, তাদের সার্কাস পার্টির জহর মোহনকে ডেকে বল্‌ছিল, "দেখেছিস মোহন, রুণকির দিকে একবার তাকিয়ে? বেড়ে মাল তৈরী হচ্ছে কিন্তু। মোহন উত্তরে বলেছিল, আরে আমি তো হরবকতই রুণকির দিকে নজর দিচ্ছি, তুই একটু দেখে লে।"

তাদের এই আলোচনা আর সে বেশীক্ষণ শোনা দরকার মনে করে নি। একটা শঙ্কা এবং ঘৃণায় সে তারপরে ক'দিন ওদের দিকে তাকাতে পারেনি।

কয়েকদিন পরে একদিন ভোরবেলায় সে জহরের পাল্লায় পড়ে গেল। সেদিন জহর তাকে সামনে পেয়ে হঠাৎ হাত ধরে ফেলল এবং জোর করে টেনে একেবারে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরল, তারপরে ম্যানেজারের চোখে পড়ে যাওয়ায় একছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার অবশ্য তাকে ডেকে শাসিয়ে দিয়েছিল, আর বলেছিল এরকম করলে দলের 'ডিসিপ্লিন' নষ্ট হয়ে যাবে।

রুণকির আর একটুও ভাল লাগে না। ভাল লাগে না তার এইভাবে জীবনযাত্রা, দলে তো আরও কয়েকজন মেয়ে রয়েছে। নতুন নাচওয়ালী রঙ্গিলাও তো সেদিন এসে ভর্ত্তি হয়েছে, সবাইরই মনের দিগন্ত জুড়ে কি তার মত একটা মানসিক চঞ্চলতা, অশান্তি আর অতৃপ্তি রয়েছে? রুণকির মন কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না।

রুণকি ভাবে একবার বুলানী, মুনিয়া আর রঙ্গিলাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে যে তাদের এইভাবে জীবনযাত্রা কেমন লাগে। ওদের কথা ভাবতে তার চোখে জল আসে।

ওদের জীবনটা যেন অভিশপ্ত। কতদিন এই দলে এইভাবে আছে, তা সে ঠিক জানে না, তবে এখন ওদের বয়স ২৫।২৬এর কম নয়, কিন্তু এর মধ্যেই যেন দেহের শক্তি সামর্থ্য সব হারিয়েছে—ওদের মুখে এক বিন্দুও সৌন্দর্য্য, স্নিগ্ধতা, কমনীয়তা নেই—আবার এদিকে জোর করে দেহে যৌবনকে বেঁধে রাখবার চেষ্টাও যে নেই তা নয়।

এরা দুজনেই নাচ বিভাগের মেয়ে। এদের মধ্যে মুনিয়ার স্বাস্থ্যটা বেশ খানিকটা খারাপ হওয়ায় রঙ্গিলাকে আমদানী করতে হয়েছে।

রুণকি ভাবে আচ্ছা, এরা তো আর কয়েক বছর পরে ম্যানেজারের আর কোন কাজেই আসবে না—তখন ম্যানেজার এদের কি এখানে থাকতে দেবে, না তাড়িয়ে দেবে? রুণকি নিজের কথাও ভাবতে বসে। সেও আর কয়েক বছর পর এই বুলানী, মুনিয়ার মত হয়ে যাবে। দেহ এবং মনের সব শক্তি হারিয়ে ফেলবে, তার নিজের সমস্ত সত্তাকে বিলিয়ে দিতে হবে এই সব হতভাগাদের আমোদের জন্য—তারপর, তারপর কি হবে তার অবস্থা?

হঠাৎ রুণকি রঙ্গিলাকে সামনে পেয়ে নিতান্ত প্রগলভার মত জিজ্ঞাসা করে বসে, "আচ্ছা রঙ্গিলাদি, তুমি কেন আবার হঠাৎ এ দলের মধ্যে ঢুকলে? নিজের ভাল মন্দ জ্ঞান তোমাদের কি একটুও হল না, এখন তো আর ছোট নও!"

রঙ্গিলা তার এই প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যায়। সে তো একটা ব্যবসাদারী মেয়েলোক। তা জীবনে আবার ভাল মন্দ কি। সে নিতান্ত লজ্জাহীনার মত একগাল হেসে বলে, "কি রে ছুঁড়ী, তোর আবার হলো কি? আমাদের আবার ভাল মন্দ কি? যেখানে মজা লুটব, ফুর্ত্তি পাব, রোজগার করব, সেইখানেই আমাদের দিন হেসেখেলে কেটে যাবে?"

রুণকি আর পরে তার সঙ্গে কোন তর্ক করেনি। কয়েকদিন পরে বুলানীকেও সে এই রকম প্রশ্ন করেছিল, বুলানীও প্রায় রঙ্গিলার মত জবাব দিয়েছিল, তবে সে আরও বলেছিল, "আমাদের আর উপায় কি? পৃথিবীতে আমাদের জন্ম এই উদ্দেশ্যেই।" রুণকি তারপরে আর একদিন মুনিয়াকেও ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, মুনিয়াকে তার মোটামুটি ভাল লাগে। মুনিয়া তার কথা শুনে বলেছিল, "সত্যি বলছি রুণকি, জীবনে যদি মানুষের মত বাঁচতে চাস রুণকি, তবে আজই পালা এখান থেকে, আমি তো মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছি, কিন্তু তোদের মত নিষ্পাপ প্রাণকে অকালে সর্বনাশের পথে পা বাড়াতে দেখলে সত্যই আর থাকতে পারি না। তুই পারিস তো আজই পালা।"

পালানোর কথা রুণকির মাথায় চেপে বসে। সারাদিন কাজে কর্ম্মে, খেলা দেখানোয় কেবল মাথার মধ্যে এক কথা, পালাতে হবে। ভাবতে ভয় হয়, শঙ্কা হয়, অথচ একটা আনন্দও হয়।

কিন্তু কি ক'রে পালানো যায়? যদি বা দুপুর রাতে সকলের নিদ্রার সুযোগ নিয়ে তাঁবুর

বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু এই অজানা দেশে কোথায় তার আশ্রয়? তার কেউ নেই। পিতা-মাতার কাছে কি করেই বা যাবে? বাপ যদি আবার জানিয়ে দেয় সার্কাসের ম্যানেজারকে? তাঁবুই তার বাড়ী, তার জগৎ। তাঁবুর বাইরে যে বিরাট জগৎ রয়েছে তার অসংখ্য নর-নারীর সহিত তার সম্পর্ক খেলা-দেখানোর সম্পর্ক—সে-সম্পর্কে স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, প্রেম নাই। সমস্ত জগতের সংখ্যাহীন নর-নারীর নিকট থেকে এক বিন্দু অশ্রু পাবার কোন সুযোগ নেই তার।

শিবিরের চারদিকে বন্দী-জীবনের অসহ্য জ্বালা। সিংহগুলির গুমরে উঠা কান্না, হাতীর ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ, বাঘের ব্যথাভরা গোঙানি সবই যেন ব্যর্থ জীবনের মূল্যহীন ক্রন্দন। মুক্তি নেই? মুক্তি স্নান?

যে যখনি পালায়, তাকে লক্ষ্যহীনভাবে পালাতে হয়। এ কথা কে যেন রুণকির কানে ঢুকিয়ে দিল। চাই মুক্তি। এই জীর্ণ কাপড়ের তাঁবুর আবরণের বাইরে অখণ্ড বিরাট জগতে মুক্তি চাই। যেতেই হবে।

এক নির্ম্মল প্রভাতে সহরের চারশত মাইল দূরে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত রুণকি ট্রেণ গাড়ী থেকে নেমে অবাক হয়ে ভাবলে, এখন কি করি? হয়তো তাঁবুর সবার ভেঙেছে ঘুম, রাত্রের অন্ধকারে তার পলায়নের খবর কেউ পারেনি জানতে। কিন্তু এখন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো এসেছে পৃথিবীতে। ছদিন আগে রঙিলা পালিয়ে গেছে, তিন দিন আগে গুলদা। সবাই ভাবে রঙিলা ভাল নাচে, অন্য কোথায় জুটিয়ে নিয়েছে। ধরা তো তারাও পড়েনি!!

'কাঁহামে যায়েগা মাইজী'—এক কুলীর বিনীত প্রশ্ন! রুণকি অবাক নিস্তব্ধভাবে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

'পরের গাড়ী কখন আসবে?'

'আধ ঘণ্টা বাদ।'

'কোথায় যাবে?' কি গাড়ী?

'বি, এন, আর।'

রুণকি ভাবে তাতেই যাবো। টাকা আছে পঞ্চাশের ওপরে। তাঁবুর পঙ্কিলতা থেকে জগতের বিরাটতার পানে মুক্তি সাগরের সন্ধানে গাড়ী তীব্র বেগে ছুটবে—কোথায় থামবে কে জানে। লক্ষ্য না হয় নাই রইল, কিন্তু মহাতৃপ্তির এ তো মুক্তিস্নান!

এদিকে সকালে তাঁবুতে মহা সরগোল পড়ে যায়। রুণকির কোন খোঁজ নেই। সবাই ভাবে পালিয়েছে জানি কোন লোভে পড়ে। ধারণা কিন্তু সবার এক হয় না।

বুলানী বলে, জানিনে! গেছে ঐ গুলদার সঙ্গেই। রঙিলা বেটী তো আগেই পালাল। পরে দুজনে করেছে চুক্তি। সবাই গেল—বয়সে আমরাই কিছু করলুম না। হুঁ......দীর্ঘশ্বাস।

মুনিয়া বলে, মেয়েটার পেটে যে এত কুবুদ্ধি ছিল জানতাম না তো। রঙিলা নতুন নাচওয়ালী—ভাল কাজটাজ পেয়ে থাকবে, গেছে। এই গুলদাটাই ওকে সরালে। যেটাকে জানিনে আমি? পীরিত আমার সঙ্গেই কম করতে চেষ্টা করেচে? আহা মেয়েটার সর্বনাশ করলে।

কেবল ম্যানেজার চুপ করে তার ঘরে বসে ভাবে। দীর্ঘ প্রৌঢ় চেহারায় একটা শিথিলতার ভাব আসে। হঠাৎ চোখের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে। একখানা কাগজের দিকে আবার চোখ বুলায়—

'আমি চললুম। এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাই! এখানে আর কোন ছোট মেয়েকে আনবেন না, আমার শেষ অনুরোধ।—রুণকি!'

ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁতের ফাঁকে বলে ওঠে—মুক্তি? বেশ!

জয়যাত্রার পথে তুর্কীনারী

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

আতাতুর্ক জাতির কানে মুক্তির বাণী শুনাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। পুরুষের ন্যায় নারীরও সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার বিধিবদ্ধ করিলেন। নারীর বোর্খা উঠিয়া গেল। তাহার গতি হইল অবাধ ও সচ্ছন্দ। নারীর প্রতি একটা নূতন মর্য্যাদা-বোধ জাতির প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

ধর্মযাজক, মৌলবী ও মোল্লাদের প্রভাব চিরতরে খর্ব হইয়া গিয়াছে। তবু যদি এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পায়, কামালের দৃঢ়-কঠোর শাসন-সবল বাহু তাহার জন্যও সর্বদাই প্রস্তুত।

অথচ সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা, কামাল নারীর কোনো বিশেষ অধিকারের কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন; "নারী-পুরুষের এই সব অনাবশ্যক ভেদাভেদ চুলায় যাক্। কর্মই কর্মের রূপ; নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রভেদে তার রূপ বদলে যায় না। শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, লেখক,—নারী হোক আর পুরুষ হোক, আকার এদের বদলাবে না।" এমন কি শব্দের ব্যাকরণ-গত পার্থক্যও তিনি মানিয়া নিলেন না।

আতাতুর্কের প্রত্যেকটি কাজ ইন্দ্রজালের মতো। সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্য্যোগের মধ্যেও তিনি যেমন ছিলেন একটা মস্ত বড় বিস্ময়, আজো সমগ্র জাতির নিকট তিনি তেমনি মূর্ত্তিমান বিস্ময়। নব্য-তুর্কী তাই বলে, "আমাদের একমাত্র কাজ তাঁকে মেনে চলা। তিনি দেবেন নির্দেশ, আর তাঁকে কিছু করতে হবে না। তিনি কখনো ভুল করেন নি, করতে পারেনও না।"

কামাল কোনো দিনই গায়ের জোরে সংস্কার চালাইবার পক্ষপাতী নহেন। যে অনাবিল স্বতঃপ্রণোদিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সমগ্র জাতি তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছে, তাহারই উপর আতাতুর্কের সকল সংস্কারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

তুরস্কের বদ্ধমূল ধর্মান্ধতা তাঁহার অজানা ছিল না; তিনি ইহাও জানিতেন যে বর্তমানে ইস্‌লামীয় সভ্যতার ধার্মিক ও সামাজিক রূপ অবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে-কোনো সামাজিক সংস্কারকে ধর্মের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ মনে করিয়া ধর্মান্ধরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে, একথাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু এ সকলের উপরেও তিনি চিনিতেন তাঁহার নব্যতুর্কীকে বেশি করিয়া, যাঁহাদের সাহায্যে তিনি তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিতে চান।

পুরুষের ন্যায় নারীর জন্যও বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন প্রচলিত হইয়াছে। চল্লিশ বৎসরের নীচের স্ত্রী-পুরুষের প্রত্যেককেই লেখাপড়া শিখিতে হইতেছে। চল্লিশের উপরের স্ত্রী-পুরুষের প্রতি এ আইন প্রযুক্ত না হইলেও নব্য-তুরস্কের অতিবৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও আজ আর নিরক্ষর থাকিতে

চায় না। তাহারা নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া বিদ্যালয়ে যায়: একান্ত ধৈর্য্য ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। আজিকার তুরস্কে অশীতিপর বৃদ্ধাকে কেহ যদি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সে হাসিমুখে বলিয়া থাকে "ঘরের ছেলেমেয়েরা সবাই আজ শিক্ষিত হয়ে উঠছে, আমি পেছনে পড়ে থাকতে পারি না।" দেহ তাহার কুব্জ কিন্তু মনে তাহার যৌবনের তেজ ফিরিয়া আসিয়াছে।

দাসী চাকরও এই বিরাট জাতীয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ হইতে বাদ পড়ে নাই। সন্ধ্যার পর প্রত্যেক পরিবার দাসী চাকরকে ছুটি দিতে আইনতঃ বাধ্য; তাহাদের বাদ দিয়া তো জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

ছেলেদের ন্যায় মেয়েরাও চারুশিল্প ও উটজশিল্পের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। মেয়েদের নর্মাল কলেজের কার্জ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দলে দলে নব্য-তুর্কী-তরুণী তুরস্কের বালক-বালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শিশুগণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানুষ করিয়া তোলাকে তাহারা পবিত্র কার্য বলিয়া গণ্য করে। তুরস্কের সেবা অপেক্ষা আর কোনো মহৎ ও বৃহৎ লক্ষ্য তাহাদের নাই।

তুরস্কের নারী বাহিনী

ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষাদানের প্রথায় (co-education) আতাতুর্কের অত্যধিক আগ্রহ। নেকী হানমের কঠোর সাধনা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে বর্তমান তুরস্কের স্কুল কলেজে ২৩৮,৫৬৩ জন ছাত্রী আর ৫,৯২৬ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন।

তের বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইবার উপায় নাই। তের বৎসর বয়স পর্যন্ত তুরস্কের জাতীয় স্কুলেই তাহাদের পড়িতে হয়। ভাল ভাবে মন তৈয়ারী না হইলে আতাতুর্ক একটি ছেলেমেয়েকেও বৈদেশিক আওতায় যাইতে দিতে চান না। আগে তাহারা তুরস্ককে চিনুক, জানুক, প্রাণ ভরিয়া তুরস্ককে ভালবাসিতে শিখুক, তারপর বিশ্বের দিকে দিকে তাহারা ছুটিয়া যাউক।

যুদ্ধের সময় যে-সব মন্ত্রীদের লইয়া সমর পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, আজ তাহাদের লইয়াই

শিক্ষা-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহার কর্ণধার নেগাতি বে। আজিকার তুরস্কের ইহাই প্রকৃত রূপ। সে-দিন যুদ্ধের সফলতার জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল, আজ শিক্ষাবিস্তারকল্পে সেই শক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে। সেদিনের সমস্যা ছিল বর্তমানকে লইয়া, আজিকার সমস্যা জাতির ভবিষ্যৎ গঠন। বর্তমান যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতের সংগ্রামের সম্ভাবনাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে আজো পারে নাই। নিজেকে বাঁচাইতে হইলে ইহা তাহাকে করিতেই হইবে।

কর্মের একটা বিপুল নেশা নব্য-তুরস্ককে পাইয়া বসিয়াছে। একটা অবিশ্রান্ত কর্মের প্রবাহ তাহার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। নব্য-তুরস্কের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহ আর পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না।

হারেম হইতে ফ্যাক্টরীতে

তুরস্কের প্রাচীন নৃত্য-শালা, বড় বড় মস্‌জিদ্ স্কুলগৃহে পরিণত হইতেছে। দুই চারিটি আগেকার রাজ-প্রাসাদও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লাগিয়াছে। সুলতান আবদুল হামিদের অত বড় পাঠাগার আজ কন্‌ষ্টান্‌টী-নোপল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নুরুদ্দীন বে'র জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তও নব্য-তুর্কীর শিক্ষার কাজ ব্যাপৃত থাকে। বিপ্লবের দিনে যে অনন্য, অসাধারণ এবং জীবন-পণ-করা দুর্জ্জয় সংকল্প ইহাদের প্রাণে জাগিয়াছিল, নূতন রূপে আজো তাই ইহাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তেমনি চাঞ্চল্য তেমনি অধীরতা, তেমনি নিজেকে বিলাইয়া দিবার অদম্য সুখে ইহাদের সকলের প্রাণ আজো পরিপূর্ণ। কেহ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ইহারা বলিয়া উঠে, "শতাব্দীর পিছনে তুরস্ক পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার যে আজ ক্ষতি-পূরণের দিন।"

তুরস্কের নারী-স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির স্বাস্থ্য বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য একতালে যাইতে না পারিলে নব্য-তুর্কীর অভীপ্সিত জীবনের স্ফুরণ হইবে না,—একথা কামাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পুরুষানুক্রমিক হারেম-জীবন তুর্কীনারীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বয়স একটু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কী-নারীর দেহ হয় অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িত, আর না-হয় অনাবশ্যক স্থূলতা তাহার সকল সৌন্দর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। যক্ষ্মারোগ তুর্কী-নারী-জীবনের নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব মৃতকল্পা হতভাগিনীদের গর্ভেই ভবিষ্যৎ তুর্কী-বংশধরেরা জন্মগ্রহণ করিত। প্রাচীন তুর্কী-জীবনে বাঁচিয়া থাকাই ছিল আকস্মিক ঘটনা। শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৭৮।

অথচ পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা বোধ হয় তুর্কীরই মানুষের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। অবিরাম যুদ্ধ, বিপ্লব ও নৈসর্গিক বিপর্যয় কতকাল হইতে তাহার লোক-বল ধ্বংস করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক শিশুর জীবন যে তুরস্কের কত বড় সম্পদ, সে-দিন একথা সে বুঝিতে পারে নাই।

তুরস্কের তরুণ বৈজ্ঞানিক দল

প্রাচীন তুরস্কে ইচ্ছা থাকিলেও শিশু ও জননীকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় ছিল না। অশিক্ষিতা গ্রাম্য ধাই ও কুসংস্কারের অগ্রদূত 'তুক্‌তাকে'র উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইত।

কিন্তু আজিকার তুরস্ক দেখিয়া এ-দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। আজ প্রত্যেকটি ছোট বড় সহরে 'শিশুমঙ্গল সমিতি' ও 'শিশু-সেবা-সদন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিশুরক্ষা কার্য কামালের অন্যতম বিলাস। গভর্ণমেণ্টের যাহা করিবার তাহা তো করাই হয়, তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত হিসাবে এ বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। নূতন কোনো 'শিশুমঙ্গল সমিতি' বা 'শিশু-সেবা-সদন' প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র তাঁহার মুখে-চোখে আনন্দের উচ্ছ্বসিত দীপ্তি ফুটিয়া উঠে। স্মিত মুখে তিনি বলেন, "তোমরা তুরস্কের শিশুদের সবল ক'রে তোল, আমি তোমাদের স্বাধীনতা অক্ষয় ক'রে গড়ে তুলব।"

তুরস্কের মহিলা ডাক্তার শ্রীমতী আতাউলা লণ্ডনের এম,ডি এবং শ্রীমতী সাফায়ার আলি জার্মানীর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা। উভয়ের আহার নিদ্রারও আজ অবকাশ নাই। ইঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নব্য-তুর্কী-মেয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতেছে। জাতি তো শুধু পুরুষের নয়, তাহাদের লইয়াও তো জাতি; তাহারাই বা তবে বসিয়া থাকিবে কেন?

বর্তমান তুরস্কের অন্যতম খ্যাতনামা অধ্যাপক সেলিমসারী বে মেয়েদের সুইজারল্যাণ্ডের প্রথায় ড্রিল শিখাইবার জন্য সেখান হইতে একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন। এই মহিলাটির অপরিসীম চেষ্টা ও আন্তরিক যত্নের ফলে ত্রিশটী তুর্কী রমণী ড্রিলে পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছে। ইহারাই সমগ্র দেশের স্কুলে শিক্ষকতা করিবে।

দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলে মানুষ যেমন তাহার সর্বাঙ্গেই স্বাস্থ্যের স্পন্দন অনুভব করে, জাতির স্বাস্থ্য-সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি অনুভূতি হয়। তুরস্ক একদিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল, সর্বাঙ্গে তাহার ক্ষত ছিল, ক্লেদ ছিল; আজ সে নষ্ট স্বাস্থ্য শুধু ফিরিয়া পায় নাই, পূর্ব স্বাস্থ্য অপেক্ষাও স্বাস্থ্য তাহার সুন্দর হইয়াছে, সবল হইয়াছে। তাহার কোন বিশেষ অঙ্গ সজীবতা লাভ করে নাই, সমস্ত অঙ্গে তাহার নব-জীবনের আশা জাগিয়াছে, কল্পনা জাগিয়াছে।

আনকোরায় একজন নারী শিল্পী

ললিত কলা বলিতে তুরস্কে কিছু ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। জগতের ভাস্কর্য, সাহিত্য, চিত্র-শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যশিল্পের ভাণ্ডারে তুরস্কের আজ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নাই। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং একান্ত অজ্ঞতা এ-পথে প্রতি পদে-পদে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ ভাবপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয় তুর্কীর পেলব-কোমল শিল্পী-মন ললিত-কলার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র।

একটা জাতি যদি তাহার অন্তরের কল্পনাশক্তি ও ভাবাবেশ হারাইয়া ফেলে, সে জাতি বাঁচিতে পারে না। ললিত-কলা এই কল্পনা ও ভাবাবেগকে আহার যোগায়, তাহাকে প্রাণবন্ত করে। ললিত-কলার চর্চা না থাকিলে জাতিকে উপবাস করিতে হয়!

নব্য-তুর্কী একথা বুঝিতে পারিয়াছে। প্রকৃতি দেওয়া প্রাণশক্তিকে সে তাই ফিরিয়া পাইতে চায়। কামালের আদেশে 'মিউজিয়ম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাচীন স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ সেখানে যাহা পাওয়া যাইতেছে, সযত্নে 'মিউজিয়মে' রক্ষিত হইতেছে।

ভাস্কর্যের কাজ দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। এক কামালেরই ছয়-ছয়টা প্রস্তর মূর্তি

বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রেজান হানুম এবং সেবিহা হানুম এদিকে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কামাল আশা করেন, তুরস্কের তরুণীরা একাজে আগাইয়া আসিবে। রেজান নিজে কামালের একটি প্রস্তর মূর্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

কন্‌ষ্টান্‌টিনোপ্‌লের ভূতপূর্ব পার্লিয়ামেন্ট প্রাসাদ আজ নব্য-তুরস্কের কলাভবন (School of Art)। মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। উৎসুক নর-নারী প্রদর্শনীর গৃহে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভিয়েনার শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে আরো একটি স্কুল খোলা হইয়াছে।

তুর্কী-চরিত্রে স্বভাবতই নাটকীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। সহজ ও সরল মজ্জাগত ভাবভঙ্গীদ্বারা নরনারী প্রত্যেকেই আশ্চর্যরূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। পূর্বে কোনো মুসলমান নারী নাট্যশিল্পে যোগদান করিতে পারিত না। আজ আর সে-বাধা নাই। বহু স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া থাকে। বর্তমানে মোহিদ রিফেত্‌ বে ও তাঁহার পত্নী নাট্যকলায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

নাট্যকলা নূতন ভাবে রূপান্তরিত করিবার জন্য বহু ছাত্র ও ছাত্রীকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হইয়াছে। অতীতের জীবন হইতে তাহারা বহু নাটকীয় উপাদান পাইয়াছে।

তারপর নৃত্য, নৃত্য কামালের আরেকটি বিলাস। সন্ধ্যার নীলাঞ্চল পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্কের নৃত্যশালা নবরূপ ধারণ করে।

কামাল নিজে নৃত্যে যোগদান করেন। সর্বপ্রথম তাঁহার বিশ্বস্ত গোষ্ঠী-মেয়েদের (Party Women) লইয়াই এই দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হন। তুর্কী-নারী প্রকাশ্যে পরপুরুষের সহিত নৃত্যশালায় নাচিবে, কেহ একথা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

আজো কেহ কেহ কামাল ও তাঁহার হাতে-গড়া নব্য-তুরস্কের প্রতি কটাক্ষ না করে তাহা নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে উহা করিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। লেখা বা কথা তো দূরের কথা, সামান্য আকার-ইঙ্গিতেও যদি তুর্কী নারীর এই জয়যাত্রাকে বিদ্রূপ করিবার কেহ প্রয়াস পায়, রাজদণ্ডের কঠোর শাসন তাহাকে কিছুতেই রেহাই দেয় না। কেহ এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কামাল বলেন: "জীবন ভরিয়া বড় দুঃখ ওরা পাইয়াছে, আজ একটু আনন্দ করুক।"

অথচ তুরস্কে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না বা প্রতিভাশালিনী কোনো নারী এই আন্দোলনের পুরোভাগে নাই। অতি সাধারণ নারীই এই কাজে আগাইয়া আসিয়াছে এবং ইহাদের সহায়তায় কামাল অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

হালিদা হানুম ইচ্ছা করিলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারিতেন এবং একদিন করিয়াছিলেনও কিন্তু কামালের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের রূপ লইয়া সর্বপ্রথম মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। তারপর বহু দূর গড়াইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে হালিদা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে বাস করিতেছিলেন।

এই বিপ্লবী-তুর্কী-মহিলার অসামান্য আত্মবিশ্বাস, গঠনশক্তি এবং তাঁহার চরম মতবাদ একদিন

তুরস্কে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপ্লবের মধ্যে এই নারী যে ধীশক্তি, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। কন্‌ষ্টান্‌টিনোপ্‌ল্‌ হইতে কৃষক রমণীর বেশে পলায়ন, আনকোরার সেই দুর্গম-পথে অসংখ্য বিপদের মধ্যে তাঁহার অবিচলিত যাত্রা, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষেত্রে বিপ্লবী বন্ধুদের পাশে দাঁড়াইয়া পরিখাযুদ্ধ,—এ সবই উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

হালিদার সাহিত্য-রসানুভূতি অতুলনীয়। একদিন তাঁহার লেখনী ও বাণী তুরস্কের অবরুদ্ধ প্রাণকে চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজো তাঁহার অনবদ্য 'জীবনস্মৃতি' তুর্কী-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

হালিদার পরই নেকী হানুমের নাম উল্লেখযোগ্য। নেকী আজো তুরস্কের নারী-আন্দোলনের প্রাণস্বরূপা। নেকী আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় আজ তুরস্কে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষার (co-education) ব্যবস্থা হইয়াছে।

তুরস্কের ভবিষ্যৎ নারী-আন্দোলনের ধারা কোন্ পথে পরিচালিত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অত্যধিক পাশ্চাত্যানুকরণ-প্রিয়তার জন্য কেহ কেহ তুর্কী-নারীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে; কিন্তু তুরস্কের চিন্তাশীল সমাজ-সংস্কারকগণ, বিশেষ করিয়া আতাতুর্ক এ সব শুনিয়াও শুনিতে চান না। শতাব্দীর বন্ধন-দশা হইতে মুক্তি পাইবার পথে যদি ক্ষণেকের জন্যে একটু-আধটু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়ই, তাহা এমনই বা কী মারাত্মক! আতাতুর্ক বলেন: "দাসত্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে-কোনো একটাকে যদি আমাকে বেছে নিতে হয়, আমি উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বেছে নেব।"

তুরস্ক আজ সমগ্র প্রাচ্যের অগ্রদূত: কে জানে অবশিষ্ট প্রাচ্য তাহাকে কী ভাবে গ্রহণ করিবে?

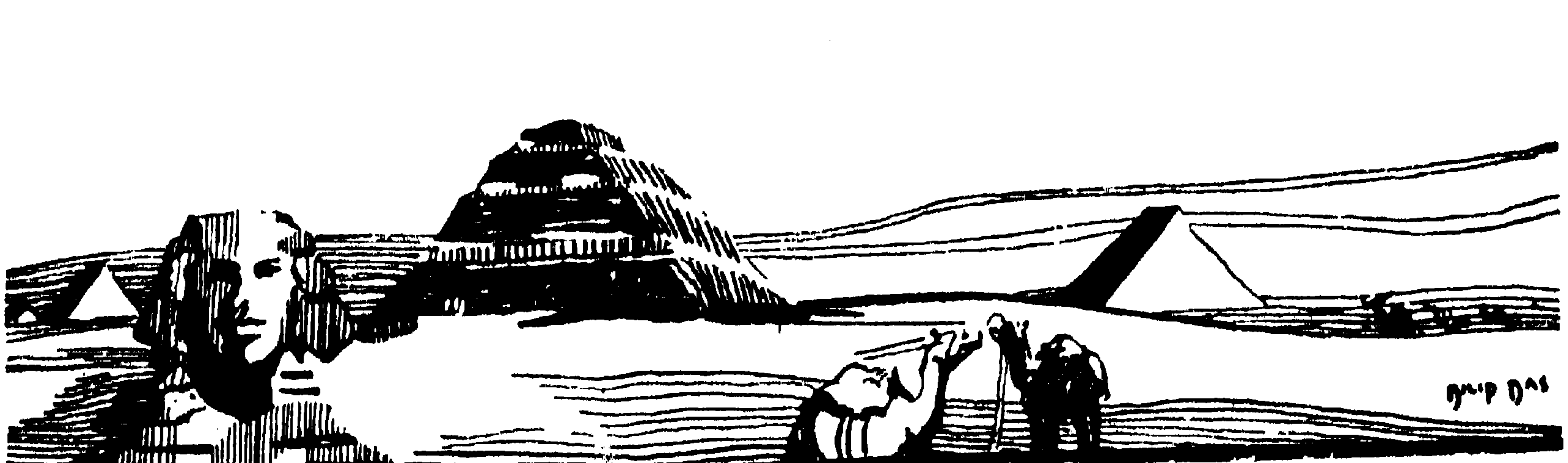

মে-দিবস

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ ব্যথায় কাল যুগান্ত কম্প্রমান,
পাণ্ডুর দিন দহন দাপটে ক্ষণে মিলায়
ঘোড় সোয়ারের ঘর্ম বুঝিবা ঝরে বৃথাই
শাণিত সূর্য আগামীকালের বাণী শোনায়।

শাসনের নামে এই বুঝি শেষ শোণিতপাত
রাজপথে কাঁপে দৃঢ় সামরিক পদক্ষেপ,
বৈশাখী ঝড়ে উড্ডীয়মান লাল নিশান,
উঁচু উদরের শ্রান্তি মেটেনা কী আক্ষেপ!

পরোয়াবিহীন কুচকাওয়াজের জিন্দাবাদ,
পাথুরে বুকের সফল স্বপ্ন উদ্দীপন,
কুমারী পৃথিবী স্পন্দিত প্রাণ কী উল্লাস
বণিকের বুকে শক্তিশেলের আবর্তন।

দূরদিগন্তে দ্বিতীয় সূর্য আলোকময়
ব্যর্থ ব্যথায় বেওনেট করে আর্তনাদ,
সৈনিক প্রাণে শোণিতের বেগ উচ্ছলিত
ইনক্লাব আর কাস্তে-হাতুড়ী জিন্দাবাদ।

ঝড়ের শেষ

মানসকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্ষণমুখর আকাশ ভোরের দিকে সবেমাত্র ক্ষান্ত হইয়াছে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে আসাতে সুশান্ত বিছানার চাদর গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিল। অলকা স্নান সারিয়া চায়ের কাপ হাতে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল ঘড়িতে প্রায় সাতটা বাজিতে চলিয়াছে কিন্তু সুশান্ত গায়ে ঢাকা দিয়া দিব্য আরামে তখনও নাক ডাকাইতেছে। বাহিরে তীব্র শব্দে মোটরের হর্ণ জানাইয়া দিল হাঁসপাতালের সময় হইয়াছে গাড়ী প্রস্তুত।

হর্ণের শব্দে সুশান্ত'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানার উপর বসিয়া চোখ রগড়াইয়া ঘড়িতে দেখিল বেলা সাতটা হইয়াছে। তারপর বিরক্তভাবে অলকার দিকে চাহিয়া বলিল—এ্যাঃ বড্ড বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিত আচ্ছা তুমিও ত কই ডেকে দাওনি ?

অলকা হাসিয়া বলিল—বাইরে বর্ষার হাওয়ায় গায়ে ঢাকা দিয়ে বেশত আরামে ঘুমুচ্ছিলে আর তাছাড়া আমি ত সবে স্নান সেরে এই আসছি।

তাড়াতাড়ি ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া সুটটা পরিয়া কোট গায়ে চাপাইতে চাপাইতে সুশান্ত হাত বাড়াইয়া বলিল—চা'টা দাও অন্য কিছু খাবার আর সময় হবে না বড্ড বেলা হয়ে গেছে—

কোনমতে খাবারটা গিলিয়া চায়ের পেয়ালাটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া সুশান্ত গাড়ীতে গিয়া বসিতেই গাড়ী হাঁসপাতালের দিকে চলিল।

সুশান্ত রায়—কোন মফঃস্বলের সরকারী হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিবার পর পিতার সুপারিশে সহরের কোন একটী সরকারী হাঁসপাতালে সহকারীরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, পরে নিজের কৃতিত্বে অবশ্য বছরখানেক বিলাতে কাটাইয়া আসিয়া মোটা বেতনে কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন একটী সরকারী হাঁসপাতালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিৎসকের কাজ পাইয়াছে।

গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইতেই সমাগত রোগীদের সামনে দিয়া সুশান্ত দৃঢ়পদে নিজের ঘরের দিকে চলিল—ডাক্তারবাবুকে আসিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হাঁসপাতালটাই কর্ম্মমুখর হইয়া উঠিল।

অনেকগুলি রোগী দেখিয়া ও সহকারী ডাক্তার ঘোষকে গুটীকয়েক রোগী সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিয়া সুশান্ত আবার নিজের ঘরে চেয়ারে আসিয়া বসিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 'আউট ডোরে' রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে সুরু করিয়াছিল—সুশান্ত চেয়ার ছাড়িয়া একবার

তাহার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইল। উঠানের ওপাশে বড় হলঘরে মাথায় সাদা কাপড় ঢাকা শুশ্রূষাকারিণীর দল নিঃশব্দে নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়াছে পাশের ঘরে সহকারী ডাক্তার ঘোষ তখনও কয়েকটী রোগী লইয়া ব্যস্ত।

বেলা তখন অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, হাতেও বিশেষ কিছু কায ছিল না কাজে-কাজেই সুশান্ত উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময় ডাক্তার ঘোষ আসিয়া বিনীতভাবে জানাইল যে একবার 'ইমার্জ্জেন্সি ওয়ার্ডের' দিকে যাইতে হইবে—একটা নূতন কেস্ এইমাত্র আসিয়াছে।

হাঁসপাতালের গাড়ী তখনও দাঁড়াইয়া, উর্দ্দিপরা বাহকেরা সবে ষ্ট্রেচার লইয়া ঘরের ভিতর হইতে আসিতেছিল ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়া নত হইয়া সেলাম করিয়া সঙ্কুচিতভাবে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

সুশান্ত ভিতরে যাইয়া দেখিল টেবিলের উপর এক স্ত্রীলোকের দেহ। তাহার পরণের ময়লা কাপড় মাঝে মাঝে ছেঁড়া ও রক্তের দাগ লাগা। মাথায় কপালে জায়গায় জায়গায় থেঁতলান এবং জমাট রক্ত শুকাইয়া রহিয়াছে। মুখখানা বিকৃত, রোগিণী অজ্ঞান—তবে মরে নাই, গাড়ীচাপা পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সুশান্ত বুঝিতে পারিল যে আঘাত সাংঘাতিক। রোগে ভুগিয়া জীর্ণ শরীরের উপর মোটরের ধাক্কার চোটে প্রাণ বাহির হয় নাই সত্য কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেও বাঁচিবার সম্ভাবনা খুব কম।

মৃত্যুপথ যাত্রী হইলেও তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে তাই সুশান্ত একটা 'ইনজেকসান্' করিয়া রোগিণীকে একটা খালি বেডে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবে—এমন সময় রোগিণী একটু নড়িয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের মধ্য হইতে একটা ছোট জিনিস মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। ডাক্তার ঘোষ সেটাকে কুড়াইয়া সুশান্তর হাতে দিতে সুশান্ত দেখিল সেটা একটা ছোট লকেট, বহুদিনের অব্যবহার্য্য ভিতরের ফটোখানাকে এখন আর চিনিবার উপায় নাই। লকেটটী তুলিয়া দেখিতে দেখিতে সুশান্তর মুখে একটু হাসি দেখা দিল, মনে মনে ভাবিল—রুগ্ন, শীর্ণ, মরণের মুখে চলিয়াও প্রিয়তমের স্মৃতিটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে—ছাড়ে নাই।

ডাক্তার ঘোষ জানাইল—পুলিশে এগুলো পাঠাইতে হইবে। পরিচয় পত্রে নাম লিখিবার জন্য ডাক্তার ঘোষ সুশান্তকে বলিল তাইত নামত লিখতে হবে কিন্তু কি লেখা যায়?—তারপর সে সুশান্তর হাত হইতে লকেটটা লইয়া দেখিতে লাগিল—

হঠাৎ হাতের চাপ লাগিয়া—লকেটটা খুলিয়া যাইতেই ডাক্তার ঘোষ দেখিল যে ভিতরে ছুটী ছোট্ট অক্ষরে লেখা 'মীনা'।

লেখাটা পড়িয়াই ডাক্তার ঘোষ সুশান্তর হাতে লকেটটা দিল। পরে নামটা লিখিয়া লইয়া

সুশান্তকে বলিল—চলুন ফেরা যাক্—সুশান্ত লকেটটা লইয়া অন্যমনস্কভাবে নিজের কোটের পকেটে ফেলিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া—কি মনে করিয়া সুশান্ত লকেটটা পকেট হইতে বাহির করিল—মীনা নামটা দুই তিনবার পড়িয়া সে একটু গম্ভীর হইয়া গেল, বহুদিনের একটা হারাণো স্মৃতি—কালো পর্দ্দা তুলিয়া তাহার চোখের সামনে তখন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধনীর প্রাসাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দরিদ্রের এক ভাঙ্গা একতলা বাড়ী—ঝড় ঝাপ্টা খাইয়া কোনমতে টিকিয়া আছে। বাড়ীর সামনে ছোট এক টুকরা ফুলবাগান। ভোরে স্নান সারিয়া এক কিশোরী সাজি হাতে প্রতিদিন বাগানে আসিয়া ফুল তুলিতে থাকে। ধনীর প্রাসাদের দ্বিতলের জানালা খুলিয়া যায়—পাঠনিরত এক যুবক বসিয়া বসিয়া তাহা দেখে। এ বাড়ীর গৃহিণী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তিনি এ দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আর তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। ক্রমশঃ মেয়ের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীতে একটা আবর্ত্তন সুরু হইল। চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়াও যখন পাত্র মিলিল না তখন কন্যার পিতা সদাশিববাবু প্রতিবেশী রায় সাহেব হরিহরের শরণাপন্ন হইলেন। সমস্ত শুনিয়া রায় সাহেব গম্ভীরভাবে রায় দিলেন যাহা হইবার নহে তাহা হইবে না এবং পুত্রকে বিদেশে পড়িবার অছিলায় কঠোর নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর সদাশিববাবুর বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল, দরজা খুলিতেই সুশান্ত ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল—'কাকাবাবু মীনা কোথায়?'

কেহ কোন কথা বলিবার আগে সুশান্ত নিজের পকেট হইতে একছড়া সরু সোনার হার বাহির করিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—মীনা আজ থেকে তুমি আমার, আমি শিগ্‌গির ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু 'তারপর'—একটা শব্দ করিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া গেল, সুশান্তর চমক যখন ভাঙ্গিল তখন দেখিল অলকা জানালা দিয়া হাসিমুখে রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুশান্ত সোজা উপরে গিয়া পাখাটাকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। অলকাও স্বামীর পিছু পিছু উপরে আসিয়াছিল, এবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সুশান্ত অলকার দিকে চাহিয়া শুধু বলিল—রুনু কোথা?

অলকা এ ভাবের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কেন রুণু ত ইস্কুলে!

সুশান্তর বুক হইতে অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দুই হাতে নিজের মাথাকে চাপিয়া ধরিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল—এমনই।

অলকা একেবারে সুশান্তর গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল কপাল গরম নয়—যাক্ অসুখ বিসুখ কিছু নহে—

কিছুক্ষণ পরে সুশান্ত মুখ তুলিয়া অলকার দিকে চাহিয়া বলিল—'অলকা—'

সুশান্তর গলা দিয়া যে স্বর অলকার কানে আসিল সে স্বর অলকার নিকট অপরিচিত। দীর্ঘ ছয় বছর একসঙ্গে থাকিয়া সুশান্তর এ মূর্ত্তি কখনও সে দেখে নাই।

সুশান্তর পাশে বসিয়া তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অলকা সুশান্তর ভিতরের কথাটা জানিবার চেষ্টা করিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুশান্তর দিকে সে এমন ভাবে চাহিল যে সে চাহনির অর্থ :—কি-এমন গোপন কথা—যা স্ত্রীর সামনে প্রকাশ করিতে সুশান্তর বাধিতেছে।

সুশান্ত পকেট হইতে লকেট্‌টা টানিয়া বাহির করিয়া অলকার সামনে তুলিয়া ধরিল ও হাতের চাপ দিয়া সেটাকে খুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—'পড়'—

কিছু না বুঝিতে পারিয়া অলকা লকেট্‌টা লইয়া ভিতরের লেখাটা পড়িল ও সুশান্তর দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল অপরাধীর মত সুশান্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তার মূর্ত্তি পাথরের ন্যায় স্থির ও চোখে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

অলকা চোখ বুজিয়া লেখাটার যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ মনে মনে কল্পনা করিয়া যখন চোখ খুলিল তখন তাহারও দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত দিন কাহারও ভাল করিয়া স্নানাহার হইল না। সুশান্ত উপরের ঘরে সারা বেলাটা ছটফট করিয়া কাটাইয়া দিল। লজ্জায় অলকার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার মত সাহস সে আজ হারাইয়াছে। একটা নিরপরাধিণীর জীবন-মৃত্যুর দ্বারের দিকে আজ সে চলিয়াছে—তাহার জন্য দায়ী সে নিজে। মীনা গাড়ীর নীচে চাপা পড়িলেও নারীহত্যার অপরাধে যদি সুশান্তকে দোষী করা যায় তাহা হইলে সুশান্ত স্বেচ্ছায় যে কোন চরম দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতে আজ প্রস্তুত।

—আর অলকা আজ যে অস্বস্তি পাইয়াছে সারাজীবনের মধ্যে সে এরূপ জ্বালা কখনও পায় নাই। তাহার সমস্ত মন-প্রাণ সুশান্তর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিয়াছে। ঘৃণায় অভিমানে ও রাগে তাহার সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিতেছিল। সুশান্ত এতদিন মীনার কথা তাহার কাছে গোপন করিয়া তাহার যে অপমান করিয়াছে, তাহা সুশান্ত শ্রেণীর ইতরেরা ভদ্রতার মুখোস পরিয়া সমাজের বুকের উপর যদি এরূপ আরও অত্যাচার করে তার জন্য সমাজের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অর্থ ও রূপের লোভে পাষণ্ডটা তাহাকে আয়ত্বের মধ্যে আনিলেও আধুনিক যুগের নারী হইয়া সে সহ্য করিবে কেন? যাহোক আজই এই মুহূর্ত্তে সে সুশান্তর সহিত শেষ হিসাব-নিকাশ করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে চায়—একবার মনে পড়িল রুনুর কথা কিন্তু পরক্ষণে কঠোর হইয়া ভাবিল রুনু তাহার কেহ নহে, সে সুশান্তর কন্যা—উত্তেজনায় অলকা মেঝের উপর সোজা হইয়া বসিল।

সুশান্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বেহারা যথারীতি সেলাম করিয়া জানাইল হাসপাতালের

গাড়ী আসিয়াছে। সুশান্তের কানে কথাগুলি যেন প্রবেশ করে নাই—সে বেহারার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল মাত্র।

অলকা ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—চল হাসপাতালে, আমিও যাব।

যখন তাহারা হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছাইল তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে।

অলকা গাড়ী হইতে নামিলে সুশান্তও নামিল। যে ভাবে সুশান্ত চলিতেছিল তাহা দেখিলে মনে হয় যে চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত ডাক্তার সুশান্ত রায় নারীহত্যার অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে চলিয়াছে।

সামনে যে পড়িল তাহার নিকট হইতে সকালের নূতন রোগিণীটীর বেড-নম্বর জানিয়া লইয়া অলকা সোজা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরের শুশ্রূষাকারিণী অলকার পিছনে ডাক্তার রায়কে দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকা রোগিণীর মাথার শিয়রের টুলটায় বসিয়া একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল—দিদি—

স্বপ্নের ঘোরে ডাক শুনিয়া মানুষ যেমন করিয়া জাগিয়া উঠে মীনাও তেমনিভাবে চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার জীবনদীপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে। হয়তো আজ রাত্রিতেই নিভিয়া যাইবে কিন্তু নিভিবার আগে যে আস্বাদন আজ সে পাইল তাহাই বুঝি তাহার পরপারের পাথেয়।

মীনার দৃষ্টি অর্থহীন—কোঠরগত চোখ দুটী বিস্ফারিত করিয়া নবাগতের পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিল বটে—কিন্তু স্মৃতি দুর্ব্বল হওয়ায় পারিল না—কেবল তাহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

অলকা এতক্ষণ প্রাণপণশক্তিতে নিজেকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল এবার তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না—মাথাটা মীনার কাঁধের কাছে লুটাইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—দিদি এমন অসময়ে এলাম যে তোমাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না!

সুশান্তরও এ-দৃশ্য দেখিয়া চোখ শুষ্ক ছিল না—ডাক্তারের কঠিন প্রাণও আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

পিছনে ডাক্তার ঘোষের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—স্যার—আপনি—

কঠিন কর্ত্তব্য সুশান্তকে হাসপাতালের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি রোগিণীর হাতটী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিল—হাতটী বরফের মত ঠাণ্ডা—প্রাণের ক্ষীণ-স্পন্দনটুকু থামিয়া গিয়াছে।

বর্ম্মার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবী

থাকিন্ থান্ তুন

অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করেন—"বর্ম্মার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি? এখনও কি সেখানে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত কোন মনোভাব বিদ্যমান আছে?" মাত্র কয়েক লাইনে অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ ভারতের অনেকেই জানেন না যে প্রকৃতপক্ষে বর্ম্মায় এখন কি ঘটিতেছে, বিশেষতঃ সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিভাবে দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে।

সুতরাং আশা করি সংক্ষিপ্ত হইলেও এই প্রবন্ধ ভারতীয়দের বর্ম্মার রাজনীতি এবং বর্ত্তমান ঘটনাবলীর একটা যথাযথ চিত্রই প্রদর্শন করিবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বর্ম্মার জাতীয় আন্দোলন সুরু হয়, তখন বিশ্বের অর্থনীতিতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের পর্য্যায়ে চরম উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহা হইতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর অসন্তোষের সৃষ্টি এবং তাহাতেই জাতীয় আন্দোলনেরও আরম্ভ হইল। রুষ জাপান যুদ্ধ, বাংলার সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয় আন্দোলন ইত্যাদি বর্ম্মার অসন্তুষ্ট ক্ষুদ্র বুর্জ্জোয়া শ্রেণীকে বিচলিত করিল এবং তাদের অভিযোগ এবং দাবীর প্রতিকারকল্পে দেশের সর্ব্বত্র Young Men's Buddhists Associations এর প্রতিষ্ঠা হইল। তখনকার দিনে জাতীয় আন্দোলন ধর্ম্মের পুনরুত্থানের রূপই ধারণ করিত। ১৯০৭ খৃঃএর অর্থসঙ্কট, পারস্য ও তুরস্কে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, ১৯১১ খৃঃএর চীনের বিপ্লব জাতীয় আন্দোলনকে নূতন প্রেরণা দান করিল এবং ইহাতে মূলতঃ এখন আক্রমণাত্মক সুরই ফুটিয়া উঠিল। "বর্ম্মা বর্ম্মীদের জন্য" (Burma for Burmans) এই শ্লোগানই প্রবল হইয়া উঠিল এবং দেশের শাসনতন্ত্রে অধিকতর দাবী ও উত্থিত হইল।

১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধ আসিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে জাতীয় আন্দোলনের বিশেষ কোন বাঁধাধরা মনোভাব ছিল না বরং ইহাকে অগ্রসর হইতেই দিল। মণ্টেগুর ঘোষণা বাণীতে জাতীয় আন্দোলন প্রবলতর হইয়া উঠিল এবং শাসনতন্ত্রে অধিকতর অংশ গ্রহণের দাবীকে জনগণ তীব্রতর করিয়া তুলিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রাশিয়ার বিপ্লব এবং ভারতের অসহযোগ আন্দোলন বর্ম্মায় ও প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিল। জনগণের উপর আরোপিত ইউনিভার্সিটীর শিক্ষাকে প্রতিহত করিবার জন্য ইউনিভার্সিটী এবং বিদ্যালয়গুলিকে ধর্ম্মঘট সুরু হইল। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া শ্রমিক আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং করদান বন্ধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২০—২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ম্মা এক বৈপ্লবিক সঙ্কটের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল।

ইহার প্রতিক্রিয়া আসিল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি

তীব্রভাবেই প্রতিহত হইল। ধনতন্ত্রের সমতা, ইটালীতে ফ্যাসিজমের প্রসার, ভারতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ইত্যাদি তখনকার প্রতিক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ। বর্ম্মাতে এর প্রতিক্রিয়ারূপে আসিল জাতীয় আন্দেলনে ভাঙ্গন এবং জাতীয়দলের এক শ্রেণীর কাউন্সিল প্রবেশ। যারা বাইরে রহিলেন তাঁরা পার্লামেন্টারী কর্ম্মপদ্ধতির সহায়তা না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন এবং যাঁরা ভিতরে ছিলেন তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া বাইরের গণ-আন্দোলনকে দমন করিতে লাগিলেন।

বাইরের আন্দোলন ভাঙ্গনের পর ভাঙ্গন ধরিয়া দিন দিন দুর্ব্বলতর হইতে লাগিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অর্থসঙ্কট ঘনাইয়া আসিল। ভূমি সম্বন্ধীয় অসন্তুষ্টি হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইন্দো-বর্ম্মা দাঙ্গার উৎপত্তি হইল এবং ইহা আরো বিষম বিপর্য্যয়—Jhassawaddy বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করিল। যে ভয় ছিল, সংগঠনে বিশৃঙ্খলার জন্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল। ভিতরের দৃঢ়সংবদ্ধ পার্লামেন্টারী দলটীও ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জস্বরূপে এবং রাজনৈতিক প্রতিঘাতের জন্য অর্থনৈতিক অসন্তুষ্টিরূপে জনমত সংগঠনকল্পে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আমাদের আন্দোলন সুরু হইল। এই আন্দোলন থাকিন্ আন্দোলন (Thakin Movement) নামে সুপরিচিত হইল, কারণ মেম্বারদলের সকলেরই নামের আগে থাকিন্ উপাধি ছিল। থাকিন্ অর্থ প্রভু। পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা নিজেদের থাকিন্ বলিত, এবং পরবর্ত্তীকালে বর্ম্মায় ভারতীয়েরাও ইউরোপীয়দের এই বিষয়ে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রতিকারকল্পে আমরা জনগণকে বুঝাইতে লাগিলাম যে তারা থাকিন্ বা মালিক নয়, দেশের সন্তান আমরাই প্রকৃতপক্ষে থাকিন্। আমাদের দলকে বলা হয় Drama Asiayone, অর্থাৎ বর্ম্মার জাতীয় দল (Burmese National League). তখনকার দিনের অনুসৃত মূলনীতি ছিল সিন্‌ফিনীয় (Sinn Fein). শ্লোগানগুলির অধিকাংশই ছিল সেই নীতির সমর্থক।

দু' তিন বৎসর পর আমাদের সদস্যেরা জনগণের কর্ম্মে (বা গণ-আন্দোলনে) আত্মনিয়োগ করিলেন এবং শ্রমিক ও কৃষকদিগকে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

আমাদের কার্য্যপদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যেই বদ্ধমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মতবাদ ও প্রাচ্য-ভাবাপন্ন হইল এবং ক্রমে ইহা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তরিত হইল।

স্থানীয় এবং আংশিক দাবীমূলক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পুরোভাগে থাকার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান দিন দিন শক্তি অর্জ্জন করিল; আজ ইহা জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণই ইহার সদস্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিতরূপে ইহা নিজ কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। আইন সভার সদস্যের দ্বারা গঠিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অবশ্য আছে, তবে দেশের জনসাধারণের সমর্থন তার পিছনে নাই।

গত সেপ্টেম্বরে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব অবস্থা মোটামুটি এই রকমই ছিল। তারপর আসিল যুদ্ধ এবং তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য আমরা সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিলাম এবং ছয়টী বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে Burma Freedom Bloc গঠিত হইল। ইহার লক্ষ্য হইল জাতির মুক্তির জন্য সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা।

তখন হইতেই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য এই আন্দোলন ক্রমশঃই শক্তি অর্জ্জন করিতেছে। অন্য দলগুলি পূর্ণ স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করে নাই, এখন তারা ইহাতে যোগ দিয়াছে। আগে তাদের কোন সংগ্রামাত্মক নীতি ছিল না, এখন তারা আমাদের শ্লোগান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে যে, দাসরূপে আর কোন অংশ আমরা স্বীকার করিব না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আন্দোলন ব্যবস্থাপক সভায়ও প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। নিম্নলিখিত নীতিমূলক যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবও আমরা পেশ করিয়াছি—

(১) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী, জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব উপযোগী করিয়া লইয়া Constituent Assembly দ্বারা শাসনতন্ত্র রচনা।

(২) গ্রেটব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব হইতে বর্ম্মাকে বাদ দেওয়া।

(৩) বর্ম্মায় যুদ্ধকালীন বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধিতা।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ভাষার কতকটা পরিবর্ত্তনে পরিষদে গৃহীত হইয়াছিল, অবশ্য ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থন ইহাতে ছিল না।

আইন সভার যুক্ত অধিবেশনে গবর্ণরের বক্তৃতাকালেও সমগ্র জাতির অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের জাতীয় দাবীতে সম্মত হন নাই বলিয়া ঐ অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার জন্য আমরা সদস্যদের আহ্বান করিয়াছিলাম। মাত্র এক তৃতীয়াংশ লোক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, অন্যান্যেরা গবর্ণরের বক্তৃতাকে প্রায় বয়কট করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে।

সুতরাং বড় বড় সরকারী চাকুরী বা ঐরূপ সামান্য কারণে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব বর্ত্তমানে বর্ম্মায় আর নাই। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রমূলক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এমন কি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে বর্ম্মায় মাইনরিটি সমস্যা নাই—এই জাতীয় আন্দোলনে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার সংঘর্ষে নিজেদের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ক্রম অধোগতির জন্য শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ দুর্গতিপূর্ণ হইতেছে এবং তারাও আজ এই নূতন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

বর্ম্মার মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকেরাও এই প্রবল গণ-আন্দোলনে আজ পিছনে পড়িয়া

থাকিতে চায় না; যে কোন জাতীয় আন্দোলন ভূমি সম্পর্কিত সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকিতে বাধ্য।

বর্ম্মার এই জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয়গণ কোন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে? ১৯২৩ খৃঃএর আগে ভারতীয়েরা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ডায়ার্কির (Dyarchy) পদ্ধতিতে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা এবং প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 'বর্ম্মা বর্ম্মীদের জন্য' (Burma for Burmas) এই শ্লোগাণের ক্রম বর্দ্ধিত তীব্রতা ভারতীয় ও বর্ম্মীদের মধ্যে গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। ১৯২৯এর অর্থসঙ্কটে বর্ম্মার অনেক কৃষকই বিত্তহীন হইল—দক্ষিণ ভারত হইতে আগত Chettyar (চেট্টিয়ার) মহাজনদের হাতে সব ভূমি চলিয়া গেল। রেঙ্গুনে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়া পরে উহা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়—অবশ্য তখন উহা রেঙ্গুনেই ইউরোপীয় স্বার্থের ষড়যন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতীয় শ্রমিক এবং ভূমিহীন বর্ম্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল' জমি অধিকতরভাবে চেট্টিয়ারদের কাছে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। মূলতঃ জমিদার এবং মহাজন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকুল ভূমি সংক্রান্ত এই অশান্তি প্রথমে চেট্টিয়ারদের এবং পরিণামে ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিল। আবার বৌদ্ধ এবং ভারতীয়দের আইনের সামঞ্জস্য না থাকায় বর্ম্মী নারী ও ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহেও রীতিমত আপত্তি উত্থাপিত হইল। উত্তেজনার কারণ এতই প্রবল ছিল যে সামান্য ইন্ধণেই ভীষণ হইয়া উঠিল। কোন মুসলমান বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করা মাত্রই উহা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই দাঙ্গা সম্বন্ধে আমাদের নীতি সরল এবং স্পষ্ট। দাঙ্গার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেই আমরা ইহার নিন্দা করিয়াছি এবং এখনও প্রকাশ্যে ইহার বিরুদ্ধেই বলিয়া থাকি। গবর্ণমেন্টের দমন-মূলক নীতির সুযোগ নিয়া আমরা গণ-আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছি; ভারতীয় বিদ্বেষ এখন গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ আন্দোলনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার ফলে অচিরেই মন্ত্রী সভার পতন ঘটিল।

গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিদ্বেষ এখন গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৈল খনি, কয়লার খনি এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রধান অঞ্চলে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের পরিচালিত এই ইউনিয়নের সদস্যেরা প্রধানতঃ ভারতীয়। ভারতীয় চাষীরাও এখন সংগঠনে মন দিয়াছে এবং বর্ত্তমানে জাতীয় কৃষকদলের পুরোভাগে রহিয়াছে। বর্ম্মী শ্রমিক এবং কৃষকদের এক সঙ্গে কাজ করার দরুণ তারাও আজ জাতীয় সংঘর্ষের অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় জনমত আমাদের অনুকূল হওয়াতে এখন আমাদের স্থির বিশ্বাস এই হইয়াছে যে ১৯৩৮ খৃঃএর দাঙ্গার মূলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত নিশ্চয়ই ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে বর্ম্মী এবং ভারতীয়দের মধ্যে আমরা মাত্র দুইটি দাঙ্গার ইতিহাসই দেখিতে পাই, কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ম্মায় অন্ততঃ তিনবার হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বর্ম্মার রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয়

বিদ্বেষই প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ম্মী মুসলমানেরাও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; তাহারা আমাদের সমর্থন করিতেছে, আমাদের শ্লোগান গ্রহণ করিয়াছে, এমন কি হাতুড়ী ও কাস্তে ছাড়া আমাদের জাতীয় পতাকাও গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতি মোটামুটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে খুবই অনুকূল।

চাষীদের সংগঠন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামীরাও নিজেদের সংগঠনে মন দিয়াছে। ভূমি সম্পর্কিত স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের—বড় জমিদারের চেয়ে যাহাদের স্বার্থ প্রজাদের সঙ্গে অধিকতররূপে সংশ্লিষ্ট—যে পুরোভাগে রাখা হইয়াছে ইহাতে চতুর নৈপুণ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়, বড় বড় জমিদারেরা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত চালাইতেছে। অসময়োপযোগী গৃহবিবাদ আমদানী করিয়া ঐক্যীভূত জাতীয় মস্তিষ্কে বিপর্যস্ত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। এই ভূস্বামীদের একটা রাজনৈতিক দলও আছে, ইহা Myo-Chit Party (দেশ প্রেমিক) নামে পরিচিত এবং ফ্যাসিজ্‌মের ধরণে পরিচালিত হয়।* এই জমিদারী স্বার্থ এবং নবজাত ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রচুর বিত্তশালী ও সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ধনিকশ্রেণী।

আমাদের অবস্থা খুবই স্পষ্ট; আমরা অবশ্যই বিনা কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিব না, ক্ষুদ্র বিবাদেও আমরা অকারণে লিপ্ত হইতে চাই না। তবু ভবিষ্যতের বৃহৎ সংঘর্ষের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সেই অনুযায়ী আমরা নিম্নলিখিত কর্ম্মতালিকা স্থির করিয়াছি—

(১) অর্জ্জিত রাজনৈতিক ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা, আংশিক আন্দোলন দ্বারা সেই শক্তি সম্পন্ন করা।

(২) স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র সংঘর্ষকে তীব্রতর করিয়া তোলা এবং ক্রমশঃ ঐগুলিকে সংহত করিয়া দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূচনা করা।

(৩) যুদ্ধের আর্থিক পরিণতিকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করা।

(৪) বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র আন্দোলন।

(৫) ছাত্রদলের কুচকাওয়াজ, অর্থসংগ্রহ, সদস্য সংগ্রহ, ভলান্টিয়ার কোর গঠন, সংগ্রামাত্মক কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি গঠনমূলক আয়োজন।

দিনের পর দিন জনসাধারণ আগামী অভিযানের জন্য সংহত হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অবশ্যই প্রবলতর সংঘর্ষ। আমরা জানি ভারত ও বর্ম্মার রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই; সেইজন্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আজ আমরা ভারতে আসিয়াছি।

বর্ত্তমান বিগ্রহেই যে কেবল আমাদের ভাগ্য এক সঙ্গে জড়িত তাহা নয়। আমরা একই গন্তব্যের দিকে চলিয়াছি, কারণ অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন জাতি সমূহের ফেডারেশনে ভারত এবং বর্ম্মার সমান দাবী থাকিবে।

আশা করি ভারতীয় বন্ধুরা বর্ম্মার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবেন, যাহাতে আমরা এক সঙ্গেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারি।

জয়শ্রীর জন্য বিশেষভাবে লিখিত মূল প্রবন্ধ হইতে শ্রীরাধানাথ দাস এম, এ কর্ত্তৃক অনূদিত।—প্রবন্ধের লেখক—দোবামা এসিয়ন্ (বার্ম্মার জাতীয় দল) এর কার্য্যকরী সভার সদস্য।

নরেন সরকার

প্রতিদিন নতুন নতুন বিস্ময়। নতুন নতুন দেশ যুদ্ধের আবর্তে তলিয়ে গেল। এ্যাপো-ক্যালিপস্‌এর ঘোড়সওয়াররা ছুটে চলেছে দুর্বার অন্ধগতিতে। মানব-সভ্যতা কোন্ গহনে আশ্রয় নেবে কেউ জানে না। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, নিশ্চিত হলেও তাতে মানুষ আশ্বাসের কিছু খুঁজে পাবে না। পরাজয় যারই হোক্—তার গ্লানি আঁকা থাকবে সমগ্র মানব-সভ্যতার বুকে। কেমন করে যে মানুষ আপনার মনুষত্বে অধিষ্ঠিত থাকবে, ভেবে পাচ্ছে না কেউ। বিশ্ব আজ যে আবর্তে পড়েছে, কেমন ক'রে তার উদ্ধার হবে সেখান থেকে ?

হোতো যদি মানব আর দানবে যুদ্ধ, হোতো যদি সুরাসুরের সংগ্রাম, তা'হলে বিশ্বাস রাখতুম বিশ্বের অপরাজেয় নীতিশক্তির ওপর, তাকাতুম নেমেসিস্‌এর দিকে, খুঁজতুম পৃথিবীব্যাপী নির্মম ট্র্যাজেডীর মাঝে পোয়েটিক্ জাষ্টিস্‌কে। কিন্তু ধর্ম ও নীতির বাঁধা বুলি কারও তো মর্ম-স্পর্শ করতে পারছে না। বিশ্বের স্তব্ধ চৈতন্য আজ অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ? আশা এই, তুহিন-হিম শীতের প্রান্তে রয়েছে বসন্তের নবপত্রোদ্গম ; জাগ্রত মনুষ্যত্বের, নবোদিত সাম্যের জয়ধ্বনি কি সকল তাণ্ডবকে অতিক্রম করে বেজে উঠবে না ?

নাৎসী অগ্রগতি

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ব্যাপারটার একটা মোটামুটি হিসেব-নিকেশ হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও যে সংশয় মনে জাগছিলো আজ তা নির্মূল হয়েছে। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় নাৎসী-শক্তির জয়জয়কার। পার্লামেণ্ট বিতর্কের ফলে মিত্রশক্তির নরওয়ে-অভিযান ও তার ফলাফল আর হেঁয়ালীর রাজ্যে

নেই। নরওয়েকে উপলক্ষ্য করে চেম্বারলেনের পতন হোলো। সুযোগ বুঝে জার্মানী তার বহুদিনের জল্পনা কার্যে পরিণত করলে। নেদারল্যাণ্ড নাৎসী-কবলিত হতে চলেছে। নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম এলাকায় এতদিন জার্মানী যে 'war of nerves' চালাচ্ছিল তা এবার সত্যিকার যুদ্ধে পরিণত হোলো। 'Blitzkreig of propaganda' আক্রমণে পর্যবসিত হয়েছে। পূর্ব ও উত্তরপ্রান্তে সফল হয়েই জার্মাণীর উত্তর-পশ্চিম অভিযান এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে। বৃটেনের 'wishful thinking' বাস্তবের সংঘর্ষে এসে দ্বিতীয় পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আপাতদৃষ্টিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে!

বল্‌ক্যান

অষ্ট্রিয়া, সুদেতেনল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, মেমেল, পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ! ততঃ কিম্? ড্যানিয়ুব-উপকূল কি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হবে না? দুই কারণে সে সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার কাঁচা মালের লোভ জার্মাণীর অপরিত্যজ্য। রুমানিয়ার ভবিতব্য অনেকেই এখন নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছেন। জার্মাণীর যে যে মালের অভাব, বল্‌ক্যানে সেই সেই মালেরই প্রাচুর্য। এ যেন প্রকৃতির ষড়যন্ত্র। তারপরে আছে রাজনৈতিক চালবাজির জের—

"Germany vitally interested in the Security of the Balkans, is attempting to pursuade Italy to mount guard with her. Over and above this it is important to bring about a state of affairs which will permit of a Russo-Italian reapproachement for the Fuehrer is convinced that a new 'Holy Alliance' of Rome, Berlin and Moscow can and must be used in the fight against Britain."

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ঘটনাগুলো বল্‌ক্যান্ এবং নিকট প্রাচ্যে তাদের জের টানবে তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ দেশসমূহ ভেবে পাচ্ছে না মিত্রশক্তির 'promissary note' গ্রহণযোগ্য কিনা। তাতে প্রতিজ্ঞা আছে, কিন্তু পালনের আয়োজনটায় ছিদ্র ধরা পড়ছে। সুইডেনের দুরবস্থা থেকে তুরস্ক যে কিছু শিক্ষালাভ করবে না তা নয়। বৃটেনের কাছে তার যে অঙ্গীকার সেটা নথি-পত্রের বাইরে কি মূল্য নেবে বলা কঠিন। মেডিটারেনিয়ানে মিত্রশক্তির তোড়-জোড়, সুয়েজে সতর্কতা, এগুলো রিবেনট্রোপের মতে শুধু ধাপ্পাবাজি। যুদ্ধের সত্যিকার পরিধি থেকে লোকের মনকে দূরে সরিয়ে রাখাই এগুলোর উদ্দেশ্য।

অনেকদিন বিজ্ঞের মত চুপচাপ বসে থাকবার পর ইটালীও অল্পে অল্পে মুখ খুলছে। প্যারিস ও লণ্ডনে Fuehrer আর Duceকে বিজয়গর্বে প্রবেশ করতে দেখবার জন্যে ইটালীর যুবশক্তি নাকি উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। টিউনীস্! টিউনীস্! রবে ইটালীর আকাশ মুখর হয়ে উঠেছে। অর্থ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। জার্মাণীর 'diplomatic war' মিত্রশক্তির 'economic war'কে পিছনে ফেলে চলতে চায়। বাল্‌ক্যানে কি তারই আভাস পাচ্ছি?

বৃটেনের জনমত

মাসখানেক আগে এক বিখ্যাত সাংবাদিক লিখেছিলেন, "A genuinely National Government is the only alternative to the present So-called National Government. And it is the only alternative to Hitler." বৃটেনের জনমত এই ধারাতেই বয়ে চল্‌ছিল। চার্চিল এবং লয়েড্ জর্জ যা বলেছিলেন তা অপ্রিয় হলেও লোকে সত্যি বলেই জেনেছিলো। যুদ্ধটা যেন তেমন জমাট বাঁধ্‌ছেনা, 'there is no real war'—সর্বসাধারণের নালিশ। ফিন্‌ল্যাণ্ডকে সাহায্য করাটা ছেলে ভুলানো ব্যাপার এ কথা সুইডেনের মুখ থেকেও পরিষ্কার শোনা গেল। বৃটেনের জনমত বিক্ষুব্ধ হোলো, সন্দেহ জাগ্‌লো—নরওয়ের ব্যাপারটা কি 'Northern Munich' এ শেষ হবে? প্রথম মিউনিখের স্রষ্টা, ধৈর্যের অবতার, ছত্রপতি চেম্বারলেনকে অবশেষে জনমতের বেদীমূলে বলি দেওয়া হোলো। চার্চিল যুদ্ধটাকে অন্তত 'real war' করে তুলবেন এ আশা অনেকেই পোষণ করছে।

ভবিতব্য

অর্থ ও লোকবল এবং কাঁচামালের অধিকার মিত্র শক্তির কবলেই বেশী। এগুলোই হোলো যুদ্ধের স্নায়ু—'Sinews of war.' কিন্তু এগুলো থাক্‌লেই যুদ্ধজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে না। পণ্ডিত Crowther বলেন,

"We have more men to spare for fighting and munition-making, and we have more materials for them to work with. Does this prove that we shall win the war? It does not. It proves that we *can* win the war if we do certain things. ...Time is on our side—if we use it."

এই 'যদি' গুলোর নিরসন নির্ভর করছে মিত্রশক্তির বিচক্ষণতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির ওপর। এক বিখ্যাত বিলাতী মাসিকপত্রের সম্পাদক অনুযোগ করেছেন, "It is a calamity that the initiative is still with Hitler, that the question is always 'what will he do?' and never 'what will we do?'

চীন-জাপান

পশ্চিম ভূখণ্ডের তাণ্ডব প্রাচ্যের যুদ্ধটাকে অনেকটা আওতায় ফেলে দিয়েছে। তবে যুদ্ধের বিরতি নেই, চাং কাই শেক ঘুমিয়ে পড়েন নি, 'Chinese incident' টা জাপানকে সর্প-ছুছুন্দর কাহিনীটিই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাচ্য চীনের পুতুল সম্রাটকে দিয়ে জাপানের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়নি। তাকে সবাই বিশ্বাসহন্তা বলেই জানে। জাপানের মন্ত্রীসভা আশ্বাস দিয়েছেন যে incident' টার একটা বিলি-ব্যবস্থা শীগ্‌গিরই করা হবে। করা যে দরকার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। যুদ্ধের খরচ যোগাতে জনসাধারণের শোষণ চল্‌ছে অবিরাম, সোভিয়েটের চোখ রাঙানী নীরবে

হজম করতে হচ্ছে, রুজভেল্টকে করতে হচ্ছে সমীহ, এবং Dutch East Indies ব্যাপারে তৃতীয় রিপুকেও দমন করতে হবে হয়তো। কিন্তু 'incident' এর শেষ কোথায়? "মরিয়া না মরে রাম—"

ভারত

'ভারতের বাতাসে আজও আমিষের গন্ধ'—ক্ষুব্ধ হৃদয়ে মহাত্মা সে কথা পুনর্বার স্মরণ করেছেন। অতএব, ভারত যেই তিমিরে সেই তিমিরে। বড়লাট কি আবার ডাকবেন না? আবার দেবেন না আলিঙ্গন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবেন। চাই না সংগ্রাম চাই না বিরোধ। জয় হোক্ আত্মার। আর চাই না ঐক্য, চাই না সংহতি, চাই না আত্মোৎসর্জন--জয় হোক্ ইডিয়লজীর; দেশ যাক্। থাকুক থীসিস্।

১১ই মে, ১৯৪০
কলিকাতা।

গ্রন্থ-পরিচয়

বক্তৃতা বিজ্ঞান—

শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম, এল, এ—প্রকাশক শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ৬৮বি, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু লিখিত ভূমিকা সম্বলিত মূল্য—১৲ টাকা মাত্র।

বাংলা দেশে যে কয়েকজন বক্তা বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, এই পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের অন্যতম। তাহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের ভিতর উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। লেখক যে উপায়ে বক্তৃতা বিজ্ঞান আয়ত্ত্ব করিয়াছেন এই পুস্তকখানি তাহার সেই অভিজ্ঞতার ফল। বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল, লেখকের প্রচেষ্টা সেই অভাব পূরণ করিয়াছে।

মুখবন্ধে লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "একদল লোকের বক্তৃতা দিবার সময় ফুরাইয়া গিয়াছে এখন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে" এই সমালোচনাই বাংলা দেশে বক্তার অভাবের কারণ। ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহাতে লেখকের দুঃখিত হইবার কারণ থাকিলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; কারণ, "বক্তৃতা দিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে" এই কথা বলিয়া উক্ত সমালোচকগণ শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটাইয়াও বহু সভায় দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে বক্তৃতার উপযোগীতা কোন সময়েই ফুরাইয়া যাইতে পারে না বা ফুরাইবেনা।

লেখক বক্তৃতার যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা অনুধাবন যোগ্য। বক্তৃতা বিজ্ঞান আয়ত্ব করিলে ডেমাগগ্ ও জাতির নেতার আসন লাভ করিতে সমর্থ হন। এই সত্যটি প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া লেখক ষ্টালিন্, মুসোলিনী, হিট্‌লার, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই গণজাগরণের দিনে সুবক্তার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিতেছি। ভবিষ্যতে যাহারা বাংলা দেশের বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তকখানা বাংলার বক্তা সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

শতাব্দীর স্বপ্ন—

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত প্রকাশক র‍্যাডিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট, গৌহাটী।

পৃঃ ৯৭ মূল্য ।।০ মাত্র।

সাতটি গল্পের সমাবেশে পুস্তকখানা রচিত। প্রত্যেকটী গল্পের বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। গল্প সাহিত্যে গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া লেখক বাংলা সাহিত্যের এক নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার এ প্রচেষ্টা শুধু নূতন নহে—প্রশংসার্হ। আইডিওলজির উপর ভিত্তি করিয়া গল্প রচনা আমাদের দেশে খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। যে দুই একটি স্থলে উহার প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার প্রায় সব কয়টিতেই দেখা গিয়াছে যে তাহা গল্প-রস-শূন্য কতকগুলি ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র। কিন্তু এই পুস্তকের রচয়িতা তাহার গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের উপর যে ভাবে রেখাপাত করিয়াছেন ও রূপায়িত করিয়াছেন তাহা একদিক দিয়া যেমন বিশেষ আইডিওলজির উপর লোকের আস্থা বৃদ্ধি করে অন্য দিকে তেমনি পাঠককে সাহিত্য রসের সন্ধান দেয়।

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকায় লেখকের বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক গল্প লেখার টেকনিকের দিক দিয়া লেখক ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাহার রচনা সুষ্ঠুলিখনভঙ্গী জোরালো। আমরা পুস্তকখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

নিখিল রায়।

মরুযাত্রী—

৺বিমল সেন প্রকাশক র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য ৷৷৹ বারো আনা।

ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস সত্যই বলেছেন "মৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় সাধন করে দেবার ভার যার ওপর পড়ে তাকে ভাগ্যবান্ বলতে পারি না, কারণ, সে যাকে অনন্ত কালের পাঠক-দরবারে হাজির করবে তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা শুদ্ধ হয়েছে, বর্ত্তমানের সামান্য অক্ষমতাকে ভাবীকালের প্রত্যাশায় রঙ্গীন করে তোলবার কোনও উপায় নেই।"

অকরুণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য যে বাঙালী তরুণ দল গ্রন্থকার তাদেরই একজন। স্বল্প-পরিসর জীবনকালে তিনি যে চিরকালের দরবারে নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে যেতে পেরেছেন "মরুযাত্রী" সে পরিচয় বহন কচ্ছে। কিশোরদের ধাবমান মনকে অতি সহজে অধিকার কর্বার মতন কল্পনার সাবলীলতা ও তার বাহন হ'বার যোগ্য ভাষার নমনীয়তা এ দু'য়ের এমন সমন্বয় আধুনিককালেও

খুব বেশী দেখা যায় না। অনাদৃত গৃহকোন থেকে মুক্তি পেয়ে এতদিন পরে যাদের চেষ্টায় পুস্তকখানা প্রকাশিত হ'তে পেরেছে আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গোলকচন্দ্রের আত্মকথা ঃ—

কাজী দীন মোহাম্মদ, বি,এ,বি,টি, ৮২, সদর বক্সী লেন হাওড়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা।

কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত এর অনুসরণে লিখিত দশবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে গ্রন্থকার বাঙালীর জীবনের অনেক অনালোকিত অংশে তীব্র সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বললে অত্যুক্তি হ'বেনা। ললিত বাবু ও কেদার বাবুর পদচিহ্ন-গর্বিত সাহিত্য-সরণিতে নতুন পথিকের আবির্ভাব যে ভবিষ্যত সম্ভাবনায় পূর্ণ একথা বলতে দ্বিধা নেই। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জিতেন গোস্বামী।

সম্পাদকীয়

কর্পোরেশনে কংগ্রেস লীগ্ প্যাক্ট

কর্পোরেশনে কংগ্রেস লীগ্ প্যাক্ট নিয়ে সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হোয়েছে। সপক্ষী-য় দের প্রধান যুক্তি তাঁরা বলেন হিন্দু মুসলমান ঐক্য ভাল জিনিষ কিন্তু লীগ ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী—একত্রে মিলন অর্থ কংগ্রেসের পক্ষে নিজের নীতিকে বিসর্জন দেওয়া। বিশেষতঃ যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মিউনিসিপ্যাল বিল লীগের সাহায্যে বাংলায় আমদানী হোয়েছে তার সহিত প্যাক্ট অর্থ পরোক্ষভাবে তাদের কাজকে সমর্থন করা। আমরা স্বীকার করি কংগ্রেস যদি লীগের সহিত চুক্তি করতে বাধ্য না হোত তবে সবচেয়ে ভাল হোত—কিন্তু যে হেতু লীগ কংগ্রেসের আদর্শানুযায়ী প্রতিষ্ঠান নয়—বরং ক্ষমতা হাতছাড়া করাও ভাল কিন্তু তবু এ চুক্তিকে সমর্থন করা যায় না। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে চল্‌তে হবে—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা হাতে রাখতে হবে, নূতন ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করতে হবে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে—কারণ এ ক্ষমতা দ্বারা সে জনসাধারণকে সেবা করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের প্রস্তুত করবে। কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে নাগরিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা কামনা করা অন্যায়ও নয় অস্বাভাবিক ও নয়। ১মতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মিউনিসিপ্যাল বিল্ এর আম্‌দানী যদিও লীগের প্ররোচনায় হোয়ে থাকে লীগের কোন ক্ষমতা হোত না এ দুটী জিনিস বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়ায় যদি না তৃতীয় পক্ষ তার বিভেদনীতির সমর্থন এতে পেত। কাজেই এই তৃতীয় পক্ষকে যদি আমাদের জাতীয় জীবন থেকে দূর করতে পারা যায় তবেই বিষবৃক্ষকে নির্মূল করা সম্ভব হবে তা না হোলে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এদের সহায়তায় নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি কোরবে ও জাতীয় সংহতি ও কল্যাণকে চিরদিন ঠেকিয়ে রাখ্‌বে।

২য়তঃ বিভিন্ন নীতির প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে চুক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষ কত সিলেক্ট কমিটিতে একত্র কাজ কোরে থাকেন যদিও নীতির দিক দিয়ে এই দুই পক্ষ সম্পূর্ণ বিরোধী। ৩য়তঃ চুক্তি হোয়েছে বলেই যে কোন উপায় ও যে কোন অবস্থাতে একে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। যদি চুক্তি রাখা অসম্ভব হয় তবে তা ভেঙ্গে দেওয়াটা এত কঠিন যে বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা কেন মনে করছেন বোঝা দুষ্কর।

, হিন্দুসভা কিছুদিন ধরে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন তাতে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা কতদূর হবে জানিনা সাম্রাজ্যবাদীদের এই নূতন বিভেদসৃষ্টিতে আনন্দ করবার খোরাক্ মিলবে।

সমগ্র জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন পরীক্ষা আসবে সংগ্রাম আসবে—তখন যারা এগিয়ে আসবে দেশ তাদেরই বন্ধু বলে গ্রহণ করবে এবং পরীক্ষার দিনও নিকটতর হোচ্ছে প্রতিদিন।

স্বামী সহজানন্দ

ভারতীয় কৃষাণ সভার সম্পাদক স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীকে জাতীয় সপ্তাহে বক্তৃতার জন্য ভারত রক্ষা আইন অনুসারে বিহার সরকার তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সম্মান সন্দেহ নেই। তিনি কারাবরণের পূর্ব মুহূর্তে বলে গিয়েছেন :—

"আমার সন্দেহ নেই—ভারতের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এ সময় দ্বিধা বা সঙ্কোচ করা সবচেয়ে বড় ভুল হবে। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য করতে হবে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রণেতা—আমাদের সম্পর্কে এমন কথা যেন না বলতে পারেন—আমরা জাতীয় দুঃসময় কৃপণতা করেছি—"

স্বামীজির বাণী দেশ কর্মীর মনে প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চার করবে।

বিহার সরকার স্বামীজিকে "বি" শ্রেণীভুক্ত করেছেন। আমরা বুঝতে পারছিনা স্বামীজির কারাদণ্ডকে কঠিনতর করাই সরকারের উদ্দেশ্য কিনা? কৃচ্ছ্র সাধনে তিনি অভ্যস্ত এ অসম্মান ও তাঁকে স্পর্শ করবেনা—কিন্তু সন্ন্যাসী নেতার প্রতি বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের এই সামান্য দাক্ষিণ্যের অভাব দণ্ডিতের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করবে।

দুর্মূল্য-ভাতা

গত ১৪ই এপ্রিল B.P.T.U.C.র আফিসে উক্ত সঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা যুদ্ধের দরুণ শ্রমিকদের দুর্মূল্য ভাতার দাবী সমর্থন করে। মালিকরা—বিশেষভাবে পাটকলের মালিকরা যুদ্ধের দরুণ প্রচুর লাভ করছে—শ্রমিকদের এই লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত করা একান্ত অন্যায়। মালিকরা এই অন্যায়ের প্রতিকারে অগ্রসর না হলে—আইনের সাহায্যে সরকারের প্রতিকার করা উচিত। মন্ত্রীগণ শ্রমিকদের বন্ধু ব'লে গর্ব করে থাকেন—এই দুঃসময়ে তার পরিচয় দিতে সম্মেলন আহ্বান করেছে। নানা প্রদেশের শ্রমিকদের ধর্মঘটে—বিশেষভাবে বোম্বে শ্রমিকদের, কলিকাতা ও হাওড়ার ধাঙ্গরদের ধর্মঘটে এই দুর্মূল্য-ভাতার প্রয়োজন প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সরকার এই সম্পর্কে কোন বিবেচনা এ পর্য্যন্ত করেন নি। শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই এই দুঃসময়ে তাদের ন্যায্য দাবী পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। Mill Owners Associations সম্প্রতি খাটুনির সময় কমিয়ে দেবার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—সভাপতি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন—কারণ শ্রমিকদের আয় তাতে আরও কমে যাবে। সম্মেলন এই সম্পর্কে একাধিক প্রস্তাব

গ্রহণ ক'রেছে ;—আইনের সাহায্যে দুর্মূল্য ভাতা বাধ্যবাধকতাপূর্ণ করা, শ্রমিক নেতাদের প্রতি সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ, সম্মেলনে পুলিশ উপস্থিতির প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হোয়েছে। কৃষকদের সম্পর্কে সম্মেলনের প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের দরুণ শিল্পজাত-দ্রব্যের মূল্য দ্রুত বেড়ে গিয়েছে—কিন্তু সরকারীনীতি কৃষিজাত-দ্রব্যের মূল্য বাড়তে দেয় নি। কৃষকদের অবস্থা তাই শোচনীয়। সম্মেলন কৃষকদের স্বার্থে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী করতে হ'লে ভারতসরকারের বর্তমান অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন---কিন্তু তা হ'লে ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ মিত্রশক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যে।

সরকারী অর্থনীতি—

বাস্তবিক পক্ষে গত ৭ মাসের সরকারী অর্থনীতির মূল কথা মিত্রশক্তির সাহায্য। যুদ্ধ লাগার পর এ ক'মাস শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের হালচাল, বৈদেশিক বাণিজ্যের এবং ছোটবড় শিল্পগুলির অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সবাই বুঝতে পেরেছে—যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ক'রে ভারতীয় আর্থিক-জীবনের পরিবর্তন করার সুচিন্তিত কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। অপর পক্ষে—সরকারী অর্থনীতি—কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য, কর বসিয়ে কমিয়ে, বিশেষভাবে Excess Profit Tax, বসিয়ে নৌবাণিজ্যের প্রসার সঙ্কুচিত ক'রে ভারতীয় বাজারে এক কৃত্রিম মন্দার অবস্থা সৃষ্টি করেছে ; মিত্রশক্তিকে সস্তায় প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য এ দেশ থেকে পাঠানোই সরকারের উদ্দেশ্য তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। Indian Chamber of Commerce এই সরকারীনীতিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছে এবং এ ভাবে স্বীকার না ক'রে বৃটেনের এ দেশের সাহায্য নেওয়ার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার চেয়ে সূক্ষ্মনীতি কিছু আছে নাকি ?

দিল্লীতে Federation of Chambers of Commerce and industriesএর বাৎসরিক অধিবেশন হোয়ে গেছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের চিন্তাধারা অধিবেশনের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। চারিদিকের অবস্থা বুঝে—সরকারের বাণিজ্যসচিব সার রামস্বামী মুদালিয়ার কিছু আশার কথা শুনিয়েছেন—শুধু তাই নয়—এ দেশের শিল্প উন্নয়ের জন্য Indian Research Board গঠনের প্রস্তাবও করা হোয়েছে—পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্যও প্রতিবৎসর এই বোর্ডকে নাকি দেওয়া হবে। টাকার সংখ্যা দেখে ভারতবাসীর সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু নেই—তবে ভারতে বৃটিশ-শাসনের ইতিহাসে এ দান এক অক্ষয় কীর্ত্তি সন্দেহ নেই।

শুধু একটি রিক্সকুলী

কিই বা তার জীবনের মূল্য। যে জীবনে কোনদিন হয়ত পেটভরে খায়নি—ক্ষুধার্ত্ত পুত্র কন্যার মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেনি সে তো মানুষ নয়। কাজেই তার জীবনের মূল্য মানুষের

তুল্য হবে কেন ? একথা পরিস্কার হোয়ে গেছে রিক্স কুলীর মৃত্যুর সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে। ঘটনাটী এরূপ, এক সৈনিকের কিছু বচসা হয় ভাড়া নিয়ে—গোরা সৈনিক কালো কুলীর এ স্পর্দ্ধা সইবে কেন—কাজেই তার ভাগ্যে ঘটল প্রচুর প্রহার ও তার ফলে মৃত্যু। গোরা সৈনিককে সামান্য অর্থদণ্ড ও কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মুক্তি দিলেন। এ দেশের জনসাধারণও বিস্মিত হোলো—সংবাদপত্রে সমালোচনা হোল—হাইকোর্ট এই মামলাটী হাতে নিলেন—নিয়ে মন্তব্য করলেন দণ্ড যথেষ্ট হোয়েছে বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আর কি করার থাক্‌তে পারে—। একটী রিক্সকুলী—তার জন্য দু দুবার ইংরেজের কোর্টে বিচার হোল এর চাইতে সে হতভাগ্য বা তার পরিবারর্গ কি আশা করতে পারে। মানুষের মূল্য মানুষ যতদিন নিজে আদায় কোরতে না পারবে ততদিন তাকে কুকুর বেড়ালের মতই বেঁচে থাকতে হবে।

সুজাতা সরকারের মামলা

সুজাতা সরকারের মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে রয়েছে "কোন অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি এই মেয়েটীর সর্ব্বনাশ করে এবং যখন সে এই মেয়েটীকে নিয়ে অসুবিধা ভোগ করতে আরম্ভ করে তখন উষানলিনী ঘোষের সাহায্য নিয়েই দায়মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে এবং শেষোক্ত নারী—বে-আইনী ভাবেও কিছুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন না কোরে তাকে যা কর্‌তে বলা হোয়েছিল তা করার ফলে সুজাতা মারা যায়।" উষানলিনীর ১ বৎসরের শাস্তি হোয়েছে—গুরুপাপে লঘু দণ্ডের এটা একটী জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যে ডাক্তার ও তার সাহায্যকারী এই শোচনীয় ঘটনায় সাহায্য করে সেসন জাজ তাদের যথাক্রমে ৭ ও ৪ বৎসরের দণ্ড দেন—হাইকোর্টে তারা মুক্তি পায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে একটী বালিকার এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য যে সর্ব্বপ্রথম দায়ী তাকে পাওয়াই গেলনা—আর যাদের সন্দেহ কোরে ধরা হোল প্রমাণ অভাবে তারাও মুক্তি পেল। অতি দুঃখে মনে হয় এরূপ নৃশংস হত্যা কোরেও যেখানে আইনকে এড়িয়ে যাওয়া চলে সেখানে এসব দৈনন্দিন ব্যাপার হোয়ে ওঠে তবু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

আজাদ মুস্লীম সম্মেলন—

গত ২৭শে এপ্রিল ও তার পরবর্ত্তী কয়েকদিন নয়া দিল্লীতে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সম্মেলনের আয়োজন হয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে অন্ধ রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য একদল লোক যখন দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন ঠিক সেই সময় আজাদ মুস্‌লিম সম্মেলনের—সুস্পষ্ট নির্ভীক জাতীয়তাবাদী মতামত কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় নয়, সমস্ত দেশকে পথপ্রদর্শন করবে। বিরাট মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনীধিত্ব করবার মুস্‌লিম লীগের দাবীর মূলে এই সম্মেলন কুঠারাঘাত করেছে।

"আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট কোন মুসলমানই চায় না স্বদেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক

চালবাজীর ক্রীড়নক হোতে।" সভাপতির সুস্পষ্ট উক্তি, স্বদেশ ও স্বজাতিকে অন্যের হাতের খেলার জিনিষ করতে যাঁরা চান তাঁদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি সংখ্যালঘিষ্টদলের স্বার্থ রক্ষার যথার্থ উপায় দেখতে পেয়েছেন এবং তারই জন্য বলেছেন ঃ—

"মাইনরিটির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্য্যন্ত আপনারা যে প্রণালী ও পরিকল্পনাই স্থির করুন না কেন—আপনাদিগকে এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতে হবে যে হিন্দু মেজরিটি প্রদেশের মুসলমান মাইনরিটির স্বার্থরক্ষায় এবং মুসলমান মেজরিটি প্রদেশে হিন্দু মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষায় একই মানদণ্ড ব্যবহার করতে হবে।" এই অতি সহজ যুক্তিটী যদি তিনি সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা অন্ধ হিন্দু মুসলমানকে গ্রহণ করাতে পারেন—তবে ভারতের সর্বাপেক্ষা কঠিনতর সমস্যার মীমাংসা সহজে হোয়ে যায়।

"যাঁরা পাকিস্থান বা ঐরূপ কোন দুর্লভ স্থানের স্বপ্ন দেখেছেন তাঁদের তিনি বলেছেন—আমাদের ধর্ম্মমত যাহা হউক আমরা আমাদের দেশে পরস্পরের উপর পূর্ণ সম্প্রীতিতে বসবাস করিব। একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভ্রাতাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ।" এছাড়াও লাহোরের অহ্‌র যুব সম্মেলন ও বিহারের মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের কনফারেন্সও লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

হায়দরাবাদে দাঙ্গা

গত ২৩শে মার্চ্চ হায়দরাবাদের বিদর নামক রাজ্যে এ ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতি হ'তে ও পুণার মারাঠা পত্রিকার এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট বের হয় তা থেকে জানা যায় কয়েকটী অল্পবয়সী বালকের ঝগড়ার ফলেই এই দাঙ্গাটী হয়। বালকদের সেই ঝগড়াতে ইন্ধন জোগান কয়েকটী সুপরিচিত নেতা—তার ফলে ১১৭ খানা বাড়ী ও দোকান ভস্মীভূত হয়—৫০ হাজার টাকার মাল ধ্বংস হয়। তিন ঘণ্টা যাবৎ উন্মত্ত জনতা লুট চালাতে থাকে কিন্তু পুলিশ তাদের কাজে বাধা না দিয়ে দাঁড়িয়ে এই অত্যাচার দেখে—এমনকি কেবল তারা যে নিরপেক্ষ ভাবে দাঁড়িয়েছিল তাই নয়—জনতাকে মধ্যে মধ্যে প্ররোচিতও করে। রিপোর্টে এও জানা যায় যে ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা এ সম্পর্কে হায়দরাবাদ সরকারের নিকট আবেদন কোরে কোন ফল পায়নি। এমন কি নিজাম গভর্ণমেন্ট একটী নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করবার অনুরোধেও এ পর্য্যন্ত কর্ণপাত করেন নি।

অবস্থা সবক্ষেত্রেই সমান কি বৃটিশ শাসিত খাস বাংলাদেশে কি তাঁদের আশ্রয় পুষ্ট ও পদাঙ্ক অনুসরণকারী দেশীয় রাজ্যে—ভারতবাসীর ধন প্রাণ কোনক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়—তার মূল্যও কিছু নেই। বৃথা বিলাপ কোরে আর লাভ নেই—এ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন চাই—জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, তারই উপায় চিন্তা করতে হবে তাদের যারা মানুষের মতই বাঁচতে চায়।

বিপন্ন ভারতীয় প্রবাসী

ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য মিঃ এস্, বি, মেহদ্ সম্প্রতি মাদ্রাজে ফিরেছেন। তথাকার প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা অত্যন্ত শোচনীয়। গতবছর ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী ভবানী দয়াল প্রায় সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি বর্ণ বৈষম্যমূলক হীন, দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান ভাইসরয়ের নিকট এক খোলা চিঠিতে লিখেছেন—

"History of Indians in South Africa from 1885 is a tale of oppression and repression, breaches and assurances, pledges and agreement....... Assisted Emigration Repatriation, Colonisation and Segregation are some of the weapons in their armoury with which they strike voiceless Indians in South Africa.

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটির সদস্য মনু সুবেদার ভারতীয় প্রবাসীদের দুরাবস্থা ও ভারত গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা সম্বন্ধে বহুবার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। মোহনলাল সাকসেনা এমিগ্রেশন কমিটির বৈঠকে বলেছিলেন যে 'ভারত গভর্ণমেণ্ট যুক্তি, অনুরোধ, উপরোধ দ্বারা বুঝাবার সমস্ত উপায় নিঃশেষ করে ও ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে ট্রান্সভাল এসিয়াটিক্ ল্যাণ্ড এণ্ড ট্রেডিং বিল দ্বারা ভারতীয়দের পৃথক রাখার ব্যবস্থা যে অন্যায়, তা স্বীকার করাতে পারবে না'। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ব্যবস্থা পরিষদে এসিয়াটিক বিল গত বছর পাশ হয়েছে। এ যদিও নামে এসিয়াটিক প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রবাসীরাই তার লক্ষ্য স্থল। যদি কোন অঞ্চলের শতকরা ৭৫ জন ইউরোপীয় অধিবাসী কোন ভারতীয়কে তথায় থাকা অপছন্দ করে তবে তার সে অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে। কাজেই এখন শ্বেতাঙ্গদের পছন্দ অপছন্দের উপরই ভারতীয়দের অবস্থান বহিষ্কার নির্ভর করবে।

এ বিলের নগ্নতাকে একটু ভদ্র আবরণ দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। এশিয়াবাসীগণ পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অনভ্যস্ত। তাদের আয়ও খুব বেশী নয়। কাজেই ইউরোপীয়দের হালফ্যাসানে উঁচু ধরণের জীবনযাত্রা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এশিয়াটিকদের সংস্পর্শে বিপন্ন হতে পারে। বিপন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখাই নাকি এশিয়াটিক বিলের প্রধান লক্ষ্য। এ মহৎ আদর্শের প্রেরণা হিটলারের ইহুদী দমনের বর্ব্বরতাকে কিরূপ ম্লান করে দিয়েছে তা মিঃ মেহদের বিবরণে বুঝা যায়।

ভারতীয় প্রবাসী ভারতবর্ষের বিরাট সমস্যারই অঙ্গ। সাময়িক চুক্তি, মীমাংসা, সর্ত্তবন্ধনে বা খণ্ডভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এর মৌলিক প্রতিকার নির্ভর করচে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যের উপর। ভারতবর্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করলেই শুধু ২,৪৩২,১৭৪ ভারতীয় প্রবাসীর লাঞ্ছনা, দুর্গতি ও জাতীয় অমর্য্যাদার অবসান হতে পারে।

ভারতীয় চরিত্রে কলঙ্কপাত

এলাহাবাদ হাইকোর্টের দু'জন ইংরেজ বিচারপতি একটি আপীলের মামলার রায়ে লিখেছেন 'মামলাটি অসন্তোষজনক ; কারণ এ মামলায় ন্যূন পক্ষে এমন পাঁচজন সাক্ষী আছে, যাদের সাক্ষ্যে আস্থা স্থাপন করলে তাদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তথাপি এদেশে সত্যের উপর যে সামান্য মুল্য দেওয়া হয় তা বিবেচনা করে তাদের সাক্ষ্যে আস্থা স্থাপন করা যায় কিনা, তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করতে হবে।' মাননীয় বিচারপতিদের মতে ভারতবাসীরা সত্যের উপর বিশেষ কোন মর্য্যাদা দেয় না। সমগ্র জাতীয় চরিত্রের উপর পরোক্ষভাবে এমন মিথ্যে কলঙ্কপাত করা বিচারপতিদ্বয়ের সত্যনিষ্ঠা প্রমাণ করে না। সত্যানুরাগ ও সত্যভাষণ কোন জাতির নিজস্ব বিশেষত্ব নয়। সত্যের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। কাজেই ইংরেজ জনসাধারণ ভারতবাসীর চেয়ে অধিকতর সত্যপরায়ণ বলবার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে God, Nation, and His Majesty King-Emperpor এর নামে আবদ্ধ সর্ত, সন্ধি বা চুক্তি স্বার্থের সংঘাতে ভঙ্গ করা ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে অনেক সময় দেখা যায়নি, বলা চলে না। বরং তার ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে।

দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে অধিষ্ঠিত থেকে দু'জন ইংরেজ বিচারপতির ভারতবাসীদের চরিত্রে কলঙ্কপাতের চেষ্টায় আত্ম কলঙ্ক ও নিজেদের অযোগ্যতাই প্রকাশ পায়।

মহাত্মা গান্ধী বিচারপতিদের এ হীন উক্তির প্রতিবাদে বলেছেন, 'এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় তাদের পক্ষপাতিত্বমুলক মনোভাববশেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং এ দ্বারা দায়িত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পক্ষে তাদের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন করেছেন' আমরা আশা করি বিচারপতিদ্বয় অন্যকে অমর্যাদা করতে গিয়ে নিজেদের কতখানি হেয় প্রমাণ করেছেন বুঝতে পারবেন।

ইংরাজ ও ভারতীয় "জ্ঞানী" ব্যক্তির সম্মেলন

গত ২৭শে এপ্রিল "হরিজন পত্রে" গান্ধীজী বলেছেন—"যদি শ্রেষ্ঠ ইংরাজ ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণ সন্ধি না করে উঠব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সম্মিলিত হন তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী শাসন পরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বানের পথ পরিষ্কার হবে।" এর পর সম্প্রতি Times of Indiaর প্রতিনিধির কাছে তিনি বলেছেন—"দেশ রক্ষা এবং বাণিজ্য স্বার্থ ইত্যাদি ব্যাপারে আমি বৃটেনের সঙ্গে সন্ধির বিরোধী নই। এবং শাসন পরিষদের সাধারণ চুক্তির মধ্যে এই সমস্ত সমস্যাগুলি মীমাংসার জন্য ছাড়িয়া দিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"জ্ঞানী" ব্যক্তির সম্মেলন ইতিপূর্ব্বে বহুবার হয়েছে—কিন্তু অজ্ঞান দেশবাসীর অর্থদণ্ড ছাড়া তাতে আর কোন লাভ হয়নি। গান্ধীজী যদিও বলেছেন যে ভারতীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমস্ত পূর্ণ-

বয়স্ক ব্যক্তির ভোটে নির্বাচিত হবেন তবু তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। এ সম্মেলন অবশ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে না—কিন্তু শাসন পরিষদ কি ভাবে আহুত হবে—কারা নির্বাচন করবে—শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলি মূল পরিষদ প্রণয়ন করবে—না কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে এ সমস্ত বিষয় সাব্যস্ত করবে। গান্ধীজীর একমাত্র সর্ত ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার (self determination) দাবী "জ্ঞানী" ব্যক্তিরা মেনে নেবেন।

আমাদের ধারণা এ দাবী বাহুল্য মাত্র। কারণ হোয়াইট হলের "জ্ঞানী" ব্যক্তিরা বহুদিন ধরে বলে আসছেন ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে।, বিশেষ করে বিগত ভারত শাসন আইনের পর এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আসতে পারে না।

সমর-সঙ্কট ও ভারতবর্ষ

মহাযুদ্ধের সূচনায় কংগ্রেস এবং ভারতের চিন্তাশীল নেতারা অনেকেই ইংরাজ ও মিত্রশক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। মহাত্মা, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই বলেছিলেন একতান্ত্রিক স্বৈরশাসন থেকে মানবতাকে রক্ষা করবার যে গুরু দায়িত্ব জাতীয়তা ও গণতন্ত্রবাদী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি গ্রহণ করেছে তার জন্যে বিশ্বের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা তাদের পেছনে রয়েছে! দর-কষাকষি হিসেবে নয়, কোন সর্ত হিসেবে নয়—তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন—ইংরেজ তার সদিচ্ছার নির্দেশ স্বরূপ ভারতকে স্বরাজ দিক্। এরপর একাধিক বার গান্ধী-বড়লাট আলোচনার ব্যর্থতায় দেশবাসী ইংরাজের সদিচ্ছায় নিরাশ হয়েছে। কিন্তু এই নৈরাশ্য এতদিন নেতাদের মুখে ব্যক্ত হয়নি।

ইউরোপীয় মহাসমরে আজ গুরুতর নূতন পরিস্থিতির সুচনা হয়েছে। নরওয়েতে মিত্রশক্তির প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করে স্বস্তিকের স্বৈরশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত্রুর হাত থেকে বিনা লোকক্ষয়ে সদলবলে পলায়ন করা—নরওয়ে যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির এ ছাড়া গর্ব্বের কথা আর কিছু ছিল না। এ পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী বাহিনী হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ আক্রমণ করেছে। মর্মান্তিক প্রহসনের কথা যে ঠিক সেই সময় ব্রিটিশ বাহিনী "স্বদেশ রক্ষার জন্য" আইস্ল্যাণ্ডে ছাউনি ফেলেছিল। নাৎসী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল সোরগোল উঠ্লো তাদের নৃশংসতা, আন্তর্জাতিক নিয়মবিরোধিতা নিয়ে। কিন্তু হলাণ্ড আক্রমণ ও আইস্ল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ যে একই কারণে গর্হিত ও নিয়ম বিরুদ্ধ এ সত্যকে মিত্রশক্তির সাংবাদিকরা চোখ ঠেরে গেছে। লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা শত্রুপক্ষকে গালাগালি করলে কমেনা। শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান যখন লণ্ডনের দক্ষিণে নাগালের মধ্যে আক্রমণের আয়োজন করছে—সে সময় উত্তরে বহুদূরে আইস্ল্যাণ্ডে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সকলের হাস্য উদ্রেক করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ও কূটনীতিতে ব্রিটেনের এই পরাজয়ের সময় ব্রিটেনের হয়তো গর্ব করবার শুধু এই আছে যে তার সাম্রাজ্যের উপর দৃঢ়মুষ্টি এখনও শিথিল হয়নি। এই সন্ধিক্ষণে ভারতের

মনোভাব দুজন কংগ্রেস নেতা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রকাশ করেছেন। জওহরলাল বলেছেন—"একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—ভাসা ভাসা ভাবে বলছে ইউরোপে গণতন্ত্র ও ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার কথা—অন্যদিকে সে সাম্রাজ্যকে সে জেঁাকের মত অঁাকড়ে আছে। এর ফলে হবে এই যে—যে সাম্রাজ্য সে সুষ্ঠুভাবে বহুলোকের শুভাকাঙ্খা অর্জন করে এবং আপন সুবিধায় বর্জন করতে পারতো—সে সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হবে বাইরের ঘটনার অনিবার্য প্রভাবে।" "ভারত যদিও নাৎসী জয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী—তবু যে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদ এখনও তার সঙ্গে স্পর্দ্ধার সহিত এবং প্রভুত্বের ভাষায় কথা বলে সেই সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণের জন্য তার সাহায্য চাওয়ার কোন অর্থ হয়না।"

জওহরলালের উক্তি খুবই স্পষ্ট কিন্তু "ভারতবাসী সহযোগীতা করতে পারেনা" এর বেশী নির্দেশ তিনি কিছু দিতে পারেন নি। কেন দিতে পারেননি তার কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হয়না। কংগ্রেসেরই নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদ এ সম্পর্কে আর একটি বিবৃতি দিয়েছেন। "গত কয়েক দিনের ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। অবশ্যই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে এবং আমরা জানি যে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেনি; এ সত্ত্বেও আমি বুঝি যে একতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির থেকে ইংল্যাণ্ড ভাল এবং ইংরাজ ও ফ্রান্স যুদ্ধে জিতুক এ ইচ্ছা আমি না করে পারিনা।" তিনি আরও বলেছেন, "যে সমস্ত জাতির স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়েছে—পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেক্—তাদের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতির ইচ্ছা যদি দেশের ইচ্ছার প্রতীক হয় এবং ইচ্ছার সঙ্গে যদি কাজের সম্বন্ধ থাকে তবে রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃতি অনুযায়ী ভারতবর্ষকে এ যুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য করতে হয়। জওহরলালের উক্তি ও রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তি আমূল পরিপন্থী। নেতারা যে শুধু আমাদের কর্মপন্থাই দিতে পাচ্ছেন না তা' নয়—আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকেও চালনা করতে পারছেন না।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পরিবর্তন

হল্যাণ্ড আক্রমণের অব্যবহিত পরে চেম্বারলেন মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। এর পূর্বে কমন্স-সভার বিতর্কে ৮১ ভোটের আধিক্যে এই মন্ত্রীসভা কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছিল। নরওয়েতে ইংরাজের পরাজয়ের জন্য শুধু লেবার এবং লিবারেল দল নয় ফরাসী এবং বহু বিদেশী কাগজ চেম্বার-লেনকে দায়ী করেছিল। কাজেই প্রতিপক্ষ দল বলেছিল "জাতীয়" মন্ত্রীসভায় তারা অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু চেম্বারলেনের নেতৃত্বে নয়। নূতন মন্ত্রীসভার নায়ক হয়েছেন—উইনষ্টন চার্চিল। পুরাতন মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে চেম্বারলেনকে এবং লর্ড হ্যালিফকস্‌কে আর লেবার দল থেকে মেজর এ্যাটলি ও গ্রিনউডকে নিয়ে নূতন সমর পরিষদ (war cabinet) গঠিত হয়েছে। রক্ষনশীল

নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন আছে—ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ামে নূতন নেতৃত্বের পরীক্ষা শীগ্‌গীরই হবে। দেখা যাবে ইংরাজের পরাজয়ের জন্য দায়ী চেম্বারলেন—না ভঙ্গুর সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরিণ শক্তিহীনতা।

আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর—

জার্মেনীর হল্যাণ্ড আক্রমণের আশঙ্কা করে আগে থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সতর্কবাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর ভয় হল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থার অছিলা করে জাপান না ডাচ্‌-অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ অধিকার করে বসে। হল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি নতুন করে আমেরিকার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন ইউরোপের পরিস্থিতি যাই হোকনা কেন প্রশান্ত মহাসাগরে তাই নিয়ে প্রাক্‌যুদ্ধ ব্যবস্থার কোন রকম পরিবর্তন তাঁর অভিপ্রেত নয়। জাপানের ইষ্ট-ইণ্ডিজ এর উপর যে প্রবল লোভ রয়েছে তারই উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণীর প্রচার সন্দেহ নেই। এদিকে জাপান আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছে ডাচ্‌-ইষ্ট ইণ্ডিজে জাপানের স্বার্থ এত অধিক ভাবে জড়িত যে এই অঞ্চলে ইউরোপীয় ঘটনার পরিবর্তনে সে তার স্বার্থের বিন্দুমাত্রও হানি সহ্য করেবনা—তার জন্য জাপানী নৌবহর প্রস্তুত রয়েছে। আমেরিকা ও জাপানের পারস্পরিক বিরুদ্ধ স্বার্থ প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল নতুবা উত্তর ও ভূমধ্য সাগরে বিব্রত ব্রিটিশ নৌবহরকে সুদূর প্রাচ্যের তোরণ-রক্ষার জন্য অধিকতর উৎকণ্ঠিত থাকতে হ'তো।

আমেরিকা ও নিরপেক্ষ নীতি

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ,—আমেরিকার ইণ্টার ন্যাশনাল্ ল সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ কর্ডেল হাল আমেরিকাবাসীকে সতর্ক করে বলেন,—"জগতে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। সে বিপদ হইতে আমাদের দেশও নিরাপদ নয়। এই বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করবেনা,—এ আশায় আমরা নিজেদের বঞ্চনা করতে পারি না।

বর্ব্বরযুগসুলভ আন্তর্জ্জাতিক অরাজক অবস্থা আজ দিগ্বলয়ে বিস্তৃত হয়েছে। আমার সুদৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে এই অবস্থা মানব সভ্যতার অস্তিত্ব প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। আমরা নির্লিপ্ত থাকার অথবা অন্যত্র নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা কোরে এই বিপদকে দূরে রাখতে পারবো না। ন্যায় ও শৃঙ্খলার মূলনীতির মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে নৈতিক চাপ দিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে চেষ্টা করবে, তার সমর্থনকল্পে আমেরিকাবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখন যত বড় আকারে দেখা দিয়েছে, পূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ দেখা যায় নি। মিঃ কর্ডেল হাল বলেন,—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা পর্য্যুদস্ত কোরে ন্যায়-নীতি জয়লাভ করবে।

রুজভেল্টের বিজ্ঞান কংগ্রেসের বক্তৃতায় ও এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে। মনে হয় আমেরিকা নিরপেক্ষনীতির মূল কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে। ভবিষ্যতে মিত্রশক্তির অনুকূলে আমেরিকার নৈতিক সহানুভূতি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ কর্বার পূর্বাভাস সূচিত হ'ল কি?

যুদ্ধ ও ইউ. এস্. এস্. আর—

সাধারণ রাজনীতিকের কাছে রুষদেশটা আজ পৌরাণিক স্ফিংস্ এর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রুষ সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক চিহ্ন দুঃস্বপ্নের মত তাদের বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করছে। ফিন্ল্যাণ্ড-বিজয়ী রুষ, পোল্যাণ্ডগ্রাসী রুষ কি লেনিনের রুষ, নিখিল সর্ব্বহারার রুষ? সাম্রাজ্যবাদ কি ছদ্মবেশ ধরে ষ্টালিন্-মোলোটফ্—ভোরোশিলফ্‌কে পথ ভোলবার চক্রান্ত করে নি? উত্তরে মতদ্বৈধের অন্ত নেই। হাঁ ও না সমান জোরেই বলা হচ্ছে।

কিন্তু হাঁ-বাদীরা এই সামান্য কথাটা ভুলে যান যে দেশের সীমান্তকে নিরাপদ করতে না পারলে এই কুরুক্ষেত্রে সোভিয়েটের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর হোতো না। যুদ্ধ সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন-গভর্ণমেন্টের ভবিষ্যতবাণী গুলো প্রায় বর্ণে-বর্ণে সত্য হয়েছে। সম্ভাবিত আক্রমণের জায়গা-গুলোতে নিজেদের ঘাঁটি না বসালে সোভিয়েটকে অনুতাপ করতে হোতো নিশ্চয়ই। স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ায় যুদ্ধের সম্ভাবনাটা বহু রাষ্ট্রবিশারদ দেখেননি, বা দেখেও দেখেননি। ফিনল্যাণ্ড আক্রমণটা সে সময়ে বর্বরোচিত মনে হয়েছিল, ডেভিড ও গোলিয়াথ্ এর এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সে সময়ে বিশ্বের বিবেককে লাঞ্ছিত করেছিল। আজ আমরা ভাল করেই বুঝছি সোভিয়েট-ফিনিশ চুক্তির সার্থকতা কি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, উত্তরে মিত্রশক্তির মর্য্যাদাহানি, বল্টিক অঞ্চলে নাৎসী-নিয়ন্ত্রণ—সবই এই চুক্তির ফলে সম্ভব হয়েছে। উত্তর দিক থেকে সোভিয়েটকে আক্রমণ করার সম্ভাবনাটা যে কাল্পনিক নয় তা ধারে ধারে অনেকেই বুঝতে পেরেছে। অল্প কিছুদিন আগেও এক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ লিখেছিলেন, 'hard blow' না হলে সোভিয়েটকে জব্দ করা যাবে না। প্রয়োজন হবে—'threats of armed action against her Arctic and Black Sea ports, of raids that will interrupt her oil production and distribution, and of rebellion in Cancasia, the Ukraine, and Russian Poland.' এই আশঙ্কা গুলো থেকে নিজেকে বাঁচতে হলে যদি পুঁথি-পত্তরের বাইরে এসে সোভিয়েটকে কিছু কিছু 'real politik'এর আশ্রয় নিতে হয় তবে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুপ্রীম ফেডারেল ও ন্যাশানাল কাউন্সিলের যুক্ত অধিবেশনে মোলোটফ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা' থেকে সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে অনেক আলো পাওয়া গেছে। রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা তাতে নেই। "We must maintain our position of neutrality and refrain from participation in the war of the Great Powers. This policy not only serves the interests of the Soviet Union but also exercises restraining influence upon attempts to kindle and spread the war in Europe.' কথাগুলো অবিশ্বাস করবার পক্ষে বিশেষ

যুক্তি নেই। সোভিয়েটের সাম্যবাদ জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বিশ্বমানবের কল্যাণই তার লক্ষ্যস্থল, আন্তর্জাতিকতার দিকেই তার চোখ ফেরানো।

বাংলায় পাট সমস্যা—

৬ই মের দার্জিলিংএর খবরে প্রকাশ যে পাট ও হেসিয়ানের বর্তমান উচ্চ মূল্য যাতে বজায় থাকে তার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট একটি ব্যাপক পরিকল্পনা বিবেচনা করছেন। ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যক্ষ ভাবে বা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের মারফতে অতিরিক্ত পাট ক্রয় এবং ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে রায়তদিগকে শিক্ষাদান এই চতুর্বিধ উপায় অবলম্বন উক্ত পরিকল্পনার আলোচ্য বিষয়। বিশেষজ্ঞরা ইহাও মনে করেন যে পাটের বর্তমান মূল্য যদি ন্যূনতম মূল্য বলিয়া স্বীকৃত হয় তা'হলেও পাটের পরিবর্তে অন্য কোন দ্রব্যের প্রচলন হওয়া সম্ভবপর নয়। গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা যে তাহাদের পরিকল্পনায় চাষী ও মিলমালিক উভয়ের স্বার্থ তুল্যভাবে সংরক্ষিত হতে পারবে। অথচ পাটের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের প্রচলন যাতে হ'তে না পারে তারা সে সম্বন্ধে ও সচেতন থাক্‌বেন।

পরবর্তী খবরে প্রকাশ বাংলা গবর্ণমেণ্ট পাটের নিম্নতম মূল্য ১২৲ টাকা ও হেসিয়ানের ১৩৲ টাকা নির্ধারণ করতে মনস্থ করেছেন মিলমালিকরা ব্যবস্থাটাকে প্রফুল্লমনে মেনে নিতে পারবেন না; ইতি মধ্যে প্রতিবাদে স্মারকলিপি পাঠাবার তোড়জোড় হচ্ছে। সেই পুরানো মামুলি যুক্তি Laissez Faire যে ক্ষেত্র বিশেষে অচল ইংরেজ বণিককে সে কথা নতুন করে বলে দেওয়া দরকার।

মৌলবী মুজিবর রহমান

গত ১০ই বৈশাখ শুক্রবার ৭১ বৎসর বয়সে প্রবীন জাতীয়তাবাদী জননেতা ও খ্যাতিমান সাংবাদিক মৌলবী মুজিবর রহমান পরলোক গমন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের রক্তিম উষায় বাঙ্গালী হিন্দুর সাথে হাত মিলিয়ে দেশের কাজে অনন্যব্রত হ'য়ে যাঁরা নেমেছিলেন এমন অহিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী নয় তাই আজ দেশ-ব্রতী মুজিবর রহমানের অভাব অধিকতর তীব্র ভাবে বাংলার বুকে বাজ্‌বে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করে ১৯০৬ সালে 'দি মুসলমান' পত্রের ম্যানেজাররূপে সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করেন এবং অনতিকাল মধ্যে ঐ পত্রের সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের কার্যকালে মুজিবর রহমান তাহার সহযোগিতা করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিশ্বস্ত সহকর্মীদের তিনি অন্যতম। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে সে সময় তাঁকে কারাবরণ করতে হ'য়েছিল। ১৯৩১ সালে ক'লকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদে নির্বাচিত ক'রে পৌর-প্রতিনিধির যথাযোগ্য সম্মান দান করা হয়। মৃত্যুর দু'বৎসর আগে থেকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হ'য়ে তিনি স্বীয় পৈতৃক ভিটাতে বাস করছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাহার দান আপনার গৌরবের মহিমায় ভাস্বর হ'য়ে থাকবে।

রবীন্দ্র জন্মতিথি—

দেশব্যাপী যে রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব হয়ে গেল, আমরাও তাতে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। যে লোকোত্তর প্রতিভা মর্মে মর্মে প্রবেশ করে' আমাদের প্রাণবান করে রেখেছে, আমাদের অন্তরকে রূপে রসে ভরিয়ে দিয়েছে, আমাদের কৃষ্টিকে, সাধনাকে মুখর করে তুলেছে, আমাদের ধ্যানকে মূর্তির মাঝে লীলায়িত করেছে, আমরা তাকে স্মরণ করে' প্রণাম জানাই। কবির বয়সে নেই, তাঁর আয়ু—"নাই সে কেবল দিন-গণনার পুঁথির পাতায়, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।" দেশ-কালকে অতিক্রম করে' তাঁর জীবন আপন মহিমায়, আপন সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই দিক থেকে তাঁর সাম্বৎসরিক আয়ু গণনার সার্থকতা নেই। তবুও, নির্বিশেষ থেকে বিশেষে স্মৃতিকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে, সমগ্র মননা নিয়ে বলা যে "আমরা ধন্য হয়েছি,"—এর একটা আকর্ষণ আছে সহজ-পৌত্তলিক মানব-হৃদয়ের নিভৃতে। কবির কথা ঝঙ্কারে বেজে উঠছে,—"চির নূতনেরে দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ।—"